আরব্য উপন্যাস

সচিত্র গার্হস্থ্য সংস্করণ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম রজনী

শাহরিয়ার

দিনারজাদী ও শাহারজাদী

সাকী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল—

(দুই ফকির ও বাগদাদনগরের তিন রমণীর কথা)

প্রকাশকের নিবেদন

'আরব্য উপন্যাস' প্রাচ্য আখ্যানরীতির এক অভিনব নিদর্শন। আখ্যানের সঙ্গে আখ্যান গেঁথে তৈরি হয় এর গল্পের ভুলভুলাইয়া। কিন্তু যে-জীবনবোধ প্রকাশ পায় এই আখ্যানমালায়, অল্পবয়সীদের উপভোগের অনুকূল নয় সে-দর্শন। অথচ তার কথারসের আকর্ষণও উপেক্ষণীয় নয় তাদের কাছে। সম্পাদকশ্রেষ্ঠ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাই 'আরব্য উপন্যাসে'র পুনঃকথন করেছিলেন সাবলীল ভাষায়।

বইটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখেছিলেন, 'আপনার সম্পাদিত বাংলা আরব্য উপন্যাস উপহার পাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি পূর্বেই ইহা ক্রয় করিয়া আমার পরিবারস্থ বালক বালিকা ও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবকাশ কালে পড়িবার জন্য দিয়াছি — ইহা হইতেই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন। জগতে কথা-গ্রন্থের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের তুলনা পাওয়া যায় না — অথচ নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি গৃহস্থ ঘরে রাখা যায় না। আপনি সংশোধিত আকারে বাংলায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শিশুপাঠ্য সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থ শিশুসম্প্রদায়ের পিতামাতারও মনোরঞ্জন করিবার যোগ্য।' ('চিঠিপত্র' ১২,

সুধাংশুশেখর দে

এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ একমনে কোরাণ পড়িতেছেন……

[জোবেদীর কথা]

ঐ পাখী আমাকে লইয়া আকাশে উড়িল······

[সিন্দবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্রা]

আরব্য উপন্যাস

বেদরুদ্দীনকে ধন্যবাদ দিয়া নিজেদের তাঁবুর দিকে চলিল।
(নুরুদ্দীন আলি ও বেদরুদ্দীন হুসেন)

মেয়েটি আবার গান করিতে আরম্ভ করিল···
(নিদ্রোত্থিতের কথা)

বিষয়-সূচী

স্থানটি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল।
(পারস্য দেশীয় তিন ভগিনীর কথা)

একবর্ণ চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

মায়াময় অশ্ব

তখন দানহাস ও কাশকাশ ঘুমন্ত রাজকুমারীকে তুলিয়া লইয়া—
(কামারলজমান ও বেদৌরার কথা)

বহুবর্ণ চিত্র-সূচী

আরব্য উপন্যাস

উপক্রমণিকা

শাহরিয়ার ও তাঁহার রাণী

সেকালে পারস্যদেশে শাহরিয়ার নামে এক সুলতান ছিলেন। তিনি তাঁহার এক রাণীকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ রাণীকে অত্যন্ত দুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পারস্যদেশের তখনকার নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার হুকুম পালন করিলেন। রাণীর প্রাণ গেল। এ দিকে রাজা শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল যে, সব মেয়েই তাঁহার রাণীর মত দুষ্ট; সুতরাং জগতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত কমে, ততই ভাল। এইজন্য তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক-একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে লাগিলেন এবং পরদিন সকালে প্রধান মন্ত্রীর সম্মুখে তাহাদের ফাঁসী হইতে লাগিল। প্রতিদিন এক-একটি স্ত্রী জুটাইবার ভার প্রধান মন্ত্রীর উপর ছিল। তিনি বড়ই অনিচ্ছার সহিত এই কাজ করিতেন; কিন্তু সুলতানের হুকুম অগ্রাহ্য করিতে তাঁহার সাহস হইত না। সুতরাং প্রতিদিন একটি মেয়ের বিবাহ হইত এবং একটির প্রাণ যাইত।

এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার কথা ক্রমে ক্রমে সব জায়গায় ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্য-মধ্যে সুলতানের অত্যন্ত নিন্দা উঠিল এবং প্রজারা ভয় পাইয়া নিজেদের মেয়েদের লইয়া মহা বিপদে পড়িল। চারিদিকে হায় হায় শব্দ;—কোন স্থানে বাবা মেয়ের শোকে ব্যাকুল হইয়া দিনরাত কাঁদিতেছেন; কোথাও বা মা অভাগিনী মেয়েদের কপালে কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়া ভয়ে অস্থির হইতেছেন। কেহ কেহ বা পারস্যদেশ ছাড়িয়া অন্যদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

যে রাজমন্ত্রী সুলতানের হুকুমে এই ভয়ানক অত্যাচারে প্রভুর সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহার দুই মেয়ে ছিল; বড়টির নাম শাহারজাদী, ছোটটির নাম দিনারজাদী। ছোট মেয়েটি খুব গুণবতী ছিলেন; কিন্তু বড়টির বুদ্ধি বিবেচনা আর সাহস এমন ছিল, যে, মেয়েদের মধ্যে তেমন প্রায় দেখা যায় না। ঐ মেয়েটি খুব লেখা-পড়া

শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার এমন মনে রাখিবার ক্ষমতা ছিল যে, যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিয়া যাইতেন না। তা ছাড়া এই মেয়েটি খুব সুন্দরী আর ভাল ছিলেন; তাই মন্ত্রী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। একদিন সকলে একসঙ্গে বসিয়া নানা বিষয়ের কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে শাহারজাদী তাঁহার বাবাকে বলিলেন, "বাবা! আপনার কাছে আমি একটা জিনিষ চাইব, যদি দেন, তা'হলে খুব খুসী হব।" মন্ত্রী কহিলেন, "বাছা, কি চাও বল; দেবার মত হলে নিশ্চয়ই দেব।" শাহারজাদী বলিলেন "শুনেছি আমাদের রাজা প্রতিদিন এক-একটি মেয়েকে মেরে ফেলেন। তাতে তাদের মায়েরা বড়ই কষ্ট পান। আমি তাঁদের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্যে এক উপায় ঠিক করেছি।" মন্ত্রী বলিলেন, "তোমার এই ইচ্ছা ভাল বটে, কিন্তু তুমি কি উপায়ে ঐ উৎপাত দূর কর্‌বে?" শাহারজাদী বলিলেন, "সুলতানের কনে ত আপনিই রোজ ঠিক করেন। একদিন আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিন, এই আমার ইচ্ছা।"

মন্ত্রী এই কথা শুনিবামাত্র খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি পাগল হয়েছ, যে, ইচ্ছা করে এমন কাজ কর্‌তে চাও? তুমি কি জান না, যে, রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, রাত্রে যাকে বিয়ে কর্‌বেন, রাত্রি শেষ হলে তাকে মেরে ফেল্‌বেন? তবে তুমি কি সাহসে তাঁর রাণী হতে চাও? সাবধান, আর কখনও এমন কথা মুখে এনো না।" মন্ত্রীর মেয়ে বলিলেন, "বাবা! এতে যে বিপদ হতে পারে, তা আমি বেশ জানি। পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে প্রাণ গেলে কিছুমাত্র নিন্দা হবে না, কিন্তু যদি কোনও রকমে আমি এই মেয়ে-খুন-করা বন্ধ কর্‌তে পারি তা' হলে চিরকাল আমার সুনাম থাকবে।" মন্ত্রী বলিলেন, "তুমি নিজের জেদ বজায় রাখ্‌বার জন্যে যা খুসি বল, কিন্তু তুমি মোটেই মনে কোরো না যে, তোমার কথায় ভুলে আমি নিজে তোমাকে যমের হাতে সঁপে দেব। যখন সকালে রাজা আমাকে রাণীর মাথা কাট্‌তে হুকুম দেবেন, বাধ্য হয়ে আমাকে তাঁর হুকুম পালন কর্‌তে হবে। কাজেই বাবা হয়ে নিজের হাতে মেয়েকে মার্‌বার সময় আমার মনের কি অবস্থা হবে, বাছা, তা একবার ভেবে দেখ দেখি।" শাহারজাদী বলিলেন, "দোহাই বাবা! আপনাকে হাত জোড় করে বল্‌ছি, আমাকে এ বিষয়ে নিরাশ কর্‌বেন না।" মন্ত্রী বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কেন বার বার জেদ কর্‌ছ?"

মন্ত্রী যখন দেখিলেন মেয়ে কিছুতেই ছাড়িল না, তখন তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আজ রাত্রে আমার বড় মেয়ে শাহারজাদী আপনার রাণী হবেন।" রাজা অবাক্ হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সত্য-সত্যই আমার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মেয়ের একদিন রাণী

হবার বড় সাধ; এতে প্রাণ যায়, তাও স্বীকার।" রাজা বলিলেন, "তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কাল যখন আমি তোমাকে তার মাথা কেটে ফেল্‌তে হুকুম কর্‌ব তখন তোমাকে আমার কথা শুন্‌তেই হবে।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, নিজের হাতে মেয়েকে মেরে ফেলা বাবার পক্ষে যদিও একেবারেই অনুচিত, তবুও প্রভুর হুকুম অগ্রাহ্য কর্‌বার নয়; কাজেই তা আমাকে নিশ্চয়ই পালন কর্‌তে হবে।" ইহা বলিয়া মন্ত্রী বাড়ী গিয়া মেয়েকে ঐ সমস্ত কথা জানাইলে তিনি খুব খুসী হইয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন। মেয়ের প্রাণ যাইবার ভয়ে মন্ত্রী বড়ই দুঃখিত হইয়া রহিলেন।

শাহারজাদী রাজার সহিত দেখা করিবার মত পোষাক পরিয়া ও সাজগোজ করিয়া, আপনার ছোট ভগিনী দিনারজাদীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "স্নেহের ভগিনী! একটি কঠিন কাজে তোমাকে আমার সাহায্য কর্‌তে হবে, আমি অনুরোধ কর্‌ছি তাতে কখনও অরাজী হয়ো না। তুমি শুনে থাক্‌বে, আজ রাত্রে রাজার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি মহারাজের অনুমতি নিয়ে তোমাকে শোবার ঘরেই রাখ্‌ব। তুমি ভোর হবার একঘণ্টা আগে বিছানা থেকে উঠে আমাকে বল্‌বে, 'দিদি! যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, তা হলে তুমি অন্য দিনের মত আমাকে একটি সুন্দর গল্প বল।' তখন আমি একটি খুব সুন্দর গল্প আরম্ভ কর্‌ব; আর আশা করি সেই গল্পের জোরে এই রাজ্যে রোজ যে ভয়ানক অন্যায় কাজ হচ্ছে, তা বন্ধ কর্‌তে পার্‌ব।" দিনারজাদী বোনের এই চমৎকার উপায়ের অনেক প্রশংসা করিয়া নিজে সেই অনুসারে চলিতে তখনই স্বীকার করিলেন।

মন্ত্রী সন্ধ্যায় সময় রাজার হাতে পরম আদরের মেয়েকে সঁপিয়া দিয়া দুঃখিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রাজা শুইবার ঘরে ঢুকিয়া মন্ত্রীর মেয়েকে ঘোমটা খুলিতে বলিলেন। তিনি ঘোমটা খুলিলে রাজা তাঁহার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া অবাক হইলেন, এবং তাঁহার চোখে জল দেখিয়া তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নূতন রাণী কহিলেন, "মহারাজ! আমার একটি ছোট বোন আছে। আমি তাকে বড়ই ভালবাসি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, এইজন্যই আমি কাঁদ্‌ছি। যদি মহারাজ আজ রাত্রে তাকে এই ঘরে শুয়ে থাক্‌বার অনুমতি দেন, তা হলে আমি মরবার আগে আর-একবার বোনের মুখ দেখে পরম সুখে মর্‌তে পারি।" রাজা মন্ত্রীর মেয়ের এই কথায় রাজী হইয়া তখনই দিনারজাদীকে সেইখানে আনাইলেন। তারপর শাহারজাদী রাজার সহিত অনেক হীরকমুক্তামাণিক-বসান এক উচ্চ পালঙ্কে শুইয়া রহিলেন। দিনারজাদী তাহার পাশে নীচে আর-এক বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন। ভোর হইবার এক ঘণ্টা আগে দিনারজাদী উঠিয়া বলিলেন, "দিদি, যদি তোমার ঘুম ভেঙ্গে থাকে, তা হলে একটু কষ্ট করে আমাকে আগের মত একটি অদ্ভুত গল্প বলে জন্মের মত সুখী

তিনি ঘোম্‌টা খুলিলে রাজা তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন

কর।" শাহারজাদী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি বলেন?" রাজা কহিলেন, "আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প বল।" শাহারজাদী রাজার অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্প আরম্ভ করিলেন।

বণিক্ ও দৈত্যের কথা

মহারাজ! অনেকদিন আগে কোন দেশে এক সওদাগর বাস করিতেন। তাঁহার অনেক টাকাকড়ি ও জমীজায়গা ছিল। তিনি নানা দেশ ঘুরিয়া কেনা বেচা ও ধার-দেওয়া প্রভৃতি ব্যবসা করিতেন। একদিন ঐ বণিক্, কোন বিশেষ কারণে দূরদেশে যাইবার দরকার হইলে, পথে পাছে কোন খাবার জিনিস না পাওয়া যায় এই ভয় করিয়া এক ক্ষুদ্র থলিয়াতে কয়েকটি রুটি ও কতকগুলি খেজুর লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন ও নিরাপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজের কাজ শেষ করিলেন। বাড়ী ফিরিবার সময় তিনি একদিন রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া ময়দানে একটি ঝরণার নিকটে ঘোড়া হইতে নামিয়া

বিশ্রাম করিলেন। পরে থলিয়া হইতে রুটি ও খেজুর বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং খেজুরের আঁঠিগুলা দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। খাইবার পর হাত পা ধুইয়া নামাজ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা বিকটাকার বৃদ্ধ খাঁড়া হাতে তাঁহার সামনে আসিয়া বলিল, "তোমার হাতে আমার ছেলে মারা গেছে, কাজেই আমিও তোমাকে মেরে ফেল্‌ব।" বণিক্ তাহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "আমি আপনার ছেলেকে কি করে মেরে ফেল্‌লাম? আমি তাহাকে কখনও চোখে দেখিনি।" দৈত্য বলিল, "তুমি খেজুর খেয়ে আঁঠিগুলো এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেল্‌ছিলে কি না?" বণিক্ বলিলেন; "হাঁ আমি ফেল্‌ছিলাম।" দৈত্য বলিল, "তখন আমার ছেলে ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা খেজুরের আঁঠি তার চোখে ঢুকে যাওয়ায় সে মারা গেছে।" সওদাগর কাতর হইয়া বলিলেন, "হে দৈত্যরাজ! যদি তা'তে আপনার সন্তানের প্রাণ গিয়ে থাকে আমি না-জেনে এই কাজ করেছি, আমার এ বিষয়ে কোন দোষ নেই, আমাকে ক্ষমা করুন।" দৈত্য বলিল, "না, কখনও তা হবে না। তুই আমার ছেলেকে মেরেছিস্ আমিও তোকে মার্‌ব।" ইহা বলিয়া ভয়ানক রাগিয়া জোরে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিবার জন্য প্রকাণ্ড খাঁড়া উঁচু করিয়া তুলিল। বণিক্ খুব ভয় পাইয়া তাঁহার যে কোনও দোষ নাই তাহা প্রমাণ করিয়া নিজ জীবন রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোনো ফল হইল না।

যখন বণিক্ দেখিলেন দৈত্য তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলে, আর দেরি নাই, তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "হে দৈত্যেশ্বর! আমাকে মার্‌বেন বলে যদি নিতান্তই ঠিক করে থাকেন, তা হলে, আমাকে দয়া করে অন্ততঃ এক বছরের জন্যে ছেড়ে দিন। আমি সেই সময়ের মধ্যে বাড়ী গিয়ে বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা আর ধার-টার শোধ করে, স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসি। তার পর, আপনার যা ইচ্ছা হয় কর্‌বেন। আমি আপনাকে মিনতি করে বল্‌ছি এখন আমাকে মেরে ফেল্‌বেন না।" দৈত্য বলিল, "তুমি যে ফিরে আস্‌বে, তা কি করে বিশ্বাস করা যায়?" সওদাগর বলিলেন, "আমি শপথ করে বল্‌ছি, এক বৎসরের মধ্যে আবার আমি এই জায়গায় এসে হাজির হব।" দৈত্য ঐ শপথের উপর নির্ভর করিয়া তখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। বণিক্ বিষণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বাড়ী আসিবামাত্র তাঁহার বাড়ীর সব লোকজন খুবই খুসী হইল; কিন্তু বণিক্‌কে বিমর্ষ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী বিস্তর অনুনয় করিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক্ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ঐ ভয়ানক কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী আর বাড়ীর অন্য সকল লোকই খুব দুঃখিত হইল। তারপর বণিক্ তাঁহার সকল ধনসম্পত্তির ভাল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আপনার ধার শোধ ও আদায়, বন্ধু-বান্ধবদিগকে উপহার দেওয়া,

গরিব লোকদের টাকা দেওয়া, দাসদাসীদিগের দাসত্ব দূর করিয়া দেওয়া, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ এবং মরিবার আগে মানুষ আর যা-কিছু কাজ করে সবই করিলেন। পরে একবৎসর কাটিয়া গেলে, তিনি শোক-বসন পরিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই জায়গায় গেলেন। সেখানে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া ঝরণার নিকট বসিয়া তিনি দৈত্যের আসিবার অপেক্ষায় আছেন, এমন সময়, একজন বৃদ্ধ একটি হরিণী সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইজনে একটু কথাবার্ত্তার পর ঐ বৃদ্ধ বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তুমি কিজন্যে এই ভয়ানক জায়গায় একলা বসে আছ? এই জায়গায় যত ভীষণ দৈত্যের আড্ডা, এখানে লোকজন কখনও আসে না, এখানে এলে প্রাণ যাবার খুবই সম্ভাবনা আছে, তা কি তুমি জান না?" ঐ কথায় বণিক্ তাঁহাকে নিজের আসিবার কারণ বলিলেন। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া অবাক্ হইয়া "দৈত্য আসিলে কি হয় দেখা যাক"—এই ভাবিয়া তাঁহার একটু দূরে বসিয়া রহিলেন।

গল্পের এই পর্য্যন্ত বলিয়া শাহারজাদী কহিলেন, "মহারাজ! ভোর হল, এখন গল্প বন্ধ থাকুক, এর পরে আরও অনেক অদ্ভুত কথা আছে।" রাজা গল্পের বাকীটুকু শুনিবার ইচ্ছায় সেদিন তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার কোন হুকুম দিলেন না।

পরদিনও ভোর হইবার একটু আগে দিনারজাদী গল্প শুনিতে চাহিলেন, শাহারজাদী আবার গল্প আরম্ভ করিলেন। এইরূপে প্রতিদিন শাহারজাদী ভোরে গল্প আরম্ভ করিয়া সূর্য্য উঠিলে গল্প শেষ হইবার আগেই বন্ধ করেন। এবং প্রতি রাত্রির শেষে দিনারজাদী এইরূপ গল্প শুনিবার প্রার্থনা করেন। রাজাও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শাহারজাদীর প্রাণদণ্ড প্রত্যহ স্থগিত রাখিয়া দিনের পর দিন ক্রমাগত এইরূপ গল্প শুনিতে লাগিলেন।—

বণিক্ এবং ঐ বৃদ্ধ এক জায়গায় বসিয়া কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে আর-একজন বৃদ্ধ দুইটি কালো রঙের কুকুর লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আসিবামাত্র বণিক এবং প্রথম বৃদ্ধ তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখানে এ-রকম ভাবে বসে কি কর্‌ছেন?" প্রথম বৃদ্ধ বণিকের মুখে তাঁহার বিপদের বিষয় যেমন শুনিয়াছিলেন, অবিকল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আজ এঁকে মেরে ফেল্‌বার দিন; কাজেই দৈত্য এলে এঁর কি দশা হয়, তাই দেখ্‌বার জন্যে আমি এইখানে বসে আছি।" তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় বৃদ্ধও দৈত্যের আসিবার অপেক্ষায় সেইখানে বসিয়া রহিলেন। তারপর ঐ তিনজনে একসঙ্গে বসিয়া কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে আর-একজন বৃদ্ধ সেইখানে আসিয়া বণিক্‌কে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া তাঁহার কাছে যাঁহারা বসিয়াছিলেন সেই দুই বৃদ্ধকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা খুলিয়া বলিলেন। তাহাতে ঐ বৃদ্ধও কি হয় তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া বসিলেন।

বণিক ও তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে
হঠাৎ একটা ধোঁয়ার মত দেখা গেল

এইরূপে বণিক্ ও তিনজন বৃদ্ধ একসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মাঠের একদিকে হঠাৎ একটা ধোঁয়ার মত দেখা গেল; ঐ মেঘ ক্রমেই তাঁহাদিগের নিকটে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই ঐ প্রকাণ্ড ধোঁয়ার থাম মিলাইয়া গেল; এবং তাহার ভিতর হইতে সেই দৈত্য হাতে খড়্গ লইয়া বাহির হইল এবং অপরিচিত বৃদ্ধ তিনজনের দিকে না তাকাইয়া বণিকের হাত ধরিয়া বলিল, "ওরে শীঘ্র ওঠ্, তুই যেমন আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিস, তেমনি আমিও তোকে যমের বাড়ী পাঠাব।"

বণিক্ এবং ঐ তিনজন বৃদ্ধ দৈত্য দেখিয়া খুব ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর প্রথম বৃদ্ধ যখন দেখিলেন দৈত্য বণিক্কে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলে, আর দেরি নাই, তখন তিনি দৈত্যের পায়ে পড়িয়া বলিলেন, 'হে দৈত্যরাজ! আমি জোড়হাত করে প্রার্থনা করছি, আপনি রাগ দূর করে আমার আর এই হরিণীর

গল্প শুনুন। হে দানবেন্দ্র, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, যদি এই গল্প বণিকের গল্পের চেয়ে বেশী অদ্ভুত বোধ হয়, তা হলে আপনি অনুগ্রহ করে বণিকের দোষের তিন ভাগের এক ভাগ ক্ষমা করবেন।” দৈত্য খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “ভাল, রাজী হলাম, তোমার কি গল্প শীঘ্র বল।”

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা

বৃদ্ধ বলিলেন, “হে দৈত্যরাজ! এই যে আমার সঙ্গে একটি হরিণীকে দেখিতেছেন, ইহা বাস্তবিক হরিণী নয়, এ আমার কাকার মেয়ে ও আমার স্ত্রী; যখন ইহার বার বৎসর বয়স, তখন ইহার সহিত আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর বিশ বৎসর আমি ইহার সঙ্গে একসঙ্গে কাটাইলাম, এত দিনের মধ্যে ইহার সন্তান-সন্ততি কিছুই হইল না। কিন্তু তাহার জন্য আমি কখনও আমার স্ত্রীকে অশ্রদ্ধা করি নাই। শেষে এক দাসীর ছেলেকে পোষ্যপুত্র লইলাম। তাহার পর হইতে আমার স্ত্রী হিংসা করিয়া ঐ ছেলেটি ও তাহার মাকে বড়ই ঘৃণা করিত। কিন্তু আমি তাহা পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতাম না। ক্রমে ছেলেটি যখন বিশ বৎসরের হইল, তখন কোন দরকারী কাজের জন্য আমার বিদেশ যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, আমার স্ত্রীর হস্তে ছেলেটির আর তাহার মায়ের সকল ভার দিয়া এক বৎসরের নিমিত্ত বিদায় হইলাম। ইতিমধ্যে আমার এই স্ত্রী তাহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য জাদুবিদ্যা শিখিয়া, তাহার বলে আমার ছেলেকে ভেড়ার ছানা ও তাহার মাতাকে ভেড়া করিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, “আমি এই দুটিকে কিনে এনেছি, তুমি ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে এদের মোটা কর।”

এক বৎসর পরে আমি বাড়ী আসিয়া ছেলেটিকে ও তাহার মাকে না দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তারা কোথায়?” সে উত্তর করিল, “দাসী মরে গিয়েছে এবং দুইমাস হল তোমার পোষ্যপুত্র বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে।” দাসীর মৃত্যুসংবাদে আমি দুঃখিত হইলাম, কিন্তু খোঁজ করিলে ছেলেটিকে আবার পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ আশার উপর নির্ভর করিয়া আটমাস পর্য্যন্ত তাহার খোঁজ করিলাম, কিন্তু অবশেষে আমার সে আশা একেবারে বিফল হইল। তারপর ঈদ পর্ব্বের দিনে একটা মোটাসোটা ভেড়া কাটিতে ইচ্ছা করিয়া রাখালকে একটা ভাল দেখিয়া ভেড়া আনিতে বলিলাম। বলিবামাত্র রাখাল একটা খুব মোটাসোটা ভেড়া আনিয়া হাজির করিল। আমি উহাকে বাঁধিলাম, কিন্তু যখন তাহার গলা কাটিতে গেলাম, তখন সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল ও তাহার চোখ দিয়া জল

পড়িতে লাগিল। তাহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম ও আমার দয়াও হইল, কাজেই তাহাকে কাটিতে না পারিয়া তাহাকে তখনই ছাড়িয়া দিলাম এবং রাখালকে অন্য একটি ভেড়া আনিতে বলিলাম। আমার স্ত্রী তখন কাছেই ছিল। পাপীয়সী যখন দেখিল আমার মনে দয়া হওয়াতে তাহার মতলব মাটি হইতে বসিয়াছে, তখন সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি করেন কি, এমন ভাল ভেড়া আর কোথায় পাবেন? এইটিকেই কাটুন।" কি করি! স্ত্রীকে খুসী করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐ ভেড়াটাকে কাটাই ঠিক করিলাম। কিন্তু নিজে কাটিতে না পারিয়া রাখালের হাতে তাহাকে দিয়া আসিলাম। রাখাল আমার কথামত ভেড়াটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া কাটিয়া ফেলিল। পরে যখন তাহার গা হইতে চামড়া ছাড়ান হইল, তখন দেখা গেল যে, তাহার শরীরে কেবলই হাড়। তাহাতে আমি বিরক্ত হইয়া রাখালকে বলিলাম, "এই মাংসহীন ভেড়ার কোন দরকার নেই। যদি একটি মোটাসোটা বাচ্চা থাকে, তা হলে এর বদলে তাকেই নিয়ে এস।"

রাখাল এই কথা শুনিবামাত্র ভেড়াটিকে সেখান হইতে লইয়া চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আমার স্ত্রী তাহাকে যে বাচ্চাটি দিয়াছিল সেই বাচ্চাটিকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনে দয়া হইল। ভেড়ার বাচ্চাটিও আমাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া কাছে আসিবার জন্য গলার দড়িটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমার পায়ে আসিয়া পড়িল এবং নানাপ্রকারে সে যে আমার ছেলে ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিল। মানুষের আপন ছেলের প্রতি যে স্নেহ থাকে সেই স্নেহে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ভেড়ার ছানাটির কাতরতা দেখিয়া তাহাকে কাটিতে আমার কিছুতেই হাত উঠিল না। আমি রাখালকে বলিলাম, "এ বাচ্চাটি রেখে অন্য একটিকে নিয়ে এস।" আমার দুষ্ট স্ত্রী ইহা শুনিবামাত্র ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, "নাথ, করেন কি? এমন সুন্দর বাচ্চাকে কখনও ছাড়তে আছে?" আমি এই কথার আর উত্তর না দিয়া স্ত্রীর মন জোগাইবার জন্য ঐ বাচ্চাটাকেই কাটিতে গেলাম, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চাটা আমার দিকে এমন কাতরভাবে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিল যে, তা দেখিয়া আমি শোকে দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলাম ও আমার হাত হইতে অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল। তারপর স্ত্রীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "আসছে বছর ঈদের সময় এই বাচ্চাটা বলি দেবো, এখন আর একটা বাচ্চা কাটা যাক্।" ইহা বলিয়া আর একটা বাচ্চা মারিলাম।

পরদিন সকালে আমি একলা বসিয়া আছি এমন সময় রাখাল আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মহাশয়কে গোপনে একটি বিষয় নিবেদন করতে চাই। বোধ হয় তা শুনে আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। প্রভু! আমার একটি মেয়ে আছে। সে খুব ভাল জাদু জানে। কাল আপনি যে ভেড়ার বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দিলেন, তাকে যখন আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার মেয়ে তাকে দেখে একটু হাসল, আবার তার পরেই খুব জোরে কাঁদতে লাগল। আমি এর কিছুমাত্র মানে বুঝতে না পেরে

মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি একই সময়ে এমন করে হাস্‌লে আর কাঁদ্‌লে কেন?' মেয়ে উত্তর দিল, 'বাবা! যে ভেড়ার বাচ্চাটা আপনার সঙ্গে ফিরে এল, সে আমাদের জমিদারের পোষ্যপুত্র। একে মারতে গিয়েও যে প্রভু ছেড়ে দিয়েছেন, এই আনন্দে হাস্‌লাম; কিন্তু এর মা ভেড়া হয়ে প্রভুর হুকুমে মারা গেলেন ভেবে শোকে কেঁদে উঠ্‌লাম।' মেয়ে আরও বল্‌ল যে, 'আমাদিগের প্রভুর স্ত্রী হিংসেতে জাদু করে ক্রীতদাসী ও তার ছেলের এই অবস্থা করে দিয়েছিলেন।"

হে দৈত্যেশ্বর! আপনি ভাবিয়া দেখুন, এই সংবাদ পাইয়া আমার কি-রকম আশ্চর্য্য হওয়া সম্ভব। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তৎক্ষণাৎ রাখালের মেয়ের সঙ্গে নিজে কথা বলিবার জন্য রাখালের বাড়ীতে গেলাম। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে গোয়াল-ঘরের যেদিকে আমার ছেলে বাঁধা ছিল, সেই দিকে গিয়া ভেড়ার ছানার রূপধারী আমার ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে যদিও আর-কিছু করিতে পারিল না, তবুও আকার ও ইঙ্গিতে এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সে যে আমার সন্তান সে-বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তারপর রাখালের মেয়েটি সেখানে আসিলে তাহাকে বলিলাম, "আমার ছেলে যেমন মানুষ ছিল, যদি তাকে ঠিক সেইরকম করে দিতে পার, তা হলে, তোমাকে আমার যত টাকাকড়ি আছে সমস্তই দেবো।" মেয়েটি ইহা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাদের প্রভু, আপনার খেয়ে আমরা মানুষ হয়েছি, আপনার হুকুম আমাদের মাথায় করে নেওয়া উচিত। তবুও আমার দুটি পণ আছে; তা পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞা করলে, আপনার ছেলেকে মানুষ করে দেবো। প্রথম পণ এই যে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন; দ্বিতীয় পণ এই যে, যে ওকে ভেড়ার বাচ্চা বানিয়ে রেখেছে, আমি তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো, তাতে আপনি কিছু বাধা দিতে পারবেন না।" আমি বলিলাম, 'যে আমার এমন উপকার করবে তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেওয়া আর কি বেশী কথা। বরং আমি আনন্দের সঙ্গে আরও স্বীকার করছি যে, বিয়ের সময়ে আমি তোমাকে যৌতুক-স্বরূপ অনেক টাকা দেবো। আর আমার স্ত্রী যখন এমন কুকাজ করেছে, তখন তাকেও উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। মেয়ে-মানুষকে মেরে না ফেলে অন্য-কোনরকমে শাস্তি দেওয়া হয়, এই আমার ইচ্ছে।"

রাখালের মেয়ে ইহা শুনিয়া তখনই একটি জলপূর্ণ পাত্র লইয়া কতকগুলি অজানা মন্ত্র বলিতে লাগিল, এবং কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার করিয়া বলিল "ওগো ভেড়ার বাচ্চা! যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমাকে ভেড়া করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তুমি এই অবস্থায়ই থাক, আর যদি মানুষ হইয়া কোন কুহকিনীর জাদুবিদ্যার বলে ভেড়ার রূপ ধারণ করিয়া থাক তবে মুহূর্ত্তমাত্রেই ঈশ্বরপ্রসাদে আবার মানুষের রূপ ফিরিয়া পাও।" মেয়েটি এই বলিয়া সেই জলের পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া আমার ছেলের গায়ে ছিটাইয়া দিবামাত্র সে ভেড়ার রূপ ছাড়িয়া আগেকার মত মানুষের

রূপ ধরিল। আমি আমার ছেলেকে এতকাল পরে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া বলিলাম, "বাছা! যে মায়াবিনী জাদুবিদ্যার জোরে তোমাকে আর তোমার মাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল সেই পাপীয়সীকে শাস্তি দিবার জন্য আর তোমাদের এই দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধার করবার জন্য পরমেশ্বর এই মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন। এখনি সেই পাপিষ্ঠা কুহকিনীর উচিত শাস্তি দেওয়া যাবে। এখন এই মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে, কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তোমার সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে দেবো।" আমার ছেলে খুসী হইয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল, কিন্তু সেই রাখালের মেয়ে তাহাদিগের বিবাহের আগে মন্ত্রের দ্বারা আমার স্ত্রীকে হরিণী বানাইয়া দিল। সেই হরিণী এই আমার সঙ্গে রহিয়াছে।

কিছুকাল পরে আমার পুত্রবধূ মারা যাওয়াতে, আমার ছেলে বাড়ী ছাড়িয়া দেশ বেড়াইতে বাহির হইল। তখন হইতে তাহার ফিরিয়া আসার আশায় কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু শেষে তাহার কোন খবর না পাইয়া এখন নিজে তাহার খোঁজ করিবার জন্য দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপন স্ত্রীকে কাহারও নিকটে রাখিয়া আসিতে ইচ্ছা না হওয়ায় তাহাকে নিজে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। হে দৈত্যেশ্বর! আমার এবং হরিণীর গল্প এই। এখন আপনি ভাবিয়া দেখুন, ইহা অদ্ভুত কি না! দৈত্য বলিল, "হাঁ, এটা আশ্চর্য্য বটে। আচ্ছা, আমি বণিকের অপরাধের তিনভাগের একভাগ ক্ষমা করিলাম।"

শাহারজাদী বলিলেন, "মহারাজ, প্রথম বৃদ্ধের গল্প শেষ হবামাত্র যাহার সহিত দুটি কালো কুকুর ছিল, সেই দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলিলেন, 'হে দৈত্যরাজ! আপনি আমার এবং এই দুটি কুকুরের গল্প শুনলে এর চেয়েও বেশী অবাক্ হবেন।' দৈত্য বলিল, 'যদি তা হয় তা হলে বণিকের অপরাধের দুই ভাগের একভাগ ক্ষমা করব।' এই শুনিয়া দ্বিতীয় বৃদ্ধ এইরূপে নিজের গল্প আরম্ভ করিলেন।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও দুই কুকুরের কথা

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলিলেন, "হে দৈত্যরাজ! আমার নিকটে এই যে দুইটি কালো কুকুর দেখিতেছেন, ইহারা আমার দুই ভাই। পিতা মরিবার সময় আমাদিগের প্রত্যেককে এক এক হাজার মোহর দিয়া যান, আমরা সেই টাকাতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর আমার বড় ভাই বিদেশে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছায় স্বদেশী সকল জিনিষ বিক্রয় করিয়া যে যে দেশে যাওয়া ঠিক করিয়াছিলেন সেইস্থানে কাজে লাগিতে পারে এমন-সকল জিনিষ সংগ্রহ করিয়া অন্যদেশে যাত্রা করিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত

তাঁহার কোন খবর পাইলাম না। পরে একদিন আমি এক দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একজন লোক আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ গরীবের মত। আমি তাহাকে ভিখারী ভাবিয়া বলিলাম, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" সে উত্তর করিল "জগদীশ্বর তোমারও মঙ্গল করুন। তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌নি ?" আমি তাহার এই কথায় অবাক্ হইয়া মনোযোগ দিয়া তাহাকে বারবার দেখিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি আমার বড়-ভাই, সুতরাং তখনই আনন্দে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাই! আপনাকে এ বেশে চিন্‌তে পারা খুবই শক্ত! অতএব আমার দোষ ক্ষমা করবেন।" তারপর তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়া তাঁহার শরীর কেমন আছে ও কাজকর্ম্ম কেমন চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার ভাই বলিলেন, "ভাই! মিথ্যে কেন সে সকল কথা তুলছ ? আমার চেহারা দেখেই ত তুমি ভালমন্দ সব বুঝে নিতে পার।" আমি এ-কথার পর আর কিছু না বলিয়া দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলাম এবং স্নানের পর নূতন কাপড় পরাইয়া আহারাদি করাইলাম। পরে আপন দোকানের হিসাব মিলাইয়া দেখিলাম, সেই সময় আমার মূলধন দ্বিগুণ হইয়াছে। কাজেই তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক হাজার মোহর ভাইকে দিয়া বলিলাম, "ভাই এই টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করুন।" বড় ভাই ঐ টাকা পাইয়া খুসী হইলেন এবং আগের মত আমার নিকটে থাকিয়া সেই টাকা দিয়া ব্যবসায়াদি করিতে লাগিলেন

তারপর আমার মেজ ভাইও বড়'র মত যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ব্যবসা করিবার ইচ্ছায় অন্যদেশে যাওয়া ঠিক করিলেন। আমরা দুই ভাইয়ে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া অন্য দেশে যাইতে বারণ করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই না যাইয়া ছাড়িলেন না। এক বৎসর পরে দেখিলাম, তিনিও বড়-ভাইয়ের মত দুর্দ্দশায় পড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন আমার আর-এক হাজার মোহর লাভ হইয়াছিল, কাজেই তাঁহাকেও এক হাজার মোহর দিয়া ব্যবসা করিতে বসাইয়া দিলাম। এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর এক দিবস জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুই ভাই আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ভাই! স্বদেশের বাণিজ্যে তেমন লাভ হয় না, বিদেশে চল, অল্পকালের মধ্যে বিস্তর টাকা আন্‌তে পারব।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "তোমরা তো এক-একবার বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলে, কি লাভ করে আন্‌লে ? তোমাদের যেমন দুর্দ্দশা হয়েছিল আমারও ত তেমনি হতে পারে।" ইহারা দুইজনেই আমাকে অন্য দেশে ব্যবসা করিতে যাইবার জন্য অনেকবার বলিতে লাগিলেন, ও যাইবার কারণ দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের পরামর্শ না শুনিয়া, নিজের মতে ক্রমাগত পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত আগের মত বাণিজ্যাদি করিতে লাগিলাম। শেষে তাঁহারা নিতান্ত জেদ করাতে কাজেই তাঁহাদিগের কথামত বিদেশে যাইতে রাজী হইলাম।

তারপর যখন ব্যবসা করিবার উপযুক্ত জিনিষপত্র কিনিতে গেলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে, আমি ব্যবসা করিবার জন্য দুই ভাইকে যে এক হাজার মোহর দিয়াছিলাম,

তাহার এক পয়সাও তাঁহাদিগের হাতে নাই, সকলই নষ্ট করিয়াছেন। যদিও এই কথা জানিতে পারাতে তাঁহাদিগের উপর আমার একটু অশ্রদ্ধা হইল, তবুও আমি তখন তাঁহাদিগকে কিছু বলিলাম না। ঐ সময়ে আমার ছয় হাজার মোহর জোগাড় হইয়াছিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, সমস্ত টাকা একবারে ব্যবসায়ে না ফেলিয়া অর্দ্ধেক টাকায় সম্প্রতি জিনিষপত্র কিনি এবং বাকী টাকা কোন জায়গায় লুকাইয়া রাখি। কেন না, কপালদোষে যদি কোনরূপে ব্যবসা করিতে গিয়া সব টাকা লোকসান হয়, তবে ঐ লুকানো টাকায় আবার ব্যবসা করিয়া দিন কাটাইতে পারিব। এইরূপ ঠিক করিয়া আমাদের তিন ভাইয়ের জন্য তিন হাজার মুদ্রা ঘরের ভিতর পুঁতিয়া রাখিলাম। পরে বাকী তিন হাজার মোহর দিয়া ব্যবসায়ের জন্য জিনিষপত্র কিনিয়া, আমরা তিনজনে জাহাজে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। একমাস পরে ঐ জাহাজ অনুকূল বাতাসে নির্ব্বিঘ্নে এক সহরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আমরা ঐ-সব জিনিষ দশগুণ দামে বিক্রয় করিলাম। তাহাতে যে টাকা লাভ হইল, তাহা দিয়া ওখানকার ভাল ভাল জিনিষ কিনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আবার জাহাজে চড়িতে যাইতেছি এমন সময় ময়লা-কাপড়-পরা খুব সুন্দরী একটি মেয়ে হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমার হস্ত চুম্বন করিয়া বলিল, "আপনি যদি দয়া করে আমাকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে যান, তা হলে কৃতার্থ হই।" আমি এই কথাতে প্রথমে খুবই আপত্তি করিলাম। কিন্তু সেই মেয়েটি অনুনয় করিয়া আবার বলিল, "আপনি আমাকে অভাগিনী দেখে ঘৃণা করবেন না। আমি ভাল ব্যবহারে আপনাকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করব; এবং আমার প্রতি দয়া করলে, আপনার খুবই উপকার হবে।" এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহ করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইলাম।

আমাদের জাহাজ ছাড়িবার সময়ে ঐ মেয়েটি নিজের গুণ আর শান্ত স্বভাবের এমন পরিচয় দিতে লাগিল যে, আমি তাহার স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন তাহার প্রতি বেশী করিয়া ভালবাসা দেখাইতে লাগিলাম। আমার দুই ভাই আমাদিগের এই ভালবাসা দেখিয়া খুব হিংসা করিতে লাগিলেন আর আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার মত লব করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে আমরা জাহাজের উপর ঘুমাইয়া আছি এমন সময় তাঁহারা আমাদের দুইজনকেই একসঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। আমি যে-মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় সে জলে ডুবিয়া গেল না, বরঞ্চ আমাকে জল হইতে তুলিয়া এক দ্বীপে লইয়া গিয়া কহিল, "হে জীবিতেশ্বর! দেখ, আমাকে বিয়ে করাতে তোমার কেমন উপকার হল। কিন্তু আমি কে তা তুমি জান না; কাজেই আমি নিজের পরিচয় দিচ্ছি, শোন। আমি গন্ধর্ব্বের মেয়ে, আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় তোমাকে দেখে তোমার প্রতি ভালবাসা হওয়ায় আমি তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে ঐ-রকম ছদ্মবেশে তোমার কাছে যাই। তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করে খুবই দয়ার কাজ করেছ; তাই আমি তোমার এই উপকার করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। কিন্তু তোমার দুই ভাই যেমন

অবিশ্বাসীর কাজ করেছে, তাতে তাদের না মেরে কিছুতেই আমার রাগ ঠাণ্ডা হবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি পরীর নিকটে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিনীতভাবে বলিলাম, "প্রিয়ে, প্রার্থনা করি, আমার ভাইদুজনকে প্রাণে মেরো না! যদিও তারা আমার প্রতি

পরী কহিল, "এই যে দুটি কুকুর দেখ্‌ছেন এরা আপনার দুই ভাই।"

খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে, তবুও আমি কিছুতেই তাদের উপর নির্দ্দয় হতে পার্‌ব না।" পরী এই-সমস্ত কথার কোন উত্তর না দিয়া হঠাৎ আমাকে কোলে তুলিয়া আকাশে উঠিল এবং এক মুহূর্ত্তে সমুদ্র পার হইয়া আমার বাড়ীর ছাদের উপর আমাকে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি পরীর এই ব্যাপারে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম পরে ছাদ হইতে নীচে আসিয়া, ঘরের ভিতর লুকানো যে টাকা আছে তাহা দিয়া আবার ব্যবসা

করিবার কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেছি, এমন সময় এই দুইটি কালবর্ণ কুকুর অতি নম্রভাবে আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। আমি ইহাদিগের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই পরী আসিয়া আমাকে কহিল "নাথ! এই যে দুটি কুকুর দেখ্ছেন, এরা আপনার দুই ভাই।" আমি এই কথা শুনিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। অনেকক্ষণ পরে একটু জ্ঞান হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরা এমন কুকুর হয়ে গেল কি করে?" পরী বলিল, "এদের দুষ্কর্ম্মের জন্যে আমার বোন আমার কথায় এদের এমন চেহারা করে দিয়েছে এবং এদের জাহাজও ডুবিয়ে দিয়েছে। এরা দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাক্‌বে, তারপর এদের আবার মানুষ করে দেবো।" এই কথা বলিয়া পরী চলিয়া গেল। তখন হইতে তাহার কোন খোঁজ পাই নাই। পরে যখন দেখিলাম, সেই দশবৎসর কাটিয়া গেল, অথচ পরী আসিল না, তখন আমি এই দুই ভাই কুকুরকে সঙ্গে লইয়া, সেই পরীকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। হঠাৎ এই জায়গা দিয়া যাইবার সময়ে, বণিক্ ও হরিণীর সঙ্গী বৃদ্ধের সহিত দেখা হওয়াতে এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। হে দৈত্যাধিপ! এই আমার গল্প। ইহা কি আপনার অদ্ভুত বোধ হয় না?"

দৈত্য বলিল, "হাঁ, এটা আশ্চর্য্য বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের বাকী দুই ভাগের একভাগ ক্ষমা কর্‌লাম।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথা শেষ হইলে, তৃতীয় বৃদ্ধও অন্য দুইজনের মত দৈত্যরাজকে নিজ প্রার্থনা জানাইল। দৈত্যরাজও তৃতীয় বৃদ্ধের গল্প অন্য দুইজনের গল্প অপেক্ষা বেশী অদ্ভুত হইলে, বণিকের অপরাধের শেষ ভাগ ক্ষমা করিতে রাজী হইল। তখন তৃতীয় বৃদ্ধ দৈত্যরাজকে নিজের গল্প বলিল। কিন্তু আমি সে ইতিহাস জানি না, এইজন্য বলিতে পারিলাম না। তবে ইহা জানি যে, তাহা অন্য দুই বৃদ্ধের গল্প হইতেও বেশী আশ্চর্য্য হওয়ায় দৈত্য অবাক হইয়া বলিল, "হাঁ এটা অদ্ভুত বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের শেষ ভাগও ক্ষমা কর্‌লাম।" দৈত্য আরও বলিল, "বণিকের খুব ভাগ্য ভাল যে, তোমরা তিনজনে নিজের নিজের গল্প বলে একে বাঁচালে; না হলে এতক্ষণ ওকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম।" এই কথা বলিয়া দৈত্য মিলাইয়া গেল। বণিক্ আপনার উদ্ধারকারী বৃদ্ধ তিন জনের কাছে আসিয়া অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। পরে ঐ তিন বৃদ্ধ আপন আপন কাজে চলিয়া গেলেন। বণিকও নিজের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই গল্প শেষ করিয়া শাহারজাদী কহিলেন, "মহারাজ! যে যে গল্প বল্‌লাম, সব কটাই আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এর মধ্যে কোনটিই ধীবরের গল্পের মত নয়।" শাহরিয়ার এ কথায় কোন উত্তর না করাতে দিনারজাদী বলিল, "এখনও রাত্রি ভোর হয়নি, অতএব সেই গল্পটি বল।" রাজা তাহাতে রাজী হওয়াতে শাহারজাদী এইরূপে উপন্যাস আরম্ভ করিলেন।

ধীবরের উপাখ্যান

মহারাজ! অনেকদিন আগে এক বৃদ্ধ ধীবর বাস করিত। সে এমন গরীব ছিল যে, তাহাকে অতি কষ্টে আপনার, আপন স্ত্রীর এবং তিনটি সন্তানের ভরণপোষণ করিতে হইত। সে প্রতিদিন সকালে মাছ ধরিবার জন্য জাল কাঁধে করিয়া নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু কখনও চারিবারের বেশী জাল ফেলিত না। একদিন ঐ ধীবর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির শেষে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিবার কাপড় ছাড়িয়া অপর কাপড় পরিয়া সাগর জলে জাল ফেলিল। কিছুক্ষণ পরেই জাল টানাতে জাল ভারী মনে হইল, কাজেই ধীবর খুসী হইয়া ভাবিতে লাগিল, আজ অনেক মাছ পড়িয়াছে। কিন্তু তখনই জাল তীরে তুলিয়া দেখিল, একটা মরা গাধা উঠিয়াছে, বিশেষতঃ গাধার ভারে জাল স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে; তখন তাহার আর বিরক্তির সীমা রহিল না। যাহা হউক, ধীবর ছেঁড়া জাল মেরামত করিয়া আবার জলে ফেলিল। সেবারও আগের মত ভারী বোধ হওয়াতে ভাবিল, এবারে বোধ হয় অনেক মাছ পাইব; কিন্তু জাল তুলিয়া দেখিল, বালি ও কাদায় ভরা একটা ঝুড়ি উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া ধীবর দুঃখিত হইয়া বলিল, "হা কপাল, আমি বড় গরীব, মাছ ধরে তাই বেচে স্ত্রী আর ছেলেপিলে নিয়ে কোন ও রকমে দিন কাটাই আজ বিধাতা তাতেও আমার বাদ সাধ্লেন। হা বিধাত! তোমার কি এই কাজ! ভদ্র ও মহৎ লোককে দুরবস্থায় ফেলে অভদ্র আর নীচ লোকদের ভাল করে মজা দেখ।" এইরূপ দুঃখ করিয়া ধীবর জাল হইতে ঝুড়িটা দূরে ফেলিয়া দিল এবং জাল পরিষ্কার করিয়া তৃতীয়বার জলে ফেলিল। সেবারেও কাদা এবং কতকগুলা পাথর ও শামুক ছাড়া অন্য কিছুই উঠিল না। তাহা দেখিয়া ধীবর একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে রাত্রি ভোর হইলে ধীবর নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "প্রভু! আপনি জানেন, আমি প্রতিদিন চারিবারের বেশী জাল ফেলি না। এর আগে আমি তিনবার জাল ফেলেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। আর একটিবার মাত্র জাল ফেল্তে বাকী আছে, এবারেও যেন আগের মত বিফল না হই।"

ধীবর এইরূপে প্রার্থনা করিয়া চারবারের বার জাল ফেলিল, কিন্তু সেবারেও মাছ না উঠিয়া তাহার বদলে একটা তামার কলসী উঠিল। ঐ কলসী ভারী মনে হওয়াতে, ধীবর ভাবিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে জিনিষ আছে। পরে ধীবর ভাল করিয়া মন দিয়া দেখিল যে, কলসীর মুখ সীসা দিয়া বন্ধ আছে এবং তাহার উপর শীলমোহর রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "অবশ্য এই কলসীর মধ্যে কোন দামী জিনিষ আছে। আর যদিও না থাকে, তা হলে অন্ততঃ কলসী বিক্রী করেও কিছু টাকা পাব, তাই দিয়ে শস্য কিন্লে আপাততঃ কিছু দিন চল্বে।" ইহা বলিয়া কলসের মধ্যে কি আছে তাহা

জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া একখানি ছুরি দিয়া তাহার মুখ খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ পরে ঐ কলস হইতে এমন গাঢ় ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল যে, ধীবর তাহার কাছে থাকিতে না পারিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ঐ ধূমরাশি সমুদ্রের তীরে ও আকাশে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, চারিদিক

কলস হইতে গাঢ় ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল।

নিবিড় কুয়াশায় ঢাকা মনে হইতে লাগিল। ধীবর তাই দেখিয়া খুবই ভয় পাইল। তারপর যখন ঐ-সমস্ত ধূম কলস হইতে বাহির হইল, তখন উহা আবার এক জায়গায় জড় হইয়া একটা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড দৈত্যের মূর্ত্তি ধরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "প্রভু সলোমন্! আমাকে ক্ষমা করুন। প্রভু সলোমন্! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর কখনো আপনার কথা অমান্য কর্‌ব না। আপনি

যখন যা করতে বল্‌বেন, আমি তখনই তা পালন করব।" ধীবর দৈত্যকে দেখিয়া প্রথমে খুব ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার ঐ-রকম কাতর কথা শুনিয়া একটু সাহস পাইয়া বলিল, "ওরে বোকা দৈত্য! তুই কি কথা বল্‌ছিস? ভবিষ্যদ্বক্তা সলোমন্ আঠারো শ বৎসর হ'ল মারা গিয়েছেন, তুই কি তা জানিস্ না? তুই কে? কি করেই বা এই কলসের মধ্যে ছিলি?" দৈত্য ধীবরের এই কথায় খুব রাগিয়া তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া বলিল, "তুই আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলিস্, আমাকে বোকা বলে গালি দিয়ে এত সাহস দেখাস্ না।" ধীবর বলিল, "তোকে ভাগ্যবান্ প্যাঁচা বল্‌লে বুঝি বেশী ভদ্রতা দেখান হত?" দৈত্য বলিল, "ওরে যতক্ষণ তোর আয়ু বাকী আছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বল্।" ধীবর বলিল, "তুমি কি জন্য আমাকে মেরে ফেল্‌বে? আমি যে এইমাত্র তোমাকে কলস থেকে বের কর্‌লাম, তা কি এর মধ্যেই ভুলে গিয়েছ?" দৈত্য বলিল, "না, আমি তা ভুলে যাইনি, কিন্তু তার জন্য তোকে না মেরে কখনই ছাড়্‌ব না। যা হোক আমি তোকে একটি অনুগ্রহ কর্‌ছি।" ধীবর বলিল. "তুমি আমাকে কি অনুগ্রহ কর্‌বে?" দৈত্য বলিল, "আমি তোকে মার্‌ব বটে, কিন্তু তোর যে রকমে মরতে ইচ্ছা হয়, খুলে বল্, আমি তোকে সেই-রকম করেই মার্‌ব; তোকে এই অনুগ্রহ কর্‌ছি।" ধীবর বলিল, "আমি তোমার কাছে কি অপরাধ কর্‌লাম? এইমাত্র যে তোমার উপকার কর্‌লাম, তারই এই পুরস্কার নাকি?" দৈত্য বলিল, "আমার কথা মিথ্যে হবার নয়। কেন তোকে মার্‌ব, তার বিশেষ কারণ বল্‌ছি শোন্।

"যে-সব দৈত্য ঈশ্বরের কাছে অধীনতা স্বীকার কর্‌ত না, সেই-সকল বিদ্রোহকারী দৈত্যদিগের মধ্যে আমি একজন। অন্যান্য দৈত্য মহারাজ সলোমনকে মান্য কর্‌ত এবং তাঁর কথা শুনে চল্‌ত, কিন্তু আমি ঐ নীচতাও স্বীকার করিনি। এজন্যে ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা অত্যন্ত রাগ করে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে এই তামার কলসের মধ্যে বন্ধ কর্‌লেন, এবং আমি কখনও যাতে এ থেকে বেরতে না পারি এই ইচ্ছায় সীসা দিয়ে কলসের মুখ বন্ধ করে, তার উপর নিজের নামের শীলমোহর করে আপনার অধীন এক দৈত্যের হাতে দিয়ে সেটা সমুদ্রে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন। সে তাঁর কথামত এই পাত্রের মধ্যে বন্ধ করে আমাকে সাগরের মধ্যে ফেলে দিল। আমি এই-রকমে কলসের মধ্যে বন্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম—যে-ব্যক্তি আমাকে এক শ বৎসরের মধ্যে এর ভিতর থেকে উদ্ধার কর্‌বে, আমি তাকে খুব বড়লোক করে দেবো। কিন্তু এক শ বৎসর কেটে গেল, তবুও কেউ আমাকে উদ্ধার করল না। তারপর আমি দিব্য কর্‌লাম, দ্বিতীয় শত বৎসরের মধ্যে যে-ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার কর্‌বে, তাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত টাকা-কড়ির মালিক করব। কিন্তু তার মধ্যেও কেউ আমাকে তুল্‌ল না। তারপর প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, যে-ব্যক্তি তৃতীয় শতাব্দীতে আমাকে উদ্ধার কর্‌বে, তাকে আমি খুব বড় ক্ষমতাপন্ন সম্রাট্ করে দেবো, আর চাকরের মত হয়ে সব সময় তার কাছে থাক্‌ব এবং সে ব্যক্তি প্রতিদিন

যে-কোন তিনটি প্রার্থনা করবে, তখনই তা পূর্ণ করব। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতেও কেউ আমায় উদ্ধার করল না। অনেককাল এইরকম বদ্ধ থাকাতে শেষে আমার ভয়ানক রাগ হল এবং আমি পাগলের মত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, যে-ব্যক্তি এর পর আমাকে মুক্ত করবে, তাকে আমি মেরে ফেলব, কখনও তার প্রতি দয়া দেখাব না, তবে তার প্রতি এইমাত্র অনুগ্রহ করব যে, সে যে-রকম ভাবে মরতে চাইবে, তাকে তেমনি ভাবেই মারব। আজ তুই আমাকে উদ্ধার করেছিস, অতএব তুই কি রকমে মরতে চাস্ বল, আমি তোকে তেমনি করেই মারি।"

এইরূপে ধীবর যখন দেখিল যে, দৈত্য তাহাকে নিশ্চয়ই মারিয়া ফেলিবে, তখন সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া গেল। সে মরিয়া গেলে তাহার ছেলেমেয়ে না খাইয়া মরিবে, ইহা ভাবিয়া ধীবর যেরূপ কাতর হইল, নিজে মারা যাইবে ভাবিয়াও সেরূপ ব্যাকুল হয় নাই। তারপর ধীবর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া করুণস্বরে বলিল, "হে দৈত্যরাজ! আমি আপনার যে উপকার করলাম তা মনে করে আমার প্রতি দয়া করুন।" দৈত্য বলিল, "বৃথা সময় নষ্ট করে দরকার নেই। তোমার তর্কবিতর্কে কোন ফল হবে না। এখন শীঘ্র বল কি রকমে মরতে চাও।"

বিপদে পড়িলেই মানুষের বুদ্ধি আপনা-আপনিই বাড়িয়া যায়। কাজেই যখন ধীবর দেখিল, দৈত্য কিছুতেই দয়া করিল না, তখন সে উপায় না দেখিয়া বলিল, "দৈত্যরাজ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই মেরে ফেল, তা হলে আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে মরতে প্রস্তুত হচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব; তোমাকে তার ঠিক উত্তর দিতে হবে।" ইহা শুনিয়া দৈত্য একটু ভয় পাইয়া বলিল, "কি প্রশ্ন আছে শীঘ্র বল, বৃথা সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।" দৈত্য তাহার ঠিক উত্তর দিতে প্রতিজ্ঞা করিলে, ধীবর তাহাকে বলিল, "তুমি যে এই কলসের মধ্যে ছিলে তা পরমেশ্বরের নাম নিয়ে বলতে পার?" দৈত্য বলিল, "হাঁ, আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি যে, আমি এর মধ্যে ছিলাম।" ধীবর বলিল, "না, আমি তা কখনও বিশ্বাস করতে পারি না। তোমার একখানি পাও এর মধ্যে থাকতে পারে না, সমস্ত শরীর এর মধ্যে থাকা একেবারেই অসম্ভব।" দৈত্য বলিল, "ধীবর! আমি এইমাত্র পরমেশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করলাম যে, আমি এই পাত্রের মধ্যে ছিলাম, তাতেও কি তোমার আমার কথায় বিশ্বাস হয় না?" ধীবর বলিল, "আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনও একথা বিশ্বাস করতে পারি না।" এই কথা শুনিয়া দৈত্য আগেকার মত ধোঁয়া হইয়া অল্পে অল্পে কলসের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত ধূম কলসের ভিতর ঢুকিয়া গেল, তখন তাহার ভিতর হইতে গম্ভীর স্বরে এই কয়েকটা কথা বাহির হইল—"ওরে সন্দিগ্ধ ধীবর! দেখ্, আমি সম্পূর্ণভাবে কলসের মধ্যে ঢুকেছি। কেমন, এখন তোর বিশ্বাস হয়?" ধীবর দৈত্যের এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া তখনই সীসার ঢাকনিখান

তুলিয়া লইয়া তাহা দিয়া কলসের মুখ বন্ধ করিয়া বলিল, "কেমন রে দৈত্য! এখন তোর মর্‌বার সময়। আমি এই দণ্ডেই তোকে মেরে ফেল্‌ব, বল্‌ দেখি তুই কি রকমভাবে মর্‌তে চাস্? না হয় থাক্, তোকে প্রাণে মার্‌ব না, তোকে আবার সমুদ্রের মধ্যেই ফেলে দেবো। আর আমাকে সমুদ্রের তীরে একখানি বাড়ী বানিয়ে থাক্‌তে হবে। কেননা যদি অন্য কোন ধীবর এইখানে এসে জাল ফেলে, তা হলে তাকে সাবধান করে দেবো যেন সে তোর মত কৃতঘ্ন লোকের ভাল না করে। কারণ তুই উদ্ধারকর্ত্তাকে মেরে ফেল্‌তে চাস্।" দৈত্য এই কথায় ভয়ানক রাগিয়া কলস হইতে বাহির হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু সলোমনের মোহরে কলসের মুখ ঢাকা থাকাতে সে কোন-রকমেই পাত্র হইতে বাহির হইতে পারিল না। এইরূপে যখন দৈত্য দেখিল, ধীবরের হাতেই তাহার জীবন, তখন সে আপনার রাগ সাম্‌লাইয়া নরমভাবে বলিল, "ওহে ধীবর! তুমি যেন সত্য-সত্যই আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিও না, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলাম, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পারনি?" ধীবর উত্তর করিল, "রে দৈত্য! তুই একটু আগেই দৈত্যরাজ ছিলি, এখন শক্তিহীন হয়ে দৈত্যাধম হয়েছিস, কাজেই তোর এই চালাকীতে আর কোন লাভ হবে না, তোকে নিশ্চয়ই আবার সমুদ্রের মধ্যে থাক্‌তে হবে। নিজের জীবনরক্ষা কর্‌বার জন্য আমি তোর কাছে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বিস্তর অনুনয় করেছি, কিছুতেই তোর মনে দয়া আন্‌তে পারিনি, কাজেই এখন আমারও তোর প্রতি সেই-রকম নির্দ্দয় ব্যবহার করা উচিত।" দৈত্য কোন-প্রকারে ধীবরের মনে দয়া উৎপাদন করিতে না পারিয়া বলিল, "ওহে আমি মিনতি করে বলছি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর. এর পরে আমার কৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তুমি যথেষ্ট আনন্দ পাবে।" ধীবর উত্তর করিল, "তুই ভারী কৃতঘ্ন, তোর কথায় আর বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। যদি বোকামী করে আমি তোর কথায় বিশ্বাস করি, তা হলে পারস্যদেশীয় কোন রাজা দোবান নামক চিকিৎসকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তুইও আমার সঙ্গে সেইরকম কর্‌বি। আমি তোকে সেই গল্প বল্‌ছি, শোন্।"

পারস্যদেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা

পারস্য দেশে জোমান নামক সহরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ আসলে গ্রীসদেশীয় হইলেও শেষে তাহারা মাতৃভূমি ছাড়িয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া বাস করিয়াছিল। হঠাৎ একদিন রাজার কুষ্ঠরোগ দেখা দিল। তাহা এত ভয়ানক যে, কোন চিকিৎসক তাঁহার রোগ দূর করিতে পারিল না। কিছুদিন পরে দোবান নামক একজন খুব ভাল চিকিৎসক

রাজার রোগের কথা শুনিয়া একদিন রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চিকিৎসক গ্রীক্, পারস্য, তুরকী, আরব্য, লাটিন, হিব্রু, প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসা-বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি একজন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং গাছপালার দোষগুণ-বিচার ভাল করিয়া করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার খুবই নাম ছিল। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! শুন্‌লাম রাজবৈদ্যেরা আপনার রোগ সারাবার কোনও উপায়ই কর্‌তে পারেননি। এখন যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তা হলে আমি ওষুধ না খাইয়েই অথবা মালিশ না করেই আপনাকে এই ভীষণ রোগের হাত থেকে উদ্ধার কর্‌তে পারি।" রাজা চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "হে ভিষ্‌গবর! যদি আপনি আমাকে সারিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আপনাকে এত টাকা দেবো যে, চিরকাল আপনি পরম সুখে দিন কাটাতে পার্‌বেন, আর আমি সারাজীবন আপনাকে আমার প্রিয় বন্ধু করে রাখ্‌ব।" দোবান এই কথা শুনিয়া তখনই নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন, এবং একটা ছেঁদাওয়ালা মুগুর বানাইয়া তাহার বাঁটের মধ্যে নানারকম ঔষধ রাখিয়া দিলেন। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ভাঁটাও তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিলেন। পরদিন সকালে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি যেখানে মুগুর ভেঁজে থাকেন, সেখানে একবার ঘোড়ায় চড়ে আপনাকে যেতে হবে।" রাজা চিকিৎসকের কথামত খেলিবার জায়গায় উপস্থিত হইলে, চিকিৎসক রাজার হাতে মুগুর ও ভাঁটা দিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, যে পর্য্যন্ত আপনার শরীরে ঘাম না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি এই মুগুর আর ভাটা নিয়ে খেলা করুন, আমি মুগুরে ওষুধ রেখেছি। যখন ঘাম বেরবে তখন তার গুণ আপনার শরীরের ভিতরে ঢুক্‌বে। ঘাম হলে আপনার আর খেলা কর্‌তে হবে না, আপনি বাড়ী গিয়ে স্নান করে ঘুমতে যাবেন, পরদিন সকালে আপনি রোগের চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পাবেন না।"

রাজা চিকিৎসকের কথামত কয়েকজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মুগুর লইয়া খেলিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন ঘাম হইল, তখন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিয়া শুইয়া রহিলেন। পরদিন সকালে রাজা বিছানা হইতে উঠিয়া দেখিলেন তাঁহার শরীর এমন সারিয়া গিয়াছে যে, কখন যে কোন রোগ হইয়াছিল এমন চিহ্নও নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত অবাক্ ও আহ্লাদিত হইয়া রাজপোষাক পরিলেন এবং রাজসভায় আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। সভ্যগণ রাজাকে সম্পূর্ণভাবে সারিয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া সকলে মিলিয়া দোবান চিকিৎসকের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর দোবান রাজসভায় আসিলে রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া আপনার পাশে বসাইয়া সকলের সামনে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। তারপর মহারাজের সারিয়া উঠিবার জন্য এক মস্ত ভোজ হইল, তাহাতে রাজা দোবান চিকিৎসকের সম্মানের জন্য তাঁহার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইলেন। জোমানাধিপতি দোবান চিকিৎসকের

সম্মান করিবার জন্য এইরূপে তাঁহার সহিত একত্র খাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া রাত্রে যখন তাঁহাকে বিদায় দিলেন, তখন তাঁহাকে রাজবন্ধুদের উপযুক্ত পোষাক পরাইয়া দুই হাজার মোহর পুরস্কার দিলেন, এবং রোজ নূতন নূতন উপায়ে নিজের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ঐ রাজার প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত লোভী, হিংসুটে ও লোকের অনিষ্টকারী ছিল। সে চিকিৎসকের এই রকম সম্মান ও তাহার পুরস্কার দেখিয়া হিংসা করিয়া, কি উপায়ে তাহার সুনাম নষ্ট হয়, সব সময় তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল। একদিন সে আপনার মতলব সিদ্ধ করিবার জন্য রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে কয়েকটি কথা বলিবার অনুমতি চাহিল, এবং রাজার আদেশ পাইয়া এইরূপে বলিতে লাগিল, "হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যার বিশ্বস্ততার বিশেষ পরিচয় না পাওয়া যায়, সেই-রকম লোককে হঠাৎ বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান লোকের উচিত নয়। বিশেষতঃ আপনি যে চিকিৎসককে সব সময় অনুগ্রহ করেন, এবং সঙ্গে নিয়ে সব সময় আমোদ-প্রমোদ করেন, সে বিশ্বাসঘাতক, কোন-রকমে মহারাজের প্রাণ নষ্ট কর্‌বার জন্যই সে এখানে এসেছে।" নৃপতি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি করে এ কথা জান্‌লে যে, হঠাৎ আমার সাম্‌নে এ কথা বল্‌তে তোমার এতদূর সাহস হল? তুমি কার সাম্‌নে কথা বল্‌ছ আগে তোমার তা বিবেচনা করা উচিত, এবং তুমি এরকম কথা বল্‌ছ যা আমি কখনই অনায়াসে বিশ্বাস কর্‌ব না।" মন্ত্রী বলিল, "মহারাজ! আমি ভাল করে জেনে আপনাকে এ বিষয় জানাচ্ছি আপনি আর তাকে বেশী বিশ্বাস কর্‌বেন না। মহারাজ এখন ঘুমিয়ে আছেন, কাজেই সেই ঠকের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। ঘুম ছেড়ে মন দিয়ে ভেবে দেখুন, দেখ্‌তে পাবেন, সে রাজসভায় খাতির নেবার জন্যে তার মাতৃভূমি গ্রীস দেশ ছেড়ে এখানে এসে হাজির হয়নি, কিন্তু যেকোনো রকমে আপনাকে নষ্ট কর্‌বার উদ্দেশ্যেই সে নিজের দেশ থেকে এসেছে।" রাজা বলিলেন, "না না, মন্ত্রী! তুমি এরকম কথা আর কখনো মুখেও এনো না। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যাকে তুমি প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বল্‌ছ, তিনি খুব ধার্ম্মিক আর বিশ্বাসী, এবং তাঁর মত ভালবাসার পাত্র আমার এ-জগতে আর কেউ নেই। তুমি কি জান না, কি-রকম ওষুধ দিয়ে অথবা কেমন দৈবশক্তির জোরে তিনি আমাকে কঠিন কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত করেছেন? যদি আমার প্রাণ নষ্ট করাই মতলব হত, তিনি আমার রোগ সারাবেন কেন? অতএব মন্ত্রী চুপ কর, আমার মনে সন্দেহ এনে দিও না। আমি কখনও তোমার এমন কথা শুন্‌ব না; বরং আজ থেকে সেই প্রাণ-দাতা যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন ততদিন মাসিক এক হাজার মোহর বৃত্তিস্বরূপ দেবো। তিনি আমার যেমন উপকার করেছেন তাতে তাঁকে আমার সমস্ত রাজ্য ও সমস্ত টাকাকড়ির ভাগ দিলেও কখনও তাঁর ঋণ শোধ হবে না। বোধ হয়, তুমি তাঁর গুণ দেখে হিংসা করে এরকম অন্যায় কথা বল্‌ছ। কিন্তু তুমি কখনও এমন মনে করো না যে, আমি হিংসুটের কথায় বিশ্বাস করে কখনও তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার কর্‌ব। সিন্ধবাদ নামক কোন রাজা নিজের ছেলেকে মেরে ফেল্‌বার হুকুম দিলে তাঁর মন্ত্রী তাঁকে যা বলেছিলেন, তা আমার বেশ মনে

আছে।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! তিনি কি বলেছিলেন?" রাজা কহিলেন, "মন্ত্রী রাজাকে এই কথা বলেছিলেন যে সৎমায়ের কথায় বিশ্বাস করে ছেলেকে মেরে ফেল্‌লে শেষে আপনাকে তার জন্যে অনুতাপ কর্‌তে হবে। এই কথা বলিয়া সেই মন্ত্রী সিন্ধবাদরাজাকে উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলেন, তাহা এই।"—

এক মনুষ্য ও শুকপক্ষীর কথা

কোন এক ভদ্রলোকের এক পরম-সুন্দরী স্ত্রী ছিল। তিনি তাহাকে এত ভালবাসিতেন যে, এক মুহূর্ত্তও স্ত্রীকে চোখের আড়াল করিতেন না। একদিন কোনো দর্‌কারী কাজের জন্য অন্য জায়গায় তাঁহার যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি একটি শুক পক্ষী কিনিয়া আনিলেন। ঐ শুক স্পষ্টভাবে কথা বলিত, এবং তাহার সাম্‌নে যাহা-কিছু ঘটিত তাহা সমস্তই বর্ণন করিতে পারিত। তিনি শুককে খাঁচায় করিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, যতদিন না আমি ঘরে ফিরে আসি, ততদিন তুমি এই পাখীটিকে বিশেষ যত্নে রেখো!" এই কথা বলিয়া তিনি বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন। পরে কাজ শেষ হইলে তিনি বাড়ী ফিরিয়া প্রথমে শুককে নির্জ্জনে বলিলেন, "শুক, আমি যখন ছিলাম না তখন বাড়ীতে কি কি ঘটেছিল, তা সব খুলে বল।" শুক এমন অনেক কথা বলিল, যাহার জন্য ঐ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যথেষ্ট বকিলেন। ঐ দুষ্ট স্ত্রী এরূপে অপমানিত হইয়া ভাবিল, চাকরাণীদের মধ্যে কেহ-না-কেহ এই কথা বলিয়াছে; অতএব তাহাদিগকে খুব বকিয়া বলিল, "তোদের কি এই কাজ?" তাহারা শপথ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, আমরা এর কিছুই জানি না। তবে বোধ হয় ঐ শুকটা বলে দিয়ে থাক্‌বে।" ইহা শুনিয়া ঐ নারী শুককেই সব কথা বাহির হওয়ার কারণ ঠিক করিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিল।

তারপর আর-একদিন বাড়ীর কর্ত্তা অন্য জায়গায় চলিয়া গেলে তাঁহার স্ত্রী এক চাকরাণীকে হুকুম করিল, "আজ রাত্রে তুই শুকপাখীর খাঁচার তলে বসে ক্রমাগত ঘর্ঘর শব্দে জাঁতা ঘুরাবি।" আর-একজনকে বলিল, "তুই এমন ভাবে ছাদের উপর থেকে জল ফেল্‌বি, যেন মনে হয় বৃষ্টি হচ্ছে।" অন্য চাকরাণীকে বলিল, "তুই প্রদীপের কাছে একখান আয়না ধরে তা এমন ভাবে নাড়্‌বি যেন শুকের চোখে তার আলো ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে লাগে।" চাকরাণীরা গিন্নির কথামত রাত্রির অধিকাংশ ঐরকম করিয়া কাটাইয়া দিল। পরদিন কর্ত্তা বাড়ীতে আসিয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুক, গত রাত্রে আমি যখন ছিলাম না তখন বাড়ীতে কি কি হয়েছিল?" শুক উত্তর করিল, "প্রভু, রাত্রে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের সঙ্গে

ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে আমার এমন কষ্ট হয়েছিল যে, আমি আর কোনো-কিছুর খোঁজ রাখ্‌তে পারিনি।" ঐ ব্যক্তি জানিতেন যে, সে-রাত্রিতে এসকল কিছুই হয় নাই, কাজেই শুকপাখীর এই কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, "হায়! আমি এই বোকা পাখীর কথায় বিশ্বাস করে স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলাম! যখন এ আমার সাম্‌নে একবার মিথ্যা কথা বল্‌ল, তখন এ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধেও নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলেছে।" ইহা বলিয়া ঐ অবিবেচক লোকটি খুব রাগিয়া শুককে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া এমন জোরে মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন যে তখনই সে মরিয়া গেল। কিন্তু শেষে প্রতিবেশীদিগের মুখে নিজের স্ত্রীর খারাপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া শুককে নির্দ্দোষী বুঝিতে পারিয়া ঐ লোকটি খুবই অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ধীবর দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দানবাধম! গ্রীসদেশীয় রাজা এইরূপে শুকের গল্প শেষ করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী! ঐ স্ত্রীলোক যে-রকম শুকপাখীর উপর রাগ করে তাকে মেরে ফেলেছিল, তুমিও সেই-রকম হিংসা করে দোবান চিকিৎসকের অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ, কিন্তু আমি সাবধান হলাম, কখনও সেই গৃহস্থের মত দোবানকে মেরে ফেলে শেষে অনুতাপ কর্‌ব না।" দুষ্ট মন্ত্রী দোবান চিকিৎসককে মারিবার জন্য খুব ব্যগ্র হইয়াছিল, কাজেই রাজা তাহাকে ঐ-ভাবে বারণ করিলেও সে তাহাতে না থামিয়া আবার বলিল, "মহারাজ! শুকপাখীকে মারা একটা সামান্য কথা; আর আমার মনে হয়, তার জন্য তার প্রভু বেশীদিন দুঃখ করেননি; কিন্তু কিজন্যে মহারাজের এমন ভয় হচ্ছে যে, দোবান চিকিৎসকের শাস্তি হলে নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করা হবে? যে ব্যক্তি মহারাজের প্রাণ নষ্ট করতে চায়, তাকে শাস্তি দেওয়া কি আপনার উচিত কাজ মনে হয় না? হে ক্ষিতীন্দ্র! রাজার প্রাণ সাধারণ লোকের প্রাণের মত নয়, তা সব-সময় যত্ন করে রক্ষা করা উচিত। কেউ ঐ প্রাণ নিতে চেষ্টা কর্‌ছে এমন সন্দেহ হলেই তাকে তখুনি মেরে ফেলা উচিত। বিশেষতঃ মহারাজ, দোবান যে অপরাধী সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই, কারণ তার দেশ ছেড়ে এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্যই যে কেবল মহারাজকে নষ্ট করা এর বিলক্ষণ প্রমাণ রয়েছে। হে রাজেন্দ্র! আপনি কখনও এমন মনে কর্‌বেন না যে, আমি হিংসা করে তার শত্রুতা কর্‌ছি, কেবল পাছে মহারাজের কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে আমি আপনাকে সাবধান করে দিলাম। মহারাজ! যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তা হলে কিছুকাল আগে এক মন্ত্রীর যেমন শাস্তি হয়েছিল, আমাকেও আপনি সেই-রকম শাস্তি দেবেন।" গ্রীসদেশীয় রাজা বলিলেন, "সে মন্ত্রী শাস্তি পাবার মত কি কাজ করেছিল?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমি বল্‌ছি, আপনি শুনুন।"

দণ্ডিত মন্ত্রীর কথা

মহারাজ! অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক ছেলে ছিল, তিনি শিকার করিতে খুব ভালবাসিতেন। রাজা ছেলের শিকারের প্রতি ঝোঁক দেখিয়া স্নেহ করিয়া সব-সময়ে তাঁহাকে ঐরূপ আমোদ করিতে প্রশ্রয় দিতেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর প্রতি হুকুম করিয়াছিলেন, "মন্ত্রী! তুমি সব-সময় কুমারের সঙ্গে থাক্‌বে, কখনও যেন তিনি তোমার চোখের আড়াল না হন।" একদিন শিকার করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গের শিকারীরা একটি হরিণ দেখাইয়া দিলে, মন্ত্রী তাঁহার পিছনে আছেন এরূপ মনে করিয়া রাজপুত্র হরিণকে বাণ মারিবার জন্য এমন জোরে এবং এমন ব্যস্ত হইয়া তাহার পিছনে ছুটিতে লাগিলেন, যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক দূর চলিয়া গিয়া একলা হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার দেখিলেন যে, তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন ও তাঁহার সঙ্গেও কেহ নাই। কাজেই তিনি শিকারের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া, ব্যস্ত হইয়া রাস্তা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন হরিণের পিছনে ছুটিয়াছিলেন, সে-সময় অত্যন্ত জোরে যাওয়াতে এবং হরিণ ছাড়া অন্য দিকে লক্ষ্য না রাখাতে রাস্তা চিনিয়া রাখিতে পারেন নাই, কাজেই এখন যাইবার রাস্তা ঠিক করিতে না পারিয়া ভুল পথে গিয়া পড়িলেন। রাজকুমার এইরূপে পথ হারাইয়া কোন রাস্তা ঠিক করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, রাস্তার ধারে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। রাজপুত্র তাহা দেখিয়া দয়া করিয়া তখনই লাগাম টানিয়া ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কিজন্যই বা এখানে একলা বসে কাঁদ্‌ছ?" মেয়েটি বলিল, "আমি ভারতবর্ষীয় এক রাজার মেয়ে। বাবার কথামত হাওয়া খাবার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম পাওয়াতে ঘোড়ার উপরেই ঘুমিয়ে পড়ি। পরে জেগে দেখ্‌লাম আমি একলা এই বিজন মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, ঘোড়া আর আমার সঙ্গের লোকজন কে কোথায় গিয়েছে, কিছুই বল্‌তে পারি না।" তাহা শুনিয়া যুবরাজ তাহার প্রতি দয়া করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও, তা হলে এই ঘোড়ার পিছনে উঠে বসো।" মেয়েটি আগ্রহ দেখাইয়া তখনই তাহাতে রাজী হইল

তারপর দুজনে ঘোড়ায় চড়িয়া কিছুদূর যাইবার পর হঠাৎ একটা ভাঙা-চোরা মস্ত রাস্তা দেখিতে পাইলেন। তাহার কাছে আসিয়া মেয়েটি ঘোড়া হইতে নামিতে চাওয়াতে রাজপুত্র তাহাকে নামাইয়া দিলেন, এবং নিজেও ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সুন্দরীর পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। ক্রমে যুবতী একটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেলে রাজকুমার অবাক্ হইয়া শুনিলেন, সে তাহার ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, "ছেলেরা কোথায় গেলি? আজ তোদের খাবার জন্যে একটি মোটাসোটা লোককে ধরে এনেছি।" তিনি আরও শুনিলেন, তাহার পরেই তাহার পুত্রেরা চীৎকার করিয়া বলিল, "কই মা, সে কোথায়? তাকে শীঘ্র দাও না, আজ আমাদের বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

রাজকুমার ঐ-সমস্ত কথা শুনিয়া নিজে যে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া খুবই ভয় পাইলেন। এখন তাঁহার বেশ বিশ্বাস হইল যে, এ-স্ত্রীলোক কখনই মানুষ নয়. সে কেবল প্রবঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছে। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই মায়াবিনী রাক্ষসী জনশূন্য স্থানে বাস করে' অনেক রকম মূর্ত্তি ধরে' হতভাগা পথিকদের ভুলিয়ে এই-রকম করে খেয়ে ফেলে। এখন করি কি? এ সময়ে অবসন্ন হয়ে একেবারে কিছু না কর্‌লে নিশ্চয়ই মর্‌তে হবে।" রাজকুমার এই বলিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া তখনই ঘোড়ায় চড়িলেন। রাজকন্যারূপিণী রাক্ষসী তখনই সেখানে আসিয়া দেখিল, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়াছেন, শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন, কাজেই পাছে আপনার চাতুরী বিফল হয় ইহা ভাবিয়া সে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে বলিল, "হে যুবরাজ! তোমার ভয় কি? তোমাকে এত ব্যস্ত দেখ্‌ছি কেন? ওদিকে তুমি কি খুঁজ্‌ছ?" রাজকুমার কহিলেন, "আমি পথ হারিয়েছি, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি।" রাক্ষসী বলিল, "তুমি পথ যদি ভুলে থাক, তা হলে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। তিনি তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন।"

রাক্ষসী সরলভাবে তাঁহাকে এমন উপদেশ দিতেছে, রাজকুমারের একটুও এমন বিশ্বাস হইল না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে এখন নিজের হাতে আনিয়াছে মনে ঠাওরাইয়া ঠাট্টা করিয়া এ-প্রকার কথা বলিতেছে! যাহা হউক, তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু! হে সর্ব্বশক্তিমান! আমার প্রতি কৃপা করে এই শত্রুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।" রাজপুত্রের এইরূপ প্রার্থনা শেষ হইলে রাক্ষসী আবার সেই ভাঙা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, যুবরাজ যত শীঘ্র পারেন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখন ঠিক রাস্তা দেখিতে পাইয়া নিরাপদে পিতার কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং মন্ত্রীর অসাবধানতার জন্য তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সে-সব কথা আগাগোড়া পিতাকে বলিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্তই রাগিয়া গেলেন, এবং মন্ত্রীর মাথা কাটিয়া ফেলিবার জন্য তখনই হুকুম দিলেন।

গ্রীসদেশীয় রাজার দুষ্ট মন্ত্রী ঐ গল্প শেষ করিয়া বলিল, "মহারাজ! যদি এ বিষয়ে আমার কোন দোষ ধরা পড়ে, তা হলে ঐ মন্ত্রীর মত আমার প্রাণদণ্ড কর্‌বেন, কিন্তু মহারাজকে আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি, কখনও দোবান চিকিৎসককে বিশ্বাস কর্‌বেন না, তা হলে মহারাজের বড়ই অনিষ্ট হবে। আমি স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি, আপনাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যেই শত্রুরা তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। মহারাজ বল্‌ছেন, সে ব্যক্তি আপনার রোগ সারিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারই বা ঠিক কি? হয়তো সে ভেতরে ভেতরে রোগ রেখে কেবল বাইরের রোগটুকুই সারিয়ে থাক্‌বে। কে এমন বল্‌তে পারে যে, তার ওষুধের গুণে আর কখনও এ রোগ দেখা দেবে না? মহারাজ তো খুব বুদ্ধিমান, আপনি বিবেচনা করে দেখুন দেখি, একদিনের চিকিৎসায় এই এতদিনের রোগ সেরে যাওয়া সম্ভব কি না"।

গ্রীসদেশীয় রাজার বুদ্ধি কিছু কম ছিল, সুতরাং মন্ত্রীর দুষ্ট বুদ্ধি বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ইহা সত্য হইতে পারে; এবং শেষে মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি যা বল্‌ছ তা এখন আমার ঠিক মনে হচ্ছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন খারাপ মতলবে এসেছে, কোন্‌দিন কোন্ ওষুধের গন্ধ শুঁকিয়েই অনায়াসে আমার প্রাণ নষ্ট করবে। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি? ভেবে দেখ দেখি।"

দুষ্ট মন্ত্রী রাজাকে নিজের উপদেশ-মত চলিতে ব্যস্ত দেখিয়া বলিল, "মহারাজ! নিজের জীবন নিরাপদ কর্‌বার একমাত্র ভাল উপায় এই দোবানকে এই মুহূর্ত্তেই এইখানে ডেকে এনে তাকে মেরে ফেলা। এ-রকম শত্রুকে একটুও বেঁচে থাক্‌তে দেওয়া উচিত নয়। কি-জানি কখন্ মহারাজের কি অনিষ্ট চেষ্টা করে।" রাজা বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ, এ-রকম না কর্‌লে তার দুষ্টবুদ্ধির হাত এড়াবার অন্য উপায় নেই।" এই বলিয়া দোবানকে সেখানে আনিবার জন্য তখনই একজন চাকরকে আদেশ করিলেন। রাজার মত্‌লব দোবান কিছুই জানিতেন না, সুতরাং রাজার আজ্ঞা পাইবামাত্র নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈদ্যরাজ রাজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোবান! আমি তোমাকে কিজন্য ডেকেছি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?" দোবান উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি কিছুই জানি না, অনুমতি করুন।" রাজা বলিলেন, "আমি তোমাকে মেরে ফেলে তোমার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা কর্‌ব, এইজন্যই তোমাকে ডেকে এনেছি।" দোবান এই কথা শুনিবামাত্র একবারে হতজ্ঞান ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "মহারাজ! আমি এমন কি দোষ করেছি যে, আমাকে মেরে ফেল্‌বেন?" রাজা বলিলেন, "আমি কোনও বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনেছি, তুমি কেবল আমার প্রাণনাশ কর্‌বার জন্যই রাজসভায় এসেছ, কাজেই তোমাকে মেরে ফেলে নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ হব।" এই বলিয়া কাছেই যে জল্লাদ ছিল তাহাকে বলিলেন, "শীঘ্রই এই বিশ্বাসঘাতকের মাথা কেটে ফেল।"

চিকিৎসক রাজার এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, রাজা তাঁহাকে যে টাকাকড়ি আর সম্মান দিয়াছেন তাহা দেখিয়া হিংসার জন্য শত্রুতা করিয়া কেহ তাঁহার প্রতি রাজার মন ভাঙিয়া দিয়াছে। তখন তিনি দুঃখ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হায়! আমি এই রাজাকে রোগ থেকে উদ্ধার করে নিজের সর্ব্বনাশ ঘটালাম।" তারপর রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে যে কঠিন রোগ থেকে উদ্ধার কর্‌লাম তারই কি এই পুরস্কার হল?" রাজা তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার জল্লাদকে বলিলেন, "শীঘ্র একে মেরে ফেল।" তখন দোবান হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি একেবারে নির্দ্দোষ, আমাকে মার্‌বেন না, জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী কর্‌বেন।" দোবান এইরূপে বিস্তর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহার কথা একটুও না শুনিয়া

বলিলেন, "আমার কথা মিথ্যা হবার নয়। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মেরে ফেলব, তা না হলে তুমি আমার প্রাণ নষ্ট করবে।" এই কথা শুনিয়া চিকিৎসকের চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল, এবং তিনি অনেক কান্নাকাটি করিয়া অবশেষে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তারপর যখন ঘাতক তাঁহার দুই চোখ আর হাত বাঁধিয়া তাঁহার গলা কাটিবার জন্য খাঁড়া উঠাইতে গেল, তখন তিনি মাটিতে জানু পাতিয়া করুণস্বরে রাজাকে বলিলেন, "হে পৃথিবীশ্বর! আমাকে মেরে ফেলা যদি আপনার সত্যিই ইচ্ছা হয়, তা হলে আমাকে অন্ততঃ একবার বাড়ী যেতে দিন, আমি আমার ছেলে-মেয়েদের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়ে এবং বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে আসি আর আমার যে-সব ভাল ভাল বই আছে তা যাদের হাতে পড়লে জগতের উপকার হবে সেই-সব লোকের হাতে দিয়ে আসি। তার মধ্যে আমার একখানি চমৎকার বই আছে, সেটা মহারাজকে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ চমৎকার বইয়ের গুণ কি?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "ঐ বইয়ে অনেক অদ্ভুত বিষয়ের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, যখন আমার মাথা কাটা হবে, সে-সময় যদি মহারাজ একটু কষ্ট স্বীকার করে ঐ বইয়ের ছ'য়ের পাতা খুলে বাঁ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পংক্তি পড়েন, তা হলে আপনি যে-কোন প্রশ্ন করবেন, আমার কাটা মুণ্ড তখুনি তার উত্তর দেবে।"

রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পরদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসকের মাথা কাটা বন্ধ রাখিলেন, এবং তাঁহাকে সৈন্য দিয়া ঘিরিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। বৈদ্য বাড়ী যাইয়া নিজের সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার প্রাণদণ্ডের পর কাটা মুণ্ড কথা বলিবে, এই গুজব সব জায়গায় ছড়াইয়া যাওয়াতে মন্ত্রী সভাসদ্ ও রাজবাড়ীর সকল লোক তাহা দেখিবার ইচ্ছায় পরদিন রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর দোবান একখানা প্রকাণ্ড বই হাতে করিয়া রাজসভায় ঢুকিলেন এবং বিনীতভাবে সিংহাসনের কাছে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! একটা পাত্রে একটু জল আনতে বলুন।" রাজার হুকুমে তখনই জল আনা হইলে, তিনি বইখানি যে কাপড়ে ঢাকা ছিল সেইখানি জলের পাত্রের উপর রাখিয়া রাজার হাতে বই দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! যখন আমার মাথা কাটা হবে, তখন সেই কাটা মাথা এই কাপড়ের উপর রাখবেন, কেননা তাতে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। পরে বই খুলে যে প্রশ্ন করবেন আমার কাটামুণ্ড তখনই তার উত্তর দেবে। কিন্তু মহারাজ, আমি আপনাকে অনুনয় করে প্রার্থনা করছি, দয়া করে আমাকে মেরে ফেলবেন না, আমি আপনাকে সত্যিই বলছি আমার কোন অপরাধ নেই।" রাজা বলিলেন, "বৃথা কেন আর প্রার্থনা কর। যদিও তোমার কোন অপরাধ না থাকে তবুও তোমার কাটামুণ্ড কথা বলবে, এই মজা দেখবার জন্যও অন্ততঃ তোমাকে মারব।" এই বলিয়া তিনি দোবানের হাত হইতে বইখানি লইয়া তখনই জল্লাদকে তাহার মাথা কাটিতে হুকুম দিলেন।

জল্লাদ এমন ভাবে দোবানের গলা কাটিল যে তাহার মাথা ঠিক পাত্রের উপর গিয়া

পড়িল। কাটা মুণ্ড তাহার উপর পড়িবামাত্র রক্ত পড়া বন্ধ হইল! তখন মুণ্ড সকলকে অবাক্ করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল, "মহারাজ এখন বই খুলে দেখুন।" রাজা বই খুলিলেন, কিন্তু তাহার পাতাগুলি পরস্পর বড়ই লাগানো ছিল; কাজেই জিবের ডগায় আঙ্গুল দিয়া লালাতে আঙ্গুল ভিজাইয়া এক-একখানি পাতা খুলিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপে ছয়ের পাতা পর্য্যন্ত উল্টাইয়া গেলেন, কিন্তু ইহার কোন পাতাতেই লেখা দেখিতে পাইলেন না। পরে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৈদ্য! এর কোন পাতাতেই যে লেখা দেখ্‌তে পাই

মুণ্ড সকলকে অবাক্ করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল

না?" মুণ্ড উত্তর করিল, "আরও কয়েক পাতা উল্টিয়ে যান।" এইরূপে রাজা এক-একবার জিবের ডগায় আঙ্গুল দিয়া এক-একখানি পাতা উল্টাইতে লাগিলেন! ঐ বইয়ের প্রত্যেক পাতায় বিষ মাখানো ছিল, কাজেই ভিজা আঙ্গুলের ভিতর দিয়া ঐ বিষ ক্রমে ক্রমে রাজার সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিল। তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া তখনই সিংহাসন হইতে মাটিতে পড়িলেন। যখন দোবানের কাটা মাথা দেখিল, রাজা মরমর, তখন সে চীৎকার করিয়া বলিল, "রে দুরাচার নৃপাধম! তুই যেমন বিনা দোষে আমার প্রাণ নষ্ট করলি, আমিও তেমনি তোকে উচিত প্রতিফল দিলাম। অন্যায় করে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে ঈশ্বরের কাছে এই-রকম শাস্তি পেতে হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে দোবানের প্রাণ বাহির হইয়া গেল। রাজাও মুহূর্ত্তমধ্যে মারা গেলেন।

ধীবর এই গল্প শেষ করিয়া দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে দৈত্য! যদি গ্রীসদেশীয় রাজা দোবান চিকিৎসকের প্রাণ নষ্ট না করতেন, তা হলে জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি সদয় থাকতেন। কিন্তু তিনি কুমন্ত্রীর কথায় চিকিৎসকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে তাঁকে মেরে ফেললেন, কাজেই নিজেও প্রাণ হারালেন। তোমাতে আমাতেও ঠিক সেই-রকম ঘটেছে। যখন আমি তোমাকে বললাম—আমার কোন দোষ নেই, আমাকে মেরো না, তখন তুমি আমার কথায় কান দিলে না, সুতরাং এখন আমার হাতেই তোমার জীবন। কাজেই আমিও তোমার প্রতি কখনও দয়া করব না, তোমাকে নিশ্চয়ই সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।" এই কথা শুনিয়া দৈত্য খুব কাতর হইয়া বলিল, "দোহাই ধীবর! তুমি সত্যসত্যই আমাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিও না, আমার একটি কথা শুন। আমি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করছি, কখনও তোমার অনিষ্ট করব না, বরং তোমাকে এমন কোন উপায় বলে দেব, যাতে তুমি চিরকাল অনন্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে পারবে।"

ধীবর খুব গরীব ছিল বলিয়া চিরকাল অতিকষ্টে সংসার চালাইত, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, কিন্তু দৈত্য পাছে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন না করে, এই ভয়ে তাহাকে বলিল, "দৈত্য! তোমার কথায় আমার হঠাৎ বিশ্বাস হয় না। যদি তুমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করে বল, কখনও আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে না, এবং এইমাত্র যে কথা বললে তা পরে পালন করবে, তা হলে আমি তোমাকে কলস থেকে বার করে দিই।" দৈত্য শপথ করিয়া বলিল, "আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করব না।" ধীবর তাই শুনিয়া কলসের মুখ খুলিয়া দিল, এবং তখনই সেই দৈত্য আগের মত ধোঁয়ার আকারে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া নিজের রূপ ধরিয়া আগেই লাথী মারিয়া কলসটা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। তাহা দেখিয়া ধীবর অত্যন্ত ভয় পাইল। দৈত্য ধীবরকে ভয় পাইতে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওহে ধীবর! তুমি ভয় পেয়ো না, আমি কেবল ঠাট্টা করে এমন করলাম, তুমি জাল নিয়ে আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে ঢের টাকা দিচ্ছি।" এই বলিয়া দৈত্য চলিতে আরম্ভ করিল, ধীবরও জাল কাঁধে করিয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত দৈত্যের কথায় ধীবরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই।

ক্রমে তাহারা সহর ছাড়াইয়া একটা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া উঠিল, এবং সেখান হইতে এক প্রকাণ্ড মাঠে নামিয়া কিছু দূর গিয়া চারটি পাহাড়ের মাঝে এক সরোবরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্য সেই পুকুরের তীরে দাঁড়াইয়া ধীবরকে বলিল, "তুমি এই পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধর।" ধীবর দেখিল, ঐ পুকুর মাছে ভরা এবং সকল মাছ চার রংএর, অর্থাৎ সাদা, হলদে, নীল, আর লাল। তাহা দেখিয়া ধীবর খুসী হইয়া জলে জাল ফেলিয়া এক মুহূর্ত্তেই চারিটা মাছ ধরিল। ধীবর আর কখনও সে-রকম মাছ দেখে নাই, কাজেই সে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল এবং ইহা বেশী দামে বিক্রী হইতে পারিবে ভাবিয়া

খুবই আনন্দিত হইল। দৈত্য বলিল, "ধীবর! তুমি এই মাছগুলিকে নিয়ে গিয়ে রাজাকে উপহার দাও। তিনি খুসী হয়ে তোমাকে এত ধন দেবেন, যে তুমি এ জীবনে তত ধন চোখেও দেখনি। আর তুমি রোজ এখানে এসে মাছ ধরো, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কখনও দিনে একবারের বেশী জাল ফেলো না। তা করলে তোমাকে বিপদে পড়্তে হবে। এখন আমি যা উপদেশ দিলাম, তুমি সাবধান হয়ে যদি সেইমত চল, তা হলে তুমি পরম সুখে কাল কাটাতে পার্বে।" এই কথা বলিয়া দৈত্য শূন্যে মিশাইয়া গেল।

ধীবর ও চারিটি মৎস্য

তারপর ধীবর দৈত্যের কথামত চলিবে বলিয়া ঠিক করিয়া দ্বিতীয়বার জাল না ফেলিয়া সেই কয়েকটি মাছ লইয়া আনন্দিত মনে একেবারে রাজার বাড়ী গিয়া রাজাকে চারিটি মাছ উপহার দিল। রাজা সেই আশ্চর্য্য মাছ দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তাহাদের অনেক প্রশংসা করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রী! কয়েকদিন হল গ্রীসদেশীয় রাজা আমার কাছে যে এক খুব ভাল রাঁধুনী পাঠিয়েছেন তাকে এই মাছগুলি ভাল করে ভাজ্তে বল। তা হলে তার রান্নার কেমন হাত তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে। আমার বোধ হয় মাছগুলি দেখ্তে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনি ভালই হবে।"

মন্ত্রী নিজে সেই মাছগুলি লইয়া গেলেন, এবং রাঁধুনীর হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ তোমাকে এই চারিটি মাছ ভাল করে ভাজ্তে বলেছেন।" মন্ত্রী এই বলিয়া তখনই রাজার কাছে ফিরিয়া গেলে রাজা তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন "ধীবরকে চারশ' মোহর পুরস্কার দাও।" ধীবর জন্মে কখনো তত টাকা একসঙ্গে দেখে নাই কাজেই একসঙ্গে চার'শ মোহর পাইয়া খুবই খুসী হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

এদিকে রাঁধুনী মাছগুলির আঁস ছাড়াইয়া কড়ার গরম তেলে ফেলিয়া ভাজিতে আরম্ভ করিল ক্রমে সেগুলির একদিক্ ভাজা হইলে অন্য দিক ভাজিবার জন্য মাছ কয়েকটিকে উল্টাইয়া দিবামাত্র হঠাৎ রান্নাঘরের মেজে ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে খুব-সাজগোজ করা পরম সুন্দরী একটি মেয়ে লাঠিহাতে বাহির হইয়া কড়ার কাছে আসিল এবং লাঠি দিয়া প্রত্যেক মাছকে ছুঁইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে মাছ! তুমি কি নিজের কর্ত্তব্য কাজ করছ? মাছগুলি কোন উত্তর না দেওয়াতে, রমণী আবার ঐ কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।

তাহাতে মাছ-চারিটি মাথা তুলিয়া বলিল "হাঁ হাঁ, যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আমরাও ফিরে যাব, যদি তুমি এস, তবে আমরাও আস্‌ব; আর যদি তুমি আমাদের ছেড়ে যাও তবে আমরাও তোমাকে ছেড়ে যাব।" তাহারা এই কথা বলিবামাত্র মেয়েটি কড়াটা উল্টাইয়া দিয়া দেওয়ালের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং মেজেও আগেকার মত সমান হইয়া গেল।

পরম সুন্দরী একটি মেয়ে লাঠি হাতে কড়ার কাছে আসিল

রাঁধুনী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে উনান হইতে মাছগুলি তুলিয়া দেখিল সেগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোন-রকমেই তাহা রাজার কাছে পাঠান যাইতে পারে না। তাহাতে সে খুব ভয় পাইয়া বলিল, "হায়! বিধাতা আমার ভাগ্যে আজ কি লিখেছেন? যা দেখলাম, তা রাজার কাছে বল্‌লে তিনি কখনও বিশ্বাস কর্‌বেন না, বরং আমার উপর খুবই রাগ কর্‌বেন।" রাঁধুনী একলা রান্নাঘরে বসিয়া এইরকম কান্নাকাটি করিতেছে, এমন সময় প্রধান মন্ত্রী সেখানে

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মাছ ভাজা হয়েছে?" রাঁধুনী এ-কথায় কি উত্তর দিবে? কাজেই যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই অবিকল বর্ণনা করিল। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন, কিন্তু রাজাকে সে-বিষয় কিছু না জানাইয়া কৌশলে সেদিন তাঁহাকে মাছ খাওয়ার কথা ভুলাইয়া রাখিয়া ধীবরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ধীবর! তোমাকে সেইরকম আর চারটি মাছ এনে দিতে হবে।" দৈত্য ধীবরকে একবারের বেশী জাল ফেলিতে বারণ করিয়াছিল। ধীবর তাহা না বলিয়া মন্ত্রীকে বলিল, "মহাশয়, যেখান থেকে এ-রকম মাছ আন্‌তে হবে, সে জায়গা এখান থেকে অনেক দূর, কাজেই আজ আপনি আর পাবেন না। কাল আপনাকে সেই-রকম মাছ নিশ্চয়ই এনে দেব।" এই বলিয়া ধীবর রাত্রিবেলায় সেখানে চলিল, এবং পরদিন সকালে আগের মত চারটা মাছ ধরিয়া ঠিক সময়ে মন্ত্রীর কাছে আনিয়া হাজির করিল। মন্ত্রী নিজে ঐ মাছগুলি লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন এবং ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাঁধুনীকে আপনার কাছে বসাইয়া রান্না করাইতে লাগিলেন। রাঁধুনী আগের দিনের মত কড়ার ভিতর মাছ ফেলিল এবং একদিক ভাজা হইলে যখন অন্যদিক উল্টাইয়া দিল, তখন সেইরকম দেয়াল ভেদ করিয়া সেই সুন্দরী লাঠিহাতে কড়ার কাছে আসিয়া আগে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছিল সেই-রকম বলিল। মাছগুলিও সেই-রকম উত্তর দিল। তারপর সেই মেয়েটি কড়াখানা উল্টাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইল, এবং দেয়ালও আগের মত সমান হইয়া গেল। মন্ত্রী এই-সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড নিজের চোখে দেখিয়া ভাবিলেন, এখন ইহা রাজাকে না জানান আর উচিত নয়। কাজেই রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অবিকল বলিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইলেন, এবং নিজে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ধীবরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ধীবর! তুমি আমাকে সেই-রকম আর চারটা মাছ এনে দিতে পার কি না?" ধীবর উত্তর করিল, "মহারাজ! যদি আমাকে এক দিন সময় দেন, তা হলে আমি অনায়াসে আপনাকে সেই-রকম মাছ এনে দিতে পারি।" রাজা তাহাতে রাজি হইলে ধীবর সেই পুকুরে গিয়া প্রথমবার জাল ফেলিয়াই সেই-রকম চারিটা মাছ ধরিল। তারপর সে সেই কয়েকটি মাছ লইয়া রাজার সাম্‌নে হাজির হইবামাত্র রাজা খুব খুসী হইয়া আগের মত চারশত মোহর তাহাকে পুরস্কার দিলেন। ধীবর মনের আনন্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাজা রান্না করিবার বাসন প্রভৃতি সব নিজের ঘরে আনাইলেন, এবং নিজে মন্ত্রীর সঙ্গে সেইখানে বসিয়া ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া মাছ ভাজিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রী মাছগুলিকে আঁসশূন্য করিয়া গরম তেলে ফেলিলেন, এবং একদিক ভাজা হইবামাত্র যেমন তাহাদিগের অন্যদিক উল্টাইয়া দিলেন অমনি সে ঘরের ভিত্তি ফুঁড়িয়া সেই মেয়েটির বদলে ভীষণ চেহারাওয়ালা একটা কালো মানুষ লাঠিহাতে ঘরে ঢুকিয়া লাঠি দিয়া মাছকে ছুঁইয়া ভীষণ স্বরে বলিল, "ওহে মীন! তুমি কি নিজের কর্ত্তব্য কাজ করছ?" মাছগুলি এই কথা শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, করছি। যদি তুমি ফিরে যাও, তা হলে আমরাও

ফিরে যাব ; যদি তুমি এস, তবে আমরাও আস্‌ব ; আর যদি তুমি আমাদের ছেড়ে যাও, তবে আমরাও তোমাকে ছেড়ে যাব।" তাহারা এই কথা বলিবামাত্র ঐ কালো লোকটা কড়াখানা উল্টাইয়া দিয়া মাছগুলিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিল। তারপর সে যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া দেয়ালের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। দেয়ালও আগে যেমন ছিল, সেই রকম হইয়া গেল।

রাজা নিজের চোখে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! এ অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। নিশ্চয় এর কোন গূঢ় কারণ আছে, তা আমাদের অবশ্যই জান্‌তে হবে।" এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ধীবরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধীবর আসিলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীবর! তুমি যে-সব মাছ এনে দিয়েছিলে, তা দেখে আমি অত্যন্ত অস্থির হয়েছি। তুমি ঐসব মাছ কোথায় ধরেছ?" ধীবর বলিল, 'মহারাজ এখান থেকে ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওর পেছনে অন্য চারটা ছোট পাহাড় আছে। ঐ-সকলের মধ্যে একটি সুন্দর পুকুর আছে। আমি সেখান থেকে প্রতিদিন মাছগুলি ধরে থাকি।" ইহা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সেই পুকুর দেখেছ?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি অনেকদিন ধরে পাহাড়ের চারধারে মৃগয়া করে আস্‌ছি, কিন্তু কখনও সে জায়গায় কোন পুকুর দেখিনি, এবং সেখানে যে কোন পুকুর আছে তা কখনও কানেও শুনিনি। তারপর রাজা ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীবর! ঐ পুকুর রাজবাড়ী থেকে কতদূর মনে কর?" ধীবর বলিল, "মহারাজ! সে জায়গা এখান থেকে তিন ঘণ্টার বেশী সময়ের রাস্তা নয়।" তাহা শুনিয়া রাজা লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পুকুরের দিকে চলিলেন, ধীবর পথ দেখাইয়া সকলের আগে আগে চলিল। তারপর সকলে পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলেন যে, নীচে এক প্রকাণ্ড মাঠ রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ ঐ মাঠ আগে কখনও কাহারও চোখে পড়ে নাই। শেষে তাঁহারা মাঠ পার হইয়া দেখিলেন, ধীবরের কথামত চারিদিকে পাহাড়ঘেরা এক চমৎকার পুকুর রহিয়াছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার, এবং তাহার মধ্যে ঐ-রকম অনেক মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে। রাজা সেই পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইলেন, এবং অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ ঐ-সব মাছ দেখিয়া সঙ্গীদের বলিলেন, 'এই পুকুর রাজধানীর এত কাছে অথচ তোমরা কেউই কখন এটা দেখনি?" তাঁহারা সকলেই বলিলেন, "মহারাজ! এটা দেখা দূরে থাক্, আমরা এর নামও শুনিনি।" রাজা বলিলেন, "তোমরা যখন কেউই কখনো এই পুকুরের কথা শোননি, তখন এই পুকুর নিশ্চয়ই নূতন হয়েছে। কিন্তু কি-রকমে এটা এখানে বানানো হল, আর কি জন্যই বা এর মাছগুলোর চার রকম রং হল, এ বিষয়ে সব কথার খোঁজ করা আমাদের উচিত। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম, এর সব না জেনে আমি কখনই রাজধানীতে ফির্‌ব না।" এই বলিয়া তিনি তখনই সেখানে তাঁবু ফেলিয়া সকলকে সেইখানে থাকিতে আদেশ দিলেন।

রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবধি আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। যে পর্য্যন্ত না আমি এর ঠিক কারণ বের কর্‌তে পার্‌ব, সে পর্য্যন্ত আমার মন কখনই ঠাণ্ডা হবে না। অতএব আমি এই রাত্রেই লুকিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এর কারণের খোঁজ কর্‌ব। তুমি সাবধান হও, যেন এ বিষয়ে অন্য কেউ জান্‌তে না পারে।" মন্ত্রী এই দুঃসাহসিক কাজ হইতে রাজাকে নিরস্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই কোন কথা না শুনিয়া রাত্রে বেড়াইবার উপযুক্ত পোষাক পরিয়া হাতে খাঁড়া লইয়া সেই পাহাড়ের উপর উঠিলেন। তাহা পার হইয়া যে একটা মাঠ ছিল, তাহার ভিতর দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাত্রি ভোর হইল। তাহাতে তিনি দেখিতে পাইলেন, অনেক দূরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী রহিয়াছে। তারপর তিনি ঐ বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলেন, উহা কালো পাথরে তৈরী এবং আয়নার মত চক্‌চকে ইস্পাতের পাতে মোড়া। রাজা ঐ বাড়ী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং কিছুক্ষণ একদৃষ্টে উহা দেখিতে লাগিলেন। শেষে দরজার কাছে আসিয়া দেখিলেন উহা অর্দ্ধেক খোলা রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রথমে ধীরে ধীরে কপাটে ধাক্কা দিলেন। তাহাতেও কেহ না আসাতে, শেষে বেশী জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। তাহাতেও যখন কাহারও সাড়া-শব্দ পাইলেন না তখন একটু অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এমন সুন্দর বাড়ীতে জনমানব নেই!"

তারপর তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওহে, আমি একজন অতিথি, ক্ষিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত হয়েছি; অতিথিসৎকার করে এমন লোক কি এখানে কেউ নেই?"

রাজা চীৎকার করিয়া দুই-তিনবার এই কথা বলিলেন; কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া নির্ভয়ে বারান্দার উপরে উঠিলেন, এবং সেখানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইতে পারে, এই আশায় চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া একে একে সকল ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক ঘরই বহুমূল্য আস্‌বাব দিয়া সাজানো রহিয়াছে। তারপর একটি সুন্দর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার মাঝখানে এক ফোয়ারা ও চারিটি সিংহমূর্ত্তি ছিল। সেই সিংহসকলের মুখ হইতে ক্রমাগত জল পড়িতেছিল। ঐ জলধারা ক্রমশঃ মুক্তা ও হীরা হইয়া ফোয়ারাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড থামের উপরে উঠিয়া আবার ভাঙা মন্দিরের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

রাজা এক ঘরে বসিয়া সাম্‌নের বাগানের শোভা দেখিতেছেন, এবং সেখানে যে-সব সুন্দর জিনিষ দেখিয়াছিলেন সেই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ কাহার কান্নার শব্দ তাঁহার কানে আসিল। তাহা শুনিয়া যেখান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল সেইদিকে গিয়া নৃপতি এক প্রকাণ্ড দালানের কাছে উপস্থিত হইলেন। ঐ দালানের দরজা বন্ধ থাকাতে

তিনি তাহা খুলিয়া দেখিলেন,—তাহার মাঝখানে মেজে হইতে কিছু উপরে একখানি সিংহাসনের উপর একটি তরুণ পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চেহারা ও পোষাক অতি সুন্দর, কেবল মুখখানি অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল। রাজা ঐ যুবকের সাম্‌নে গিয়া নমস্কার করিলেন, যুবাও একটু মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন, কিন্তু উঠিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহাশয়! উঠে আপনার অভ্যর্থনা করা যদিও আমার উচিত, কিন্তু কপাল-দোষে আমি তা কর্‌তে পার্‌লাম না, অতএব এ-বিষয়ে আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন।" রাজা বলিলেন, "হে সদাশয়! আপনার এ-রকম ভদ্রতা দেখেই আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আমি কেবল আপনার কান্না শুনে এখানে এসেছি। এখন যদি আমাকে দিয়ে আপনার কোন উপকার হয়, আমি প্রাণপণে তা করতে রাজি আছি। আপনার কি কষ্ট তা আমাকে বলুন।" যুবা এই কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। কিছু পরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "ভাগ্যলক্ষ্মী! তোমার চপলতা অতি অদ্ভুত! তুমি এক-সময় যাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়ে উন্নত কর, তাদের আবার কিছুদিন পরে ঘোর দুর্দ্দশায় ফেলে দাও। তোমার প্রসাদ কারও প্রতি স্থির থাকে না। তুমি মানুষকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মজা দেখ।"

যুবকের এইরূপ দুঃখপূর্ণ কথা শুনিয়া রাজার দয়া হওয়াতে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ-রকম দুঃখের কথা বল্‌বার মানে কি?" যুবা করুণস্বরে উত্তর করিলেন, "মহাশয়! না কেঁদে কি করে থাক্‌ব?" ইহা বলিয়া তিনি আপনার পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে রাজা দেখিলেন, যুবার মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত মানুষের মত এবং নীচের ভাগ কালো পাথরে তৈরি। রাজা ঐ তরুণ পুরুষের এই-রকম শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া এবং আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনার এই আশ্চর্য্য চেহারা দেখে যদিও আমার মনে অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, তবুও আপনার এই-রকম ভয়ানক অবস্থা হওয়ার যে কি কারণ তা শুনবার জন্য খুবই ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে সব কথা খুলে বলুন। আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, আপনার এই বিবরণ নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হবে। আর আমি যে পুকুর আর মাছ দেখে এসেছি, আপনার দুর্দ্দশার সঙ্গে তাদেরও কিছু সংস্রব আছে বলে মনে হচ্ছে।" যুবক বলিলেন, "নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গেলে আমার শোক আবার নূতন হয়ে ওঠে; তবুও কি করি, মহাশয়ের অনুরোধে আমাকে তা বল্‌তে হবে।" এই বলিয়া ঐ তরুণ পুরুষ নিজের দুর্ঘটনার বিষয় এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের কথা

যুবক বলিলেন, মহাশয়, আমার বাবা এই দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম মহম্মদ। কাছের চারিটি ছোট পাহাড় হইতে তাঁহার রাজ্যের নাম কৃষ্ণ উপদ্বীপ হইয়াছিল। ঐ চারিটি পাহাড় এক সময়ে উপদ্বীপ ছিল, কিন্তু এখন তাহারা পাহাড় হইয়া রহিয়াছে। এখন আপনি যেখানে পুকুর দেখিয়া আসিলেন, আগে সেখানে রাজপুরী ছিল। যেভাবে সে সকল বদ্‌লাইয়া গেল তাহার কথা বলিতেছি, শুনুন।

সত্তর বৎসর বয়সে আমার বাবা মারা গেলে আমি রাজা হইয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহার সহিত তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে এক বিশ্বাসী চাকরও আসিয়া রহিল। আমার স্ত্রী আমার প্রতি দিন দিন অতিশয় ভালবাসা দেখাইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে খুবই ভাল বাসিতাম। এই-রকমে দেখিতে দেখিতে পরমসুখে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। তারপর আমার প্রতি আমার স্ত্রীর ভালবাসা যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। একদিন আমার স্ত্রী স্নান করিতে গেলে আমি দুপুরের খাওয়ার পর একটু চোখ বুজিয়া শুইয়া আছি, এমন সময় রাণীর যে দুই দাসী তখন ঐ ঘরে ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আমার পায়ের কাছে ও অন্যজন আমার মাথার কাছে বসিয়া চামর ঢুলাইতে লাগিল। তারপরে আমি ঘুমাইয়াছি মনে করিয়া তাহারা আস্তে আস্তে কথা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আমি কেবল চোখ বুজিয়া ছিলাম, ঘুমাই নাই, কাজেই তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইলাম।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "বোন! আমাদের রাজা দেখ্‌তে সুন্দর, তবুও যে রাণী তাঁকে ভালবাসেন না, এটি কি তাঁর অন্যায় নয়?"

হে মহানুভব! দাসী-দুইটির মুখে এই কথা শুনিয়া আমি রাণীর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। তারপর কোন গুরুতর অপরাধে রাণীর বাপের বাড়ীর সেই দাসের প্রাণদণ্ড দেওয়াতে, রাণী শোকে কাতর হইয়া আমাকে এক প্রাসাদ বানাইয়া দিতে বলিলেন। প্রাসাদ তৈয়ারী হইলে, তিনি সেখানে দুই বৎসর ধরিয়া সেই বিশ্বাসী দাসের জন্য শোক করিলেন। শেষে আমি রাণীকে দাসের জন্য কাঁদিতে বারণ করিলাম। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি, রাণী মানুষ নয় মায়াবিনী রাক্ষসী। ঐ দাস তাহার স্বামী ও রাক্ষস। মায়াবিনী যাদুবিদ্যার জোরে স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু দাস কথা বলিতে বা নড়িতে পারিত না। আমি যখন রাণীকে কাঁদিতে বারণ করিলাম, তখন সে কতকগুলি অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে বলিল, "আমি মায়াবিদ্যার জোরে আদেশ কর্‌ছি, তুই উপরের দিকে মানুষ আর নীচের দিকে পাথর হয়ে থাক্।" হে মহাশয়! এই কথা বলিবামাত্র আমি অর্দ্ধেক মানুষ ও

অর্দ্ধেক পাথর হইয়া গেলাম। তখন হইতে আমি এইরূপ অবস্থায় রহিয়াছি। তারপর ঐ রাক্ষসী আমাকে এই ঘরে আনিয়া রাখিল, এবং যাদুবিদ্যাদ্বারা আমার রাজ্যকে বনের মত করিয়া ফেলিল। আগে যেখানে আমার রাজধানী ছিল এখন সেইখানে একটি হ্রদ হইল। যে চার জাতীয় মানুষ আগে সেখানে থাকিত, এখন তাহারা চারি রংএর মাছ হইয়া ঐ পুকুরে রহিয়াছে, অর্থাৎ মুসলমান, পারস্য, খ্রীষ্টিয়ান, ও ইহুদী জাতিরা সাদা, লাল, কালো ও হলদে রংএর মাছ হইয়াছে। যে চার উপদ্বীপের নামে এই দেশ কৃষ্ণ উপদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এখন তাহারা চারটা পাহাড় হইয়া রহিয়াছে। মায়াবিনী এই রকমে রাজ্য নষ্ট করিয়াও আমাকে দুর্দ্দশায় ফেলিয়াই ছাড়ে নাই। সে প্রতিদিন এইখানে আসিয়া গোরুর চামড়ায় মোড়া লাঠি দিয়া আমাকে একশ' বার আঘাত করে। তাহাতে আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইলে, সে ছাগলোমে তৈয়ারী একখানা বিশ্রী কাপড়ে তাহা বাঁধিয়া তাহার উপর এই রাজপোষাক পরাইয়া দেয়। হে মহানুভব! আপনি এমন মনে করিবেন না, যে, সে আমার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য এমন সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ আমাকে পরায়। তাহার এ-রকম করিবার মানে কেবল আমাকে ঠাট্টা করা মাত্র।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের চোখ-দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দুর্ঘটনার কথা আগাগোড়া শুনিয়া রাজার মনে এমন দুঃখ হইল যে, তিনি তাঁহার সান্ত্বনার জন্য একটিও কথা বলিতে পারিলেন না। শেষে ঐ দুষ্ট মায়াবিনীকে উচিত প্রতিফল দিবার ইচ্ছায় যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বিশ্বাসঘাতক মায়াবিনী এখন কোন্ জায়গায় থাকে, আর তার স্বামী সেই জঘন্য রাক্ষসটাই বা কোথায় থাকে?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "হে মহানুভব। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, সেই নরাধম এখন রোদনাগারে আছে। ঐ গম্বুজাকৃতি গোরস্থান এই দুর্গের সঙ্গে লাগানো। কিন্তু রাণী যে কোথায় থাকে তা কিছুই জানি না। তবে আমি এইমাত্র বল্‌তে পারি, সে প্রতিদিন সকালে এইখানে এসে প্রথমে আমাকে ভয়ানক মারে, তার পরে নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য রোদনাগারে গিয়ে থাকে। রাণী তার ভিতরে ঢুকে স্বামীকে একরকম ওষুধ খাওয়ায়। তাতে তার প্রাণ বেরুতে পারে না। মহাশয়! এখন আপনি বুঝ্‌তে পারছেন, আপনাকে দিয়ে এই কুকাজের কিছু প্রতিকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

ইহা শুনিয়া রাজা দুঃখ করিতে করিতে বলিলেন, "হে যুবরাজ! তোমার এই দুরবস্থার বিষয় ভাব্‌তে গেলে অত্যন্তই কষ্ট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক তোমার মত এমন আশ্চর্য্য দুর্ঘটনা জগতে কারও ভাগ্যে যে কখনও ঘটেছে বলে মনে হয় না। আমি তোমার এই অসহ্য যন্ত্রণার কথা শুনে যে কি-পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলাম তা বল্‌তে পারি না। ঐ মায়াবিনী রাক্ষসীর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া এখন খুবই উচিত, আর আমি প্রতিজ্ঞা করছি, প্রাণপণে সে-বিষয়ে যত্ন

করব।” রাজা এই কথা বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং যেজন্য সেখানে আসিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। পরে ঐ মায়াবিনীকে যে উপায়ে শাস্তি দিবেন, যুবরাজের সঙ্গে তাহার পরামর্শ করিয়া সে-রাত্রি সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজ সর্ব্বদা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন বলিয়া তাঁহার চোখে ঘুম ছিল না, সুতরাং অন্য দিনের মত সেদিনও তাঁহার চোখের উপরে রাত্রি ভোর হইয়া গেল।

রাজা সকালে উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং লুকাইয়া রোদনাগারে ঢুকিয়া দেখিলেন, সেখানে অসংখ্য মশাল জ্বলিতেছে এবং নানারকম সোনার ধূপদানি হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া সমস্ত ঘর ভরিয়া রহিয়াছে। তার পরে রাজা দেখিলেন, রাক্ষস সুন্দর বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে। তিনি তখনই খড়্গ দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তাহার মৃত-দেহটা কুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিজের মতলব কাজে খাটাইবার জন্য নিজে বিছানায় শুইয়া তাহার মত কাপড় ঢাকা দিয়া রহিলেন, এবং অস্ত্রখানা নিজের পাশেই লুকাইয়া রাখিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই দুষ্টা মায়াবিনী পুরীর মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে যুবরাজের ঘরে গিয়া তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে মারিতে আরম্ভ করিল। যুবরাজের কান্নার শব্দে সমস্ত পুরী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যুবরাজ অনেক মিনতি করিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই দুষ্টার মনে দয়া হইল না। সে তাঁহাকে একশ'বার আগের মত না মারিয়া কিছুতেই থামিল না। পরে সেই মায়াবিনী কাঁদিতে কাঁদিতে রোদনাগারে ঢুকিল, এবং খাটের উপর নিজের স্বামী শুইয়া আছে এই মনে করিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, “হে প্রাণবল্লভ! তুমি আর কতকাল এইরকম চুপ করে থেকে আমাকে যন্ত্রণা দেবে? আমি তোমাকে অনুনয় করে বল্‌ছি, আমার সঙ্গে একটি কথা বল; তোমার মিষ্ট কথা শুনে আমার জীবন সার্থক হোক। নাথ! আমি বেঁচে থাক্‌তে তুমি কি আর কথা বল্‌বে না? দাসীর প্রতি দয়া করে একটি মাত্র কথা বল।”

রাজা এই-সব কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বলিলেন, “ঈশ্বরের কি অচিন্ত্য শক্তি! তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ছাড়া আর কারও কিছুমাত্র ক্ষমতা নেই।” মায়াবিনীর এত আশা ছিল না যে, সে আবার নিজের স্বামীর কথা শুনিতে পাইবে। সুতরাং রাজার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র সে অত্যন্ত খুসী হইয়া স্বামী মনে করিয়া তাঁহাকে বলিল, “হে জীবিতনাথ, আমি কি তোমার মুখে এই কথা শুন্‌লাম, তুমিই কি এ-কথা বলে আমার কথার উত্তর দিলে? না আমারই ভুল হয়েছে?” রাজা বলিলেন, “ওরে দুশ্চরিত্রে! তোর কথার উত্তর যে দেব, তুই কি তার উপযুক্ত?” রাণী বলিল, “নাথ! তুমি আমাকে এমন ভয়ানক কঠিন কথা বল্‌ছ কেন?” রাজা বলিলেন, “তুই রোজ যুবরাজকে নির্দ্দয়ভাবে মারিস, তার কান্নার শব্দে আমি দিনরাতের মধ্যে একবার চোখ বুজ্‌তে পারি না। তাকে ঐরকম করে না রাখ্‌লে আমি এতদিন সেরে যেতাম। আমি

কেবল তোর জন্যই এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি। কাজেই কি করে তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমার ইচ্ছা হবে ?" রাক্ষসী বলিল, "হে প্রাণবল্লভ, যদি যুবরাজের প্রতি অত্যাচার না করলে তোমার মন ভাল থাকে, তা হলে আমি তোমার কথামত এই দণ্ডেই তাকে মানুষ করে দিয়ে আস্‌তে পারি।" রাজা বলিলেন, "তবে এই মুহূর্ত্তে গিয়ে তাকে মানুষ করে আয়, তার কান্না আমার সহ্য হয় না।"

দুষ্ট রাক্ষসী এই কথা শুনিবামাত্র রোদনাগার হইতে বাহির হইল, এবং একটা জলভরা পাত্র লইয়া কতকগুলি মায়ামন্ত্র পড়িতে লাগিল। তাহাতে পাত্রের জল এমন ফুটিতে লাগিল যেন তাহাতে আগুন লাগিয়াছে। তারপর সে পাত্র-হাতে যুবরাজের কাছে গিয়া তাঁহার গায়ে কিঞ্চিৎ জল ছিটাইয়া দিয়া বলিল, "যদি সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে এইরকম চেহারা দিয়ে থাকেন, তা হলে তুমি এই অবস্থাতেই থাক; কিন্তু যদি মানুষ হয়ে আমার মন্ত্রের বলে এইরকম চেহারা পেয়ে থাক, তা হলে আবার তুমি নিজের মানুষের চেহারা ফিরে পাও।" মায়াবিনীর এই কথা শেষ হইবামাত্র যুবরাজ নিজের স্বাভাবিক মানুষের চেহারা ফিরিয়া পাইলেন এবং আনন্দে পালঙ্ক হইতে নামিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাণী বলিল, "এই দণ্ডেই তুমি এখান থেকে পালাও, আর কখনও এই পুরীতে পা দিও না, দিলে নিজের প্রাণ হারাবে।" যুবরাজ তাহার কথায় আর আপত্তি না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং সেই দয়ালু অতিথির অনুগ্রহেই নিজের দুরবস্থার শেষ হইল বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শেষ কাজ দেখিবার ইচ্ছায় পুরীর কাছেই এক জায়গায় লুকাইয়া রহিলেন।

তারপর সেই মায়াবিনী রোদনাগারে আবার ঢুকিয়া নিজের স্বামী ভাবিয়া রাজাকে বলিল, "হে প্রাণবল্লভ! তুমি আমাকে যা করতে বলেছিলে, তা করে এলাম! এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।" রাজা রাক্ষসের স্বরে তাহাকে বলিলেন, "তুই এখন যা করে এলি, তাতে আমার একেবারে রোগ সেরে যাবার সম্ভাবনা নেই। এতে আমার রোগের কেবল একটুখানি সেরেছে। কিন্তু একেবারে আমাকে সারাতে হলে তোর আরও কিছু কাজ বাকী আছে।" মহিষী বলিল, "নাথ! তোমার রোগ সারাবার জন্যে আমাকে কি করতে হবে, বল? আমি এখনি তা সম্পাদন করছি।" রাজা একটু রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "ওরে দুশ্চারিণি! তুই কি কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্ না? তুই কুহকবিদ্যা দিয়ে এই প্রকাণ্ড নগর আর উপদ্বীপ-চারটাকে ধ্বংস করেছিস্ আর সেখানকার সব-লোককে মাছ করে পুকুরের মধ্যে রেখে দিয়েছিস্। তারা রোজ রাত্রে জল থেকে মাথা তুলে আমাদের অভিশাপ দেয়। আমি এতদিন কেবল তাদের অভিশাপের ফলে একেবারে নীরোগ হতে পারছি না। যদি তোর আমাকে সারিয়া তুলবার সত্যই ইচ্ছা থাকে, তা হলে তুই এই দণ্ডেই গিয়ে যে সকল জিনিষ আগে যে ভাবে ছিল, সেইরকম করে আয়। তুই এখানে এলে আমি নীরোগ হয়ে হাত বাড়াব আর তুই আমার হাত ধরলে আবার আমি

বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ব।" মায়াবিনী এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "হে প্রিয়তম! এ আর একটা বিচিত্র কি? আমি এখুনি গিয়ে তোমার কথা-মত কাজ করে আস্‌ছি।" এই বলিয়া সে তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং পুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া মায়ামন্ত্র পড়িয়া উহা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সেই মহানগরী আগের মত সুন্দর হইয়া উঠিল, মানুষগুলিও যে যেমন ছিল সে তেমন হইয়া উঠিল।

এইরকমে রাণী সেখানকার সমস্ত জিনিষের আগেকার মত চেহারা করিয়া দিয়া আনন্দিত মনে তাড়াতাড়ি রোদনাগারে ঢুকিয়া রাজাকে স্বামী মনে করিয়া আবার বলিল, "হে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার কথামত সমস্ত জিনিষকে আগেকার মত করে এসেছি, এখন আমার হাত ধরে উঠ্‌বার জন্যে হাত বাড়াও।" রাজা বলিলেন, "এখন আমি তোমার ব্যবহার দেখে বড়ই খুসী হলাম। তুমি কাছে এসে আমার হাত ধর।" এই শুনিয়া রাণী আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার বিছানার কাছে আসিবামাত্র রাজা হঠাৎ উঠিয়া এমন শীঘ্র তাহার হাত ধরিয়া টান দিয়া খড়্গাঘাত করিলেন যে, কে তাহাকে মারিতেছে তাহা বুঝিবার আগেই রাণী দুই টুক্‌রা হইয়া তাঁহার বিছানার দুইপাশে গড়াইয়া পড়িল। রাজা এইরকমে সেই দুষ্টা কুহকিনীর উচিত শাস্তি দিয়া যুবরাজের কাছে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! এখন তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার দুরন্ত শত্রুকে আমি যমের বাড়ী পাঠিয়েছি।" এই শুনিয়া যুবরাজ খুবই আহ্লাদিত হইলেন, এবং আপন উদ্ধারকারী রাজার কাছে অনেক-প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। রাজা তাঁহাকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রাজ্যশাসন কর। আমার রাজ্য এখান থেকে বেশী দূর নয়। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা কর্‌বার যদি ইচ্ছা হয়, তা হলে নিজের রাজ্য মনে করে আমার রাজ্যে গিয়ে কখন কখন সেখানে থাক্‌তে পার। আমি তাতে খুবই সুখী হব।" যুবরাজ বলিলেন, "হে মহানুভব! আপনি কি মনে করেন আপনার রাজ্য এ-রাজ্যের কাছে?" রাজা উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমার রাজ্য এখান থেকে চার-পাঁচ ঘণ্টায় যাওয়া যেতে পারে।" যুবরাজ কহিলেন, "মহারাজ! চার-পাঁচ ঘণ্টার কথা দূরে থাক, একবৎসরের মধ্যেও আপনার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। আমার রাজ্য আগে মায়াধীন ছিল বলে আপনি ঐ সময়ের মধ্যে এসে থাক্‌বেন। এখন মায়া দূর হওয়াতে আপনি তার সম্পূর্ণ উল্টা ব্যাপার দেখ্‌তে পাবেন। যা হোক আপনি এমন মনে কর্‌বেন না যে, দূর বলে আমি আপনার সঙ্গে যেতে ছেড়ে দেব। আপনার রাজ্য যদি পৃথিবীর শেষেও হয়, তা হলেও আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

রাজা রাজধানী হইতে এত দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, স্বপ্নেও কখন এরূপ ভাবেন নাই। সুতরাং হঠাৎ এই কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় অবাক্ হইলেন। কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে এরূপ ঘটিবার সুস্পষ্ট কারণ বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি উত্তর করিলেন, "হে যুবরাজ! যদিও এখান থেকে নিজের রাজ্যে

ফির্বার জন্যে আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার কর্তে হবে, তবুও এখানে এসে তোমার যে কিছু উপকার কর্লাম এই ভেবে আমার একটুও কষ্ট হবে না। হে যুবরাজ! আমার ছেলে নেই, সুতরাং অনেক পুণ্যফলে তোমাকে ছেলের মত পেয়েছি। যদি তুমি আমার সঙ্গে আমার রাজ্যে এস, তা হলে তুমি জান্তে পার্বে, আমি কেমন স্নেহের চোখে তোমাকে দেখেছি! আমি তোমাকেই আমার নিজের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কর্‌ব ঠিক করেছি।" এই বলিয়া রাজা যুবরাজকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর যুবরাজ, নিজের উদ্ধারকর্ত্তার সঙ্গে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বিদেশে যাইবেন শুনিয়া প্রজাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। যুবরাজ তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিজের একজন পরমাত্মীয়ের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া খুব ধুমধাম করিয়া রাজার সঙ্গে কৃষ্ণ-উপদ্বীপ হইতে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে রাজা নির্ব্বিঘ্নে নিজের রাজধানীর কাছে আসিলে, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আনন্দিত মনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন, এবং নগরের লোকেরা আনন্দিত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া রাজাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

রাজা নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে সকলের কাছে ভ্রমণের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন; পরে কৃষ্ণ-উপদ্বীপের যুবরাজকে যে আপনার উত্তরাধিকারী করিবেন ঠিক করিয়াছেন, তাহাও সকলের সাম্‌নেই বলিলেন। তারপর তিনি যখন ছিলেন না তখন যে-সকল কর্ম্মচারী ভাল করিয়া রাজকার্য্য চালাইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপর খুসী হইয়া প্রত্যেককে উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন; এবং একমাত্র ধীবরই কৃষ্ণ-উপদ্বীপের যুবরাজের দুঃখ মোচনের আসল কারণ জানিয়া তাহাকে এত প্রচুর ধন দান করিলেন যে, সে বড়লোক হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে কাটাইতে লাগিল।

দুই ফকির ও বাগ্‌দাদনগরের তিন রমণীর কথা

হারুন-অল্-রশীদ রাজার রাজত্বের সময়ে বাগ্‌দাদনগরে একজন মোটবাহক থাকিত। সে যদিও নিজের পেট ভরাইবার জন্য এইরূপ কাজ করিত, তবুও সে উপযুক্ত সময়ে নিজের রসিকতা এবং ঠাট্টা করিবার ক্ষমতার খুবই পরিচয় দিতে পারিত। একদিন সকালে ঐ মুটে একটা ঝাকা হাতে করিয়া বাজারে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় ঘোম্‌টা-দেওয়া পরম রূপবতী এক যুবতী তাহার সাম্‌নে আসিয়া মধুরস্বরে বলিল, "হে বাহক, আমি তোমাকে

মোট দেব, তুমি ঝাঁকাটা নিয়ে আমার পিছন পিছন এস।" মোট-বাহক এই কথা শুনিবামাত্র পরম আহ্লাদে সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "আজ কি শুভক্ষণেই রাত ভোর হয়েছে।" মেয়েটি কিছুদূরে গিয়া এক বাড়ীর সাম্নে উপস্থিত হইল; সেই বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকাতে সে তাহা খুলিবার জন্য দরজায় শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই বাড়ীর ভিতর হইতে একজন শাদা দাড়ীওয়ালা খ্রীষ্টিয়ান বাহিরে আসিল। তরুণী তাহার হাতে কতকগুলি টাকা দিলে পর, সেই বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতরে যাইয়া কিছুক্ষণ পরে এক কলস ভাল সরবৎ আনিয়া উপস্থিত করিল। রমণী তাহা দেখিয়া মুটিয়াকে বলিল, "তুমি এই কলসীটা ঝাঁকার উপরে তুলে নাও আর আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।" মোটবাহক তখনই তাহা তুলিয়া লইয়া মেয়েটির পিছন পিছন চলিল এবং ভাবিতে লাগিল, "অহো আজ আমার কি সুপ্রভাত!"

তারপর মেয়েটি আর-কিছুদূর গিয়া বাজার হইতে অনেক-প্রকার ফল, ফুল, মসলা ও মিষ্টান্ন কিনিয়া মুটিয়ার মাথায় তুলিয়া দিল, এবং ক্রমশঃ যাইতে যাইতে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল। রমণী দরজায় ঘা দিতেই আর-এক সুন্দরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাহক এমন আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল, যে, তাহার মোট পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। যে-রমণী মুটিয়াকে সঙ্গে আনিয়াছিল, সে তাহার এমন অবস্থা দেখিয়া এমন একমনে তাহারই কথা ভাবিতেছিল যে, তাহাদিগের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবার জন্য যে দরজা খোলা হইয়াছে ইহা ভুলিয়া গিয়া সে কিছুক্ষণ সেখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া যে-মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল সে বলিল, "প্রিয়তম ভগিনি, তুমি কিসের অপেক্ষা কর্‌ছ? শীঘ্র ভিতরে এস। তুমি কি দেখ্‌ছ না মোটের ভারে মুটে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? সে আর কতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে এই অসহ্য ভার বইবে? এই কথায় মেয়েটি মুটিয়ার সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। যে-মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল সে তখনই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর তাহারা তিনজনে বাড়ীর ভিতরে একটি সুন্দর উঠান পার হইয়া ক্রমে একটা প্রকাণ্ড দালানের কাছে উপস্থিত হইল। ঐ দালানের চারিদিকে অনেকগুলি সাজানো এবং গায়ে গায়ে লাগানো ঘর ছিল। ঘরগুলি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। এই-সকল দেখিয়া মুটিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ঐ দালানের শেষের দিকে চারটি সুন্দর থামের উপর স্থাপিত, উজ্জল এবং প্রকাণ্ড এক হীরকখণ্ডে খচিত, চারদিকে সুন্দর মুক্তার ঝালরে সজ্জিত, উপরে সুন্দর শাটিনের আস্তরণে ঢাকা এক সোনার সিংহাসনে, পরমা সুন্দরী এক তরুণী বসিয়াছিলেন। তিনি ঐ মেয়ে-দুটিকে সাম্নে আসিতে দেখিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদিগের কাছে আসিলেন। মোটবাহক নিজের সঙ্গের স্ত্রীলোক-দুটির ব্যবহার দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে, সিংহাসনে যিনি বসিয়া ছিলেন তিনিই বাড়ীর কর্ত্রী, এবং অন্য দুটি যুবতী তাঁহার সখী। তাঁহার নাম

জোবেদী, এবং তাঁহার সখীদ্বটির মধ্যে যে মেয়েটি দরজা খুলিয়া দিয়াছিল তাহার নাম সাফী, আর যে বাজার হইতে খাবার প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছিল তাহার নাম আমিনী। মুটিয়া বোঝার ভারে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া জোবেদী সখীদিগকে বলিলেন, "এই মুটিয়া বেচারা মোটের ভারে শ্রান্ত হয়েছে। তোমরা শীঘ্র এর মোট নামাচ্ছ না কেন?" এই কথা শুনিয়া আমিনী ও সাফী দুই সখীতে তখনই মোটের দুই ধার ধরিয়া উহা মাটিতে নামাইল। জোবেদীও এ বিষয়ে তাহাদিগের অনেক সাহায্য করিলেন। তাহার পর সকলে হাতাহাতি করিয়া ঝাঁকা হইতে জিনিষপত্র নামাইলে পর আমিনী মুটিয়ার হাতে একটি টাকা দিল। বাহক টাকা পাইয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ঐ তিনজন রমণীর ও ঘরের শোভা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল!

টাকা দেওয়ার পরও মুটিয়াকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জোবেদী প্রথমে মনে করিল, সে বিশ্রাম করিবার জন্য সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু শেষে যখন দেখিল সে সেইভাবে সেখানে অনেকক্ষণ রহিল, তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুটিয়া! তুমি কি-জন্য এখানে এত দেরী করছ? তুমি কি তোমার কাজের উচিত দাম পাওনি?" তারপর আমিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ভগিনি! মুটিয়াকে আরও কিছু দিয়ে খুসী করে বিদায় কর।" এই শুনিয়া মোটবাহক বলিল, "আর্য্যে! আমি তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি কথনও তা মনে করবেন না। আমি যা পেয়েছি তাতেই যথেষ্ট খুসী হয়েছি। আমি বেশ বুঝেছি যে, এতক্ষণ এখানে দেরী করাতে আমার বিশেষ বেয়াদবী দেখান হয়েছে। তবুও আমি আশা করি এ অধীনের আর-একটি বাচালতা আপনি অনুগ্রহ করে সহ্য করবেন। আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে কেবল এই ভাবছি যে, আপনাদের, তিনজনকেই বড়ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে; অথচ এখানে আপনাদের বাবা মা স্বামী বা ভাই কাকেও দেখ্‌ছি না! এর কারণ কি।"

মুটিয়ার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র জোবেদী একটু গম্ভীর স্বরে কহিল, "ওহে! তুমি কিছু বেশী পরিমাণে নিজের বাচালতা দেখাচ্ছ। যদিও তোমাকে আমাদের বিষয় বলাতে কোন ফল হবে না, তবুও তোমাকে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি, তুমি মন দিয়ে শোনো। আমরা তিন বোনে নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ খুব লুকিয়ে করে থাকি। এইজন্যে আমরা পুরুষ-জাতের কোন সম্পর্কে থাকি না।" মুটিয়া বলিল, "হে সুন্দরীগণ! আপনারা যে খুবই গুণবতী তা আপনাদের চেহারা দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি; যদিও আমি কপালদোষে এই ছোটলোকের কাজ করে দিন কাটাচ্ছি তবুও আপনারা মনে করবেন না যে, আমি একেবারে মূর্খ। মনের জড়তা দূর কর্‌বার জন্যে, আমি লেখা-পড়া শিখ্‌বার জন্যে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করেছি, আর বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদিতে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে। আমার আর-একটি অসাধারণ গুণের কথা আমি এ পর্য্যন্ত বলিনি, তা এই—আমি প্রাণান্তেও কখন একজনের লুকানো কথা অন্যকে বলি

না। যদি কোন লোক বিশ্বাস করে আমাকে কোন কথা বলেন, তা হলে, সিন্দুকের ভিতর কোন জিনিষ চাবি দিয়ে রাখ্‌লে যেমন থাকে আমি সে কথা মনের মধ্যে ঠিক সেই-রকম লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি।” জোবেদী মুটিয়ার এরকম কথার দৌড় দেখিয়া তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইল এবং তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, “ওহে বন্ধু! আজ আমাদের বাড়ীতে একটি ভোজ হবে। সেটি খুব টাকা খরচ করেই হবে। যদি তুমি তাতে আমাদের কিছু সাহায্য কর্‌তে পার, তা হলে, তোমাকে এ আমোদ থেকে বাদ দেব না।” বাহক হঠাৎ এই কথার উত্তর দিতে না পারাতে একটু লজ্জিত হইয়া তখনই সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু আমিনী তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অনেকক্ষণ তাহার হইয়া অনেক কথা বলিয়া তাহাকে সেখানে রাখিবার জন্য জোবেদীকে অনুরোধ করিল। জোবেদী আমিনীর কথা-মত তাহাকে সেখানে থাকিতে অনুমতি দিয়া মুটিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “ওহে বন্ধু। এখন তুমি এখানে থাক্‌তে পেলে। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাদের যা কিছু কর্‌তে দেখবে কখনও তা কারও কাছে বোলো না, আর সর্ব্বদা ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কোরো।”

মুটিয়া জোবেদীর আদেশমত চলিতে প্রতিজ্ঞা করিলে পর, আমিনী ভোজনের আয়োজন করিবার জন্য প্রথমে ঘরের মধ্যে কয়েকটি বাতি জ্বালিয়া দিল; ঐ-সকল বাতি হইতে সুগন্ধ বাহির হওয়াতে সমস্ত ঘর ভরিয়া উঠিল। তাহার পর ঘরের মধ্যে অনেক-রকম খাবার সাজানো হইলে, তাহারা তিন ভগিনীতে খাইতে বসিল এবং মুটিয়াকে আপনাদের এক পাশে বসিতে অনুমতি করিল। খাওয়ার পর আমিনী একটা পাত্রে সর্‌বৎ ঢালিয়া আগে নিজে পান করিল; পরে দুই বোনকে দুই পাত্র দিয়া শেষে মুটিয়ার হাতে এক পাত্র দিল। সে তাহা পাইবামাত্র চীৎকার করিয়া একটি গান করিতে লাগিল। তারপরে সে ঐ সরবৎ পান করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে জোবেদী মুটিয়াকে বলিল, “আর বেলা নেই, এখন তুমি বিদায় হও, রাত্রি হয়ে এল।” মুটিয়া বলিল, “আপনি আমাকে এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা কর্‌ছেন কেন? আমি রাতকাণা। এখন যদি অন্ধকারে এখান থেকে বের হই, তা হলে, আমি কখনও নিজের বাড়ী খুঁজে যেতে পার্‌ব না। অতএব অনুগ্রহ করে আজ আমাকে এখানে থাক্‌তে অনুমতি দিন, কাল সকালে আমাকে এখান থেকে বিদায় করে দেবেন।” আমিনী মুটিয়ার যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া জোবেদীকে বলিল, “বোন, আজ রাত্রে গরিব মুটিয়াকে এখানে থাক্‌তে না দিলে এ নিতান্ত কষ্ট পাবে। আমি অনুরোধ কর্‌ছি, এ-রাত্রি একে এখানে থাক্‌তে অনুমতি দিন।” জোবেদী আমিনীর কথায় তাহাকে সেখানে থাকিতে অনুমতি দিল, এবং মুটিয়াকে বলিল, “তুমি আজ রাত্রে এখানে থাক্‌বার জায়গা পেলে বটে, কিন্তু তুমি আগে স্বীকার কর যে, আমাদের কোন কাজ কর্‌তে দেখলে, কখনও তার কোন কারণ জান্‌তে চাইবে না। যদি চাও তা হলে তোমার বিশেষ অনিষ্ট হবে।” মুটিয়া বলিল, “আমি আপনাদের কথামত চল্‌ব, কখনও কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ব না।”

এই-রকম কথাবার্ত্তার পর তাহারা সকলে রাত্রে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে-খাইতে নানা-রকম আমোদ করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের মনে হইল যেন কোন ব্যক্তি আসিয়া কপাটে আঘাত করিল। সেই শব্দ শুনিবামাত্র সাফী দরজার দিকে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার ভগিনীদের কাছে আসিয়া বলিল, "বোন! আজ রাত্রিটা খুব ফুর্ত্তি করে কাটা-বার এক মস্ত সুবিধা ঘটেছে। এখন যদি তোমরা আমার মতে মত দাও তা হলে আমি নিজের মত জানাই!" জোবেদী ও আমিনী তাহাতে রাজী হইলে সাফী আবার বলিল, "আমি দরজার কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম সেখানে দুইজন ফকির দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দুজনেরই মাথা দাড়ী আর ভুরু সব কামানো এবং বিশেষ আশ্চর্য্য এই, তাদের প্রত্যেকেরই ডান চোখ নেই। তারা আমাকে দেখে বল্‌ল যে, তারা এইমাত্র বাগ্দাদনগরে এসে উপস্থিত হয়েছে, এর আগে আর কখন এখানে পা দেয় নি, রাত হয়ে গিয়েছে, নিজেদের থাক্‌বার জায়গা ঠিক কর্‌তে না পেরে রাত্রিটা কাটাবার জন্যে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে চাইছে। তাদের চেহারা দেখে আমার বেশ মনে হচ্ছে যে,তাদের এখানে আস্‌তে দিলে আমাদের আরও ফুর্ত্তি বাড়্‌বে,আর তাদের জায়গা দিতে রাজী না হবার বিশেষ কোনও কারণও দেখা যায় না, কারণ তারা কেবল কোন-রকমে এখানে রাত কাটিয়ে সকালে এখান থেকে চলে যাবে।" এই কথা বলিয়া সাফী চুপ করিল। জোবেদী ও আমিনীর ফকিরদের জায়গা দিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও ভগিনীর কথা ঠেলিতে না পারিয়া বলিল, "তুমি ফকিরদিগকে এখানে আস্‌তে দিতে চাও দাও। কিন্তু তাদের আগেই সাবধান করে দিও, আমাদিগকে এখানে যা-কিছু কর্‌তে দেখবে তাতে যেন কিছু জিজ্ঞাসা না করে।" সাফী বোনেদের অনুমতি পাইয়া খুসী হইয়া তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং একটু পরে সেই দুইজন ফকিরকে সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল। ফকিরেরা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই মেয়েদের নমস্কার করিল। তাহারাও ফকিরদের সম্মান দেখাইবার জন্য তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নানাপ্রকার আদর অভ্যর্থনা করিয়া পরে নিজেদের সঙ্গে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। ফকিরেরা নিজেদের আশ্রয়দায়িনীগণের অনুরোধ ঠেলিতে না পারিয়া তাদের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিল। তারপরে তাহারা মেয়েদের বলিল, "এখন আমাদের ভারি ইচ্ছা যে গান বাজনা করে তোমাদের খুসী করি। যদি এখানে কোন বাজনা থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদের সেগুলো আনিয়ে দিলে আমরা বাধিত হব।" তিন ভগিনী এই কথা শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হইল, এবং সাফী তখনই একটা বাঁশী ও একটা তবলা আনিয়া উপস্থিত করিল। তারপর তাহারা প্রত্যেকে এক-একটা বাজনা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। সুন্দরী তিনজনেরও গান করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী ছিল, কাজেই তাহারাও সেইসঙ্গে গান গাহিতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহারা গানবাজনায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন আবার বাহিরের দরজার কপাটে আঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। সাফী তাহা শুনিয়া গান থামাইয়া কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য সেখান হইতে দরজার দিকে চলিল।

শাহারজাদী বলিলেন; মহারাজ! এত রাত্রে সুন্দরীগণের বাড়ীর দরজায় কে ধাক্কা দিল, তাহার গল্প বল্‌ছি শুনুন।

রাজা হারুন-অল্‌-রশীদের এই-রকম নিয়ম ছিল যে, শহরের লোক কে কেমন ভাবে থাকে এবং রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি ঘটে নিজের চোখে এই-সব দেখিবার জন্য তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে এদিক্‌-ওদিক্ বেড়াইয়া বেড়াইতেন। ঐ-দিন রাত্রি বেলায় তিনি জাফর নামক প্রধান মন্ত্রী এবং মসরুর নামক রাজবাড়ীর প্রধান খোজাকে সঙ্গে লইয়া সওদাগরের বেশে ঐখান দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে বাজনার শব্দ ও হাসির আওয়াজ শুনিয়া রাজা জাফর-মন্ত্রীকে বলিলেন, "দরজা খুল্‌তে বল; বাড়ীর মধ্যে কি হচ্ছে আমাকে দেখ্‌তে হবে।" মন্ত্রী রাজাকে ঐ-রকম কাজ করিতে নিষেধ করিবার জন্য বলিলেন, "মহারাজ! মনে হয় আজ এই বাড়ীর মেয়েরা নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌ছে। এ কথনও আপনার দেখা উচিত নয়।" রাজা সেকথা না শুনিয়া আবার তাঁহাকে দরজায় ঘা দিতে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রী রাজার কথা অমান্য করিতে না পারিয়া তখনই দরজায় গিয়া ঘা দিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই শব্দ শুনিয়া সাফী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঐ সুন্দরীর হাতে একটি আলো ছিল। মন্ত্রী সেই আলোতে তাহার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত কৌশল করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে! আমরা তিনজন মৌজলদেশের বণিক্, বাণিজ্য কর্‌বার জন্য আজ দশ দিন অনেক দামী জিনিষপত্র নিয়ে এই নগরে এসে উঠেছি। আজ এক মহাজনের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল, খাওয়া-দাওয়ার পরে সেখানে বসে গানবাজনা শুন্‌ছিলুম; এমন সময়ে হঠাৎ ভয়ানক গোলমাল শুনে চৌকীদারেরা জোর করে ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল, এবং একে একে নিমন্ত্রিত সব লোককেই বেঁধে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। আমরা কপালগুণে একটা দেওয়াল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমরা বিদেশী বলে এখানকার পথ চিনি না, কাজেই বাসায় ফিরে যাবার চেষ্টা করে পাছে আমরা অন্য কোন চৌকীদারের হাতে পড়ি এই ভয়ে আমরা সেদিকে যেতে সাহস কর্‌ছি না। এখনই এই পথ দিয়ে যেতে যেতে আপনাদের বাড়ীর গানের শব্দ শুন্‌তে পেয়ে আপনারা জেগে আছেন মনে করে দরজা ঠেলেছি। এখন আপনারা দয়া করে আমাদের আজ রাত্রির মত এই বাড়ীতে থাক্‌তে অনুমতি দিন, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।" সাফী বলিল, "আমি এ বাড়ীর গিন্নি নয়, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি গিন্নি ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করে শীঘ্র আস্‌ছি।"

সাফী এই কথা বলিয়া তখনই তাহার বোনদের কাছে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল। জোবেদী ও আমিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দয়া করিয়া শেষে তাহাদেরও বাড়ীর মধ্যে আনিতে অনুমতি দিল। সাফী তাহাদের কথামত রাজা, মন্ত্রী খোজাধ্যক্ষকে বাড়ীর মধ্যে আসিতে বলিল। তাঁহারা ভিতরে ঢুকিয়াই ভদ্রভাবে সুন্দরী ও ফকিরদিগকে নমস্কার করিলেন। তাহারাও তাঁহাদিগকে সওদাগর মনে করিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বসিবার

আসন দিল। তারপর জোবেদী বিনয় করিয়া কহিল, "আপনারা আসাতে আমরা খুব খুসী হলাম। কিন্তু আপনাদের আমি একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে ইচ্ছা করি। তাতে আপনারা কিছু মনে করবেন না।" মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা এখানে যা-খুসী দেখ্‌তে পারেন, কিন্তু প্রাণান্তেও কিছু বল্‌তে পার্‌বেন না, অর্থাৎ যা-কিছু এখানে দেখ্‌বেন যদি সে-বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে আপনারা বিষম বিপদে পড়্‌বেন।" মন্ত্রী কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমাদের যা আদেশ কর্‌ছেন, আমরা তাই করব, কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করব না।" এই কথা শুনিয়া সকলে ছদ্মবেশধারী রাজা ও তাঁহার সঙ্গীগণের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া আরম্ভ করিলেন। রাজা বাড়ীর মেয়েদের আশ্চর্য্য রূপ, সরল স্বভাব আর চমৎকার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন, কিন্তু দুজন ফকিরের মধ্যে প্রত্যেকের ডান চোখ নাই দেখিয়া, ভারি অবাক্ হইলেন। তিনি ফকিরদিগকে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু এখনই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা মনে হওয়াতে তখন চুপ করিয়া রহিলেন।

খানিক পরে জোবেদী হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া আমিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "বোন! আর বৃথা সময় নষ্ট করবার দরকার নেই; এস আমরা নিজেদের রোজকার কাজ করি! এই ভদ্রলোকেরা এখানে রয়েছেন বলে আমাদের কখনও কর্ত্তব্য কাজ ভুলে যাওয়া উচিত নয়।" আমিনী এই কথা শুনিবামাত্র ভগিনীর ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া তখনই উঠিয়া পড়িল, ঘর হইতে সব বাসনকোসন ও অন্যান্য জিনিষপত্র অন্য ঘরে লইয়া গিয়া রাখিল। সাফী ঝাঁট দিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, এবং জিনিষপত্র সরাইয়া ঠিক জায়গায় রাখিয়া দিয়া ঘরের আলোগুলা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। পরে ঘরের দুই পাশে দুইখানা বসিবার জন্য পালঙ্ক পাতিয়া তাহার একখানাতে দুইজন ফকির ও অন্যখানাতে রাজা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বসাইল। তাহার পর সে মুটিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওহে! তুমি এ সময়ে চুপ করে বসে আছ? শীঘ্র শীঘ্র উঠে ঠিক হয়ে থাক। আমরা যখন যা করতে বলব, তোমাকে তখনই তা কর্‌তে হবে। তুমি ঘরের লোক, তুমি এমন সময় বসে থাক্‌লে কি চলে?" সে ঐ কথা শুনিবামাত্র তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোমর বাঁধিয়া বলিল, "এই আমি আপনাদের আদেশ পালন কর্‌বার জন্য তৈরী আছি।" সাফী উত্তর করিল, "তোমার এই-রকম উৎসাহ দেখে আমি অত্যন্ত খুসী হলাম। তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমাকে আমাদের কাজে লাগাচ্ছি।" কিছুক্ষণ পরে আমিনী একখানি চৌকী আনিয়া ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে মুটিয়াকে বলিল, "এস, তোমাকে আমার কিছু সাহায্য কর্‌তে হবে।" তাহা শুনিয়া মুটিয়া তাহার পিছন পিছন গিয়া একটি কুঠরীর মধ্যে ঢুকিল, এবং একটু পরেই দুইটি কালো কুকুরীকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিল।

রাজা ও ফকিরদিগের মাঝের একখানি আসনে জোবেদী বসিয়া ছিল। সে মুটিয়াকে

দুইটা কুকুরী আনিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তবে আর বৃথা সময় নষ্ট করে দর্কার নেই। এখন আমরা নিজেদের কর্তব্য কাজ করি।" এই কথা বলিয়া নিজের পোষাক শক্ত করিয়া বাঁধিয়া আমিনীর হাত হইতে একটা লাঠি লইয়া বলিল, "মুটে! তুমি এই দুটো কুকুরীর মধ্যে থেকে একটা আমিনীর হাতে দিয়ে অন্যটা নিয়ে শীঘ্র আমার কাছে এস।" মুটিয়া তাহার কথামত একটা কুকুরী তাহার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিল। কুকুরী জোবেদীর দিকে চাহিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কুকুরীর কান্না দেখিয়া জোবেদীর মনে কিছুমাত্র দয়া হইল না। সে লাঠি দিয়া তাহার পিঠে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারিতে লাগিল যে, কুকুরী কিছুক্ষণ কাতরভাবে চীৎকার করিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া জোবেদী লাঠিটা দূরে ফেলিয়া দিয়া মুটিয়ার হাত হইতে নিজের হাতে শিকল লইয়া কুকুরীকে পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাইল; এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, তার পর নিজের কাপড়ে কুকুরীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাহাকে চুমা খাইয়া মুটিয়াকে বলিল, "তুমি যেখান থেকে এনেছিলে একে আবার সেখানে রেখে অন্য কুকুরীকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

মুটিয়া প্রথম কুকুরীকে সঙ্গে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং তাহাকে বাখিয়া আসিয়া আমিনীর হাত হইতে দ্বিতীয় কুকুরীকে লইয়া জোবেদীর কাছে আসিল এবং তাহার কথামত তাহাকেও আগের মত ধরিয়া রহিল। জোবেদী তাহাকেও সেই-রকম প্রথমে মারিয়া শেষে চুম্বনাদি করিল। তারপরে আমিনী আসিয়া তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেল। রাজা, তাঁহার সঙ্গীগণ ও দুইজন ফকির এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, মুসলমান-শাস্ত্রে কুকুরীজাতি খুবই অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলিয়া লেখা আছে। কাজেই আগে তাহাদের মারিয়া পরে তাহাদের মুখচুম্বনাদি করিবার কারণ কি ইহা কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তারপরে তাঁহারা লুকাইয়া ঐ বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং রাজা উহার কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া সঙ্কেত করিয়া মন্ত্রীকে ইহার কারণ জানিতে অনুরোধ করিলেন; মন্ত্রীও ইসারা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, এখনও জিজ্ঞাসা করিবার ঠিক সময় উপস্থিত হয় নাই।

তারপর জোবেদী বিশ্রাম করিবার জন্য কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল তাহার পর সাফী তাহাকে বলিল, "বোন! এখন তুমি এখান থেকে উঠে নিজের জায়গায় গিয়ে বস্লে ভাল হয়, কেননা আমাকেও নিজের কর্তব্য কাজ কর্তে হবে।" জোবেদী এই কথা শুনিয়া বলিল, "হাঁ উচিত বটে," এবং তখনই সেখান হইতে উঠিয়া রাজা, তাহার সঙ্গীগণ ও দুইজন ফকিরের মাঝখানে যে আসন ছিল তাহার উপর যাইয়া বসিল জোবেদী সেখানে গিয়া বসিলে পর, আবার কি কাণ্ড ঘটে তাহা জানিবার জন্য

দর্শকগণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। সাফী ঘরের মাঝখানে একখানি পালঙ্কে বসিয়া আমিনীকে বলিল, "বোন! উঠে তোমাকে এখন যা কর্‌তে হবে, শীঘ্র তা কর।" এই কথা শুনিবামাত্র আমিনী উঠিয়া যে ঘর হইতে দুইটা কুকুরীকে আনা হইয়াছিল, তাহার পাশের একটি কুঠরীতে গেল এবং হল্‌দে রংএর শাটিন কাপড়ে ঢাকা একটি ছোট সিন্দুক আনিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা বীণা বাহির করিয়া সাফীর হাতে দিল। সাফী তাহার সুর মিলাইয়া বাজাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে এমন একটি সুন্দর গান

সাফী তাহার সুর মিলাইয়া বাজাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে
এমন একটি সুন্দর গান আরম্ভ করিল—

আরম্ভ করিল, যে, তাহা শুনিয়া সকলে একেবারে মোহিত হইলেন। সাফী কিছুক্ষণ ঐ-প্রকার গান গাইয়া শেষে ক্লান্ত হওয়াতে আমিনীকে বলিল, "ভগিনী! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে, তুমি এই বীণা নিয়ে কিছুক্ষণ গান কর।" আমিনী বীণা বাজাইয়া সেইরূপ গান গাইতে আরম্ভ করিল। আমিনীও অনেকক্ষণ গান করিয়া শেষে ক্লান্ত হইলে জোবেদী তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া বলিল, "প্রিয়তমে ভগিনী! তুমি যে গান করিলে এ ভারি চমৎকার।" আমিনী গানের ভাবে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তখন তাহার জ্ঞান ছিল না। কাজেই সে ভদ্রতা ভুলিয়া গলার কাপড়

খুলিয়া বসিল। যাহা হউক, আমিনী তাহাতেও কিছুমাত্র বিশ্রাম লাভ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

জোবেদী ও সাফী ভগিনীর এই অবস্থা দেখিয়া শীঘ্র তাহাকে আশ্বস্ত করিতে গেল। এমন সময় একজন ফকির বলিল, "হায়! কেন এ-সব আগে জান্‌তে পারিনি। এখানে এসে এমন শোচনীয় কাণ্ড দেখার চেয়ে পথে শুয়ে থাকা আমাদের হাজার-গুণে ভাল ছিল।" রাজা আগেই অবাক্ হইয়াছিলেন, কাজেই ফকিরের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র তিনি তাহার এবং তাহার সঙ্গের অন্য ফকিরের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এর কারণ কিছু বল্‌তে পার?" তাহারা উত্তর করিল, "এ-বিষয়ে আপনি যতদূর জানেন আমরাও তাই। এর আগে আর কখন আমরা এ-বাড়ীতে পা দিইনি। আপনি ঢুক্‌বার মুহূর্ত্তমাত্র আগে আমরা এবাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছি, কাজেই আমরা এর কিছুই জানি না।" তাই শুনিয়া রাজা আরও অবাক্ হইলেন। পরে তিনি মুটিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আপনাদের সঙ্গের ঐ লোকটি কিছু জান্‌লেও জান্‌তে পারে!" ইহা শুনিয়া একজন ফকির মুটিয়াকে ইসারা করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে! তুমি এর কিছু কারণ বল্‌তে পার? কি-জন্যে কুকুরী-দুটিকে নির্দ্দয়ভাবে মারা হল?" মুটিয়া উত্তর করিল, "আমি পরমেশ্বরের শপথ করে বল্‌তে পারি, আমি এর কিছুই কারণ জানি না।" রাজা ও তাঁহার সঙ্গীরা আগে মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ লোকটি রমণীগণের পরিবারের কেহ হইবে, কিন্তু সে যখন নিজের পরিচয় দিল, তখন তাঁহাদের জানিবার আশা বিফল হইল। যাহা হউক রাজা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, এ-বিষয় সমস্ত না জানিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। কাজেই তিনি শেষে ঠিক করিলেন এ-বিষয় মেয়েদেরই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহার পর সঙ্গীগণকে বলিলেন, "ওহে! তোমরা মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমরা এই বাড়ীর মধ্যে সবসুদ্ধ ছয়জন পুরুষ আছি, এরা তিনজন মেয়েমানুষে আমাদের কি অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে? এস আমরা ওদেরই সাহস করে এ কথা জিজ্ঞাসা করি।" বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী জাফরের ঐ প্রস্তাব পছন্দ না হওয়াতে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "মেয়েদের এ-কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। আমরা যে শপথ করে এই বাড়ীতে ঢুকেছি তা আমাদের রক্ষা করা উচিত। বিশেষতঃ এ-রকম ব্যবহার কর্‌লে আমাদের অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা আছে।"

মন্ত্রী এই-কথা বলিয়া রাজাকে একধারে লইয়া গিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এখন রাত প্রায় ভোর হল। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, সকালে আমি এই তিনটি মেয়েকে আপনার সিংহাসনের কাছে হাজির কর্‌ব। আপনি যা যা জান্‌তে ইচ্ছা করেন, তখন সেই-সব বিষয় অনায়াসে এদের মুখ থেকে শুন্‌তে পাবেন।" যদিও মন্ত্রী এই-রকম সৎপরামর্শ দিলেন, তবুও রাজা উহা কোনমতেই গ্রাহ্য না করিয়া একটু বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন,

"মন্ত্রী, চুপ কর, তোমার শুধু-শুধু কথা কয়ে দর্‌কার নেই। আমি আর এক মুহূর্ত্তও ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পারি না। এই-দণ্ডেই আমাকে এ-বিষয়ে ঠিক কারণ জান্‌তে হবে।" মন্ত্রী এই-কথা শুনিয়া চুপ করিলে পর, রাজা সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য প্রথমে দুইজন ফকিরকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে রাজী না হওয়াতে শেষে এই ঠিক করিলেন যে, মুটিয়া ঐ কথা মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিবে।

তাঁহাদের পরস্পর এই-রকম কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় আমিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়াতে জোবেদী তাঁহাদের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এত ব্যস্ত হয়ে কি পরামর্শ কর্‌ছ?" মুটিয়া তখনই বিনীতভাবে উত্তর দিল, "ঠাকুরাণী, এই-সব মহাশয়রা জান্‌তে ইচ্ছা করেন, আপনি কি-জন্যে দুইটি কুকুরীকে নির্দ্দয়ভাবে মার্‌লেন এবং কি-জন্যই বা শেষে তাদের মুখচুম্বন কর্‌লেন? আপনি দয়া করে এই-সব বিষয়ের কারণ বলে এঁদের মন ঠাণ্ডা করুন; এঁরা এতক্ষণ আমাকে এই-সব বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌ছিলেন; আর এইজন্যই এঁদের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছিল।" জোবেদী ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তোমরা আমাকে এই-রকম কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে এই লোকটিকে অনুরোধ করেছ?" তাঁহারা সকলেই উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমরা করেছি," কিন্তু মন্ত্রী জাফরের অমতে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি কেবল চুপ করিয়া রহিলেন। জোবেদী এই কথা শুনিবামাত্র রাগে পাগলের মত হইয়া বলিল, "তোমরা ভেবে দেখ কিরকম অভদ্র ব্যবহার করেছ। আমরা বাড়ীর মধ্যে অসহায় ছিলাম বলে তোমাদের এখানে জায়গা দেবার আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, কখনও তোমরা আমাদের কাজ দেখে কোন জিজ্ঞাসাবাদ কর্‌বে না। তোমরা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌লে না। আমরা যথাসাধ্য তোমাদের অভ্যর্থনা আর যত্ন কর্‌তে ক্রুটি করিনি। সেই-সব উপকার এই-রকমে শোধ কর্‌তে তোমাদের একটুও লজ্জা হল না? যা হোক, তোমরা মনে কোরো না যে, তোমাদের এই অভদ্র ব্যবহারের জন্য উচিত শাস্তি না দিয়ে আমি কখনও চুপ করে থাক্‌ব।" এই বলিয়া মাটিতে তিনবার লাথি মারিল, তারপর তিনবার হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওরে। তোরা কোথায় আছিস্‌, শীঘ্র আয়!" এই-কথা বলিবামাত্র হঠাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল, আর তার ভিতর দিয়া ছয়জন বলবান ভীষণ-চেহারাওয়ালা কাফ্রি পুরুষ খাঁড়া হাতে ঢুকিয়া এক-একজনকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহাদের মাথা কাটিবার জোগাড় করিল।

রাজা হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন, এবং মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! কেন আমি মন্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য কর্‌লাম!" বাস্তবিক এই-সময়ে তাঁহারা ছয়জনেই প্রাণ হারাইতেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের মাথা কাটিবার আগে কাফ্রিদিগের মধ্যে একজন জোবেদীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণী! এখনি কি এদের গলা কেটে ফেলব?" জোবেদী বলিল, "একটু দেরী কর। আগে আমি এদের পরিচয়

নিই, তারপর এদের মেরে ফেলো।" এই-কথা শুনিয়া মুটিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা বিনা দোষে আমাকে মেরে ফেল্‌বেন না। এই-সব লোকরাই সত্যি অপরাধী, আমার এ-বিষয়ে কিছুমাত্র দোষ নেই।" তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আহা! আমি পরম সুখে কাল কাটাচ্ছিলাম। কি অশুভক্ষণেই হতভাগা কাণা ফকিরগুলার মুখ দেখেছিলাম, তাতেই আমার এই বিপদ ঘট্‌ল। বোধহয় এরা পা দেওয়াতে ক্রমে নগরসুদ্ধ জ্বলে যাবে।"

জোবেদীর যদিও তখন অত্যন্তই রাগ হইয়াছিল তবুও মুটিয়ার এই-সব কথা শুনিয়া সে হাসি থামাইতে পারিল না; কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যান্য লোকদিগকে বলিল, "তোমরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাও, তা হলে এই দণ্ডেই নিজের-নিজের ঠিক পরিচয় দাও, তা না হলে এখনি তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে।" রাজা ইহার আগে জীবনের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন জোবেদীর মুখ হইতে এই-কথা শুনিয়া তাঁহার মনে একটু আশা হইল। তিনি মনে করিলেন, জোবেদী তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলে কখনই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে না। কাজেই নিজের জীবন বাঁচাইবার জন্য তাঁহার পরিচয় দিতে মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন। সুবুদ্ধি মন্ত্রী রাজার এই অপমান লুকাইয়া রাখিবার জন্য প্রথমে তাঁহার ঐ-কথায় কিছুতেই রাজী হইলেন না, কিন্তু শেষে তাঁহাকে বারবার পরিচয় দিতে বলাতে তিনি অগত্যা বাধ্য হইয়া, নিজের প্রভুর পরিচয় দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে জোবেদী ফকিরদিগের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তোমরা কি দুইজনে ভাই?" তাহাতে একজন ফকির উত্তর করিল, "না, আমরা ভাই নই, তবে এক-রকম ধর্ম্ম নেওয়ার জন্য সম্প্রতি আমরা ধর্ম্মভাই হয়েছি।" তারপরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, তোমরা কি জন্মে অবধি এই-রকম এক-চোখ কাণা?" তাহাতে প্রথম ফকির উত্তর করিল, "না, আমরা জন্মে অবধি এ-রকম নই। কোন গুরুতর কারণে আমরা এক-একটি চোখ হারিয়েছি।" অন্য ফকির বলিল, "আপনারা আমাদের সামান্য লোক মনে করবেন না, আমরা দুজনেই রাজার ছেলে। যদিও এর আগে আমাদের দুজনের কিছুমাত্র আলাপ ছিল না, তবুও আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ দুজনে একত্র হওয়াতে আমরা পরস্পর ভাল করেই পরিচিত হয়েছি।" ইহা শুনিয়া জোবেদীর রাগ একটু কমাতে সে কাফ্রিদিগকে আজ্ঞা করিল, "তোমরা এখন এদের ছেড়ে দাও, কিন্তু অন্য জায়গায় না গিয়ে এইখানেই থাক। এদের মধ্যে যারা ঠিক-ঠিক পরিচয় দেবে, তাদের কোন শাস্তি দেবার দরকার নেই, কিন্তু যারা নিজেদের জীবনের কথা লুকতে চেষ্টা করবে তাদের তখুনি মেরে ফেল্‌বে।"

নিজের সব-কথা বলিলেই জীবন রক্ষা হবে, এই কথা শুনিবামাত্র মুটিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ঠাকুরাণী! আমার সমস্ত কথা আপনারা আগেই শুনেছেন। আমি মোট বয়ে কোনো-রকমে চালাই। আজ সকালে আমি ঝাঁকা নিয়ে বাজারে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন

সময় আপনার বোন আমার মাথায় মোট দিয়ে এইখানে আন্‌লেন। তখন থেকে আমি আপনাদের দয়ায় পরম সুখে কাল কাটাচ্ছি। আপনাদের এই অনুগ্রহ প্রাণ থাক্‌তে ভুল্‌ব না। এই আমার একমাত্র পরিচয়।"

মুটিয়ার কথা শেষ হইবামাত্র জোবেদী তাহাকে বলিল, "তুমি এখনি এখান থেকে পালাও, আর কখনও এ-বাড়ীতে পা দিও না।" ইহা শুনিয়া বাহক জোড়হাত করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী! যখন আমার উপর এত অনুগ্রহ দেখালেন, তখন আর-কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে এখানে থাক্‌তে অনুমতি দিন; এই-সকল ভদ্রলোকের কথা শুন্‌তে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা।" এই-কথা বলিয়া সে জোবেদীর আসনের এক পাশে গিয়া বসিল, এবং 'উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম' বলিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তাহার পর ফকিরদিগের মধ্যে একজন জোবেদীকে নিজের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম ফকিরের কথা

প্রথম ফকির বলিল, ঠাকুরাণী! যে অদ্ভুত ঘটনায় আমার ডান চোখ অন্ধ হইয়াছে, তাহা আপনাকে জানাইবার জন্য আমাকে নিশ্চয়ই আপনার কথা-মত নিজের জীবনের সব কথা বর্ণন করিতে হইবে।

আমার বাবা রাজা। আমার ছেলেবেলায় আমাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ দেখিয়া আমাকে উচিত-মত শিক্ষা দিতে তিনি কোন-প্রকার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে যে-সকল লোক বিজ্ঞানে ও শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। যে পবিত্র বইয়ে ধর্ম্মমূল, ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী লেখা আছে, আমার লিখিবার পড়িবার একটু ক্ষমতা হইবামাত্রই আমি সেই-সমস্ত বই খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিয়াছিলাম। এবং ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞতা লাভ করিবার ইচ্ছায় আমি সেই-সকল মহাত্মাদিগের বই পড়িয়াছিলাম, যাঁহাদিগের টীকায় কোরানের শক্ত জায়গা ভাল করিয়া বুঝা যায়। তাহাতেও খুসী না হইয়া আমি খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র মন দিয়া পড়িলাম, এবং অল্পকাল-মধ্যে এই-সকল শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলাম। বিশেষতঃ লিখিবার আমার এমন ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্যের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত সুলেখক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারাও আমার কাছে হার মানিলেন।

ক্রমশঃ দেশবিদেশে আমার এত সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল যে, প্রবল প্রতাপশালী ভারতবর্ষের রাজা আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একজন দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া

পাঠাইলেন। পিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিদেশযাত্রা ছাড়া যুবরাজদের যথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইলেন। ভারতবর্ষের রাজার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা হয় ইহাও তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অতএব তিনি আর দেরী না করিয়া আনন্দমনে রাজযোগ্য উপহার দিয়া কয়েকজন চাকরবাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে দূতের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রায় এক মাস-কাল আমরা নির্ব্বিঘ্নে পথ চলিলাম। তার পরে একদিন হঠাৎ দূরে একটা প্রকাণ্ড ধূলিরাশি দেখিতে পাইলাম। অল্প পরেই নানারকম অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পঞ্চাশজন দস্যু ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ভারতবর্ষের রাজাকে উপহার দিবার জন্য দশটা ঘোড়ার পিঠে নানারকম জিনিষ লইয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু আমাদের দলবল বেশী ছিল না; কাজেই তাহারা নির্ভয়ে আমাদের আক্রমণ করিল। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হই আমাদের এমন আশা ছিল না। কাজেই তাহাদের মুখে ভয় দেখাইয়া বলিলাম, "আমরা ভারতবর্ষের রাজার দূত, আমাদের কিছু অনিষ্ট করো না, করলে মহা অনর্থ ঘটবে।" দস্যুগণ এই কথায় একটুও ভয় না পাইয়া গর্ব্বিতভাবে উত্তর দিল, "তোমাদের রাজাকে আমাদের ভয় কি? আমরা ত তার রাজ্যে থাকি না।" এই-কথা বলিয়া তাহারা আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিলাম, কিন্তু শেষে আহত হইয়া এবং রাজদূত ও সঙ্গীগণ মারা গিয়াছে দেখিয়া জয়ের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া খুব জোরে ঘোড়াকে চাবুক লাগাইলাম। ঘোড়াও দস্যুদের অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তবুও সে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার ক্ষতস্থান হইতে ভয়ানক রক্ত পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় ঘোড়া কিছুদূর গিয়াই মরিয়া গেল। আমি তখন অগত্যা ঘোড়া হইতে নামিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে হাঁটিয়াই চলিলাম। সোজা রাস্তা দিয়া গেলে আবার পাছে দস্যুদের হাতে পড়ি, এই ভয়ে আমি দুর্গম রাস্তা ধরিয়া যাইতে লাগিলাম। এইরূপে সমস্ত দিন ঘুরিবার পর আমি বিকাল বেলা এক পাহাড়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ পাহাড়ের নীচে একটা প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাইয়া আমি তাহার ভিতরে ঢুকিয়া শুইয়া রহিলাম। পথে যাইতে-যাইতে যে কয়েকটি ফল পাইয়াছিলাম কেবল তাহাই খাইয়া কোনো-রকমে ক্ষুধা মিটাইলাম।

অনেকদিন ধরিয়া এইরূপে ঘুরিয়া আমি একটিও লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। তারপরে একমাস কাটিয়া গেলে আমি অনেক-লোকজনপূর্ণ একটি বড় সহরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ সহরে উপস্থিত হইবামাত্র যে-সকল সুন্দর জিনিষ আমার চোখে পড়িতে লাগিল তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য আমি একেবারে নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। তারপর সহরের মধ্যে ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। একজন দর্জী আপন দোকানে বসিয়া কাজ করিতেছিল। সে দেখিবামাত্র আমাকে বড়ঘরের ছেলে বলিয়া জানিতে পারিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা

করিল। কিছুমাত্র না লুকাইয়া যে বংশে জন্মিয়াছি, এবং যে দুর্ঘটনার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহার আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার কাছে বর্ণন করিলাম। দরজী মনোযোগ দিয়া আমার সব কথা শুনিয়া শেষে বলিল, "তুমি আমার কাছে বিশ্বাস করে যেমন নিজের পরিচয় দিলে, কখনও আর কারও কাছে এ-রকম বোলো না। আমাদের রাজা তোমার বাবার পরম শত্রু, যদি মহারাজ কোন রকমে তোমার ঠিক পরিচয় পান, তাহলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়্‌তে হবে।" আমি এই সদুপদেশ দেওয়ার জন্য তাহার কাছে বিস্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখালে, আমি প্রাণান্তেও তা ভুল্‌ব না। আজ থেকে আমি তোমার পরামর্শ অনুসারেই চল্‌ব।" তারপর সে আমাকে ক্ষুধার্ত্ত মনে করিয়া খাওয়াইল, এবং থাকিবার নিমিত্ত নিজের বাড়ীতে জায়গা দিল।

তারপর একদিন দর্জী আমাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তুমি নিজের খাওয়াপরা চালাবার মত কি কোন বিষয়কর্ম্ম শিখেছ? তোমার মত ভাল বংশের ছেলের পরের খেয়ে থাকা আমার ভাল মনে হয় না।" আমি উত্তর করিলাম, "আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য আর অলঙ্কারাদি ভাল করেই শিখেছি, বিশেষ করে লেখাতে আমার খুব ক্ষমতা আছে।" সে বলিল, "এ-সব বিদ্যায় তোমার এখানে খাওয়াপরা চালান খুব শক্ত, কারণ এদেশে এসব বিদ্যার প্রতি লোকের কিছুমাত্র টান নেই। তোমাকে বেশ সরল দেখ্‌ছি কাজেই তোমাকে একটি পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি। যদি সেইমত চল, তাহলে পেটের ভাতের জন্য অন্যের খোসামুদি না করেও স্বচ্ছন্দে তোমার দিন চলে যেতে পার্‌বে। এই সহরের শেষের দিকে এক প্রকাণ্ড বন আছে। তুমি রোজ সেখানে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি কর্‌তে থাক। তা হলে তোমার যথেষ্ট লাভ হবে, অথচ লোকে তোমার পরিচয় জান্‌তে পার্‌বে না। যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বর তোমার প্রতি দয়া করে তোমাকে এ-বিপদ থেকে উদ্ধার না করেন, তুমি সে পর্য্যন্ত এই উপায়ে এখানে থাক। আমি তার জন্যে শীঘ্রই তোমাকে একগাছি দড়ি আর একখান কুড়ুল আনিয়ে দেব।' ঐ কাজ অত্যন্ত কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য হইলেও, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইলাম। পরদিন দরজী একখানা কুড়ুল, একগাছা দড়ি আর একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাখা আমার হাতে দিল, এবং যে-সকল গরীবলোক বন হইতে কাঠ আনিয়া বিক্রি করিয়া সংসার চালায়, তাহাদের সঙ্গে করিয়া আমাকে বনে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের অনেক অনুরোধ করিল। তারপর তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে লইয়া গেল, এবং প্রথমদিন আমি যে কাঠগুলি কাটিলাম, তাহা বাজারে বিক্রি করাতে আমি আধ মোহর পাইলাম। এই-রকমে প্রতিদিন কিছু-কিছু উপায় করিয়া আমি কিছুদিনের মধ্যেই কিঞ্চিৎ জমাইলাম, এবং দরজীর কাছে যাহা কিছু ধার ছিল শীঘ্রই তাহা শোধ করিলাম।

এক-বৎসরকাল আমি এই-ভাবে বনের মধ্যে কাঠ কাটিতে গিয়াছিলাম। একদিন

অন্যদিন হইতে বেশী দূরে গিয়া একটি সুন্দর জায়গায় উপস্থিত হইয়া একটা গাছের গোড়া কাটিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ তাহার নীচে চোখ পড়াতে দেখিলাম, মাটির মধ্যে একটা লোহার দরজা লাগানো রহিয়াছে। আমি তাহা দেখিবামাত্র তাহার উপরের মাটি সরাইয়া ফেলিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে ভিতরে একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইয়া কুড়ুল হাতেই তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। ক্রমে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া দেখিলাম যে, আমি এক চমৎকার অট্টালিকার মধ্যে ঢুকিয়াছি। ঐ বাড়ীতে এমন আলো যে, হঠাৎ দেখাতে আমার এমন ভুল হইল, যেন উহা মাটির উপরেই আছে। তারপরে মণির থামের উপর তৈয়ারী এক বড় দালানের মধ্যে ঢুকিয়া চারিদিকে তাকাইতেছি এমন সময়ে পরম রূপবতী এক যুবতীকে আমার দিকে আসিতে দেখিয়া আমি একমনে তাঁহারই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। তারপর ঐ রমণী আমার কাছে আসিলে, আমি তাহাকে নমস্কার করিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? মানুষ না দৈত্য?" আমি উত্তর করিলাম, "সুন্দরী! আমি মানুষ, দৈত্যদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" এই কথায় মেয়েটি এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "এখানে তুমি কি করে এলে? পঁচিশ বৎসর আমি এর মধ্যে বাস কর্‌ছি, কিন্তু কখন একটিও মানুষের মুখ দেখ্‌তে পাইনি।"

আমি কেবল মেয়েটির সৌন্দর্য্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন আবার তাঁহার নম্রতা ও ভদ্রতা দেখিয়া আমার মনে একটু সাহস হওয়াতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "সুন্দরী! আপনার সঙ্গে এমন আশ্চর্য্যভাবে দেখা হওয়াতে, আমি যে কত আহ্লাদিত হলাম, তা বল্‌তে পারি না; যদিও আমি খুবই দুর্দ্দশায় পড়েছি, তবুও এ অবস্থাতেও এখন নিজেকে ভাগ্যবান মনে কর্‌ছি।" তার পরে তাঁহার কাছে সরলভাবে নিজের পরিচয় দিয়া যে দুর্ঘটনার জন্য সেই অপূর্ব্ব পাতালপুরীর মধ্যে ঢুকিয়াছিলাম তাহা তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলাম। তাহা শুনিয়া সেই মেয়েটি আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হে যুবরাজ! যদিও তুমি এই অট্টালিকাকে অপূর্ব্ব বল্‌ছ তবুও আমার পক্ষে এটা যমের বাড়ীর মত ভয়ানক! কারও বাড়ী যতই সুন্দর হোক না কেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধ থাক্‌তে হলে তার কখনই সুখ হয় না। আমি আব্রুস্ দেশের রাজার মেয়ে। বাবা নিজের এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করে মেয়ের বিয়ের জন্য রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব কর্‌তে আজ্ঞা দিলেন। প্রজারা আমার বিয়ের রাত্রে জয়ধ্বনি করে সহরের মধ্যে মহোৎসব কর্‌ছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা দৈত্য এসে বিয়ে শেষ হবার আগেই আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।

"আমি দৈত্য দেখে মূর্চ্ছিতা হয়েছিলাম, কাজেই তখন কি কি ঘটেছিল তার কিছুই জান্‌তে পারিনি, কিন্তু আবার জ্ঞান হলে দেখ্‌লাম, দৈত্য আমাকে এই অট্টালিকার মধ্যে এনে রেখেছে। নিজের এই দুর্গতি দেখে প্রথমে আমি কয়েকদিন অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে

কেবল কান্নাকাটি করতে লাগলাম। অবশেষে অন্য উপায় না দেখে ক্রমে আপন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলাম। যুবরাজ! পঁচিশ বৎসর আমি এই পাতালপুরীতে রয়েছি, এর মধ্যে যখন যা চেয়েছি, দৈত্য তখনই আমাকে তা এনে দিয়েছে। সে দশ দিন অন্তর আমার কাছে এসে বলে, 'আমায় বিয়ে কর।' আমি এ পর্যান্ত রাজী হইনি। আমার শোবার ঘরের দরজার কাছে সে একখানি স্পর্শপাথর রেখে দিয়েছে। অন্য কোনো সময়ে আমার তার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হলে, আমি ঐ পাথর ছুঁই, তাতে সে তখুনি আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়। আজ চার দিন হল সে আমার কাছে এসেছিল, আর পাঁচদিন তার এখানে আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব তুমি দয়া করে এই কয়েক দিন এখানে থাক, তা হলে আমি যথাসাধ্য তোমাকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করব।"

রাজকুমারী আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবেন, আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুতরাং তিনি এরূপ প্রার্থনা করাতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়া তখনই তাহাতে রাজী হইলাম। তারপর রাজকন্যা আমাকে এক সুন্দর স্নানাগারে লইয়া গেলেন। আমি স্নান করিয়া নিজের ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া সুন্দর পোষাক পরিলাম। তারপরে নানা-রকম সুস্বাদু খাবার খাইতে বসিলাম। এবং দুজনে গল্প করিয়া দিনের বাকী ভাগ পরম সুখে কাটাইয়া দিলাম। পরদিন দুপুর বেলা খাইবার সময়ে আমি বলিলাম—"রাজকুমারী! অনেকদিন পর্য্যন্ত আপনি মরার মত এই অন্ধকার পুরীতে থেকে লোকজনের সম্মুখ থেকে বঞ্চিত আছেন। অতএব আমার ইচ্ছা যে, আপনাকে এই কঠিন কারাগার থেকে মুক্ত করি।" ইহা শুনিয়া রাজকুমারী একটু হাসিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! চুপ কর, ঐসব কথা আর কখন মুখেও এনো না, দৈত্য এখানে কেবল একদিন আসে; অন্য নয় দিন এখানে থাকলে আমি মানুষের মুখ দেখে এইখানে থেকেই পরম সুখে কাল কাটাতে পারি।" আমি বলিলাম, "রাজকুমারী! তুমি কেবল দৈত্যের ভয়ে এমন কথা বলছ, কিন্তু আমি তাকে কিছুমাত্র ভয় করি না। ভাল, আমি এই স্পর্শপাথর গুঁড়ো করে দিচ্ছি, দেখি সে এসে আমার কি করতে পারে। সে যতই সাহসী বা বলবান হোক না কেন, আমার কাছে তাকে নিশ্চয়ই হার মানতে হবে। আমি শপথ করে বলছি একেবারে সমস্ত দানববংশ ধ্বংস না করে আমি কখনই ছাড়ব না।" পাথর ছুঁইলে যে মহা অনর্থ ঘটিবে তাহা রাজকন্যা বেশ জানিতেন, কাজেই তিনি আমাকে বারবার বারণ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমার! কখনও দৈত্যের স্পর্শপাথর ছুঁয়ো না, ছুঁলে আমাদের দুজনেরই মহা বিপদ হবে।" তখন আমার মতিভ্রম হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার সেই কথায় কান না দিয়া আমি অশুভক্ষণে সেই পাথরের উপর এক লাথি মারিলাম, তাহাতে তাহা তখনই টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে সেই সমস্ত অট্টালিকা কাঁপিতে আরম্ভ হইল, চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইয়া বাজ পড়ার মত বিকট শব্দ হইতে লাগিল। হঠাৎ এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া আমার জ্ঞান হইল, এবং দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আমি যে কি-রকম

মূর্খের কাজ করিয়াছি, তখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। তারপর রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "রাজপুত্রী! হঠাৎ এ আবার কি হল?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আর কি হবে? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার যা হয় হবে, এখন তুমি নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখ, শীঘ্র এখান থেকে পালাতে না পারলে তোমার আর কোনো-

বিকটাকার দৈত্য রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি হয়েছে?"

রকমেই নিস্তার নেই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সে স্থান ছাড়িয়া পলাইলাম, কিন্তু তখন বুদ্ধির ঠিক না থাকাতে দড়ি আর কুড়ুল আপনার সঙ্গে লইয়া আসিতে ভুলিয়া গেলাম। পরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ সেই অট্টালিকা দুভাগ হইয়া গেল, এবং তাহার মধ্য দিয়া একটা বিকটাকার দৈত্য পুরীতে ঢুকিয়া ভয়ানক রাগিয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি হয়েছে, তুই কি-জন্যে

আমাকে ডেকেছিস্?" রাজকন্যা বলিলেন, "আমার পেটে অত্যন্ত ব্যথা হওয়াতে একটা বোতল থেকে একটু মদ নিয়ে পান কর্‌ছিলাম। তাতে একটু মত্ততা জন্মেছিল। এজন্য হঠাৎ তোমার পাথরের উপর পড়ে যাওয়াতে দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানি ভেঙে গিয়েছে, অন্য কিছুই হয়নি।" ইহা শুনিয়া দৈত্য রাগিয়া বলিল, "ওরে দুশ্চরিত্রে! তুই অত্যন্ত মিথ্যাবাদিনী। ভাল, বল্ দেখি, এই দড়ি ও কুড়ালি কোথা থেকে এল?" রাজকন্যা এই-কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "আমি এর কিছুই জানি না। এর আগে এখানে এসব কিছুই ছিল না। তুমি যেমন বেগে এসেছ তাতে বোধহয় তোমার সঙ্গেই এসে থাক্‌বে; তুমি তা জান্‌তে পারনি।" দৈত্য এ কথায় কোনো উত্তর না দিয়া রাজকুমারীকে অনেক গালাগালি দিল এবং শেষে তাঁহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মারিতে লাগিল। রাজকন্যার কান্নার শব্দে সেই সমস্ত পুরী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমারই দুর্ব্বুদ্ধির জন্য তাঁহাকে এত যাতনা ভোগ করিতে হইল ভাবিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি তখন নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সেই নির্দ্দোষী মেয়েটিকে এ-রকম বিপদে ফেলিয়াও তাঁহার উদ্ধারের জন্য দৈত্যের সাম্‌নে যাইতে কোন-মতেই সাহসী হইলাম না। তারপর তাঁহার কান্না আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সিঁড়ির মধ্যে নিজের যে পুরানো কাপড় আর জামা রাখিয়াছিলাম শীঘ্র তাহাই পরিয়া উপরে উঠিয়া মাটি দিয়া গুপ্ত দ্বার ঢাকিয়া ফেলিলাম, তারপরে কিছু কাঠ জোগাড় করিয়া শীঘ্র সহরের দিকে চলিলাম। কিন্তু তখন ভয়ে আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, কাঠ কাটিবার সময়ে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা এখন কিছুই মনে হয় না।

আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, দরজী আমার কাছে আসিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিল, "রাজকুমার! কাল থেকে তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আমি যে কি-রকম উদ্বিগ্ন ছিলাম তা বলতে পারি না। মনে মনে কতই ভয় কর্‌ছিলাম, এক-একবার ভাব্‌ছিলাম, নিশ্চয়ই কোনো লোক তোমার ঠিক পরিচয় জান্‌তে পেরেছে! যা হোক এখন যে তুমি ভালয় ভালয় ফিরে এসেছ এতে আমি খুবই খুসী হলাম আর তার জন্যে আমি পরমেশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি।" দরজীর এই-রকম স্নেহপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি তাহাকে নমস্কার করিলাম। কিন্তু বনের মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার কিছুই বলিলাম না। পরে নিজের ঘরে গিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা মনে করিয়া নিজের যথেষ্ট নিন্দা করিতেছি, এমন সময় দরজী আমার কাছে আসিয়া বলিল, "একজন বুড়ো তোমার দড়ি আর কুড়ুল হাতে করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর বল্‌ছে যে, সে সেই-সব জিনিষ পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন সেই লোকটি তোমার জিনিষ তোমাকে দিতে চায়, কিন্তু অন্য কারো হাতে সেগুলি দিতে তার বিশ্বাস হয় না। একবার তুমি বাইরে চল।" এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। দরজী আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি

এমন ভয় পেলে কেন? সবেমাত্র এই কয়েকটি কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল, এবং দড়ি কুড়াল হাতে একটি বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিয়া আমাকে বলিল, "আমি দৈত্যরাজ ইব্‌লিসের দৌহিত্র। আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি আমার হাতে এই যে দড়ি আর কুড়াল রয়েছে এগুলি তোমার কি না?"

আমি এত ভীত ও অবাক্ হইয়াছিলাম যে, তখন আমার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। তা ছাড়া দৈত্য আমার উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। সে প্রশ্ন করিয়াই আমার কোমর বাঁধিয়া বেগে আমাকে ঘর হইতে বাহির করিল এবং আমাকে লইয়া একেবারে শূন্যে উঠিল। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে নামিয়া লাথি মারিয়া পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া গেল। তার পরেই দেখিলাম আমি সেই পাতালপুরীর মধ্যে আসিয়াছি এবং রাজকুমারী বিবস্ত্রা ও ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই সুকোমল শরীর একেবারে রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, আর চোখ দিয়া জল বহিতেছে।

দৈত্য আমাকে রাজকুমারীর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে বিশ্বাসঘাতিনী! এখন বল্ দেখি মানুষটা তোকে ভালবাসে কি না?" রাজকুমারী একবার আমার দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিলেন, "এ লোকটিকে আমি এইমাত্র দেখ্‌চি, এর আগে কখনও দেখিনি।" দৈত্য ইহা শুনিয়া রাগে অধীর হইয়া বলিল, "ওরে পাপীয়সী, যার জন্য তোকে এই-সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে, তাকে তুই চিনিস্ না, এ বল্‌তে তোর কিছু লজ্জা হল না?" রাজকন্যা বলিলেন, "যখন আমি একে বাস্তবিকই চিনি না, তখন কি করে মিথ্যা কথা বলে এই নিরপরাধী মানুষের প্রাণনাশের কারণ হব?" দৈত্য ইহা শুনিয়া রাজকন্যার হাতে একখান খাঁড়া দিয়া বলিল, "ভাল, যদি তুই একে এর আগে কখন দেখিস্‌নি, তাহলে এই খাঁড়া দিয়ে এখনি এর মুণ্ড কাট্।" রাজকুমারী বলিলেন, "হায়, আমি কি করে আপনার আজ্ঞা পালন করব? আমার এমন শক্তি নেই যে খাঁড়াটা তুলি। আর যদিই আমার শক্তি থাক্‌ত, তা হলেই বা কি করে যাকে আমি কখন চোখেও দেখিনি, সেই নির্দোষী লোকের উপর অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পারি?" ইহা শুনিয়া দৈত্য বলিল, "আর বেশী প্রমাণের দর্‌কার নেই, এতেই তোর অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে।" পরে সে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেমন, তুই এই স্ত্রীলোকটিকে জানিস্?"

যদিও আমি রাজকুমারীর সমস্ত যন্ত্রণা ভোগের একমাত্র কারণ, তবুও তিনি আমার প্রতি যেরকম সৌজন্য দেখাইলেন, আমিও তাঁহার প্রতি সেই-রকম ভাল ব্যবহার না করিলে, নিতান্ত নীচ আর কৃতঘ্নের মত কাজ করা হইবে, এই ভাবিয়া আমি বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! যে লোককে আমি এর আগে কখন দেখিনি, তার সঙ্গে কি করে আমার আলাপ থাক্‌বে?" ইহা শুনিয়া দৈত্য একটু রাগিয়া বলিল, "ভাল যদি সত্যিই তোর এর প্রতি ভালবাসা না থাকে, তবে এখনি এই খাঁড়া দিয়া এই পাপিষ্ঠার মাথা কেটে ফেল্,

তাহলে তোকে নিরপরাধী জেনে আমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করব। আমি বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! আমি আপনার আদেশ পালন করতে রাজী আছি। এই কথা বলিয়া আমি তখনই খাঁড়াখানা তুলিয়া লইলাম। আমি খাঁড়া হাতে রাজকন্যার সাম্‌নে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি ইঙ্গিতে এমন ভাব দেখাইলেন যে, নিজের প্রাণ দিয়া যদি আমার প্রাণ রক্ষা 'হয় তাতে তিনি বিলক্ষণ প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তখন আমার জীবনের উপর এমন মমতা ছিল না যে, নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত সেই নিরপরাধ স্ত্রীলোকের কোমল শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করি। কাজেই আমিও তাঁহাকে ইঙ্গিতে নিজের ইচ্ছা জানাইলাম। তাহাতে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে আমি কাটিবার ছলে খাঁড়া তুলিয়াই হঠাৎ সেখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দৈত্যকে বলিলাম, "হে দৈত্যেশ্বর! এই নির্দ্দোষ মেয়েকে হত্যা করতে আমার হাত উঠ্‌ছে না। আমি এখন আপনার অধীনে আছি। ইচ্ছা হয় আমাকে মেরে ফেলুন, কিন্তু আমি কখনই স্ত্রীহত্যার জন্যে মহাপাতকী হয়ে অনন্তকাল নরক ভোগ করতে পারব না।" দৈত্য কহিল, "তোরা দুজনেই আমার কথা অগ্রাহ্য করলি। থাক্ আমি তোদের দুজনেরই উচিত শাস্তি দিচ্ছি।" এই-কথা বলিয়া সে তখনই খাঁড়া দিয়া রাজকুমারীর এক হাত কাটিয়া ফেলিল। তাহাতে তিনি অন্য হাতের ইঙ্গিতেই আমার কাছে অন্তিম বিদায় লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন

হঠাৎ এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া আমি বজ্রাহতের মত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙিলে দৈত্যকে বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! আমাকে আর কেন এই-সব যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে রাখ্‌ছ? আমাকেও শীঘ্র মেরে ফেলে, এই অসহ্য যাতনার হাত থেকে রক্ষা কর।" দৈত্য বলিল, "বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীলোককে আমরা এই-রকম প্রতিফল দিয়ে থাকি। ইচ্ছা করলে তোমারও প্রাণবধ করতে পারি; কিন্তু দয়া করে একটু লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করি। তোর আর মানুষের শরীর রাখ্‌ব না; তোর কুকুর, বনমানুষ, সিংহ বা পাখী যা হতে ইচ্ছা হয় আমাকে স্পষ্ট করে বল্!"

দৈত্য আমাকে প্রাণে মারিবে না শুনিয়া আমার একটু আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু মানুষ হইয়া পশুশরীরে থাকাও নিতান্ত কষ্টকর মনে করিয়া আমি তাহাকে বিস্তর স্তুতি-মিনতি করিয়া বলিলাম, "হে দৈত্যেশ্বর, আপনি রাগ দূর করুন। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জীবন-দান করলেন, তবে আর আমার প্রতি অন্য-রকম দণ্ড বিধান করবেন না। যেমন একজন সাধু নিজগুণে তাঁর হিংসাকারী প্রতিবাসীর অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, সেই-রকম আপনিও আমাকে দয়া করে ক্ষমা করলে আপনার এই অনুগ্রহ আমি চিরজীবন মনে রাখ্‌ব।" দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, "সেই দুই প্রতিবাসীর মধ্যে কি ঘটেছিল?" আমি বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! আমি তাদের সমস্ত কথাই বলছি। আপনি শুনুন—"

দুই প্রতিবাসীর কথা

কোনো নগরে দুইজন প্রতিবাসী পাশাপাশি দুই বাড়ীতে বাস করিত। যদিও তাহাদের মধ্যে একজন অন্যজনের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ উপকৃত লোকটি নিজের উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া সব-সময়ই তাঁহার প্রতি হিংসা প্রকাশ করিত। তাহাতে ঐ সাধু মনে করিলেন, একসঙ্গে থাকাতেই তাঁহার প্রতিবাসীর মনে হিংসা জন্মিয়াছে। কাজেই যাহাতে ভবিষ্যতে আর এ-রকম না ঘটে তার জন্য তিনি নিজের বাড়ী অন্য জায়গায় করবার সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী ও অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রয় করিলেন। তার পরে তিনি রাজধানীর এক কোণে অনেক দাম দিয়া একটি বাড়ী কিনিলেন। ঐ বাড়ীর মধ্যে একটি চওড়া উঠান ও তাহার পাশে এক গভীর কূয়া ছিল এবং বাড়ীর সামনে একটি সুন্দর বাগান ছিল।

সাধু লোকটি ঐ বাড়ী কিনিয়া নিশ্চিন্তভাবে জীবনের শেষভাগ কাটাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরী করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে থাকিবার জায়গা দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই যশ দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সুখ্যাতি ক্রমশঃ সেই জায়গা পর্যন্ত প্রচারিত হওয়াতে, ঐ হিংসুক লোকটির মনে অত্যন্ত হিংসা হইল। তাহাতে সে যে কোনো-প্রকারে ঐ দয়ালু লোকটির অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় নিজের বাড়ী ছাড়িয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উদারচিত্ত সাধু তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তখন ঐ হিংসক ছল করিয়া তাঁহাকে বলিল, "আমি নির্জ্জনে তোমাকে কোনো দরকারী বিষয় জানাবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছি। এখন সন্ধ্যা হয়েছে। অতএব তুমি এই-সকল সন্ন্যাসীদের নিজের নিজের ঘরে যেতে অনুমতি দিলে, আমি গোপনে তোমাকে সেই বিষয় বলতে পারি।" সাধু তাহার প্রার্থনানুসারে তখনই উদাসীনদিগকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

পরে তাহারা দুজনে উঠানের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকরকম কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময় হিংসক উঠানের পার্শ্বে কূয়া দেখিতে পাইয়া আপনার দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কথা বলিতে বলিতে ঐ সাধুকে তাহার দিকে লইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া হঠাৎ ধাক্কা দিয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। তখন সেখানে কেহই ছিল না। কাজেই তাহার এই ঘৃণিত কাজ কেহই দেখিতে পাইল না। তারপর সেই দুষ্ট লুকাইয়া সেস্থান হইতে বাহির হইল এবং আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিয়া আনন্দে বাড়ী চলিয়া গেল।

ঐ পুরানো কুয়ার মধ্যে অনেককাল অবধি কতকগুলি পরী ও দৈত্য বাস করিত। তাহারা ঐ সাধুকে কুয়ার মধ্যে পড়িতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহাতে তিনি কোনো আঘাত না পাইয়া কুয়ার তলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত উঁচু জায়গা হইতে পড়াতেও যে তাঁহার গায়ে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দুইজন দৈত্যের এই-রকম পরস্পর কথাবার্ত্তা তিনি শুনিতে পাইলেন। একজন বলিল, "আমরা যার জীবনরক্ষা করলাম, ইনি কে তা জান ?" অপর ব্যক্তি বলিল, "না, আমি তা জানি না।" তাহা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল, "ভাল, আমি তোমাকে তা বলছি শোন। এই সদাশয় লোকটির একজন প্রতিবাসী অকারণে এর হিংসা করাতে ইনি নিজের গুণে তার প্রতিহিংসা না করে নিজের পৈতৃক বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এইখানে এসে বাস করছিলেন। এখানে এসেও ইনি নিজের বদান্যতাগুণে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করছেন শুনে এর প্রতিবাসীর মনে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে সে এখানে এসে এঁকে মেরে ফেলবার জন্যে এই কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমরা না থাকলে আজ এই নিরপরাধী সাধু ব্যক্তির নিশ্চয়ই প্রাণ যেত। এখন এই দেশে এই মহাত্মার এমন সুখ্যাতি হয়েছে যে, কাছেরই এক দেশের রাজা নিজের মেয়ের কল্যাণকামনায় এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আগামী কাল এখানে আসবেন ঠিক করেছেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, এই সন্ন্যাসী-পুরুষকে দিয়ে রাজকন্যার এমন কি মঙ্গল হতে পারে যে, তার জন্যে রাজা নিজে এর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ?" তাহাতে প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "কেন, তুমি কি এর আগে শোন নি যে, ঐ রাজকন্যাকে ভূতে পেয়েছে ? যে উপায়ে এই সাধু অনায়াসে রাজকন্যাকে সুস্থ করতে পারবেন তা বলছি শোন। এই সাধুর মঠে একটি কালো বিড়াল আছে। তার লেজের ডগায় একটি শাদা চিহ্ন আছে। ঐ জায়গা থেকে সাতগাছি লোম তুলে আগুনে ফেললে তার থেকে একটু ধোঁয়া বার হবে। সেই ধোঁয়া রাজকন্যার মাথায় লাগামাত্র তিনি একেবারে সেরে যাবেন, ভূত আর কখনও তার কাছেও আসতে পারবে না।" তাহারা দুজনে এই-রকম কথাবার্ত্তা বলিয়া চুপ করিল। সাধু তাহা মনোযোগ দিয়া আগাগোড়া শুনিলেন। ক্রমে রাত্রি ভোর হইলে তিনি কুয়ার একপাশে একটি গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া তাহাতে পা দিয়া অনায়াসে কুয়া হইতে বাহির হইলেন। এদিকে তাঁহার আশ্রমের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চারিদিকে তাঁহার খোঁজ করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

সাধু যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং যে প্রকারে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সমস্তই তাহাদিগের নিকটে বর্ণনা করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম করিলে পর আগের রাত্রে দৈত্যদিগের মধ্যে যে বিড়ালের কথা হইয়াছিল, হঠাৎ সে সেই জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু তাহাকে দেখিবামাত্র ধরিলেন, এবং তাহার

লেজ হইতে সাতগাছি লোম ছিঁড়িয়া এই অভিপ্রায়ে তুলিয়া রাখিলেন যে, যদি সত্যই রাজা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে সেগুলি বাহির করিয়া কাজে লাগাইতে পারিবেন।

কিছুক্ষণ পরে সে-দেশের রাজা নিজের মেয়ের রোগ সারাইবার জন্য মন্ত্রী ও অন্য অনেক লোক লইয়া ঐ সাধুর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আদর করিয়া আপনাদিগের অধ্যক্ষের কাছে লইয়া গেল। মঠাধিপতি মহা সমাদর করিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজাও অনেক ভদ্রতা দেখাইয়া তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "যে-জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি বোধকরি তা এর আগেই আপনি জানতে পেরেছেন। এখন এর উপায় কি?" সাধু বলিলেন, 'আপনি নিজের মেয়ের অসুখ সারাবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে এ অধীনের বাড়ীতে এসেছেন, আমি আগেই তা জানতে পেরেছি। সম্প্রতি যদি একবার রাজকন্যাকে এখানে আসতে অনুমতি দেন, তা হলে আমি ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁকে একেবারে আরাম করতে পারি।" এই কথা শুনিয়া রাজা মহা আনন্দিত হইয়া মেয়েকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইলেন। একটু পরেই রাজকন্যা অসংখ্য দাসদাসীর সঙ্গে সাধুর নিকটে আসিলেন।

সাধু রাজকন্যাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া আগুন জ্বালিয়া একে একে সেই সাতগাছি লোম দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই লোম-পোড়া ধূম ক্রমে রাজকন্যার মাথা ছুঁইবামাত্র ভূতটা একটা বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহার দেহ ছাড়িয়া দূরে পলাইল। রাজকুমারীকে ভূতে পাওয়াতে তিনি বহুকাল অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। এখন রোগ আরাম হওয়াতে আবার আগের মত চৈতন্যলাভ করিয়া নিজের মুখের ঘোমটা খুলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া সহচরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় এসেছি? এখানে আমাকে কে আনল?" রাজা কন্যার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া খুবই খুশী হইলেন, এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর তিনি সম্মান জানাইবার জন্য ঐ সাধুর হাত চুম্বন করিয়া অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাধু যেরূপ অদ্ভুত উপায়ে আমার মেয়েকে সারালেন, তা তোমরা সকলেই দেখেছ। এখন তোমাদের মতে এঁকে কি-রকম পুরস্কার দেওয়া উচিত।" তাহা শুনিয়া তাহারা সকলে একমত হইয়া বলিল "মহারাজ! এঁকে এই কন্যাটি সম্প্রদান করাই উচিত।" রাজা বলিলেন, "আমিও মনে মনে এই-রকম ভাবছিলাম। আজ থেকে আমি এঁকে জামাই বলে বরণ করলাম।" কিছুদিন পরে নিজের প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে রাজা নিজের জামাইকেই তাঁহার কাজ দিলেন। তারপরে রাজা নিজেই মারা গেলেন। তাঁহার ছেলে না থাকাতে প্রজারা সকলে একমত হইয়া তাঁহার সেই দয়ালু জামাতাকেই রাজ্যের রাজা বলিয়া অভিষেক করিল।

সাধু এইরকমে রাজসিংহাসনে বসিয়া একদিন নিজের অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীর মধ্যে বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে ভীড়ের মধ্যে আপনার সেই হিংসুক প্রতিবাসীকে

দেখিতে পাইয়া একজন মন্ত্রীকে কাছে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "মন্ত্রী! তুমি এখুনি গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এস, কিন্তু সাবধান, যেন ওর মনে কোনো-রকম ভয় না হয়।" মন্ত্রী রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা বলিলেন, "বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হলাম।" তারপরে তিনি নিজের একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি রাজভাণ্ডার থেকে একশ' মোহর আর কুড়ি বস্তা বাণিজ্যের জিনিষ এনে এঁকে দাও, আর যাতে ইনি নিরাপদে নিজের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন, তার জন্যে এঁর সঙ্গে কতকগুলি লোক পাঠাও।" রাজা এই কথা বলিয়া নিজের সেই হিংসাকারী প্রতিবাসীকে বিদায় দিয়া নিজের সভাসদ্‌গণকে সঙ্গে করিয়া আবার নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আমি এই গল্প শেষ করিয়া আব্রুস্ দ্বীপের রাজকুমারীর হত্যাকারী সেই দৈত্যকে বিস্তর মিনতি করিয়া বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন, এই দয়ালু রাজা নিজের গুণে পরম অনিষ্টকারী সেই প্রতিবাসীর কেবল অপরাধ ক্ষমা করেই থামেননি, সে বারবার তাঁর অনিষ্ট করলেও তিনি তার উপকার করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেননি।" আমি ক্ষমা পাইবার আশায় এই-প্রকার কৌশল করিয়া অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু সেই দুষ্ট দৈত্যের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে আমাকে বলিল, "আমি তোকে প্রাণে মারব না, এই তোর পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ করা হচ্ছে, কিন্তু তুই কখনও এমন আশা করিস্ না যে, মানুষের শরীরে আর বেশীক্ষণ থাকতে পাবি। মায়াবিদ্যার বলে এখনি তোর চেহারা বদলে দেব।" এই বলিয়া সে তখনি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া পাতালপুরী হইতে বাহির হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমাকে লইয়া এত উপরে উঠিল যে, সেখান হইতে পৃথিবী একখানি সাদা মেঘের মত দেখাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ ভয়ানক জোরে একটা পাহাড়ের উপর নামিয়া পড়িল এবং সেখান হইতে একমুঠি ধূলি লইয়া মায়ামন্ত্র পড়িতে-পড়িতে আমার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "তুই মানুষের শরীর ছেড়ে বনমানুষ হয়ে থাক্।" এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

আমি বনমানুষ হইয়া একলা সেই পাহাড়ের উপর অনেক কান্নাকাটি করিলাম, তার পরে ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিয়া এক প্রকাণ্ড মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমাগত একমাস ঘুরিবার পর আমি ঐ মাঠ পার হইয়া সমুদ্রতীরে গিয়া পড়িলাম। তখন ঝড় বৃষ্টি না থাকাতে সাগর কিছু শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়াছিল এবং প্রায় দেড় ক্রোশ অন্তরে দেখা গেল একখানা জাহাজ পাল-ভরে যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার একটু আশা জন্মিল। আমি এরকম সুযোগ ছাড়িতে না পারিয়া তখনই একটা বড় গাছের ডাল ভাঙিয়া সমুদ্রে ফেলিলাম, এবং নিজে তাহার উপর চড়িয়া দুই হাতে দুইগাছা লাঠি লইয়া বাহিতে বাহিতে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন আমি খুব কাছে আসিয়া পড়িলাম, তখন জাহাজের নাবিক ও যাত্রীগণ মজা দেখিবার জন্য জাহাজের উপরে সার দিয়া দাঁড়াইল।

আমি জাহাজের একগাছা দড়ি ধরিয়া লাফ দিয়া জাহাজের উপরে উঠিলাম। ঐ জাহাজে যে-সকল মহাজন উঠিয়াছিল তাহারা সকলেই খুব কুসংস্কারাপন্ন। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে জাহাজে উঠিতে দিলে তাহাদিগের খুব অনিষ্ট ঘটিবে। সুতরাং আমাকে জাহাজে উঠিতে দেখিয়া তাহারা নিজেদের অমঙ্গলের ভয় করিয়া আমাকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিবার জোগাড় করিল; কেহ কেহ আমাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিল। আমি এই-রকম বিপদে পড়িয়া প্রাণভয়ে জাহাজের অধিকারীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার মনের ভাব জানাইতে লাগিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আমার প্রতি দয়া করিয়া মহাজনদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই নির্দোষ জন্তুকে মেরো না। যে-কেউ এর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে আমি তার উচিত শাস্তি দেব।" তিনি আমাকে অভয় দিয়া আমার থাকিবার জন্য জাহাজের মধ্যে একটি জায়গাও ঠিক করিয়া দিলেন। আমি যদিও সেসময় কথা বলিতে পারিতাম না, তবুও আমি ইঙ্গিতে তাঁহার কাছে যথাসাধ্য নিজের কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম।

তারপর ক্রমাগত পঞ্চাশ দিন অনুকূল বায়ু বহাতে আমাদের জাহাজ এক সুন্দর নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ নগরটি একটি বড় বাণিজ্যের স্থান এবং প্রবল-পরাক্রান্ত এক রাজার রাজধানী। সেই নগরের বন্দরে আমাদের জাহাজ নোঙর করিবামাত্র কতকগুলি ছোট নৌকা আসিয়া জাহাজের চারিদিক ঘিরিয়া ধরিল। সেই-সমস্ত নৌকায় কয়েকজন আমাদিগের জাহাজের মহাজনদের আত্মীয় ছিল। তাহারা অনেক কালের পর মহাজনদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। কেহ কেহ মহাজনদের কাছে বিদেশবাসী বন্ধুদের খবর জানিতে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বা দূর দেশ হইতে জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া উহা কিরকম তাহা দেখিবার জন্যই কেবল সেখানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

এমন সময় কয়েকখানা নৌকা হইতে কয়েকজন রাজকর্মচারী আমাদের জাহাজে আসিয়া বলিল, "আমরা রাজকার্য্যের জন্যে একবার মহাজনদিগের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" ইহা শুনিয়া মহাজনেরা তাঁহাদের কাছে আসিলেন। একজন রাজকর্মচারী কহিল, "আপনাদের এখানে শুভাগমন হওয়াতে রাজা যে মহা আহ্লাদিত হয়েছেন তা আপনাদের জানাবার জন্যে, এবং আপনারা একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রত্যেকে কিছু কিছু লিখে নিজের নিজের হাতের লেখার পরিচয় দেবেন, আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা করবার জন্যে, মহারাজ আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিলেন। এরকম করবার মানে এই, মহারাজের এক মন্ত্রী রাজকার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন আর তাঁর হাতের লেখাও খুবই ভাল ছিল। কিছুদিন হল ঐ মন্ত্রী মারা যাওয়াতে মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যে-ব্যক্তি মৃত মন্ত্রীর মত সুন্দর অক্ষর লিখতে পারবেন, তাঁকেই তিনি মন্ত্রীর কাজ দেবেন। অনেক লোক ঐ কাজ পাবার জন্যে

হাতের লেখার পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু এই রাজ্যে আজ অবধি কেউই তাঁর কাজের উপযুক্ত পাত্র বলে গণ্য হন্‌নি। এখন আমরা একখানি কাগজ এনেছি, আপনারা প্রত্যেকে তার উপর একটু একটু লিখে দিন। মহারাজকে তা দেখাতে হবে।"

আমাদিগের জাহাজে যে-সকল মহাজন নিজেদের সুলেখক মনে করিতেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীর কাজ পাইবার আশায় একে একে সকলে অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া দুই-চার লাইন করিয়া লিখিয়া দিলেন। সকলের লেখা শেষ হইলে আমি সাম্‌নে আসিয়া রাজকর্ম্মচারীর হাত হইতে সেই কাগজখানা টানিয়া লইলাম। তাহাতে মহাজনগণ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! পশুর হাতে কাগজ! এ হয় এখনি খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌বে, নয় এখনি সমুদ্রে ফেলে দেবে।" কিন্তু যখন আমি রীতিমত কাগজখানা ধরিয়া লিখিবার জোগাড় করিলাম, তখন তাঁহারা অবাক হইয়া একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; তবুও পশুজাতির লিখিবার ক্ষমতা কোনকালেই নাই, ইহা তাঁহাদের বিলক্ষণ জানা থাকাতে কেহ কেহ আমার হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে বারণ করিয়া বলিলেন, "যদি বনমানুষ লিখ্‌তে পারে লিখুক, তোমরা ওকে বাধা দিও না। কিন্তু যদি এ না লিখে কাগজ নষ্ট করে তা হলে আমি ওর উচিত দণ্ড দেব।" জাহাজাধ্যক্ষের এই কথায় তাঁহারা সকলে আমাকে ছাড়িয়া দিলে পর আমি কলম ধরিয়া রাজার খুব প্রশংসা করিয়া, ছয় ভাষায় ছয় কবিতা লিখিলাম। আমার লেখা শেষ হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ ঐ কাগজ লইয়া শীঘ্র সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাজা মহাজনদিগের লেখার দিকে না তাকাইয়া একমনে আমার তৈরী কবিতাগুলি পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হওয়াতে তিনি বারবার আমার হাতের লেখার ও কবিতার অনেক প্রশংসা করিয়া, নিজের কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা শীঘ্র আমার আস্তাবল থেকে একটি ভাল ঘোড়া নিয়ে আর ভাণ্ডার থেকে দামী পোষাক নিয়ে জাহাজে যাও আর যে লোকটি এই ছয়-রকম সুন্দর লেখা লিখেছে তাকে সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে আর দামী পোষাক পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে এস।" তাই শুনিয়া রাজপুরুষগণ হাসি রাখিতে না পারিয়া খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। রাজা এ-বিষয়ে কিছুই জানিতেন না সুতরাং তাঁহাকে ঠাট্টা করিল ভাবিয়া তাহাদিগের উপর তিনি অত্যন্ত রাগ করিলেন। তখন তাহাদের মধ্যে একজন বিনয় করিয়া তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আমরা প্রভুর আদেশ অমান্য করতে সাহস করিনি। তবে আমাদের হাস্‌বার কারণ এই, আপনি যাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে এখানে আনতে বলছেন সেটি মানুষ নয়, সে একটি বনমানুষ।" রাজা বলিলেন, "বনমানুষের এমন সুন্দর লেখা, এ অতি বিচিত্র কথা!" রাজপুরুষগণ বলিল, "মহারাজের সাম্‌নে আমরা মিথ্যা বলছি না! এই কয়েক

ছত্র বাস্তবিকই একটি বনমানুষ আমাদের সাম্‌নে লিখেছে।" তাহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত অবাক্‌ হইয়া বলিলেন, "তোমরা শীঘ্র গিয়ে সেই অদ্ভুত বনমানুষকে নিয়ে এস। সে কি-রকম তা দেখবার জন্যে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।" রাজপুরুষগণ তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র জাহাজে গিয়া জাহাজের মালিকের কাছে সে-কথা বলিলেন। তিনি কোনো আপত্তি না করিয়া তখনই আমাকে তাহাদের হাতে দিলেন। তারপর রাজকর্ম্মচারিগণ আমাকে মণিমুক্তার-কাজ-করা পোষাক পরাইয়া এবং ঘোড়ায় চড়াইয়া রাজবাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। রাজা একটা বনমানুষকে মৃত মন্ত্রীর জায়গা দিতে ঠিক্‌ করিয়াছেন এবং মহাসমারোহ করিয়া তাহাকে আনিতে লোক পাঠানো হইয়াছে, এই মজার খবর নগরীমধ্যে প্রচার হওয়াতে সহরের লোক আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রাসাদের ছাদে জানলায় এবং রাস্তায় সার দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সুতরাং যখন আমি সাজিয়া-গুজিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম তখন তাহারা আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত হাসাহাসি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি গম্ভীরভাবে তাহাদের ঐসকল কাণ্ড দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাজবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তারপর রাজসভায় ঢুকিয়া দেখিলাম, রাজা নিজের সভাসদ্‌গণের মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার কাছে গিয়া তিনবার মাথা নীচু করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তারপরে উঠিয়া রাজার আজ্ঞায় আসনে বসিলাম। বনমানুষের এ-রকম ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া সভার লোক অবাক্‌ হইল। তখন তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি তাহাদের বেশি আপ্যায়িত করিতে পারিলাম না ভাবিয়া আমার মনে অত্যন্তই দুঃখ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রাজা সব লোকজনকে বিদায় দিয়া খোজাধিপতি, একজন ক্রীতদাস ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থান হইতে নিজের থাকিবার ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে খাইবার আয়োজন হইল। তিনি খাইতে বসিয়া আমাকে কাছে গিয়া খাইতে সঙ্কেত করিলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া খাইতে লাগিলাম। খাওয়ার পর আমি সুলতানকে ধন্যবাদ দিয়া কয়েক ছত্র কবিতা লিখিলাম। তারপরে এক-প্রকার সর্ব্বৎ আনা হইল। সুল্‌তান আমাকে কিছু পান করিতে সঙ্কেত করিলেন। আমি পান করিয়া নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া আরও কয়েক ছত্র কবিতা রচনা করিলাম। সুল্‌তান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। পরে সুল্‌তান সতরঞ্চের বল আনাইয়া, আমি সে খেলা জানি কি না এবং তাঁহার সহিত খেলিতে পারিব কি না, সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রণাম করিয়া-সঙ্কেতেই রাজী হইলাম। প্রথমবারে সুল্‌তান জিতিলেন; দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে আমি জয়ী হইলাম। কিন্তু তিনি আমার ন্যায়ে একটু বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য আরও একটি কবিতা লিখিলাম।

সুল্‌তান বানরজাতির এই-রকম অনেকানেক অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্‌

হইলেন এবং নিজের কন্যাকে সেইখানে আনিবার জন্য পাঠাইলেন। রাজকুমারী খোলা মাথায়ই ঘরে ঢুকিতেছিলেন, কিন্তু ঢুকিবামাত্রই ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে অন্য পুরুষের সামনে আসবার আজ্ঞা করলেন কেন?" সুলতান বলিলেন "সে কি মা! এখানে ত তোমার চেনা খোজা, এই বালক-দাস, আমি আর বানর ছাড়া আর কেউই নেই।" রাজকুমারী বলিলেন, "মহারাজ! শীঘ্রই আপনি আমার কথার প্রমাণ পাবেন। যাকে আপনি বানর বলে মনে করেছেন উনি বাস্তবিক বানর নন; উনি একজন উঁচুবংশের বিখ্যাত রাজার ছেলে। কোনো দানবের মায়াবলে এরকম অবস্থায় পড়েছেন।"

সুলতান এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন এবং এবারে আর সঙ্কেত না করিয়া স্পষ্ট ভাষায় রাজকুমারীর কথা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং আমার মাথায় হাত দিয়া রাজকুমারীর কথা সত্য বলিয়া জানাইলাম। সুলতান আবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি যে দৈত্যের মায়ায় এরকম অবস্থায় পড়েছেন তুমি তা কি করে জানলে?" রাজকুমারী বলিলেন, "পিতঃ! আপনার মনে থাকতে পারে যে, ছেলেবেলায় আমার একজন বুড়ী ঝি ছিল। সে আমাকে সত্তরটি যোগিনীমন্ত্র শেখায়। আমি তার জোরে ও-রকম লোক দেখলেই চিনতে আর সে লোক কে এবং কার মন্ত্রে তার সে-রকম দুর্দশা হয়েছে একেবারে তাও বুঝতে পারি। অতএব আপনি বিস্মিত হবেন না।" সুলতান বলিলেন, "প্রিয় পুত্রী, তোমার এত বিদ্যা আছে, আমি তা জানতাম না। যা হোক, এখন বোধ হচ্ছে যে, তুমি এই রাজকুমারের বর্তমান দুর্দশা দূর করতে পার।" রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্বাদে আমি এঁকে এঁর আগেকার চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারি।" সুলতান বলিলেন, "তবে কর। আমি তাতে খুব খুশী হব এবং এঁকে আমার মন্ত্রী করে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব।"

রাজকুমারী এই কথা শুনিয়া নিজের শুইবার ঘরে গিয়া সেখান হইতে একখানা ছুরি আনিয়া আমাদিগকে অন্দর-মহলের এক উঠানে লইয়া গেলেন। আমাদের চারিজনকে এক পাশে বসিতে বলিয়া তিনি উঠানের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের চারিদিকে একটি দাগ দিয়া তাহার মধ্যে আরবী অক্ষরে নানা-রকম মন্ত্র লিখিতে লাগিলেন। যখন তাহার গণ্ডী শেষ হইল, তখন তিনি তাহার মধ্যে বসিয়া মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আকাশ এমন অন্ধকার হইয়া আসিল, যেন রাত্রি উপস্থিত এবং জগতের প্রলয় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমরা ইহা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। এমন সময় যে-দৈত্য আমাকে বনমানুষ করিয়াছিল, সে এক ভয়ঙ্কর সিংহের রূপ ধরিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "রে কুকুর! তোর এত বড়

আস্পর্দ্ধা যে তুই আমার পায়ে না পড়ে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই চেহারায় আমার কাছে এলি!" সিংহ বলিল, "কেউ কারু ক্ষতি করব না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলি, তা কি তুই একেবারে ভুলে গেলি?" এইরূপ ঝগড়া করিতে করিতে সিংহ হাঁ করিয়া রাজকুমারীর দিকে ছুটিয়া গেল। রাজকুমারী তখনই পিছনের দিকে একটু সরিয়া গেলেন এবং নিজের মাথা হইতে একগাছি চুল লইয়া মন্ত্রবলে তাহা তরোয়াল বানাইয়া এক কোপে সিংহের শরীর দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন। পরে সিংহের শরীরের এক টুকরা উড়িয়া গেল, কেবল মাথাটি পড়িয়া রহিল! সেই মাথা দেখিতে দেখিতে বিছার রূপ ধরিল। রাজকুমারীও সাপের মূর্ত্তি ধরিয়া সেই বিছার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বিছা নিজে হারিয়া যাইতেছে দেখিয়া বাজপাখীর আকার ধরিয়া আকাশে উড়িল। সাপও তখনই সেই আকার লইয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল এবং দেখিতে দেখিতে দুইজনে চোখের আড়াল হইয়া গেল।

তাহাদের অদৃশ্য হইবার একটু পরেই হঠাৎ আমাদের সামনের মাটি ফুঁড়িয়া একটি বিড়াল ভয়ানক চীৎকার করিতে-করিতে বাহির হইল, এবং একটি কাল বাঘ তাহার পিছন-পিছন উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বিড়াল যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া একটি পোকার রূপ ধরিয়া কাছের গাছ হইতে পড়া একটি ডালিমের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। পোকা ঢুকিবামাত্র সেই ডালিমটি ফুলিয়া উঠিয়া দুলিতে আরম্ভ করিল এবং হঠাৎ ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। বাঘ তখনই মুরগীর আকার ধরিয়া ডালিমের বীজগুলি খুঁটিয়া এক একটি করিয়া খাইতে লাগিল। যখন সমস্ত বীজ শেষ হইয়া গেল, তখন সেই মুরগী পাখা ছড়াইয়া আনন্দে ডাকিতে ডাকিতে আমাদের কাছে আসিল। কিন্তু একটী বীজ সেই গাছের পাশের নালার ধারে পড়িয়াছিল। মুরগী তাহা আগে দেখিতে পায় নাই। এখন দেখিতে পাইয়া যেমন তুলিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া গেল, অমনি সেই বীজটি নালায় পড়িয়া দেখিতে-দেখিতে একটি ছোট মাছের আকার ধরিল। মুরগীও আর একরকম মাছ হইয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। জলের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর হঠাৎ আমরা এক ভীষণ চীৎকার শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম যে রাজকন্যা ও সেই দানব দুজনে দুজনের উপর আগুন-বৃষ্টি করিতেছে। ক্রমে ক্রমে কাছাকাছি আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এমন সময় সেই দুষ্ট দানব হঠাৎ রাজকুমারীর হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া আমাদের দিকে আসিল এবং আমাদের উপর আগুন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমরা বোধ হয় সকলে পুড়িয়া ছাই হইতাম, কিন্তু রাজকুমারী শীঘ্র আসিয়া দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার পিতার প্রিয় খোজা দম বন্ধ হইয়া পুড়িয়া মরিয়া গেল। তাঁহার পিতার দাড়ী গোঁফ পুড়িয়া কালো হইয়া গেল এবং আমার ডান চোখ আগুনের তাপে জন্মের মত অন্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রাজকন্যা ব্যস্ত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া একপাত্র জল চাহিলেন। ক্রীতদাস তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া দিল। তিনি

তাহাতে মন্ত্র পড়িয়া আমার মাথায় ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "যদি তুমি দানব-মায়ায় এমন অবস্থাপন্ন হয়ে থাক, তবে শীঘ্র তোমার আগেকার রূপ ফিরে পাও।" এই কয়েকটি কথা বলিতে-না-বলিতেই আমি মানুষ হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার চোখটি জন্মের মত অন্ধ হইয়া রহিল।

আমি প্রাণের সঙ্গে রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিত! আমি দুষ্ট দানবকে হারিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু এই জয়লাভে আমারও যথেষ্ট ক্ষতি হল। আমি আর দুই-এক দণ্ডমাত্র বেঁচে আছি, আমার বিবাহ দেবার আপনার যে ইচ্ছা ছিল তা পূর্ণ হল না। আমাকে বাধ্য হয়ে আগুনের অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল। তাতে আমি দানবকে পুড়িয়ে ছাই করেছি বটে, কিন্তু আমারও প্রাণরক্ষার কোনো আশা নেই।"

সুলতান একমনে কন্যার কথা শুনিতেছিলেন। কুমারীর কথা শেষ হইবামাত্র তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "মা! একবার নিজের বাবার অবস্থা ভেবে দেখ। হায়! আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এই আশ্চর্য্য। তোমার বুড়ো চাকর খোজাধিপতি মরে গিয়েছে; যে যুবাপুরুষকে তুমি উদ্ধার করলে, তিনি একটি চোখ হারিয়েছেন।" এই কথা বলিতে-বলিতে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া গেল, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমরা যখন শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিতেছি, তখন রাজকন্যা "যাই, যাই! পুড়ে মরি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীরের ভিতরে যে আগুন ঢুকিয়াছিল, তাহা ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি মরি, মরি, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং শেষে মৃত্যু তাঁহার যন্ত্রণা শেষ করিল। দানবের মত তিনিও দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেন। সুলতান মেয়ের শোকে স্ত্রীলোকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মাথা কুটিতে লাগিলেন, এবং দুঃখে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছা গেলেন। তাঁহার কান্নার শব্দে রাজমহলের কর্ম্মচারীরা সেখানে আসিয়া অনেক কষ্টে তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। সুলতান তাঁহাদের কাঁধে ভর দিয়া শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাজপ্রাসাদে ও পুরীতে এই খবর প্রচার হইল, প্রজাগণ রাজকন্যার ঐ-প্রকার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং সুলতানের দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইল। সাতদিন এইরূপ শোকে কাটিলে পর, তাহারা সেই দানবের ছাই শূন্যে উড়াইয়া দিল এবং রাজকন্যার ছাই ধূমধাম করিয়া কবর দিয়া তাহার উপর সুন্দর সমাধি তৈয়ারী করিয়া রাখিল।

কন্যার মৃত্যুতে সুলতান গভীর শোকে আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া প্রায় একমাস-কাল শুইয়া ছিলেন। তাঁহার রোগ সম্পূর্ণ সারিতে-না-সারিতেই তিনি একদিন আমাকে কাছে

ডাকিয়া বলিলেন, "আমি চিরকাল পরম সুখে থাকতাম, কখনও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি; কিন্তু তুমি রাজ্যে পা দেওয়ার পর থেকে আমার সব সুখ চলে গিয়েছে। আমি মেয়েকে হারালাম, আমার বুড়ো দাস ও মারা গেল, আর আমিও আধমরা হয়ে রইলাম। তুমিই এই-সমস্ত দুর্ঘটনার মূল। অতএব তুমি শীঘ্র আমার রাজধানী ছেড়ে চলে যাও।" আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম, কিন্তু সুলতান অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আমাকে থামাইয়া দিলেন। আমি তিরস্কৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া গেলাম; এবং আমার জন্য দুইজন নিরপরাধ লোকের প্রাণ গেল ভাবিয়া শোকে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া মাথা ও দাড়ী গোঁফ কামাইয়া ফকিরের বেশ ধরিয়া বাগদাদের দিকে চলিলাম। অনেক গ্রাম ও সহর পার হইয়া আজ বিকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আসিয়া প্রথমেই এই ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আর্য্যে, এইমাত্র আমার পরিচয়।

প্রথম ফকিরের কথা শেষ হইলে জোবেদী তাহাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি দিল, কিন্তু সে অন্যান্য লোকদিগের কথা শুনিবার জন্য সেইখানে থাকিবার অনুমতি চাহিল। জোবেদী তাহাতে কোনো আপত্তি করিল না।

দ্বিতীয় ফকিরের কথা

তারপর দ্বিতীয় ফকির জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, আর্য্যে! আপনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা শুনিলেন, আমার ইতিহাস তার মত নয়। ঐ রাজকুমার ভাগ্যদোষে একটি চোখ হারাইয়াছেন, কিন্তু আমি নিজের দোষে তাহা নষ্ট করিয়াছি।

কাশীব নামে এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার ছেলে। আমার নাম আজীব। পিতা মারা গেলে, আমি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলাম। ঐ নগর সমুদ্রের ধারে। আমার রাজ্যে সর্ব্বদাই একশ-পঞ্চাশখানি যুদ্ধের জাহাজ উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভরা থাকিত। এ-ছাড়া বাণিজ্য করিবার এবং ঘুরিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত অনেকগুলি ছোট জাহাজও ছিল! আমি সিংহাসনে বসিয়াই সবার আগে পৃথিবীর সমস্ত দেশপ্রদেশ দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। পরে দ্বীপে প্রজারা কেমন আছে তাহা দেখিবার জন্য আমার সমস্ত যুদ্ধের জাহাজ সাজাইয়া সেই দ্বীপসকলে গেলাম। ইহার পরে আরও কয়েকবার সেইখানে গিয়াছিলাম। এইরূপে বারবার যাওয়া-আসাতে সমুদ্রযাত্রার প্রতি এক-রকম অনুরাগ হইল। সেই

অনুরাগ ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, আমি দশখানি জাহাজ সাজাইয়া কয়েকটি নূতন দ্বীপ আবিষ্কার করিবার ইচ্ছায় সমুদ্রযাত্রা করিলাম

চল্লিশ দিন আমাদের নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে গেল, কিন্তু একচল্লিশ দিনের রাত্রে বিপদ ঘটিল। এমন ভীষণ ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল যে, আমাদের জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইল। রাত্রি শেষ হইলে, ঝড় কমিয়া আসিল, আকাশ আবার পরিষ্কার হইল এবং সূর্য্য উঠিয়া চারিদিক আলো হইয়া উঠিল। তারপরে আমরা একটি কাছের দ্বীপে উঠিলাম এবং সেইখানে দুই দিন থাকিয়া আমাদের দরকারী জিনিষপত্র জোগাড় করিয়া আবার সমুদ্রে ভাসিলাম। আগের দিনের ঝড়ে আমাকে এমন নিরুৎসাহ করিয়াছিল যে, আমি বেশীদূর অগ্রসর হইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার আজ্ঞা দিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমরা তখন যে জায়গায় আসিয়াছি আমাদের কর্ণধারও তাহা জানে না। তার জন্য একজন নাবিককে মাস্তলের উপর উঠিয়া দিক্ স্থির করিতে আদেশ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল যে, দক্ষিণে এবং বামে আকাশ ও সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল কাছে একটা কালো প্রকাণ্ড জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণধারের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে নিজের মাথা হইতে পাগ্ড়ী ফেলিয়া দিয়া বুক চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে বলিল, "হায়, হায়! এইবার সকলে প্রাণ হারালাম। আমাদের এক প্রাণীও আর বাঁচ্বে না। আমার সমস্ত বিদ্যা খাটিয়েও আমি এই দুর্ঘটনা থেকে জাহাজ রক্ষা করতে পারব না।" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি মরিবার ভয়ে কাঁদিতে লাগিল।

তাহাকে হতাশ দেখিয়া জাহাজের সকলেরই ভয় হইল। আমি তাহাকে নিরাশ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, "ঝড়ে আমাদের এতদূর বিপথে এনে ফেলেছে যে, কাল বোধহয় বেলা দুইটার সময় আমরা ঐ কালো জিনিষটার কাছে গিয়ে হাজির হব। ঐ কালো জিনিষটা মাটি নয়, ওটা এক চুম্বক পাথরের পাহাড়। আপনার জাহাজে লোহার পেরেক থাকাতে ঐ পাহাড় জাহাজগুলোকে এখনি অল্পে অল্পে টান্‌ছে। কাল জাহাজগুলো আরও কাছে গেলে ঐ পাহাড়ের আকর্ষণীশক্তি এত বাড়্‌বে যে, জাহাজের পেরেক প্রভৃতি সমস্ত লোহার জিনিষ খুলে গিয়ে পাহাড়ে লেগে যাবে এবং জাহাজ তখনই খণ্ড খণ্ড হয়ে জলে ডুবে যাবে। ঐ পাহাড়ের উপরে পিতলের মন্দির আর তার উপরে পিতলের তৈরী ঘোড়সওয়ারের মূর্ত্তি আছে। সেই ঘোড়সওয়ারের মূর্ত্তির বুকের উপর সীসার পাতায় ঐন্দ্রজালিক অক্ষরে কি লেখা আছে। এইরকম শুনতে পাওয়া যায় যে, ঐ মূর্ত্তিরই জন্যে জাহাজগুলো এমনভাবে বিপদে পড়ে। ঐ মূর্ত্তি চিরকাল অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে। এবং যতদিন ওটাকে নষ্ট করে ফেলা না হবে ততদিন এইরকমে লোকের সর্ব্বনাশ করবে।"

কর্ণধার এই কথা বলিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল এবং জাহাজের সমস্ত যাত্রীরাও সেইসঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন অন্যমনস্কভাবে, এত শীঘ্র আমার জীবনের দিন শেষ হইল, এই কথাই ভাবিতেছিলাম। যাত্রীরা সকলেই নিজের নিজের মুক্তির উপায় খুঁজিতে ব্যস্ত। কেহ বা কাহাকে উত্তরাধিকারী স্থির করিতেছে, কেহ বা শেষ অনুরোধ রক্ষার প্রার্থনা করিতেছে, এইভাবে রাত্রি ভোর হইল।

পরদিন সকালে আমরা ভাল করিয়া সেই পাহাড় দেখিতে পাইলাম। আগের দিন অপেক্ষা পাহাড়টি এখনি অতি ভীষণ মনে হইতে লাগিল এবং ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল। দুপুরে আমাদের সব জাহাজ পাহাড়ের এত কাছে আসিল যে, আমরা কর্ণধারের কথামত সমস্ত নিজের চোখে দেখিতে লাগিলাম। পেরেক-সকল জাহাজ হইতে খুলিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে পাহাড়ের গায়ে গিয়া লাগিল। জাহাজগুলিও খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রমে-ক্রমে অতল সাগরের জলে ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গের লোক সকলেই ডুবিয়া গেল, কেবল ঈশ্বর দয়া করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আমি একখণ্ড কাঠ ধরিয়া বাতাসের জোরে সেই পাহাড়ের তলায় উপস্থিত হইলাম। আমার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই এবং সৌভাগ্যক্রমে এমন এক জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হইলাম যে, সেখান হইতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার উপযোগী সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম।

এই সিঁড়িগুলি দেখিতে পাইয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ঐ সিঁড়ি এমন সরু আর খাড়া যে, বাতাস একটু জোরে বহিলেই বোধ হয় আমি সাগরজলে পড়িয়া যাইতাম। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় আমি নির্বিঘ্নে সেই মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সেই পিতলের তৈয়ারী মূর্তিও দেখিলাম।

আমি সেই মন্দিরের মধ্যেই শুইয়া থাকিলাম। ঘুমাইতে-ঘুমাইতে দেখি যেন একজন গম্ভীর চেহারা বুড়ো মানুষ আমার কাছে আসিয়া বলিতেছেন, "আজীব আমার কথা শোন, তোমার ঘুম ভাঙ্বামাত্র উঠে তোমার পা এখন যেখানে আছে সেই জায়গা খুঁড়্তে সুরু করবে। খুঁড়্তে খুঁড়্তে তার মধ্যে একখানি পিতলের তৈরী ধনু ও তিনটি সীসার তৈরী তীর দেখ্তে পাবে। মানুষকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্যই বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে ঐ ধনুক আর তীরগুলি সৃষ্টি হয়েছে। ঐ তীরগুলি নিয়ে তুমি এই ঘোড়সোয়ার মূর্তির উপর ছুড়্বে, তাতে মূর্তিটি সাগরের জলে পড়ে যাবে, কিন্তু ঘোড়াটি তোমারই পায়ের তলায় পড়্বে। ঘোড়াটিকে শীঘ্র সেইখানেই পুঁতে ফেলো। তার পর তুমি দেখ্তে পাবে যে, সমুদ্রের জল ফুলে উঠে মন্দিরের ভিত পর্য্যন্ত উঠেছে আর সেই সাগরের ঢেউয়ের উপরে একখানি ছোট নৌকা আর তার উপর একটি পিতলের তৈরী মূর্তি রয়েছে। ঐ মূর্তির দুই হাতে দুটি দাঁড়। তুমি তখনই নৌকায় চড়ে বোসো, কিন্তু সাবধান যেন ঈশ্বরের নাম নিও না। যদি পথের মধ্যে ঈশ্বরের নাম না কর, তা হলে সেই মূর্তি দশদিনে তোমাকে অন্য একটি সাগরে নিয়ে যাবে, আর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে নিজের দেশে যেতে পারবে।"

বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া মিলাইয়া গেল। ঘুম ভাঙিলে আমি স্বপ্নের কথা মনে করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম এবং বৃদ্ধের কথামত মাটি হইতে ধনু ও তীর খুঁড়িয়া তুলিয়া সেই ঘোড়সোয়ারের দিকে বাণ মারিতে লাগিলাম। তিনবারের বার মূর্তিটি সাগরজলে পড়িয়া গেল এবং ঘোড়াটিও আমার পাশে পড়িল। আমি ঐ ঘোড়াটাকে সেই ধনু ও তীরের গর্তে পুঁতিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ সাগরের ঢেওয়ের উপর একখান নৌকা আমারই দিকে আসিতেছে দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

শেষে নৌকাখানি কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে তাহাতে একটি পিতলের তৈয়ারী পুরুষ দুই হাতে দুইটি দাঁড় লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অতি সাবধান হইয়া নৌকাতে উঠিয়া বসিলে, সেই পুরুষটি দাঁড় টানিতে লাগিলেন। নয় দিন এইরূপ ক্রমাগত পরিশ্রমের পর কতকগুলি দ্বীপ দেখা গেল। তাহাতে আমার মনে এমন আনন্দ হইল যে, সেই বৃদ্ধের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের গুণগান করিতে লাগিলাম।

ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে-না-করিতেই সেই নৌকাখানি পিতলের মানুষটির সঙ্গে সাগরজলে ডুবিয়া গেল। আমি নিরুপায় হইয়া সমস্ত দিনরাত্রি নিকটের ডাঙার উদ্দেশে সাঁতার দিতে লাগিলাম। এদিকে আমার শরীর ক্রমে অসাড় হইয়া আসিল, সুতরাং আমি প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। শেষে হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল, এবং পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ উঠিয়া সমস্ত সাগরে দোলা দিতে লাগিল। তাহার একটি ঢেউ আমাকে একেবারে এক চড়ার উপর লইয়া ফেলিল। আমি আবার সমুদ্রে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখিয়া তীরে উঠিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং কপালগুণে বহুকষ্টে ডাঙায় উঠিয়া সেইখানেই রাত কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন সকালে আমি সেই জায়গার সব খোঁজ-খবর লইবার জন্য বাহির হইয়া দেখিলাম, যে, আমি একটি নির্জন দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও সেই দ্বীপটি নানাজাতীয় গাছপালা ও ফুলফলে সাজানো এবং অতি সুন্দর, তবুও সেই দ্বীপ মহাদেশের তীর হইতে অনেক দূরে। এই কথা ভাবিয়া আমার আনন্দ অনেক কমিয়া গেল। যাহা হউক, আমি এই বিপদের সময় বার বার ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। এমন সময় দূরে একখানি নৌকা দেখা গেল। সেই নৌকা খুব জোরে সেই দ্বীপের দিকেই আসিতেছিল। ঐ জাহাজের লোকদিগের স্বভাবাদি না জানিয়া তাহাদের সামনে যাওয়া ঠিক মনে না করিয়া আমি এক প্রকাণ্ড গাছে উঠিয়া বসিলাম। ক্রমে নৌকাখানি দ্বীপের কাছে আসিয়া লাগিলে দেখিলাম কোদালী ও অন্যান্য মাটি খুঁড়িবার উপযোগী অস্ত্র হাতে করিয়া প্রায় দশজন ক্রীতদাস নৌকা হইতে নামিয়া সেই দ্বীপের মধ্যে আসিয়া মাটি খুঁড়িয়া একটি দরজা খুলিয়া ফেলিল। তারপরে তাহারা জাহাজে গিয়া নানারকম খাইবার জিনিষ ও খাট-পালঙ্ক লইয়া ঐ দরজা দিয়া মাটির ভিতরে নামিয়া গেল। তাহার পর আবার জাহাজে গিয়া এক বৃদ্ধ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঐ জায়গায় ফিরিয়া আসিল। ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে একটি অতি সুন্দর ছেলে ছিল,

তাহার বয়স প্রায় চোদ্দ-পনর বৎসর। তাহারা সকলেই পাতালপুরীতে ঢুকিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন তাহারা মাটির তলা হইতে বাহিরে আসিয়া খোঁড়া জায়গাটিতে মাটি চাপা দিয়া জাহাজে উঠিল, তখন সেই সুন্দর ছেলেটিকে তাহাদিগের সঙ্গে দেখিলাম না। ইহাতে ঠিক করিলাম তাহারা ঐ ছেলেটিকে মাটির তলাতেই রাখিয়া আসিল।

তারপর ঐ বৃদ্ধ নিজের চাকরবাকরদের সঙ্গে জাহাজে উঠিয়া চলিয়া গেলে আমি গাছ হইতে নামিলাম এবং সেই জায়গায় গিয়া মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিলাম; খুঁড়িতে খুঁড়িতে একখানি পাথর দেখিতে পাইলাম। সেই পাথরখানি সরাইবামাত্র একটি সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। আমি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘরে উপস্থিত হইলাম। সেই ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। সেখানে দামী কাপড়ে মোড়া একখানি পালঙ্কের উপর সেই সুন্দর ছেলেটিকে পাখা হাতে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। সে আমাকে দেখিবামাত্র অবাক্ হইয়া গেল। আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিতে লাগিলাম, "তুমি যে হও, ভয় পেও না। আমি রাজপুত্র আর নিজেও রাজা। তোমার কোনো-রকম অনিষ্ট করবার ইচ্ছায় এখানে আসিনি, কেবল তোমাকে এই কারাগার থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই এসেছি। আমি দেখে অবাক্ হলাম যে, লোকে তোমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে গেল, কিন্তু তুমি একটুও আপত্তি বা অনিচ্ছা দেখালে না।" আমার কথা শেষ হইলে, ছেলেটি হাসিতে হাসিতে আমাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "রাজপুত্র! আমি আজ আপনাকে এমন অদ্ভুত কথা শোনাব যে আপনি বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

"আমার বাবা একজন মণিমুক্তার ব্যবসায়ী বণিক্। তিনি ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছেলেপিলে কিছুই ছিল না। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার একটি ছেলে হইবে, কিন্তু সে বেশীদিন বাঁচিবে না। কিছুদিন পরে আমি জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের পরিবারের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

"পিতা আমার জন্মমুহূর্ত্তের তিথিনক্ষত্র প্রভৃতি ঠিক করিয়া জ্যোতিষীগণের দ্বারা আমার ভাগ্য গণনা করাইলেন। তাহারা বলিল, 'তোমার ছেলে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে আর নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বে। কিন্তু সেই-সময় এর এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হবে। বিখ্যাত চুম্বক পাহাড়ের উপরে যে পিতলের মূর্ত্তি আছে, কাশীব রাজার ছেলে আজীব তা ভেঙে ফেল্‌বার পঞ্চাশ দিন পরে সেই রাজপুত্রেরই হাতে তোমার ছেলে মারা যাবে। যদি এই বিপদ থেকে কোনো-রকমে উদ্ধার পেতে পারে, তা হলে তোমার ছেলে অনেকদিন বেঁচে থাক্‌বে।' আজ দশদিন হইল রাজপুত্র আজীব সেই মূর্ত্তি ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া বাবা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি এর আগেই এই মাটির তলার ঘর তৈরী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজ আমাকে এখানে রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, আর চল্লিশ দিন পরে আমাকে লইয়া যাইবেন। আমার ত বিশ্বাস হইতেছে না যে, রাজপুত্র আজীব এই নির্জ্জন দ্বীপে আসিয়া আমাকে হত্যা করিবেন।"

যখন বণিকের পুত্র এইভাবে নিজের কথা বর্ণন করিতেছিল, আমার হাতে মারা যাইবার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া তখন আমি হাসিতে হাসিতে মনে মনে জ্যোতিষীদের ঠাট্টা করিতেছিলাম। বণিকবালকের কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, "সৌম্য! তোমার ভয় নেই। ঈশ্বরকে ডাক, তোমার কোনো বিপদ ঘটিবে না!" আমার কথাতে বণিকপুত্রের মনে আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমি যে কাশীব রাজার পুত্র আজীব এ কথা তখন তাহাকে বলিলাম না। গল্প করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল। যথেষ্ট খাবারের আয়োজন ছিল, দুজনে খাইলাম। খাইবার পর আবার কিছু গল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া আমি ছেলেটিকে স্নানাদি করাইয়া দিলাম। তার খাওয়া-দাওয়া হইলে দুজনে আবার কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে পরমানন্দে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আমরা দুজনে পরস্পরকে খুব ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমি গণৎকারদিগকে নিতান্তই ভণ্ড ভাবিতে লাগিলাম। কারণ আমার হাতে তাহার মারা যাইবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে উনচল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। বণিক্‌পুত্র পরদিন সকালে উঠিয়া হাসিমুখে আমাকে বলিতে লাগিল, "রাজকুমার! এই ত চল্লিশ দিনের সকাল, আমি আপনার অনুগ্রহে এখনও বেঁচে আছি। আজ আমার বাবার আস্‌বার দিন, তিনি একটু পরেই এখানে আস্‌বেন, আর আপনাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন।" এই কথা শুনিয়া আমি স্নান করিবার জন্য জল গরম করিয়া ছেলেটিকে স্নান করাইয়া দিলাম। স্নানের পর সে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাইল। ঘুম ভাঙিলে সে একটি তরমুজ খাইতে চাহিল। আমি তরমুজটি কাটিবার জন্য ছুরি খোঁজাতে সে বলিল, "আমার মাথার উপরের কুলঙ্গিতে ছুরি আছে।" আমি যেমন সেই ছুরিখানি লইতে যাইব, অমনি পায়ে কাপড় জড়াইয়া পড়িয়া গেলাম, এবং ছুরিখানি একেবারে সেই হতভাগ্য বালকের বুকে বিঁধিয়া যাওয়ায় সে তখনই মরিয়া গেল। ছেলেটি এমনভাবে মারা যাওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মাথা চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "হায় আমি কি হতভাগা! যে ছেলেটি প্রাণরক্ষার জন্যে এই জনশূন্য ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেই যার প্রাণ রক্ষা হত, আমি সেই নিরপরাধী ছেলের প্রাণনাশের কারণ হলাম।" অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আর কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই। বণিকের আসিবার সময় হইয়া আসিল, আর বেশী দেরী করিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া আমি সেই মাটির তলার ঘর হইতে বাহির হইলাম এবং আগের মত ঢুকিবার দরজায় পাথর ও মাটি চাপা দিয়া রাখিলাম।

আমার কাজ শেষ হইতে-না-হইতেই সাগরের দিকে চোখ পড়াতে দেখিলাম যে, একখানি নৌকা দ্বীপের দিকে আসিতেছে। আমি তখন মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, যদি দেখা দিই, তাহা হইলে, বণিক্ নিশ্চয়ই রাগিয়া আমাকে খুন করিয়া ফেলিবেন। আমি

যে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার ছেলেকে মারিয়া ফেলি নাই এ কথা বলিলে কখনই তাঁহার বিশ্বাস হইবে না, অতএব পলায়নই ভাল। এই ভাবিয়া আমি কাছেরই এক গাছের কোটরে লুকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে জাহাজ দ্বীপের তীরে আসিয়া লাগিল, বৃদ্ধ ও তাঁহার

ছেলেটি এমনভাবে মারা যাওয়াতে মাথা চাপড়াইতে লাগিলাম

সঙ্গের লোকজন প্রফুল্ল মুখে ঐ গর্ত্তের কাছে চলিল। কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহা সম্প্রতিই খোঁড়া হইয়াছিল, তখন তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। তাহারা সেই পাথর তুলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সেই ছেলেটীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সকলের মন আরও খারাপ হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিবামাত্র তাহারা দেখিল যে ছেলেটি বিছানার উপর বুকে ছুরি বিঁধিয়া মরিয়া আছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র তাহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং বৃদ্ধ বণিক্ শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। তাঁহার দাসগণ বণিক্‌কে সেই অবস্থায় উপরে আনিয়া তাঁহার জ্ঞান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক পরে বণিকের জ্ঞান হইলে, চাকরেরা ছেলেটির মৃত শরীর উপরে লইয়া আসিল এবং দামী কাপড়চোপড়ে সাজাইয়া সেই গাছতলাতেই পুঁতিয়া রাখিল।

তারপর সকলে ঐ গর্ত্ত হইতে সমস্ত জিনিষপত্র জাহাজে তুলিল এবং পালকে করিয়া বৃদ্ধ মনিবকে জাহাজে তুলিয়া জাহাজ খুলিয়া দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই জাহাজ চোখের আড়াল হইয়া গেল। বৃদ্ধ বণিক্ ও তাঁহার ভৃত্যগণ চলিয়া গেলে পর, আমি একলা সেই বিজন দ্বীপে পড়িয়া রহিলাম। সেই মাটির তলার ঘরেই আমি সে-রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকালে উঠিয়া দ্বীপের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। ক্লান্ত হইলেই কোনো জায়গায় বিশ্রাম করি, আবার উঠিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করি। এইরূপ কষ্টে একমাস কাটিয়া গেল। পরে ক্রমে সমুদ্রের জল শুকাইয়া যাওয়াতে আমি একদিন ঐ সমুদ্রে গিয়া নামিলাম, এবং পায়ে হাঁটিয়াই অনায়াসে পার হইয়া অন্য তীরে গিয়া উঠিলাম। তীর হইতে কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একটা আগুন জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া সেইখানে নিশ্চয়ই লোকের বাস আছে ভাবিয়া আমি প্রফুল্ল মনে তাহার দিকে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমে আমি যখন তাহার কাছে আসিলাম তখন দেখিতে পাইলাম, সেটা আগুন নয়, লাল রংয়ের ঝক্‌ঝকে তামার তৈয়ারী একটি সুন্দর বাড়ী, সূর্য্যের আলোয় দূর হইতে জ্বলন্ত আগুনের মত দেখাইতেছিল। আমি পথ চলিয়া ক্লান্ত ছিলাম, তাই বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম দশজন যুবা পুরুষ একজন লম্বা বৃদ্ধের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সেই দিকে আসিতেছে। ঐ দশজন যুবাই দেখিতে সুন্দর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই ডান চোখ কানা। একসঙ্গে দশজন যুবাকেই ডান-চোখ-হীন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয়ে মনে মনে নানা-রকম তর্কবিতর্ক করিতেছি, এমন সময় তাহারা আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, এবং কি জন্যেই বা এই বিজন দ্বীপে এসে হাজির হয়েছ?" তাহাতে আমি নিজের বিপদের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তাহা শুনিয়া তাহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল এবং কয়েকটি ঘর পার হইয়া শেষে এক প্রকাণ্ড ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঐ ঘরে নীল রঙের রেশমী কাপড়ে ঢাকা দশখান পালঙ্ক গোল করিয়া পাতা ছিল। তাহাতে ঐ দশজন যুবা দিনে বসিত ও রাত্রে শুইত, এবং তাহাদিগের মধ্যে আর-একখানা পালঙ্কে সেই বৃদ্ধটিও শুইত। যুবাগণ নিজের নিজের জায়গায় বসিলে পর তাহাদিগের মধ্যে একজন আমাকে মাঝখানে একখানি গালিচার উপর বসাইয়া বলিল, "ভাই! তুমি এইখানে চুপ করে বসে থাক, আর আমরা যা করি তা দেখ, কিন্তু সাবধান কখনও কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ কোরো না। করলে অনর্থ ঘটবে।"

কিছুক্ষণ পরে ঐ বৃদ্ধ লোকটি হঠাৎ উঠিয়া বাহিরে গেল, এবং তখনই নানা-রকম খাবার আনিয়া আমাদিগের সকলকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলে একসঙ্গে খাইলাম। তারপর সকলে আমার কথা আবার শুনিতে চাহিল। আমি আবার তাহা আগাগোড়া বর্ণন করিলাম। তাহাতে ক্রমে রাত্রি বেশী হইয়া আসিল। তখন একজন যুবক বৃদ্ধকে বলিল, "তুমি কি দেখ্‌ছ না, রাত যে ভোর হয়ে এল। আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ কখন্ কর্‌ব?" বৃদ্ধ ইহা শুনিয়া তখনই বাহিরে গেল, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে দশটা নীল কাপড়ে ঢাকা পাত্র আনিয়া প্রত্যেকের সাম্‌নে এক এক পাত্র রাখিয়া তাহার কাছে এক-একটা দীপ জ্বালিয়া দিল। যুবকগণ সেই-সকল পাত্রের ঢাক্‌না খুলিলে দেখিলাম সেগুলি ছাই, কয়লার গুঁড়ো, অঙ্গার এবং প্রদীপের কালিতে ভরা রহিয়াছে। তখন তাহারা সেই-সকল জিনিষ একসঙ্গে মিশাইয়া মুখে মাখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং মাথা ও বুক চাপ্‌ড়াইতে-চাপ্‌ড়াইতে বার বার এই কথা বলিতে লাগিল, "কুড়েমি আর বদমাইসির এই-রকম শাস্তি হয়।" তাহারা অনেকক্ষণ এই-রকম কান্নাকাটি করিয়া রাত ভোর হইবার একটু আগে চুপ করিল। ঐ বৃদ্ধ তখন তাহাদিগকে জল আনিয়া দিল। তাহাতে তাহারা নিজের নিজের হাতমুখ ধুইয়া নূতন কাপড় পরিয়া নিজের নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া থাকিল। আমি নিজের চোখে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইলাম, এবং সেই ভাবনাতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চোখ বুজিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে যখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল, তখন আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, "ভাইসকল! তোমরা আমাকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়েছ তা রক্ষা করতে আমি কিছুতেই পার্‌ব না। এখন প্রার্থনা এই, তোমরা কিজন্যে নিজেদের মুখে কালি মেখে কাঁদ এবং কিজন্যেই বা তোমাদের প্রত্যেকেরই ডান চক্ষু অন্ধ, অনুগ্রহ করে তা বলে আমার কৌতূহল নিবারণ কর। তা শুন্‌লে আমার যে বিপদ ঘটে ঘট্‌বে, তাতে তোমাদের কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হবার দর্‌কার নেই। তোমরা সকলে যে বিশেষ বুদ্ধিমান্ তা তোমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়াতেই বুঝ্‌তে পেরেছি; অথচ যে-রকম কাণ্ড কর্‌লে, তা একেবারে পাগলের কাজ! অতএব নিশ্চয়ই এর কোনো বিশেষ কারণ আছে।" যুবাগণ এই কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "তোমার এ-বিষয় জান্‌বার কোনো দর্‌কার নেই। অতএব তুমি কেন বৃথা এ কথা জিজ্ঞাসা করে নিজের বিপদ ঘটাবে।" তারপর তাহাদিগের সঙ্গে নানা-বিষয়ে কথা বলিতে দিন কাটিয়া গেল। এ-রাত্রেও আগের রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহারা অবিকল সেই-সমস্ত কাণ্ড করিল। তাহা দেখিয়া আর আমি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তাহাদিগকে মিনতি করিয়া আবার বলিলাম, "ভাই! তোমরা কৃপা করে আমার কাছে এর যথার্থ কারণ বল, তাতে আমার যে বিপদ ঘটে ঘট্‌বে।" এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন যুবা বলিল, "এর কারণ

শুন্‌লে পাছে তুমি আমাদের মত দুর্দ্দশায় পড় কেবল এই ভয়েই আমরা তোমাকে এ বিষয় বল্‌তে রাজী হইনি। অতএব তোমার ও-কথা জান্‌বার দর্‌কার নেই।" আমি বলিলাম, "আমার যে অনিষ্ট ঘটে ঘটুবে, তোমরা আমাকে সব কথা খুলে বল।"

তখন ঐ দশজন যুবক আমাকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তখনই একটা ভেড়া মারিয়া তার চামড়া তুলিয়া আমার হাতে একখান ছুরি দিয়া বলিল, "তুমি এই চামড়ার মধ্যে ঢুকে যাও। আমরা এর মুখ বন্ধ করে ফেলে রাখ্‌ব। তাই দেখি রক নামের এক প্রকাণ্ড পাখী ভেড়া মনে করে তোমাকে মুখে করে শূন্যে উঠ্‌বে। তাতে তোমার কিছুমাত্র বিপদের ভয় নেই। কারণ সে তোমাকে নিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায় নাম্‌বে। যখন তুমি দেখ্‌বে পাখী সেখানে নেমেছে, তখন তুমি ছুরি দিয়ে চামড়া কেটে বেরিয়ে এস আর ঐ চামড়াখানা দূরে ফেলে দিও। তা দেখে রক পাখী ভয়ে পালিয়ে যাবে। তখন তুমি সেই জায়গা থেকে কিছু দূর উত্তর দিকে গেলে অনেক মণিমুক্তার কাজ-করা সোনার এক আশ্চর্য্য সুন্দর বাড়ী দেখ্‌তে পাবে। ঐ বাড়ীর দরজা সব সময় খোলা থাকে। তুমি নির্ভয়ে তার ভিতর ঢুকে যেও। আমরা প্রত্যেকে কিছুকাল ঐ বাড়ীর মধ্যে থেকেছি। কিন্তু সেখানে আমরা যা দেখেছি তা এখন তোমাকে বলবার দরকার নেই। তুমি নিজের চোখেই তা দেখ্‌তে পাবে। তবে তোমাকে এইমাত্র বলে রাখি যে, সেখানে আমরা এক-একটি চোখ হারিয়েছি। আর আমাদের যে-রকম কর্‌তে দেখ্‌লে তা সেইখানে থাকার জন্যেই হয়েছে।" তাহারা এই কথা বলিয়া আমাকে ভেড়ার চামড়ার মধ্যে ঢুকিতে ইঙ্গিত করাতে আমি ছুরি হাতে তাহার মধ্যে ঢুকিলাম। তাহারা উহা সেলাই করিয়া আমাকে বাহিরে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। একটু পরেই এক প্রকাণ্ড রকপাখী আসিয়া ভেড়া মনে করিয়া আমাকে মুখে করিয়া আকাশে উঠিল। কিছুক্ষণের পর যখন সে এক পাহাড়ের উপর নামিয়া মুখ হইতে নামাইয়া আমাকে মাটিতে রাখিল, তখন আমি নিজের আবরণচর্ম্ম কাটিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া সেই চামড়াখানা দূরে ফেলিয়া দিলাম। রকপাখী তাই দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। ঐ পাখীর রং শাদা এবং আকারে অতিশয় বড়। তার গায়ে এত জোর যে, মাঠ হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতীকেও অনায়াসে মুখে করিয়া পাহাড়ের উপর লইয়া গিয়া খায়। সে যাহা হউক, রকপাখী সেখান হইতে চলিয়া যাইবামাত্র আমি ঐ অট্টালিকা খুঁজিবার জন্য উত্তর দিকে চলিলাম। প্রায় দুপুর অবধি হাঁটিবার পর দূর হইতে ঐ বাড়ীটি আমার চোখে পড়িল। যুবাগণ উহার যে-রকম বর্ণনা করিয়াছিল তাহা হইতেও উহা বেশী সুন্দর মনে হইল। আমি অবাক হইয়া উহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে উঠানে গিয়া হাজির হইলাম; তখন উহার সমস্ত সৌন্দর্য্য একসঙ্গে আমার চোখে পড়িল। উঠানটি চারকোণা এবং খুব বড়। তাহার চারিধারে একশ দরজা, তাহার মধ্যে একটি-দরজা সোনার, তা ছাড়া উপরে উঠিবার অসংখ্য সিঁড়ি ছিল।

আমি সাম্‌নে একটি দরজা খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর দিয়া এক বড় দালানের মধ্যে

ঢুকিবামাত্র সেখানে চল্লিশজন সুন্দরী যুবতী বসিয়া আছে। তাহাদিগের বেশভূষা খুবই চমৎকার। তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আসন দিয়া বিনীতভাবে বলিল, "মহাশয়ের শুভাগমনে আজ আমাদের বাড়ী পবিত্র হল।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে এক উঁচু আসনে বসাইবার চেষ্টা করিল। আমি তাহাতে রাজী না হওয়াতে তাহারা বলিল, "আপনার জন্যেই এই আসন সাজানো হয়েছে। এখন আপনিই আমাদের একমাত্র রক্ষক আর হর্তাকর্তা বিধাতা। আমরা আপনার দাসী। আপনি যখন যা আমাদের আদেশ করবেন, আমরা তা পালন করব।" এই বলিয়া তাহারা বিশেষ অনুরোধ করাতে কাজেই আমাকে ঐ আসনে বসিতে হইল। তার পর তাহারা খুব ভাল করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া আমার সব-কথা শুনিতে চাওয়াতে আমি তাহাদিগের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। পরে অন্যান্য কথাবার্তায় দিন কাটিয়া গেল। তখন তাহারা অসংখ্য বাতি জ্বালিয়া ঐ বাড়ীটিকে আলোকময় করিয়া আমার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করিতে আরম্ভ করিল। খাওয়ার পর নাচ গান করিতে প্রায় অর্দ্ধেক রাত কাটিয়া গেল। তখন মেয়েদের মধ্য হইতে একজন আমাকে বলিল, "পথ চলে' ক্লান্ত হওয়াতে বোধ হয় আপনার ঘুম পেয়ে থাকবে। অতএব আর বেশী রাত্রি না জেগে উঠে ঘুমুতে যান।"

তাহারা আমাকে এক সুন্দর শুইবার ঘরে রাখিয়া দিয়া নিজের নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে শাদা ধব্ধবে কোমল বিছানায় শুইয়া পরম সুখে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া কাপড় পরিতেছি, এমন সময় মেয়েরা কাছে আসিয়া আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল।

এইভাবে পরমানন্দে এক বৎসর কাটাইলাম। তারপর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম দিন সকালে যুবতীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হে প্রিয়তম রাজকুমার! এখন আমরা বিদায় হব, আপনি আমাদের অনুমতি দিন।" হঠাৎ তাহাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের কি হয়েছে, কেন কাঁদছ, কিজন্যেই বা বিদায় চাচ্ছ?"

এই কথায় এক রমণী কহিল, "হে রাজকুমার! তবে বলছি শোন। আমরা সকলেই রাজার মেয়ে। আমরা এই পুরীর মধ্যে যেভাবে দিন কাটাই তা তুমি সমস্তই নিজের চোখে দেখেছ। কিন্তু কোনো বিশেষ কাজের জন্যে প্রতি বৎসরের শেষে, আমাদের চল্লিশ দিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে হয়। চল্লিশ দিনের পর আবার আমরা এই বাড়ীতে ফিরে আসি। কাল বৎসরের শেষ হয়েছে, সুতরাং আজ তোমাকে ছেড়ে আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হবে, কেবল এই দুঃখেই আমরা কাঁদছি। যা হোক এখান থেকে যাবার আগে আমরা তোমার হাতেই একশ দরজার চাবি দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঐ-সকল দরজা খুলে তার ভিতরের আশ্চর্য্য জিনিষপত্র দেখে দেখে একলা থাকার কষ্ট দূর কোরো, কিন্তু সাবধান যেন সোনার দরজা খুলো না। এ বিষয়ে আমরা তোমাকে

বার বার নিষেধ করে যাচ্ছি। খুললে তোমার বিপদ ঘটবে, আর আমরা এসেও তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না। পাছে তুমি আমাদের কথা না শোন এই দুশ্চিন্তায় আমাদের শোক আরও বেড়ে উঠেছে। আমরা সোনার দরজার চাবি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার মত গুণবান যুবরাজের প্রতি অবজ্ঞা দেখান হবে, কেবল এই ভেবে আমরা এটাও রেখে চল্‌লাম।" তাহারা এই কথা বলিয়া পুরী হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি একাকী সেখানে থাকিলাম।

আমি রমণীগণের কথা রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই একশ চাবির মধ্য হইতে সোনার দরজার চাবিটি আলাদা করিয়া রাখিয়া বাকী দরজা একে একে খুলিতে লাগিলাম। প্রথম দরজা খোলাতে এক চমৎকার ফলের বাগান আমার চোখে পড়িল। দেখিলাম সেখানে নানাজাতীয় গাছ ফলভারে নীচু হইয়া পড়িয়া বাগানের এক বিচিত্র শোভা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া আমি ভাবিলাম স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও এমন শোভা সম্ভব হয় না! ঐ বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন এমন প্রফুল্ল হইল যে, মনে করিলাম এ জায়গা কখনও ছাড়িয়া যাইব না। কিন্তু আবার তখনই ভাবিলাম অন্যান্য দরজা খুলিলে হয়ত ইহার অপেক্ষাও বেশী অদ্ভুত জিনিষ দেখিতে পাইব। মনে এই-প্রকার ভাব আসাতে তখনই প্রথম দরজা বন্ধ করিয়া দ্বিতীয় দরজা খুলিলাম।

আমি দ্বিতীয় দরজা খুলিবামাত্র হঠাৎ এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাইলাম। আমি ইহার কারণ জানিবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার ভিতর ঢুকিয়া দেখিলাম এক সুন্দর ফুলের বাগানে নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে। তারপরে আমি তৃতীয় দরজা খুলিয়া দেখিলাম সেখানে নানা রংএর পাথরে তৈয়ারী এক চিড়িয়াখানাতে সুগন্ধি কাঠে তৈয়ারী সুন্দর সুন্দর খাঁচাতে নানাজাতীয় পাখী প্রফুল্ল মনে গান করিতেছে। তাহাদিগের সুললিত গান শুনিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইল।

পরদিন সকালে আমি দরজা খুলিয়া এক প্রশস্ত উঠান দেখিলাম। তাহা আমার বিশেষ চমৎকার মনে হইল। দেখিলাম উঠানের চারিধারে একটি সুন্দর বাড়ী। ঐ বাড়ীর চল্লিশ দরজা, সকলগুলিই খোলা রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক দরজা দিয়া এক-এক ধনাগারে যাওয়া যায়। ঐ ধনাগারগুলির এক-একটিতে এত ধন আছে যে, বড় বড় রাজাদের কোষগৃহেও সে রকম ধন থাকা সম্ভব নয়। প্রথম ধনাগারে গিয়া দেখিলাম সেখানে রাশীকৃত মুক্তা রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পায়রার ডিমের মত বড় বড়। দ্বিতীয় ধনাগার হীরা, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নে ভরা। তৃতীয় ঘরে পান্না। চতুর্থ ঘরে শুদ্ধ স্তূপাকার সোনা। পঞ্চম ঘরে মোহর আর টাকা। ষষ্ঠ ঘরে স্তূপাকার রূপা। সপ্তম এবং অষ্টম ঘরে নানারকম মুদ্রা। এই রকম অন্যান্য ধনাগারে প্রবাল, বৈদূর্য্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, প্রভৃতি নানারকম রত্ন দেখিলাম। ঐসকল রত্নের জ্যোতিতে ঘরগুলির যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি উনচল্লিশ দিনে নিরানব্বইটি

দরজা খুলিয়া তাহার ভিতরের জিনিষগুলি দেখিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলাম।

ক্রমে চল্লিশ দিনের দিন উপস্থিত হইল। তার পরদিন রাজকুমারীদের আসিবার কথা ছিল, সুতরাং যদি তাঁহাদিগের আসিবার প্রতীক্ষায় কেবল সেই দিনটি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকি তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে আমার মত সৌভাগ্যশালী আর কেহই থাকিত না; কিন্তু বিধাতার কি-রকম লিখন যে, আমি আপনার দুরাশা পূর্ণ করিবার জন্য অশুভক্ষণে সেই সোনার দরজা খুলিলাম। ঐ দরজা খুলিবামাত্র হঠাৎ একটা বিকট দুর্গন্ধ পাওয়াতে আমি প্রায় অজ্ঞান হইলাম, তবুও আমি ঐ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত না হইয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ক্রমে ঐ গন্ধটা বাহির হইয়া গেল এবং আমারও তখন একটু সুস্থতা জন্মিল। আমি ধীরে ধীরে তাহার ভিতরে গিয়া দেখিলাম সেখানে অসংখ্য সোনার এবং রূপার প্রদীপে আলো জলিতেছে, এবং নানারকম অদ্ভুত জিনিষে চারিদিক ভরিয়া রহিয়াছে আমি ঐ সকল অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিয়া চোখ সার্থক করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একটি পরম সুন্দর কালো ঘোড়া দেখিতে পাইলাম। আমি ঐ ঘোড়ার কাছে গিয়া দেখিলাম তাহার জিন ও লাগাম সোনার, তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের খুবই পরিচয় আছে। ঐ ঘোড়ার খাইবার পাত্র দুই ভাগে ভাগ করা, এক ভাগ পরিষ্কার যবে ও অন্য ভাগ গোলাপের জলে ভরা রহিয়াছে। ঐ পরম সুন্দর ঘোড়াটিকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। তখন তাহার বেগ পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় লাগাম ধরিয়া তাহাকে বাহিরে আনিয়া তাহার পিঠে চড়িলাম এবং তাহাকে চালাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে চালাইতে পারিলাম না। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একপাও চলিল না। তাহা দেখিয়া আমি তাহাকে চাবুক মারিলাম। সেটি পক্ষীরাজ ঘোড়া, আমি তাহা জানিতে পারি নাই। এখন তাহাকে মারিবামাত্র সে একটি ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া পাখা ছড়াইয়া আমাকে পিঠে করিয়া তীরের মত শূন্যে উঠিল; আমি তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শক্ত হইয়া তাহার পিঠে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ক্রমশঃ নীচে নামিয়া ঘোড়া এক অট্টালিকার ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া আমি তাহার পিঠ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় জোরে গা ঝাড়া দিয়া আমাকে তাহার পিছনে ফেলিয়া দিল, এবং লেজের বাড়ি আমার ডান চোখে এমন এক আঘাত করিল যে, তখনই আমার সেই চোখটি নষ্ট হইয়া গেল।

এইরূপে আমি নিজের কুবুদ্ধির দোষে চোখ কাণা করিয়া নিজেকে দোষ দিতে লাগিলাম। ঘোড়াটা তখন উড়িয়া গেল। পরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হওয়াতে আমি এক হাতে চোক ঢাকিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, এক প্রশস্ত দালানের মধ্যে গোলাকারে দশখান সুন্দর পালঙ্ক সাজানো রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার বেশ মনে হইল যে, আমি সেই একচোখ-ওয়ালা যুবকগণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি।

যুবকগণ তখন বাটীর মধ্যে ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই সেখানে আসিয়া হঠাৎ আমাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা দুঃখিত না হইয়া বলিল, "ভাই, তুমি যে এক চোখ কাণা করে এখানে উপস্থিত হয়েছ এতে আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হল। কেননা দুঃখী মানুষে নিজেদের মত দুঃখী লোক দেখ্‌লেই মনে একটু সান্ত্বনা পায়। যা হোক্, তোমার এ-বিপদের কারণ আমরা নই। তুমি নিজের দুর্ঘটনা নিজেই ঘটিয়েছ। তুমি এইখানে থেকে আমাদের সঙ্গে অনায়াসে দিন কাটাতে পার্‌তে, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সংখ্যা ভর্ত্তি আছে, সুতরাং তোমার কোনো-মতেই এখানে থাকা চল্‌বে না। তুমি এখান থেকে বাগ্দাদনগরের দিকে যাত্রা কর। কারণ এ-রকম অবস্থায় তোমার যা করা উচিত তা যিনি ঠিক কর্‌বেন, তাঁকে সেইখানে গেলেই দেখ্‌তে পাবে।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে পথ দেখাইয়া দেওয়াতে আমি সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে আসিতে-আসিতে আমি ভ্রূ ও দাড়ী-গোঁফ কামাইয়া ফকিরের পোষাকে বহুদিন ঘুরিয়া আজ বিকালে বাগ্দাদনগরে পৌঁছিয়াছি। সহরে ঢুকিবামাত্র এই ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরে আমাদের পরস্পর পরিচয়াদি হইলে আমরা দুইজনে এক সঙ্গে কোনরূপে আজ রাত কাটাইবার জন্য জায়গা খুঁজিতে-খুঁজিতে আপনাদের দরজায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। আপনারাও দয়া করিয়া আমাদের বাটীর মধ্যে থাকিতে দিয়াছেন। ভদ্রে! আমার কাহিনী এই।

দ্বিতীয় ফকিরের গল্প শেষ হইলে জোবেদী তাহাদিগের দুইজনকে বলিলেন, "আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা কর্‌লাম। অতএব তোমরা যেখানে খুসী যাও।" ইহা শুনিয়া একজন ফকির বলিল, "ঠাকুরাণী! এই তিনজন সাধুর গল্প কেমন তা শুন্‌বার জন্যে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছি। অনুমতি দিলে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এঁদের কথা শুনি।" জোবেদী এই কথায় আপত্তি না করিয়া রাজা, মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন তোমরা নিজের নিজের গল্প বল।" মন্ত্রিবর জাফর এই কথা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিবার সময় সাফীর কাছে আপনাদিগের যে-রকম পরিচয় দিয়াছেন, এখনও অবিকল সেইরূপ পরিচয় দিলেন। তাহা শুনিয়া জোবেদী তাহাদিগকে কি উত্তর দিবেন হঠাৎ তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ চিন্তিত থাকাতে ফকিরেরা তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভদ্রে! আমাদের আপনি যেমন ক্ষমা করেছেন, মোজলবাসী এই তিনজন বণিককেও সেই-রকম ক্ষমা কর্‌লে আমরা খুব খুসী হব।" জোবেদী বলিলেন, "ভাল, আমি তাদের সকলকেই ক্ষমা কর্‌লাম, কিন্তু তোমাদের এই মুহূর্ত্তেই এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আর কথা না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন তাঁহারা বাহিরে আসিবামাত্র যখন ঐ বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল, তখন রাজা ফকিরদিগকে বলিলেন, "আপনারা বিদেশী, এখনও রাত শেষ হয়নি, অতএব আপনারা এখন কোথায় যাবেন?" তাহারা বলিল, মহাশয়! আমরা কোন্ পথে যাব এ-পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক করতে পারিনি।" রাজা বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে এলে আপনাদের থাক্‌বার একটা সুবিধা করা

যেতে পারে।" এই কথা বলিয়া তিনি আড়ালে চুপি চুপি মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ রাত্রির মত তুমি এদের তোমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখ। কাল সকালে এদের আমার কাছে নিয়ে এসো। কারণ, এদের অদ্ভুত গল্প লিখিয়ে রাখা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য মনে হচ্ছে।" মন্ত্রী রাজার কথামত ফকিরদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়ী গেলেন, মুটিয়া নিজ বাসাতে চলিয়া গেল, এবং রাজা খোজাধ্যক্ষের সঙ্গে প্রাসাদে গমন করিলেন।

পরদিন রাজা যথাসময়ে সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতে করিতে মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রী! কাল রাত্রে আমি মেয়ে তিনটির কাণ্ড দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়ে সেই তিনজন মেয়ে আর সেই দুই ফকিরকে আমার সামনে নিয়ে এস।" মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পাইবামাত্র সেই বাড়ীতে গিয়া আগের রাত্রির ব্যাপার উল্লেখ না করিয়া নিজের আসিবার কারণ বলিলেন, তাহারা রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তখনই ঘোম্‌টা দিয়া মন্ত্রীর সঙ্গে চলিল। মন্ত্রী ফিরিবার সময়ে নিজের বাড়ী হইতে ফকিরদিগকে সঙ্গে করিয়া এত শীঘ্র রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে, রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর রাজা স্ত্রীলোক-তিনটিকে পর্দ্দার মধ্যে বসাইতে অনুমতি দিয়া, এবং ফকিরদিগকে নিজের পাশে বসাইয়া, মেয়েগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরীগণ! কাল রাত্রিবেলায় আমি সওদাগরের বেশে তোমাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ এ-কথা শুনে তোমরা চমকে যেতে পার, আর তোমাদের মনে এমন ভয় হতে পারে যে, আমি তোমাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে কেবল শাস্তি দেবার জন্যে তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমরা তার জন্যে কিছুমাত্র ভয় পেও না। আমি তোমাদের সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত খুসী হয়েছি। তোমাদের কোনো অনিষ্ট করবার ইচ্ছায় আমি তোমাদের এখানে আনিনি। কেবল এই কথাটা জান্‌বার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে আছি যে, কিজন্যে তোমাদের মধ্যে একজন দুটা কালো কুকুরকে প্রথমে নির্দ্দয়ভাবে মার্‌লে, কেনই বা নিজে সেই দুটো কুকুরকে চুমু খেয়ে পরে কাঁদতে বস্‌লে।"

ইহা শুনিয়া জোবেদী নির্ভয়ে নিজের গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

জোবেদীর কথা

মহারাজ! আমি যে গল্প বলিতে যাইতেছি ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। আপনি যে দুই কালো কুকুরীর কথা বলিলেন, তাহারা আমার বড় ও মেজো বোন্। যে অদ্ভুত ঘটনায় তাহারা এই নীচ পশুর দশা পাইয়াছে আমি তাহার কথা বলিতেছি। যে দুটি মেয়ে আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকে এবং যাহারা আমার সঙ্গে সম্প্রতি এখানে আসিয়াছে, তাহারা আমার

বৈমাত্রেয় বোন্। যে মেয়েটির বুকে কালো কালো দাগ তাহার নাম আমিনী, অন্যজনের নাম সাফী, এবং আমার নাম জোবেদী।

আমার বাবা মারা যাইবার পর, আমরা তাঁহার সম্পত্তি পাঁচ ভগিনীতে সমান ভাগ করিয়া লইলাম। আমার বৈমাত্রেয় বোন্ দুজন নিজের নিজের অংশ লইয়া তাহাদের মায়ের কাছে গিয়া রহিল। আমি এবং আমার দুই বোন্ আমাদের মায়ের কাছে রহিলাম। মা মারা গেলে আমরা তিন বোনে তাঁহার স্ত্রীধন সমান ভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক-এক হাজার টাকা পাইলাম। এই ঘটনার কিছু পরেই আমার বড় ও মেজো বোন্ বিবাহ করিয়া নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাওয়াতে একলাই থাকিতে বাধ্য হইলাম। কিছুদিনের পর আমার বড় ভগিনীপতি নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আফ্রিকা মহাদেশে যাত্রা করিল। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর সে জলের মত টাকা খরচ করিয়া ও অন্যান্য অন্যায় কাজ করিবা নিজের সমস্ত বিষয়াদি নষ্ট করিয়া টাকার অভাবে স্ত্রীকে খাওয়াইতে না পারিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। তখন আমার বোন্ উপায় না দেখিয়া একদিন ময়লা কাপড় পরিয়া আমার কাছে আসিয়া নিজের দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যাহা হউক আমি অনেক আদর-যত্ন করিয়া বোন্‌কে নিজের বাড়ীতে জায়গা দিলাম, এবং কয়েকমাস আমরা পরমসুখে একসঙ্গে বাস করিলাম। অনেকদিন পর্য্যন্ত মেজো বোনের কোনো খবর না পাওয়াতে সময়ে সময়ে সে-বিষয়ে আমরা কথাবার্ত্তা বলিতাম। ইতিমধ্যে একদিন ঐ বোন্‌ও হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার স্বামী আমাকে জোর করে দূর করে দিয়েছে।" আমি এই কথা শুনিয়া দয়া করিয়া তাহাকেও আদর করিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিলাম।

কিছুকাল কাটিলে পর একদিন ঐ দুই বোন্ একসঙ্গে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "বোন্! চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে আবার বিয়ে করে সংসার করা আমাদের ভাল বোধ হচ্ছে।" তাই শুনিয়া আমি বলিলাম, "তোমরা আমার বাড়ীতে রয়েছ বলে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কোরো না। কারণ, আমার যে সম্পত্তি আছে, তা দিয়ে তিনজনের একরকম স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। আর যদি তোমাদের বিয়ে করাই ইচ্ছে হয় তা হলে আমি তোমাদের মতে কিছুতেই মত দিতে পারি না। কেননা এর আগে তোমরা একবার বিয়ে করে বিলক্ষণ যন্ত্রণাভোগ করেছ।" এইরূপে আমি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বারবার বারণ করিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা না শুনিয়া আবার বিবাহ করিল। কয়েক মাস কাটিলে তাহারা আবার তেম্‌নি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া বলিল, "বোন্! কেবল তোমার কথা না শোনাতেই আমাদের আবার এই দুর্দশা হল। যদিও বয়সে তুমি আমাদের ছোট তবুও তুমি আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমতী। আমরা আগের অপরাধের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এখন যদি কৃপা

করে আমাদের আর-একবার তোমার বাড়ীতে জায়গা দাও, তা হলে আমরা চিরকাল তোমার দাসী হয়ে থাক্‌ব, প্রাণান্তেও আর কখনও তোমার পরামর্শ অগ্রাহ্য কর্‌ব না।" এই কথা শুনিয়া আমি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "বোন্! তোমরা আমার কথা শোননি এজন্য আমি দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তার জন্যে আমার তোমাদের প্রতি রাগ হয়নি. তোমরা নিজের বাড়ী মনে করে এখানে স্বচ্ছন্দে থাক।" এই বলিয়া আমি তাহাদিগকে আবার নিজের বাড়ীতে রাখিলাম।

পরমসুখে এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর আমার মূলধন ক্রমে আগের চেয়ে ঢের বাড়িয়া যাওয়াতে আমি বিদেশে বাণিজ্য করিবার ইচ্ছায় বোন-দুইটির সঙ্গে বালশোরায় গিয়া একখানি জাহাজ কিনিলাম, এবং বাগ্দাদনগর হইতে যে-সকল বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া ছিলাম তাহাতে জাহাজ বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। বাতাস ভাল থাকাতে আমরা কয়েকদিনের মধ্যে পারস্য-উপসাগর পার হইয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। জাহাজে উঠিবার উনিশ দিন পরে ভারতবর্ষীয় পাহাড় আমাদের চোখে পড়িল। পরে ক্রমে কাছে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া যখন আমরা তীরে উঠিলাম, তখন দেখিলাম ঐ পাহাড়ের তলায় এক প্রকাণ্ড নগর রহিয়াছে। আমরা নগরের দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম সেখানে অসংখ্য প্রহরী লাঠি হাতে পাহারা দিতেছে। কেহ বসিয়া, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা কেহই চলিতে পারিতেছে না এবং কাহারও চোখের পাতা পড়িতেছে না। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, তাহারা পাথর হইয়া রহিয়াছে। পরে নগরের মধ্যে ঢুকিয়া আমি যে-দিকে চাহিতে লাগিলাম সেই দিকেই পাথরের লোকজন দেখিতে পাইলাম। এইরূপে আমি পথে, ঘাটে, বাজারে যেখানে যাইতে লাগিলাম, সেইখানেই দেখিতে পাইলাম মানুষগুলি যে যে-অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্তি হইয়া রহিয়াছে। নগরের ঠিক মাঝখানে যাওয়াতে এক প্রকাণ্ড বাড়ী আমার চোখে পড়িল, তাহার বাহিরের দরজায় সোনার কাজ করা। ঐ দরজা একেবারে খোলা রহিয়াছে। তাহার সাম্‌নে এক চমৎকার রেশমের পর্দা ঝুলিতেছে, এবং উপরে একটা লণ্ঠন ঝোলান আছে। ঐ বাড়ী দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম যে, তাহা রাজপ্রাসাদ। পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলাম, সেখানেও জনমানব নাই। দারোয়ানরা কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা শুইয়া আছে। সকলেই পাথরের মূর্তি। পরে আমি এক প্রশস্ত উঠান পার হইয়া দেখিলাম সাম্‌নে একটি পরম সুন্দর ঘর রহিয়াছে। তাহার জানালাগুলি সোনার। তাহাতে ভাবিলাম সেখানে রাজমহিষী থাকেন। সেখান হইতে সুন্দর জিনিসে সাজানো এক ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সেখানে একটি পাথরের সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথায় সোনার মুকুট ও গলায় মুক্তার মালা। তাহাতে আন্দাজ করিলাম তিনিই রাজমহিষী ছিলেন।

তারপর আমি সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া অনেক মহল পার হইয়া শেষে এক প্রকাণ্ড

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম সেখানে অনেক বহুমূল্য রত্নে কাজকরা এক সোনার সিংহাসন। ঐ সিংহাসনের উপর মুক্তার ঝালর দেওয়া এক সুন্দর গদী বিছান রহিয়াছে। গদীর উপর হইতে একটা উজ্জ্বল আলো আসিতেছিল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ঐ আলো কোথা হইতে আসিতেছিল তাহা জানিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া দেখিলাম উপরে ডিমের মত বড় একটা হীরা ঝুলিতেছে। ঐ হীরার আভা এমন উজ্জ্বল যে, দিনেও আমি তাহার প্রতি চাহিতে পারিলাম না। তারপরে আমি সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য ঘরে ঢুকিয়া নানা অদ্ভুত জিনিষ দেখিতে দেখিতে এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম যে, তখন আমি বোনদের ও জাহাজের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে হইল জাহাজে যাইতে হইবে। অতএব আমি সেখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য পথ খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই পথ না পাইয়া এধার-ওধার ঘুরিতে-ঘুরিতে যে-ঘরে সিংহাসন ছিল আবার সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম, আজ এইখানেই রাত্রি কাটাই, কাল সকালে জাহাজে গিয়া উঠিব। এইরূপ ঠিক করিয়া সেই সোনার সিংহাসনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু একলা সেই অপরিচিত ও নির্জ্জন জায়গায় থাকাতে মনে একটু ভয় হইল। তাহাতে কোনো-প্রকারে আমার ঘুম হইল না। পরে যখন রাত্রি দুই প্রহর তখন আমার মনে হইল যেন কাছেই কোনো ব্যক্তি কোরান্ পড়িতেছে। তাহাতে আমি কৌতূহলী হইয়া তখনই উঠিয়া পড়িলাম, এবং হাতে একটা আলো লইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। যে ঘরের মধ্যে কোরান্ পড়া হইতেছিল তাহার দরজার উপস্থিত হইয়া হাতের আলো মাটির উপর রাখিয়া জানালা দিয়া দেখিলাম, এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ একখানা গদীর উপর বসিয়া একমনে কোরান্ পড়িতে-ছেন। তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয় এ-বিষয়ে কিছু আশ্চর্য্য আছে, তা না হইলে যে-নগরে সমস্ত লোকই অচল পাথর হইয়া রহিয়াছে, সেখানে এই রাত্রে একজন সুন্দর যুবক কোথা হইতে আসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন? তার পরে আমি ঐ ঘরের দরজা আধ-খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হে জগদীশ্বর! কেবল আপনার প্রসাদেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে মহাসমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন প্রার্থনা করি যে-পর্য্যন্ত না আমরা আবার নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যাই, সে পর্য্যন্ত আপনি আমাদের দয়া করে রক্ষা করুন।" এই কথা শুনিয়া ঐ যুবাপুরুষ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে এবং কিজন্যে এই বিজন নগরে এসেছ?" এই কথায় আমি সংক্ষেপে তাঁহার কাছে নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ঐ সহরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবা কহিলেন, "ভদ্রে! এখনই তুমি ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করলে তাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে, তুমি ঈশ্বরের তত্ত্ব বুঝতে পেরেছ। এখন আমি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির কিছু পরিচয় দিচ্ছি শোন।"

আমার বাবা প্রকাণ্ড এক রাজ্যের রাজা ছিলেন। আগে এই নগর তাঁর রাজধানী ছিল।

এইখানে কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই সূর্য্যোপাসক ও অগ্নিপূজক ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বরবিরোধী নারত্নন নামক দৈত্যের পূজা করতেন। আমি যদিও পৌত্তলিক বংশে জন্মেছিলাম তবুও আমার কখনও পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে নাই। তাহার কারণ এই—ছেলেবেলায় আমার এক ধাত্রী ছিলেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। ঐ ধাত্রী আমাকেও ক্রমে ক্রমে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি আমাকে সব সময় বল্‌তেন, 'প্রিয় রাজকুমার! ঈশ্বর এক ছাড়া দুই নাই। অতএব তুমি একমাত্র ঈশ্বরের পূজা কর, তা ছাড়া তোমার অন্য কাকেও পূজা করতে হবে না।' পরে ধাত্রী মারা গেলে আমি তাঁর উপদেশমত একমাত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে রইলাম। প্রায় চার বৎসর কাটলে পর একদিন হঠাৎ এ-নগরে দৈববাণী হল, 'হে নগরবাসিগণ! তোমরা নারত্নন ও অগ্নির পূজা ছেড়ে একমাত্র করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনা কর।' ক্রমাগত তিন বৎসর এইরকম দৈববাণী হল, তবুও কেউ তাতে কান দিল না। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের শেষদিনের রাত্রি চারটার সময় নগরের সমস্ত লোক ঈশ্বরের কোপে পড়ে যিনি যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থাতেই একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। আমার বাবা ও মা দুইজনেই কালো পাথর হয়ে এই পুরীর মধ্যে রয়েছেন, কেবল আমিই ঈশ্বরের কোপে না পড়াতে এখনও বেঁচে আছি। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই অসাধারণ অনুগ্রহ দেখে আমি তখন হতে তাঁর প্রতি আরও বেশী ভক্তি প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু এই নির্জ্জন জায়গায় থাকাতে আমার মন সব সময়ই শোকাচ্ছন্ন থাকে। সম্প্রতি তোমার আসাতে আমার বোধ হচ্ছে ঈশ্বর কেবল সেই শোক দূর করবার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছেন।"

আমি বলিলাম, "হে রাজপুত্র! কেবল তোমাকে এই ভয়ানক জায়গা থেকে উদ্ধার করবার জন্যই যে জগদীশ্বর আমাকে এখানে এনেছেন সে-বিষয়ে কিছু সন্দেহ নেই। সম্প্রতি আমি আর আমার যা-কিছু আছে সকলই তোমার অধীন। তুমি আমার জাহাজে চড়ে যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার।" রাজকুমার এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে রাত্রির শেষভাগ কাটাইয়া দিলাম। পরদিন সকালে আমরা উঠিয়া ঐ পুরী হইতে বাহির হইয়া জাহাজে গেলাম। আমার দুই বোন, পোতাধ্যক্ষ ও জাহাজের আর-সকল লোক আমার না আসাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল! তারপর আমি যে কারণে আগের রাত্রে জাহাজে আসিতে পারি নাই, যেভাবে আমার যুবরাজের সঙ্গে দেখা হয় এবং যে ঘটনাক্রমে ঐ সুন্দর নগর জনশূন্য হইয়াছে, সে সমস্তই তাহাদিগকে বলিলাম। তারপরে যে-সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যে জাহাজ ভরা ছিল তাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া সেই রাজপুরী হইতে নানা-রকম হীরকাদি লইয়া জাহাজে বোঝাই করিয়া সকলে জাহাজে চড়িয়া বাগ্দাদের দিকে চলিলাম। যখন আমি রাজকুমার ও দুই বোনের সঙ্গে জলপথে যাত্রা করি, তখন আমাদের সুখের সীমা

ছিল না। কিন্তু হায়! শীঘ্রই আমাদের সে সুখের দিন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল। কারণ যুবরাজের সঙ্গে আমার ভাব দেখিয়া আমার বোনেরা মনে মনে অত্যন্ত হিংসা করিতে লাগিল। একদিন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বোন্, তুমি কি মত্‌লবে এই রাজ-পুত্রকে বাগ্দাদে নিয়ে যাচ্ছ?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি এঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্‌ব।" পরে রাজপুত্রকে বলিলাম, "হে যুবরাজ! এ-বিয়ে সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমার নিতান্ত ইচ্ছা এই যে, বাগ্দাদে গিয়ে আপনাকে বিয়ে করে আপনার দাসী হয়ে সর্ব্বদা চরণ সেবা করি।" রাজকুমার উত্তর করিলেন, "সুন্দরী! আপনি আমার প্রতি এত বেশী অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন যে, আপনি একথা সত্যই বল্‌ছেন না ঠাট্টা কর্‌ছেন তা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যা হোক্, আমি আপনার বোন্‌দের সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, যদি আপনি দয়া করে আমাকে বিয়ে করেন, তা হলে আপনাকে দাসী মনে করা দূরে থাক্ বরং আমি নিজে চিরজীবন আপনার কথামত চল্‌ব।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার দুই বোনের মুখ একেবারে কালো হইয়া গেল এবং সেইদিন হইতে তাহাদের আমার প্রতি স্নেহ কমিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে যখন আমাদের জাহাজ পারস্য-উপসাগর পার হইল, তখন মনে এমন আশা হইল যে, পরদিন আমরা বালশোরায় গিয়া উপস্থিত হইব। কিন্তু একদিন আমার দুই বোন্ রাত্রিতে আমাকে ও রাজকুমারকে ঘুমন্ত দেখিয়া দুজনকেই ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। রাজকুমার জলে পড়িবামাত্র মারা গেলেন, কিন্তু আমি কিছুক্ষণ জলের উপর সাঁতার দিয়া সৌভাগ্যবশতঃ এক দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। ঐ দ্বীপ বালশোরা নগর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূর। ক্রমে সকাল হইলে আমি রৌদ্রে নিজের ভিজা কাপড় শুকাইয়া এধার-ওধার ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম সেখানে খাইবার উপযোগী নানারকম মিষ্ট ফল এবং পানের উপযোগী পরিষ্কার জল রহিয়াছে। তাহাতে আবার আমার মনে বাঁচিবার আশা হইল। আমি সেইখানে এক গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড পাখাওয়ালা সাপ জিহ্বা বাহির করিয়া আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া দেখিলাম, তাহার পিছন পিছন আর একটা ভয়ানক সাপ আগের সাপের লেজ ধরিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে গিলিবার জন্য মাঝে মাঝে হাঁ করিতেছে। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া দয়া করিয়া আগের সাপটিকে রক্ষা করিবার জন্য তখনই একখানা প্রকাণ্ড পাথর তুলিয়া সাহস করিয়া পিছনের সাপের মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। তাহাতে সে তখনই মরিয়া গেল। প্রথম সাপটার এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে সে আপনার পাখা মেলিয়া আকাশমার্গে উড়িয়া গেল। আমি এই কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ ঐ সাপের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সে শীঘ্রই অদৃশ্য হইল। তখন আমি সে জায়গা হইতে আর-এক গাছতলায় গিয়া শুইয়া থাকিলাম।

ঘুম ভাঙিলে আমি চোখ খুলিয়াই দেখিলাম, একজন শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোক দুইটা কালো

কুকুরীর গলায় শিকল ধরিয়া আমার পাশে বসিয়া আছেন। তাহা দেখিয়া আমি যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া মাটি হইতে উঠিয়া বসিলাম, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" রমণী উত্তর করিলেন, "যে-সাপকে আপনি কিছুক্ষণ আগে দারুণ শত্রুর মুখ থেকে রক্ষা করেছেন আমি সেই সাপ। আমরা পরী জাতি। আপনি আমার যে মহৎ উপকার

একটা পাখা-ওয়ালা সাপ জিহ্বা বাহির করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে

করেছেন, কিছু পরিমাণে তা শোধ করবার জন্যে আমি যে কাণ্ড করেছি তা শুনুন। আপনার বোন-ছুজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আপনাকে যে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল তা আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। পরে যখন আমি আপনার অনুগ্রহে মরণের হাত থেকে মুক্তি পেলাম, তখন এখান থেকে গিয়ে আমি নিজের জাতের অন্যান্য পরীদের সঙ্গে মিলে আপনার জাহাজের রত্নরাশি বাগদাদে আপনার বাড়ীতে এনে রেখে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। আর আপনার ছুই বোনকে আমি ছুই কালো কুকুরী করে আমার সঙ্গে এনেছি। এ পর্য্যন্ত এদের ছুষ্কর্ম্মের উচিত শাস্তি দেওয়া হয়নি। এদের আরও কিছু দণ্ড দেবার জন্যে পরে আমি আপনাকে উপদেশ দিয়ে যাব।" এই বলিয়া পরী এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে ছুইটা কুকুরীকে লইয়া একেবারে আকাশে উঠিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বাগদাদ

নগরে আমার বাড়ীতে আসিয়া নামিলেন। ঘরে আসিয়া দেখিলাম, আমার জাহাজে যে-সমস্ত দামী জিনিষ ছিল সে-সমস্তই আমার বাড়ীতে রাশি করা রহিয়াছে। তারপর পরী যাইবার সময় সেই দুই কুকুরীকে আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনার দুই বোন্ আপনার এবং রাজকুমারের কাছে গুরুতর অপরাধ করেছে। অতএব আমি বারবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি প্রতিদিন রাত্রে এই দুই কুকুরীকে এক-একশ ঘা লাঠির বাড়ি মারবেন। কখনও যেন এর ভুল না হয়। না করলে আপনাকেও এদের মত হতে হবে।" আমি কাজেই পরীর কথামত চলিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবং তখন হইতে তাহাদিগকে ঐরকম মারিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়।

বাগদাদেশ্বর জোবেদীর মুখে এই-সমস্ত কথা শুনিয়া খুব খুসী হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, "সুন্দরী! যে-পরী সাপের বেশ ধরিয়া তোমাকে দেখা দিয়েছিল এবং যার আদেশে তুমি প্রতি রাত্রে নিজের বোন্দের মারো, সে কোথায় থাকে তা কি তুমি জান? আর পরীর সঙ্গে তোমার আবার দেখা হবে কি না, এবং সে তোমার বোন্দের আবার মানুষ করে দেবে কি না, সে-বিষয়ে সে কি তোমাকে কিছুই বলে যায়নি?"

জোবেদী বলিল, "মহারাজ! আগে আমি আপনাকে একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা শুনুন। যখন পরী আমার কাছ থেকে চলে যায়, তখন সে আমাকে এক গোছা চুল দিয়ে এই কথা বলে যায় যে, যদি তোমার কখন আমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই গোছা থেকে দুগাছি চুল নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো, তা হলে আমি তখনি তোমার কাছে এসে উপস্থিত হব।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন সে চুলের গোছা কোথায় আছে?" জোবেদী উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি তা সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে রাখি।" এই কথা বলিয়া তিনি নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে চুলগুলি বাহির করিলেন। রাজা কহিলেন, "এই চুলগুলির গুণ পরীক্ষা করে দেখবার এই ঠিক সময়। কারণ, চুল আগুনে ফেললে বাস্তবিক পরী এখানে এসে হাজির হয় কি না, তা জানবার জন্যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছি।" তাহা শুনিয়া জোবেদী তখনই আগুন আনাইয়া তাহাতে চুলের গোছা হইতে দুগাছি চুল ফেলিয়া দিলেন। তাহাতে তখনই সেই রাজপুরী টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে পরী আসিয়া রাজার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কি করতে হবে, আমাকে অনুমতি করুন্। যে-রমণী মহারাজের আদেশে আমাকে ডেকেছেন, তিনি আমার মহৎ উপকার করেছিলেন। আমি সেই উপকারের একটু শোধ দেবার জন্যে তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী বোন্-দুইজনকে কুকুরী করে রেখেছি। এখন যদি মহারাজের অনুমতি হয় তা হলে আমি তাদের আগের মত মানুষ করে দিই।" রাজা বলিলেন, "হে রূপবতী! যদি তুমি তা কর, তা হলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হব।"

পরী কহিল, "নরনাথ, আমি আপনার অনুরোধে এখনি এই দুই কুকুরীকে মানুষ করে দিচ্ছি।"

তারপর রাজা জোবেদীর বাড়ী হইতে সেই দুই কুকুরীকে আনাইলেন। পরী একটি পাত্রে জল ভরিয়া কতকগুলি মায়ামন্ত্র পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে ঐ পাত্র হইতে একটু জল দুই কুকুরীর গায়ে ছড়াইয়া দিল। ইহা করিবামাত্র কুকুরী-দুটি দুটি সুন্দরী স্ত্রীলোক হইয়া গেল।

রাজা এই-সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া অত্যন্ত অবাক হইলেন। তিনি জোবেদীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন, এবং ফকিরবেশী দুই রাজকুমারের সহিত সেই দুই রমণীর বিবাহ দিয়া তাহাদের থাকিবার জন্য প্রত্যেককে বাগ্দাদনগরে এক-একটি সুন্দর বাড়ী দিলেন। রাজা এততেও সন্তুষ্ট না হইয়া রাজপুত্রদিগকে বড় বড় চাকরী দিলেন। তাহাতে তাঁহারা অনেক কষ্ট পাইবার পর, জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে কাটাইতে লাগিলেন, এবং এইরূপ বদান্যতা দেখানোতে রাজারও দেশ-বিদেশে খুব সুখ্যাতি হইল।

সিন্দবাদ নাবিকের কথা

হারুন-অল-রশীদ রাজার রাজত্ব-সময়ে বাগ্দাদ নগরে হিন্দবাদ নামে এক গরীব মুটে ছিল। একদিন গরমের সময় সে মাথার উপর একটা বড় মোট লইয়া নগরের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে রোদে ক্লান্ত হইয়া এক গলির মধ্যে ঢুকিল। সেখানে অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল এবং পথগুলি গোলাপজলে ভিজান থাকাতে সমস্ত গলিতে এমন সুগন্ধ হইয়াছিল যে, মুটিয়া সেই সুন্দর জায়গা ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া মাথা হইতে মোট নামাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্নে গিয়া বসিল। ঐ বাড়ী হইতেও নানারকম সুগন্ধ বাহির হইয়া চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল। মুটিয়া সেই গন্ধ পাইয়া এবং বাড়ীর মধ্যে নানাজাতীয় পাখী মিষ্ট গলায় একসঙ্গে যে গান করিতেছিল তাহা শুনিয়া খুবই খুসী হইল। কিন্তু এর আগে আর কখন ঐ পথ দিয়া আসা-যাওয়া না করাতে, সে ঐ বাড়ী কাহার তাহা বুঝিতে না পারিয়া দারোয়ানের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! এ বাড়ী কার?" সে উত্তর করিল, "সুপ্রসিদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের এই বাড়ী। তুমি বাগ্দাদ নগরে থাক, অথচ এটা জান না?" মুটিয়া পূর্ব্বে সিন্দবাদের ঐশ্বর্য্যের কথা কেবল কানে শুনিয়াছিল, সম্প্রতি নিজের চোখে তাহা দেখিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হে জগদীশ্বর! তুমি সিন্দবাদ ও হিন্দবাদের অবস্থার এমন প্রভেদ করে দিলে কেন? আমি সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করে নিজের আর বাড়ীর

লোকের জন্যে যা-তা খাবারও জোগাড় করতে পারি না। কিন্তু সিন্দবাদ এত ধন পেয়ে পরম সুখে কাল কাটাচ্ছেন। সিন্দবাদ এমন কি কাজ করেছিলেন যে, তিনি এত বড়লোক হলেন? আর আমিই বা এমন কি করেছিলাম যে আমাকে এমন অনন্ত দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে?"

মুটিয়া এই-সব বলিতেছে, এমন সময় একজন চাকর ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মুটিয়ার কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'তুমি শীঘ্র এস, প্রভু সিন্দবাদ তোমাকে ডাকছেন।" মুটিয়া এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল, "নিশ্চয় আমি যে-সব কথা বলছিলাম, তা সিন্দবাদের কানে গিয়ে থাকবে," কাজেই সে সিন্দবাদের কাছে উপস্থিত হইতে ভয় পাইতে লাগিল। কিন্তু ভৃত্য তাহাকে আশ্বাস দেওয়াতে সে তাহার সঙ্গে যাইতে সাহসী হইল। সে ঐ চাকরের সঙ্গে এক প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে ঢুকিল। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের ঠিক মধ্যে একজন সুশ্রী চেহারার বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তাঁহার পিছনে চাকরবাকর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ বৃদ্ধেরই নাম সিন্দবাদ। মুটিয়া এই-সকল সমারোহ দেখিয়া আরও বেশী ভয় পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে প্রণাম করিল। সিন্দবাদ মুটিয়াকে বিশেষ আদর করিয়া নিজের ডানদিকে বসাইয়া ভাল সরবৎ পান করিতে দিলেন। মুটিয়া আদর করিয়া তা লইয়া পান করিল।

তারপর সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে, সিন্দবাদ মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তোমার নাম কি, তুমি কি কাজ কর?" সে উত্তর করিল, "মহাশয়! আমার নাম হিন্দবাদ। আমি মোট বয়ে কোনো-রকমে দিন গুজরান্ করি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তোমার সহিত দেখা হওয়াতে আমরা খুব খুসী হয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তুমি গলিতে বসে যে-সকল কথা বলছিলে তা তোমার মুখে আর একবার শুনতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে।" হিন্দবাদ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমার শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল, সে অবস্থায় কি বলেছি তার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তুমি ভয় পেও না। আমি এমন অবিবেচক লোক নই যে, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব। তোমার মত দুরবস্থার লোকের পক্ষে এরকম কথা বলা স্বাভাবিক। আমি তোমার কষ্টের কথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। তুমি মনে করছ, আমি বিনা কষ্টে অনেক টাকা রোজগার করেছি, কিন্তু আসলে তা নয়, আমি অনেক কষ্ট করে তবে এমন সুখের অবস্থা পেয়েছি।"

এই কথা বলিয়া সিন্দবাদ সভার সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভদ্রগণ! আমি টাকা রোজগার করবার জন্যে যে-সব আশ্চর্য্য কাজ করেছিলাম, তাতে অত্যন্ত লোভী লোকেরও মনে ভয় হয়। আমি সাত-বার বাণিজ্য-যাত্রা করে যে-সমস্ত বিপদে পড়ি, সে-সকল আপনারা না শুনে থাকতে পারেন। অতএব আমি সেই-সব কথা আগাগোড়া বলছি শুনুন।"

সিন্দবাদের প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা

সিন্দবাদ বলিলেন,—আমার বাবা মারা যাইবার পর আমি অনেক টাকাকড়ি পাইয়া প্রথমে আমোদ-প্রমোদে তাহার বেশীর ভাগই নষ্ট করিলাম। পরে ঐ-রকম করা অন্যায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কাহারও ভাগ্যে ধন চিরদিন থাকে না। কিন্তু আমার মত খরুচে লোকের হাতে ইহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। "দারিদ্র্যভোগ অপেক্ষা মরণ ভাল"—সলোমনের এই কথাটি বাবা সর্ব্বদা আমার কাছে বলিতেন, এখন আমার ভাগ্যে বুঝি তাহাই ঘটিল। এই সমস্ত ভাবনা হওয়াতে আমি অত্যন্ত কাতর হইলাম। তার পর আমি নিজের জমিজমা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বাগদোরা নগরে যাইয়া কয়েকজন সওদাগরের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া পারস্য উপসাগর দিয়া ভারত দ্বীপ উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম।

এর আগে আমি আর কখনও জাহাজে চড়ি নাই। সুতরাং প্রথমবার সমুদ্র দিয়া যাওয়াতে কয়েকদিন আমার সামুদ্রিক রোগ হইল, কিন্তু আমি শীঘ্রই সারিয়া উঠিলাম এবং ভবিষ্যতে সমুদ্রপথে যাইবার সময় আমার আর কখনও সেরূপ অসুখ হয় নাই। সে যাহা হউক আমরা জলপথে যাইতে যাইতে অনেক দ্বীপে জাহাজ নঙ্গর করিয়া বাণিজ্যের জিনিষপত্র কিনিলাম ও বিক্রয় করিলাম। একদিন আমরা পাল তুলিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে একটু দূরেই একটি ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। ঐ দ্বীপ জল হইতে বেশী উঁচু ছিল না, এবং হঠাৎ দেখিয়া উহা একটি ঘাসে-ঢাকা মাঠের মত বোধ হইল। তাহা দেখিয়া আমি এবং জাহাজের আর কয়েকজন লোক পোতাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া জাহাজ হইতে ঐ দ্বীপে উঠিলাম। ক্রমাগত কয়েক দিন জলপথে চলাতে, আমাদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এখন এমন সুবিধা পাইয়া আমরা খাওয়া-দাওয়ার আমোদে মাতিয়া উঠিলাম। এমন সময় হঠাৎ ঐ দ্বীপ কাঁপিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া জাহাজের লোকেরা তাহাকে তিমিমাছের পিঠ বলিয়া জানিতে পারিয়া আমাদিগকে তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিতে বলিল। তাহা শুনিয়া কয়েকজন লোক শীঘ্র জাহাজে চড়িল, কেহ কেহ সাঁতার দিয়া জাহাজের কাছে গেল। কিন্তু আমি ঐ মাছের পিঠে থাকিতে-থাকিতেই সে জলে ডুবিয়া গেল। কাজেই আমি তখন অন্য উপায় না দেখিয়া আগুন জ্বালিবার জন্য জাহাজ হইতে যে একখণ্ড কাঠ আনিয়াছিলাম, তাহাই ধরিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম। এই সময়ে জাহাজের লোকেরা বাতাস ভাল দেখিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলেন।

এইরূপে আমি নিরাশ্রয় হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি সমুদ্রে সাঁতার দিতে লাগিলাম। পরদিন সকালে আমি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম যে, জীবনের আশা ছাড়িয়াই দিলাম। এমন সময় হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়া জোরে আমাকে এক দ্বীপের কাছে

আছড়াইয়া ফেলিল। ঐ দ্বীপের তীর অত্যন্ত খাড়া ও উঁচু ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমার পরমায়ু থাকাতে, আমি কতকগুলি গাছের শিকড় জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইয়া তাহা ধরিয়া তীরে উঠিলাম। আমি সকাল হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। তারপরে ক্ষুধা-তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া, আস্তে আস্তে মাটি হইতে উঠিয়া খাবার খুঁজিতে চলিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ দ্বীপে অনেক-রকম মিষ্ট ফল ছিল। তাই দেখিয়া এবং সাম্‌নে একটি সুন্দর ঝরণা হইতে পরিষ্কার জল ঝরিতেছে দেখিয়া আমার বিশেষ আনন্দ হইল। আমি ঐ-সকলে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া একটু জোর পাইয়া ঐ দ্বীপে ঘুরিতে ঘুরিতে এক প্রকাণ্ড মাঠে গিয়া হাজির হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র আমার মনে হইল যেন মাঠের এক অংশে একটি ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। আমি দূর হইতে ঐ ঘোড়াটিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে যখন আমি তাহার কাছে আসিলাম তখন দেখিলাম যে, এক সুন্দর ঘোড়া খোঁটায় বাঁধা রহিয়াছে। আমি ঐ ঘোড়ার আশ্চর্য্য রূপ দেখিতেছি এমন সময় হঠাৎ যেন মাটির তলা হইতে মানুষের গলার স্বর কানে আসিল। একটু পরেই একটি লোক আমার সাম্‌নে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তাহাতে আমি তাহাকে নিজের পরিচয় দিলাম। তাহা শুনিয়া ঐ লোকটি আমাকে সঙ্গে লইয়া এক গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিল। সেই গর্ত্তের ভিতরে আর কয়েকজন লোক ছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া যেমন অবাক্ হইল, আমিও তাহাদিগকে মাটির তলায় বাস করিতে দেখিয়া সেইরকম অবাক্ হইলাম।

তারপর তাহারা আমাকে কিছু খাবার দেওয়াতে, আমি তাহা খাইলাম। খাইবার পর আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি জন্যে এই বিজন মাঠে থাক?" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা এই দ্বীপের রাজা মহারাজের ঘোড়ার সহীস। প্রতি বৎসর এই সময়ে আমরা মহারাজের আজ্ঞায় তাঁর ঘোড়াকে এইখানে চরাতে আসি।"

পরদিন সকালে তাহারা ঘোড়াকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে গিয়া আমাকে রাজার কাছে উপস্থিত করিল। রাজা আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহার কাছে নিজের দুর্ঘটনার বিষয় সমস্তই বর্ণনা করিলাম। রাজা তাহা শুনিয়া দয়া করিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আমাকে নিজের কাছে রাখিলেন। আমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকিতে লাগিলাম। ঐ রাজার রাজধানী সমুদ্রতীরে ছিল এবং সেখানে একটি ভাল বন্দর থাকায় সেখানে সবসময়ই বিদেশী জাহাজ ও বণিকগণ যাওয়া-আসা করিত। সুতরাং মহাজনদিগের মুখে বাগ্‌দাদনগরের খবর পাইতে পারিব এবং কখন না কখন ঐ নগরে ফিরিয়া যাইবার সুবিধা হইতে পারিবে এই আশায় আমি সর্ব্বদা তাহাদিগের কাছে যাওয়া-আসা করিতাম। একদিন আমি মহাজনদিগের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একখানি জাহাজ বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল এবং জাহাজের লোকজন জাহাজ হইতে

বাণিজ্যদ্রব্যাদি তীরে নামাইতে লাগিল। আমি ঐ-সকল জিনিষের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, আমি বাগ্‌দোরা নগরে যে-সকল জিনিষ সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিয়াছিলাম ইহার মধ্যে সেগুলিও রহিয়াছে। ঐ জিনিষগুলির উপর আমার নাম লেখা ছিল এবং আমি পোতাধ্যক্ষকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আমি জলে ডুবিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার কাছে গিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এ জিনিষগুলি কার?" জাহাজের অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "বাগদাদনগরের সিন্দবাদ নামক একজন লোক বাণিজ্য কর্‌বার ইচ্ছায় আমার জাহাজে আস্‌ছিল। এক-দিন সমুদ্রের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তিমিমাছ জলের উপর ভাস্‌ছিল। তাকে দেখে সিন্দবাদ আর জাহাজের আর কতকগুলি লোক দ্বীপ মনে করে ঐ মাছের উপর নেমে রান্নাবান্না কর্‌তে লাগ্‌ল। পরে আগুনের তাপ লেগে ঐ মাছ হঠাৎ জলে ডুবে যাওয়াতে অনেক লোক মারা গেল। তার মধ্যে সিন্দবাদও ছিল। এই-সব বাণিজ্যের জিনিষ সেই সিন্দবাদের, সুতরাং এই-সব জিনিষ বিক্রী করে যা লাভ হবে, তা আমি সিন্দবাদের পরিবারদের দেবো ঠিক করেছি।"

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আপনি যে সিন্দবাদকে মারা গিয়েছে বলে ঠিক করেছেন আমিই সেই সিন্দবাদ, আর এই-সব জিনিষ আমার।" পোতাধ্যক্ষ কোন-রকমেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, আমি একজন জুয়াচোর। তখন যে-রকমে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল এবং যে-রকমে আমার মহীরাজ রাজার সহীসদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি তাহাদের সাহায্যে রাজার কাছে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আগা-গোড়া সব তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিলাম। ইহাতেও তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু জাহাজের লোকেরা আমাকে জীবিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করাতে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি নিজে আমাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, "তুমি যে সৌভাগ্যক্রমে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ এর জন্যে আমি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন সব জিনিষ তোমার, তুমি এগুলি নাও। আমি ঐ-সমস্ত জিনিষের মধ্যে যেগুলি বিশেষ দামী ছিল সেগুলি লইয়া মহীরাজ রাজাকে উপহার দিলাম। রাজা সেগুলি লইয়া আমাকে অনেক টাকা দিলেন। তারপর আমি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া ও আমার নানা জিনিষের বদলে সেই দেশের ভাল ভাল জিনিষপত্র লইয়া ঐ জাহাজে চড়িলাম। পথে আসিতে আসিতে অনেক দ্বীপে বাণিজ্য করাতে, আমার একলক্ষ মোহর লাভ হইল। আমি সেই-সমস্ত টাকা লইয়া বাড়ী আসিলাম। অনেক দিনের পর আমার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তখন আমি আগেকার সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া পরম সুখে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাইবার জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা তৈয়ারি করিয়া নিজের জন্য অনেক দাসদাসী রাখিলাম

সিন্দবাদ এই গল্প শেষ করিয়া একশ মোহরের একটি তোড়া আনাইয়া হিন্দবাদকে কহিলেন, "হিন্দবাদ! তুমি এটা নিয়ে আজ বাড়ী ফিরে যাও। কাল সকালে আবার এখানে এসে আমার অন্যান্য গল্প শুনো।" মুটিয়া এমন সম্মান ও পুরস্কার পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

পরদিন হিন্দবাদ ভাল কাপড়চোপড় পরিয়া ঐ দাতার কাছে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তাঁহার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে খাওয়া-দাওয়ার পর সিন্ধবাদ নিজের দ্বিতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য-যাত্রা

আমি কাল আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি ঠিক করিয়াছিলাম বাগ্দাদনগরেই আমার জীবনের বাকী দিন-কটা কাটাইব। কিন্তু কিছুদিন বাড়ীতে থাকিয়াই আমার মনে এমন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল যে, আমি আর দেরী না করিয়া আবার বাণিজ্য-যাত্রার আয়োজন করিলাম। আমি তখন বাণিজ্য-দ্রব্যাদি কিনিয়া কয়েকজন বিশ্বাসী মহাজনের সঙ্গে জাহাজে চড়িয়া দ্বিতীয়বার বাহির হইলাম। পথে যাইতে যাইতে আমরা বহুদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া জিনিষ বিক্রয় করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমাদের বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। একদিন আমরা এক দ্বীপে গিয়া জাহাজ লাগাইলাম। সেখানে নানাজাতীয় ফলের গাছ দেখা গেল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেখানে একটিও মানুষ দেখিতে পাইলাম না। জাহাজের লোকেরা তীরে উঠিয়া ফলফুল তুলিবার আমোদে মত্ত রহিল, আমি সেই অবকাশে একটু সর্‌বৎ ও খাবার লইয়া এক নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার ঘুম আসাতে আমি সেই গাছের ছায়ায় শুইয়া পড়িলাম। আমি কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া ছিলাম, তাহা এখন বলিতে পারি না। কিন্তু ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম জাহাজ চলিয়া গিয়াছে।

জাহাজ চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। আমি উঠিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজনকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে সমুদ্রের দিকে চোখ পড়াতে দেখিতে পাইলাম, জাহাজ পাল উড়াইয়া এতদূর গিয়াছে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা চোখের আড়াল হইবে। তখন আমার মন কেমন নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল, তাহা আপনারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। আমি অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এক প্রকাণ্ড গাছে চড়িয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। সমুদ্রের

দিকে চাহিয়া নীল জল ও আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পরে ডাঙার দিকে চাহিয়া কিছু দূরে একটা শাদা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া আমি তখনই গাছ হইতে নামিয়া যে-কিছু খাবার বাকী ছিল তাহা লইয়া ঐ শাদা জিনিষটার দিকে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন তাহার কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম তাহার চেহারা একটা প্রকাণ্ড জালার মত এবং তাহার উপরটা অত্যন্ত মসৃণ। যদি তাহার ভিতর ঢুকিবার কোনো দরজা থাকে এই আশায় আমি তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনো দিকেই দরজা দেখিতে পাইলাম না, এবং তাহার উপরটা এত পিচ্ছিল যে, কোনমতে তাহার উপরে উঠিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সূর্য্য ডুবিয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ আকাশ ঘন মেঘে ঢাকিয়া গেলে যেমন হয়, সেই-রকম ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। হঠাৎ এমন গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া উপর দিকে তাকাইলাম। তাহাতে দেখিতে পাইলাম এক প্রকাণ্ড পাখী পাখা ছড়াইয়া আমার মাথার উপরে ঘুরিতেছে। তাহারই প্রশস্ত পাখার ছায়ায় সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যাওয়াতে চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। আমি নাবিকদিগের মুখে শুনিয়াছিলাম রক নামে এক প্রকাণ্ড পাখী আছে। সম্প্রতি ঐ পাখীকে দেখিয়া আমি আন্দাজ করিলাম উহাই রকপাখী হইবে। আর শাদা প্রকাণ্ড জালার মত যে জিনিষটা দেখিতেছি তাহা ইহার ডিম হইবে। এই ঠিক করিয়া আমি ঐ ডিমের তলায় লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ পাখী আসিয়া ডিমের উপর বসিল। তাহাতে আমি দেখিলাম উহার পা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মত মোটা।

তাহা দেখিয়া আমি নিজের পাগ্‌ড়ীর কাপড়ে নিজেকে পাখীর পায়ের সঙ্গে এই মত ভাবে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিলাম যে, পরদিন সকালে যখন ঐ পাখী উড়িয়া যাইবে, তখন সে আমাকেও আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাতে আমার এই নির্জ্জন জায়গা হইতে উদ্ধার লাভ হইবে এবং হয়ত কোনো লোকালয়ে গিয়া উপস্থিত হইতেও পারিব। বাস্তবিক পরদিন সকালে ঐ পাখী আমাকে লইয়া আকাশে উড়িল এবং ক্রমশ এত উঁচুতে উঠিল যে, সেখান হইতে আমি আর পৃথিবীকে দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ এমন জোরে নীচে নামিতে লাগিল যে, আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তারপর ঐ পাখী যখন মাটিতে নামিল তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার জ্ঞান হওয়াতে আমি আর দেরী না করিয়া নিজের বাঁধন খুলিয়া দিলাম। তখনই পাখী একটা প্রকাণ্ড সাপকে মুখে করিয়া সেখান হইতে উড়িয়া গেল

ঐ পাখী যেখানে আমাকে ফেলিয়া গেল সে এক প্রকাণ্ড গুহা, এবং তাহার চারিদিক খাড়া পাহাড়ে এমনভাবে ঘেরা যে, সে-সকল পার হইয়া অন্য জায়গায় যাওয়া খুবই কঠিন। সুতরাং এর আগে আমি যে বিজন দ্বীপে ছিলাম সেখান হইতে এই নূতন জায়গায় আসাতে আমার কিছুমাত্র সুবিধা হইল না। সে যাহা হউক, আমি ঐ গুহায় মধ্যে বেড়াইতে

বেড়াইতে দেখিলাম সেখানে অসংখ্য হীরা রহিয়াছে, তাহার এক-একখান এত বড় যে সে-রকম হীরা কখনও কোথাও মানুষের চোখে পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহা দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। কিন্তু সে-আনন্দ অল্পক্ষণই রহিল। কেননা তখনই গুহার মধ্যে হাজার হাজার অজগর সাপ দেখিয়া আমার মনে ভয়ানক ভয় জন্মিল।

গুহার মধ্যে হাজার হাজার অজগর সাপ—

ঐসকল সাপ এত লম্বা ও মোটা যে তাহার মধ্যে যেগুলা নিতান্ত ছোট সেগুলাও একটা প্রকাণ্ড হাতীকে অনায়াসে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে পারে। রকপাখী ঐ-সকল সাপের পরম শত্রু। এজন্য সাপগুলা দিনের বেলা ভয়ে আপন আপন গর্ত্তে লুকাইয়া থাকিত। রাত্রি হইলে খাবার খুঁজিবার জন্য গর্ত্ত হইতে বাহির হইত।

অনেকক্ষণ একলা গর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া ক্রমে আমার শ্রান্তিবোধ হইল। তাহাতে বিশ্রাম করিবার জন্য এক জায়গায় বসিলাম, এবং নিজের সঙ্গে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহা হইতে কিছু খাইলাম। ক্রমশ আমার ঘুম আসাতে আমি সেইখানে শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু সবেমাত্র চোখ বুজিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ ভয়ানক শব্দ করিয়া একটা জিনিষ আমার কাছে পড়াতে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমি চোখ খুলিয়া দেখিলাম সাম্‌নে একখান মাংসের টুক্‌রা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য জায়গায়ও সেই-রকম মাংসের টুক্‌রা পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহার আগে যখন আমি নাবিক ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনিতাম, হীরায় ভরা এক পাহাড়ের গুহা আছে, হীরক-ব্যবসায়িগণ কৌশল করিয়া সেখান হইতে হীরা লইয়া আসে, তখন আমার সে-কথা উপন্যাসের মত মিথ্যা মনে হইত। কিন্তু এখন আমি তাহার প্রমাণ চোখেই দেখিলাম। যখন বাজপাখীরা চারিদিকে খানার খাবার খুঁজিতে বাহির হয় বণিক্‌রা সেই সময় গুহায় নামিতে সাহস না করিয়া নিকটের পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া সেখান হইতে বড় বড় মাংসের টুক্‌রা গুহার মধ্যে ফেলিতে থাকে। তাহাতে হীরা প্রভৃতি নানারকম, বহুমূল্য রত্ন ভাল করিয়া ঐ মাংসের টুক্‌রাতে বিঁধিয়া আঁটিয়া যায়। পরে যখন বাজপাখীরা বাচ্চাদের খাওয়াইবার জন্য ঐ সমস্ত মাংসের টুক্‌রা মুখে করিয়া পাহাড়ের চূড়ায় নিজের নিজের বাসায় যায়, তখন মহাজনগণ বিকট চীৎকার করিতে থাকে, তাহা শুনিয়া বাজপাখী ভয়ে পলাইয়া যায়। তাহার পর ব্যবসায়িগণ পাখীদের বাসায় উঠিয়া মাংসে আট্‌কান নানাজাতীয় রত্নসকল কুড়াইয়া আনে।

ঐ ভীষণ গহ্বর হইতে যে আমি কখন বাহির হইতে পারিব আমার এমন ভরসা ছিল না। সুতরাং আমি জীবনের আশায় একরকম জলাঞ্জলি দিয়া ঐ জায়গাকে নিজের কবর বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি মাংসের টুক্‌রা পড়িতে দেখিয়া আমার আবার মনে আশা হইল। তাহাতে আমি কতকগুলি বড় বড় হীরা জোগাড় করিয়া খাবার রাখিবার জন্য সঙ্গে যে থলি আনিয়াছিলাম তাহার ভিতর রাখিয়া দিলাম। তার পরে হীরকপূর্ণ থলিয়াটি কোমরে বাঁধিয়া এবং একটা বড় মাংসের টুক্‌রা পাগ্‌ড়ির কাপড় দিয়া নিজের পিঠে বাঁধিয়া উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। একটু পরেই দলে দলে বাজপাখী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রত্যেকে এক এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড পাখী আসিয়া আমার পিঠে বাঁধা মাংসপিণ্ডের সঙ্গে আমাকে মুখে তুলিয়া ঐ পাহাড়ের চূড়ায় আপন বাসায় গিয়া হাজির হইল। এমন সময় বণিকগণ বিকট চীৎকার করিয়া পাখীকে তাড়াইয়া দিয়া রত্ন কুড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি যে বাসায় ছিলাম এক ব্যক্তি সেখানে উঠিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমে খুব ভয় পাইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ভয় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু আমি কে এবং কি করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি যে তাহার হীরা চুরি করিয়াছি, এই বিষয় লইয়া সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম,

"তুমি তার জন্যে ভেবো না, আমার কাছে এত হীরা আছে যে, আমাদের দুজনের যথেষ্ট হবে, এবং সেগুলি এমন সুন্দর যে তোমার সঙ্গের ব্যাপারীরা তেমন হীরা কখনও চোখেও দেখেনি।" এই কথা বলিয়া আমি তাহাকে সেই-সব হীরক দেখাইতেছি, এমন সময়

আমি যে-বাসায় ছিলাম এক ব্যক্তি সেখানে উঠিয়া আমাকে
দেখিয়া প্রথমে খুব ভয় পাইল

অন্যান্য ব্যবসায়িগণ আমাকে সেইখানে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইল, এবং যখন তাহারা আমার কথা শুনিল, তখন তাহাদিগের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

তখন রত্নব্যাপারীগণ আমাকে নিজেদের বাড়ী লইয়া গেল। সেখানে আমি থলি হইতে হীরাগুলি বাহির করিয়া তাহাদিগের সাম্‌নে রাখিলে, তাহারা সেগুলির আকার দেখিয়া

অবাক্ হইয়া সকলে একবাক্যে বলিল, "আমরা অনেক রাজার কাছে যাওয়া-আসা করেছি, কিন্তু কোনো রাজভাণ্ডারেই এমন সুন্দর হীরা দেখিনি।" ক্রমাগত কয়েক দিন রত্নব্যাপারী-গণ গুহার মধ্যে মাংসপিণ্ড ফেলিয়া হীরা তুলিবার পর, পরদিন সকালে তাহারা সকলে দেশে ফিরিয়া চলিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। পথের মধ্যে আমাদের অনেক উঁচু পাহাড়ের ধার দিয়া যাইতে হইল। ঐ-সমস্ত পাহাড় অসংখ্য অজগর সাপে ভরা। সৌভাগ্যক্রমে যাইবার সময় আমাদের কোনো বিপদ্ ঘটে নাই। তারপর আমরা এক বন্দরে যাইয়া জাহাজে চড়িয়া এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনেক কর্পূরের গাছ দেখিলাম। ঐ গাছ অত্যন্ত উঁচু এবং তাহার ডালপালা এমন ঘন যে তাহার তলায় বসিয়া একশ লোক অনায়াসে বিশ্রাম করিতে পারে। কর্পূর তৈয়ারী করিবার জন্য ঐ গাছের উপরে একটি ছেঁদা করিয়া তাহার নীচে একটা পাত্র রাখিতে হয়। তাহাতে ছেঁদা দিয়া গাছের রস পড়ে। ক্রমে ঐ রস ঘন হইলে কর্পূর জন্মে। এইরূপে যখন গাছ একেবারে নীরস হয়, তখন তাহা শুকাইয়া মরিয়া যায়। ফিরিবার সময়েও আমি এই-রকম নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ দেখিলাম। সে যাহা হউক, আমি ঐ দ্বীপে কয়েকখানা হীরা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে সেই দেশের ভাল ভাল বাণিজ্যের জিনিষ কিনিয়া অনেক জায়গা ঘুরিয়া বালসোরা নগরে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে বাগ্দাদনগরে নিজের অট্টালিকায় আসিয়া গরীব দুঃখীকে অনেক দান করিয়া বহুকষ্টে উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য লইয়া পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

এইরূপে সিন্দবাদ নিজের দ্বিতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথা শেষ করিয়া হিন্দবাদকে আর একশ মোহর দিয়া বলিলেন, "তুমি কাল এসে আমার তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার বিবরণ শুনো।"

পরদিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য লোকেরা ঠিক সময়ে সেখানে আসিয়া জুটিলে, সিন্দবাদ্ এইরূপে নিজের তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রা

প্রথম ও দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রায় আমি যে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, কিছুদিন বাড়ীতে সুখে কাটাইয়াই আমি তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং অল্পবয়সে একেবারে অলস হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হওয়াতে, আমি আর কোনো বিপদকেই ভয় করিব না মনে মনে এইরূপ ঠিক করিয়া দেশের ভাল ভাল বাণিজ্য-দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বাগ্দাদনগর হইতে বালসোরানগরে গেলাম। সেখানে অন্যান্য মহাজনের সঙ্গে

জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া অনেক বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলাম। একদিন হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে এক প্রবল ঝড় ওঠাতে আমাদিগের জাহাজ ভুল পথে চলিল। ঐ ঝড় কয়েক দিন পর্য্যন্ত সমান থাকাতে জাহাজ এক দ্বীপের বন্দরে গিয়া পড়িল। সেখানে জাহাজ লাগান হয়, পোতাধ্যক্ষের এরূপ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু অন্য উপায় না থাকাতে তিনি সেইস্থানে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ নঙ্গর করা হইলে পর তিনি বলিলেন, "এই দ্বীপে আর এর কাছেরই কয়েকটি দ্বীপে একরকম লোমওয়ালা অসভ্য জাতি থাকে, তাহারা এই মুহূর্তে এসে আমাদের আক্রমণ করবে : তারা যদিও দেখ্‌তে অত্যন্ত বেঁটে, তবুও তারা এমনি বলবান্ যে, আমরা তাদের কিছুতেই বাধা দিতে পারব না। তারা পঙ্গপালের মত অসংখ্য, এবং যদি তাদের মধ্যে একজনও আমাদের হাতে মারা যায় তা হলে তারা একেবারে সকলে এসে আমাদের মেরে ফেল্‌বে।"

জাহাজের অধ্যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া জাহাজের সমস্ত লোক ভয়ে মরার মত হইল। বাস্তবিক তিনি যাহা বলিলেন তাহাই ঘটিল। একটু পরেই লাল্‌চে রংএর লোমওয়ালা অসভ্য মানুষের দল পঙ্গপালের মত দল বাঁধিয়া সাঁতার দিয়া এমন তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। আমরা নিজের চোখে এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম, ভয়ে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে একটিও কথা বলিতে সাহসী হইলাম না। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা আমাদিগের জাহাজের পাল খুলিয়া দিল, এবং কাছি কাটিয়া দিল। শেষে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া আপনারা যে-দিক্ হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে জাহাজ লইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে আমরা একেবারে নিরুপায় হইয়া ঐ দ্বীপের উপর গিয়া উঠিলাম। সেখানে আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী অনেকরকম ফলমূল দেখিয়া মনে একটু ভরসা হইল। পরে আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা অনেক দূরে এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা তাহার কাছে আসিয়া দেখিলাম যে, সেটি একটি খুব বড় এবং সুন্দর রাজপ্রাসাদ। তাহার বাহিরের দরজা দামী সুগন্ধি কাঠের তৈয়ারী। আমরা দরজা খুলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া উঠানে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম সাম্‌নের বারান্দার নীচে একটি প্রকাণ্ড মহল রহিয়াছে। তাহার একদিকে রাশি রাশি মানুষের হাড় ও অন্যদিকে মাংস পোড়াইবার জন্য অনেক লোহার শিক সাজানো আছে। তাহা দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ানক ভয় হইল। একটু পরেই বারান্দার ভিতর হইতে ঐ ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া তালগাছের মত লম্বা ভীষণমূর্ত্তি কালো রংএর এক রাক্ষস বাহির হইয়া আসিল। তাহার কপালে জ্বলন্ত আগুনের মত একটিমাত্র চোখ জ্বলিতেছিল। দাঁতগুলি ধারালো ও এমন বড় যে, তাহার প্রকাণ্ড মুখেও সেগুলা জায়গা না পাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঠোঁট বুক

পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। কানছটো হাতীর কানের মত তাহার কাঁধ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। এবং নখগুলা পাখীর নখের মত লম্বা ও বাঁকা। ঐ রাক্ষসকে দেখিবামাত্র আমরা ভয়ে মূর্চ্ছা গেলাম।

জ্ঞান হইলে দেখিলাম সে বারান্দার নীচে বসিয়া আমাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সে কাছে আসিয়া ঘাড় ধরিয়া আমাকে তুলিল, কিন্তু আমাকে অত্যন্ত রোগা

রাক্ষসকে দেখিবামাত্র আমরা ভয়ে মূর্চ্ছা গেলাম

দেখিয়া ফেলিয়া দিল। পরে সে একে একে আর-সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। জাহাজাধ্যক্ষকে সবার চেয়ে মোটা দেখিয়া এক হাতে তাঁহাকে ধরিয়া অন্য হাতে তাঁহার শরীরে একটা লোহার শিক ঢুকাইয়া দিল। তারপরে তাঁহাকে আগুনে পোড়াইয়া খাইয়া ফেলিল। খাওয়ার পর সে সেইখানে শুইয়া মেঘডাকার মত ভয়ঙ্কর নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল। আমরা সমস্ত রাত্রি মড়ার মত হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলাম। কেহ

কাহারও সঙ্গে কথা বলি, আমাদের এমন সাহস হইল না। রাক্ষস সকালে উঠিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। ক্রমে যখন আমরা মনে করিলাম সে-জায়গা হইতে সে অনেক দূরে গিয়াছে তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সকলে একেবারে হাহাকার করিয়া আমাদের দুর্দশার জন্য কাঁদিতে লাগিলাম। একটু পরে ধৈর্য্য ধরিয়া রাক্ষসের হাত হইতে নিজেদের কি উপায়ে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তায় আমরা সমস্ত দিন কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা হইতে পারে তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা হইলে রাক্ষস আবার আসিয়া আমাদের মধ্য হইতে আর-একজনকে সেইরূপে পোড়াইয়া খাইয়া ফেলিল, এবং সমস্ত রাত্রি আগের মত ঘুমাইয়া থাকিয়া সকালে উঠিয়া সেখান হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া গেল।

এই ভীষণ দশা হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আমি মনে মনে একটি উপায় ঠিক্ করিয়া আমার সঙ্গীদের বলিলাম, "ভাইসব! যদি তোমরা আমার কথামত কাজ কর্‌তে ইচ্ছা কর, তা হলে আমি তোমাদের একটি সৎপরামর্শ দি। আমরা সকলেই সমুদ্রের তীরে অনেক বাহাদুরী কাঠ দেখেছি। এস আমরা ঐ-সকল কাঠ দিয়ে কয়েকখানি ছোট নৌকা তৈরি করে জলে ভাসিয়ে রাখি। আর আমাদের দুরন্ত শত্রুকে মার্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। যদি ঈশ্বরের দয়ায় আমরা তাতে সফল হই তা হলে আমরা ধৈর্য্য ধরে এই দ্বীপে আরও কিছুদিন থাক্‌ব। পরে কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ গেলে আমরা সেই নৌকায় চড়ে এই ভয়ঙ্কর দ্বীপ থেকে পালাব। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুকে মার্‌তে না পারি, তা হলে আর দেরী না করে নৌকা চড়ে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কর্‌ব। তাতে যদি নিতান্তই আমাদের জলে ডুবে মর্‌তে হয়, তাও আমার বিবেচনায় এই দুষ্ট রাক্ষসের পেটে যাওয়ার চেয়ে হাজারগুণে ভাল।" আমার এই উপদেশ সকলের ভাল মনে হওয়াতে আমরা সমুদ্রতীরে যাইয়া কয়েকখানি এমন ছোট নৌকা তৈয়ারী করিয়া রাখিলাম যে, তাহার প্রত্যেকখানিতে একেবারে তিনজন চড়িতে পারে

দিনশেষে আমরা আবার ঐ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ রাক্ষস আসিয়া আমাদের আর-একজন সঙ্গীকে সেইরূপে খাইয়া ঘুমাইতে গেল। রাক্ষস যখন খুব ঘুমাইতেছে তখন আমি ও আমার আটজন সঙ্গী প্রত্যেকে এক-একটা লোহার শলা আগুনে গরম করিয়া সকলে একেবারে সাহস করিয়া কাছে গিয়া তাহার চোখে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া গেল। তখন ঐ রাক্ষস চোখের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে করিতে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া আমাদের ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই ধরিতে না পারিয়া দরজা হাতড়াইয়া বাহির করিয়া ভীষণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল। আমরা ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসের পিছন পিছন যাইয়া ক্রমে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম এবং ছোট নৌকাগুলি জলে ভাসাইয়া রাখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি সকাল পর্য্যন্ত রাক্ষস আমাদের কাছে

ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে সে মরিয়া গিয়াছে এই স্থির করিয়া আমরা ঐ দ্বীপে আর কিছুদিনের জন্য থাকিব। কিন্তু রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতেই ঐরূপ ভীষণচেহারা আর দুইটা রাক্ষসের হাত ধরিয়া সেই রাক্ষস আসিতেছে এবং তাহার পিছন পিছন অসংখ্য রাক্ষস ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমরা এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তখনই নৌকায় চড়িয়া দাঁড় বাহিয়া তীর হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রাক্ষসগণ তাই দেখিয়া তীরের দিকে দৌড়িয়া আসিল এবং বড় বড় পাথর তুলিয়া আমাদের নৌকা লক্ষ্য করিয়া এমন জোরে ছুড়িতে লাগিল যে, তাহাতে আমি এবং আমার দুই সঙ্গী যে নৌকায় ছিলাম তাহা ছাড়া আর সমস্ত নৌকাই জলে ডুবিয়া গেল। আমরা প্রাণপণে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিয়া সৌভাগ্যক্রমে পরদিন সকালে আর-এক দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন তিনজনে খুসী হইয়া তীরে উঠিয়া সেখানকার ভাল ভাল ফল খাইয়া স্বাভাবিক বল পাইলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে আমরা ক্লান্ত ছিলাম বলিয়া অন্য স্থানে না যাইয়া সমুদ্র-তীরেই শুইয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ হওয়াতে আমরা চোখ খুলিয়া দেখিলাম তালগাছের মত একটা সাপ গর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের কাছে আসিয়া আমার একজন সঙ্গীকে ধরিল। আমার সঙ্গী সাপের মুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া শেষে করুণস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাপ তাঁহাকে দুই-তিনবার মাটিতে আছড়াইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া তখনই সেইখান হইতে দূরে পলাইলাম।

পরদিন আমরা দুজনে ঐ দ্বীপে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা উঁচু গাছ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর উঠিয়া নিরাপদে রাত্রি কাটাইব ঠিক করিলাম। কিছু ফলমূল খাইয়া সন্ধ্যাকালে ঐ গাছে উঠিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ ভীষণ সাপ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া গাছে চড়িয়া আমার সঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া হাঁ করিয়া তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি গাছের খুব উঁচু ডালে বসিয়াছিলাম। সুতরাং সাপটা আমাকে দেখিতে না পাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত ঐ গাছে থাকিয়া সকালে আধমরা হইয়া গাছ হইতে মাটিতে নামিলাম কিন্তু নিজের চোখে সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া আমাকেও সেইরূপে মরিতে হইবে ইহা ঠিক করিয়া আমি জীবনের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদ্রে পড়িয়া মরিতে গেলাম। কিন্তু মানুষের স্বভাবতঃ জীবনের প্রতি এমন মমতা যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। সুতরাং আমি পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া আর মরিতে চেষ্টা করিলাম না। পরে আমি রাশি রাশি কাঠ ও শুক্‌নো ঘাস আনিয়া গাছের চারিদিকে রাখিলাম, এবং রাত্রি হইলে তাহাতে আগুন লাগাইয়া আমি গাছে চড়িয়া থাকিলাম। নিয়মিত সময়ে সাপ আসিয়া আমাকে গিলিবার জন্য গাছের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু আগুনের দুর্গের মধ্যে কিছুতেই

ঢুকিতে না পারিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে থাকিয়া সকালে সেখান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

যখন সূর্য্য উঠিল, তখন আমার মনে একটু ভরসা হইল। তাহাতে আমি গাছ হইতে নামিলাম। কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমি যে-প্রকার ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলাম, তাহাতে

ঐ ভীষণ সাপ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া গাছে চড়িয়া হাঁ করিয়া তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিল

মরণই আমার ভাল মনে হইতেছিল। সুতরাং আমি জীবনের মায়া ছাড়িয়া আগের দিনের মত মরিবার ইচ্ছায় সমুদ্রতীরে গেলাম। কিন্তু জীবগণের প্রতি ঈশ্বরের কি অসীম দয়া যে আমি তীরে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম অনেক দূরে সমুদ্র দিয়া একখান জাহাজ

পালভরে যাইতেছে। তাহা দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া নাবিকগণকে ডাকিতে লাগিলাম, এবং পাছে তাহারা আমায় না দেখিতে পায় এই ভয়ে আমি পাগ্‌ড়ির কাপড় খুলিয়া উড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ করাতে জাহাজের লোকেরা আমাকে দেখিতে পাইল, এবং পোতাধ্যক্ষ আমাকে উঠাইয়া লইবার জন্য একখানা ছোট নৌকা পাঠাইয়া দিলেন। আমি নৌকা করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইবামাত্র মহাজন ও নাবিকগণ আমার চারিদিকে আসিয়া ঐ নির্জ্জন দ্বীপে আমি কি করিয়া আসিয়াছিলাম তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কিছু না লুকাইয়া তাহাদিগের কাছে আগাগোড়া নিজের কাহিনী বর্ণন করিলাম।

যে-সকল বিষম বিপদ্ হইতে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, সেই-সকল বিপদের কথা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত অবাক্ হইল। কিন্তু সেই-সমস্ত বিপদ্ হইতে যে আমি উদ্ধার পাইয়াছি তাহার জন্য তাহারা খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। পরে তাহারা খাইবার জন্য আমাকে অনেক ভাল ভাল খাবার দিল। জাহাজের অধ্যক্ষ একজন দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি আমাকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতে দেখিয়া দয়া করিয়া নিজের একখানি কাপড় আমাকে দিলেন। কিছুকাল জাহাজে থাকিয়া শেষে আমরা সলাবত নামক দ্বীপে পৌঁছিলাম। সেখানে জাহাজ নঙ্গর হইলে পর ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিবার ইচ্ছায় জাহাজ হইতে নিজের নিজের জিনিষ নামাইতে আরম্ভ করিলেন। জাহাজাধ্যক্ষ আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "ভাই! এই জাহাজে এক মহাজন এসেছিলেন। কিছুদিন হল তিনি মারা গিয়েছেন। তাঁর কিছু জিনিষ আমার জাহাজে আছে, সেগুলি বিক্রী করে যে টাকা পাব তা আমি তাঁর পরিবারকে দেব ঠিক করেছি। অতএব যদি তুমি ঐ সমস্ত জিনিষ বিক্রী করে দেবার জন্যে একটু কষ্ট কর, তা হলে আমি তোমাকে উচিত দস্তুরী দেব।" তিনি ঐসকল জিনিষ আমার হাতে দেওয়াতে আমি তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। কারণ একেবারে অলস হইয়া থাকা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম। জাহাজের মুহুরি প্রত্যেক মহাজনের নাম ও বাণিজ্যের জিনিষের নাম লিখিয়া একখানি ফর্দ্দ করিল। আমার হাতে যে-সমস্ত জিনিষ দেওয়া হইল সে-সমস্ত জিনিষের আসল মালিক কে, মুহুরি এই বিষয় জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনি কহিলেন, "এ-সমস্ত জিনিষ সিন্দবাদ নাবিকের।"

জাহাজের অধ্যক্ষের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র আমি অত্যন্ত অবাক্ হইলাম। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখ দেখিয়া জানিতে পারিলাম, যাঁহার জাহাজে চড়িয়া আমি দ্বিতীয়বার বাণিজ্য-যাত্রা করিয়াছিলাম এবং যিনি আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এক দ্বীপে ফেলিয়া জাহাজ খুলিয়া চলিয়া যান, ইনিই সেই ব্যক্তি। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মহাশয়! এই-সমস্ত জিনিষের মালিকের নাম কি সিন্দবাদ?" জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, "হাঁ। ঐ ব্যক্তির নাম সিন্দবাদ। সিন্দবাদের বাড়ী বাগ্দাদনগরে। তিনি সেখান থেকে বালশোরায়

এসে আমার জাহাজে চড়েছিলেন। পথে একদিন আমাদের অত্যন্ত জলের অভাব হওয়াতে আমরা এক দ্বীপে জাহাজ লাগিয়ে সেখান থেকে জল তুলে নিচ্ছিলাম। জাহাজের লোকেরা দ্বীপ দেখ্‌বার জন্যে তীরে উঠে আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছিল। তারপর যখন আমরা ভাল বাতাস পেয়ে সেখান থেকে জাহাজ খুলে দিলাম, তখন অন্যান্য যাত্রীরা জাহাজে এসে উঠ্‌ল, কিন্তু সিন্দবাদ এল না। আমি অমনোযোগী হওয়াতে সে সময় তা দেখ্‌তে পাইনি। যাত্রীরাও কেউ তা লক্ষ্য করেনি। শেষে যখন জাহাজ বহুদূর চলে এসেছে, তখন জান্‌তে পার্‌লাম যে, আমি সিন্দবাদকে ঐ দ্বীপে ফেলে এসেছি। তখন জান্‌তে পেরেও আমি কিছুই উপায় কর্‌তে পার্‌লাম না।"

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি আপনি মনে করেন যে, সিন্দবাদ মরে গিয়েছে?" জাহাজের অধ্যক্ষ কহিলেন, "হাঁ, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কি?" তখন আমি বলিলাম, "না মহাশয়, সিন্দবাদ আজও বেঁচে আছে! আপনি আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমিই সেই সিন্দবাদ: আমাকেই আপনি সেই বনজঙ্গলে-ভরা দ্বীপে ফেলে এসেছিলেন।" এই-কথা শুনিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ মনোযোগ দিয়া আমার মুখ দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে চিনিতে পারিয়া জড়াইয়া ধরিলেন, এবং খুব আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর ধন্য, এতদিনের পর আমি দোষ থেকে রক্ষা পেলাম। এখন তুমি নিজের জিনিষ নাও। আমি এতদিন পর্য্যন্ত এগুলি খুব যত্ন করে রক্ষা করেছি, এবং যাতে এই-সব জিনিষ বেচে খুব লাভ হয়, সেদিকেও বেশ মনোযোগী ছিলাম।" এই-সকল কথা বলিয়া লাভসমেত অনেক টাকা ও ঐ-সব জিনিষ আমার হাতে দিলেন। আমি পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সলাবত দ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে বাণিজ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে অনেক দিন সমুদ্র-পথে ঘুরিয়া শেষে অজস্র টাকা লইয়া বাল্‌শোরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে সেখান হইতে বাগ্দাদনগরে নিজের বাড়ীতে আসিয়া দীন দুঃখী অনাথগণকে অনেক টাকা দান করিয়া পরমসুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

এইরূপে সিন্দবাদ তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার কথা শেষ করিয়া হিন্দবাদকে আর এক-শ' মোহর দিয়া তাহাকে পরদিন আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন হিন্দবাদ ও আর আর বন্ধুগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সিন্দবাদ খাওয়া-দাওয়ার পর তাহাদিগের কাছে নিজের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্রা

তৃতীয় বাণিজ্য-যাত্রার পর আমি বাড়ী আসিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। দেশে দেশে ঘুরিয়া নূতন নূতন জিনিষ দেখিবার ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিল। অতএব আমি নিজের সম্পত্তি প্রভৃতির একটা বন্দোবস্ত করিয়া যে যে জায়গায় বাণিজ্য করিতে যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, সেইসকল জায়গায় দরকারী, এমন জিনিস কিনিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ, আমি পারস্য দেশের নানা জায়গা ঘুরিয়া শেষে সেই দেশের এক বন্দরে গিয়া জাহাজে চড়িলাম। কিছুদিনের পর সমুদ্রে একদিন হঠাৎ একটা ঝড় উঠিল। তাহা দেখিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ প্রাণপণে জাহাজ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে জাহাজের পাল টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। শেষে জাহাজ ভয়ানক জোরে এক পাহাড়ে লাগিয়া ভাঙিয়া গেল। তাহাতে প্রায় জাহাজের সমস্ত লোক জিনিষপত্রের সঙ্গে একেবারে ডুবিয়া গেল। কপালগুণে আমি আর কয়েকজন লোক জাহাজের একখানা তক্তা পাইয়া তাহা ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে কাছের এক দ্বীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ দ্বীপে খাইবার উপযুক্ত মিষ্ট ফল ও পানের উপযুক্ত পরিষ্কার জল পাইয়া আমরা তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিলাম। পরে রাত্রি হইলে সমুদ্র-তীরে যাইয়া শুইয়া রহিলাম।

পরদিন সূর্য্য উঠিবামাত্র আমরা সেখান হইতে উঠিয়া ঐ দ্বীপের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম দূরে কতকগুলি ঘর রহিয়াছে। ঘর দেখিবামাত্র আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন ঐসকল ঘরের কাছে আসিলাম, তখন হঠাৎ অনেকগুলা অসভ্য কাফ্রি আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং আপনাদিগের মধ্যে আমাদিগকে ভাগ করিয়া প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। আমি ও আর পাঁচজন সঙ্গী একজনের অংশে পড়িয়াছিলাম। ঐ লোকটা আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া এক লতা খাইতে দিল। আমার সঙ্গীগণের ক্ষুধা পাইয়াছিল; তাহারা নির্ভয়ে তাহা আগ্রহ করিয়া খাইল। কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমি একটুও খাইলাম না। তাহাতে আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইল; কারণ, সঙ্গীগণ ঐ লতা খাইয়া পাগলের মত হইয়া একেবারে জ্ঞান হারাইল। পরে কাফ্রিরা নারিকেল তেলে ভাত সিদ্ধ করিয়া আমাদিগকে খাইতে দিল। আমার সঙ্গীরা পাগলের মত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা খুব করিয়া সেই ভাত খাইল। আমি যদিও তাহা খাইলাম তবুও অতি অল্প। অসভ্যগণ এই মতলবে আমাদিগকে প্রথমে লতা খাইতে দিয়াছিল যে, তাহা খাইয়া আমরা অজ্ঞান হইব। পরে তাহারা এইজন্য আমাদিগকে তেলে সিদ্ধ ভাত খাইতে দিয়াছিল যে, তাহাতে আমরা মোটা-

মোটা হইলে তাহারা আমাদিগকে ধরিয়া খাইবে। বাস্তবিক সঙ্গীরা ভাত খাইতে খাইতে বিলক্ষণ মোটা হইল। অসভ্যগণ তাই দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া খাইয়া ফেলিল। আমার বেশ জ্ঞান ছিল, এজন্য আমি বেশী করিয়া ঐ ভাত খাইতাম না। কাজেই মোটা হওয়া দূরে থাক্, বরং সর্ব্বদা দুশ্চিন্তার জন্য অত্যন্ত রোগা হইয়াছিলাম। এ কারণে তাহারা আমাকে তখন মারিল না। আমি সেখানে আগের চেয়ে একটু বেশী স্বাধীনতা পাইলাম। ক্রমে এমন হইল যে, তাহারা আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত না। তাহাতে একদিন আমি সেখান হইতে পলাইবার বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। তারপর ক্রমাগত চলিতে চলিতে রাত্রিকালে একজায়গায় বসিয়া সঙ্গে যে খাবার আনিয়াছিলাম তাহাই খাইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইভাবে ক্রমাগত সাত দিন ঘুরিবার পর আট দিনের দিন সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময় কেবল নারিকেল ও নারিকেলের জল খাইয়া কোনো-রকমে বাঁচিয়া ছিলাম। সমুদ্রতীরে আসিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি ফর্সা মানুষ গোলমরিচ তুলিতেছে। আমি নির্ভয়ে তাহাদিগের কাছে গেলাম।

তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র কাছে আসিয়া আর্‌বী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে আর কোথা থেকে আস্‌ছ?" তাহাদিগের মুখে নিজেদের ভাষা শুনিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল, এবং যেভাবে সমুদ্রে জাহাজ ভাঙিয়া জলে ডুবিয়া শেষে বন্য কাফ্রিদের হাতে পড়ি, সব-কথাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা সকলেই শুনিয়া অবাক্ হইল। তাহাদিগের গোলমরিচ তোলা শেষ হইলে পর তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় চড়িয়া নিজেদের দ্বীপে পৌঁছিয়া আমাকে রাজার কাছে লইয়া গেল। রাজা আমার সমস্ত গল্প শুনিয়া আমার প্রতি দয়া করিলেন, এবং আমাকে পরিবার কাপড়-চোপড় দিয়া স্নেহ করিয়া কাছেই রাখিলেন। ঐ দ্বীপে অনেক লোকজনের বাস এবং সকলেই ধনী, এবং তাহার রাজধানী একটি বড় বাণিজ্যের জায়গা ছিল।

ঐ দ্বীপে একটি বিষয় দেখিয়া আমি বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম। তথায় কি রাজা, কি প্রজা সকলেই জিন ও লাগাম-হীন ঘোড়ায় চড়িত। একদিন আমি রাজার কাছে ঐ বিষয়ে কথা তোলাতে তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোনো লোকই এ-সব জিনিষের ব্যবহার জানে না।" ইহা শুনিয়া আমি তখনই একজন কারিগরের কাছে যাইয়া জিন তৈয়ারী করিবার জন্য তাহাকে জিনের নমুনা দিলাম। সে তাহা তৈয়ারী করিলে পর আমি তাহা চাম্‌ড়া ও মক্‌মলে মুড়িয়া তাহার উপর জরীর কাজ করিলাম। পরে আমি যত্ন করিয়া লাগাম ও রেকাব তৈয়ারী করিয়া রাজাকে উপহার দিলাম। রাজা এই-সকল সাজে নিজের ঘোড়াকে সাজাইয়া তাহার উপর চড়িয়া খুসী হইয়া আমাকে অনেক পুরস্কার দিলেন। এইরূপ অনেক-প্রকারে আমি রাজাকে খুসী করাতে একদিন তিনি আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন, "সিন্দবাদ! আমি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি, প্রজারাও তোমাকে তার

জন্যে বিলক্ষণ মানে। অতএব তোমাকে আমি এক বিষয়ে অনুরোধ করতে ইচ্ছা করি। তোমাকে আমার সেই অনুরোধ রক্ষা করতে হবে।" আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজ! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। যা বলতে ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে আজ্ঞা করুন।" রাজা বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি বাড়ী যাবার চিন্তা একেবারে ছেড়ে দিয়ে এইখানে বিয়ে করে চিরকাল এইখানে থাক।" আমি রাজার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তখনই তাঁহার কথায় রাজী হইলাম। তিনি দ্বীপের এক বড়-লোকের পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। ঐ যুবতীর সহিত আমার বিবাহ হইলে পর, আমরা পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

তারপর একদিন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর স্ত্রী মারা যাওয়াতে আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যাইয়া দেখিলাম, তিনি শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, "জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।" প্রতিবেশী কহিলেন, "আপনি নিতান্ত অদ্ভুত প্রার্থনা করছেন। আমি কি করে দীর্ঘজীবী হব? আজ আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কবর দেওয়া হবে। সুতরাং আমি কয়েক ঘণ্টামাত্র আর বেঁচে আছি। অনেকদিন থেকে আমাদের দেশে এইরকম নিয়ম আছে যে, স্ত্রী মারা গেলে জ্যান্ত স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে কবর দেওয়া হবে এবং স্বামী মারা গেলে জ্যান্ত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সঙ্গে কবর দেওয়া হবে। আজ পর্য্যন্ত দেশের সকলেই এই নিয়ম মেনে চলছেন, আমাকেও এই নিয়মে চলতে হবে। কাজেই মরণ আমার ঘনিয়ে এসেছে।" তিনি আমাকে এই ভীষণ নিয়মের কথা বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার প্রতিবেশী বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় লোক তাঁহার স্ত্রীকে গোর-স্থানে লইয়া যাইবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে ঐ রমণীর দেহকে নানারকম সুন্দর কাপড় ও গহনায় সাজাইল। পরে তাহা একটি সিন্দুকে করিয়া গোরস্থানে লইয়া চলিল। মৃত রমণীর স্বামী ও অন্যান্য লোকেরা পিছন পিছন যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া সকলে ধরাধরি করিয়া একখান প্রকাণ্ড পাথর তুলিল। তাহাতে দেখা গেল নীচে একটা অতি গভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। তারপর ঐ শব-পূর্ণ সিন্দুক দড়ি ধরিয়া ধীরে ধীরে গর্ত্তের ভিতর নামাইয়া দিল। পরে ঐ মৃত স্ত্রীর স্বামী নিজের বন্ধুবান্ধবগণের কাছে বিদায় লইয়া অন্য এক সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিলে, তাহারা এক পাত্রে একটু জল ও অন্য পাত্রে সাতখানি রুটি দিয়া তাঁহাকেও সেই গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এইরূপে মৃতের সৎকার শেষ হইলে সকলে পাথর দিয়া গর্ত্তের মুখ আবার চাপা দিয়া সেখান হইতে বাড়ী চলিয়া আসিল।

এই ভয়ানক ব্যাপার নিজের চোখে দেখিয়া আমি ভয়ে, বিস্ময়ে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া রাজাকে বলিলাম, "মহারাজ! মরার সঙ্গে জ্যান্ত মানুষকে পুঁতে ফেলা হয়, আপনার রাজ্যে এ কি অদ্ভুত নিয়ম। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন বিশ্রী নিয়ম কোথাও দেখিনি।" রাজা বলিলেন, "সিন্দবাদ! এ-নিয়ম একজন লোকের জন্যে করা হয়নি, এটা দেশের

প্রচলিত নিয়ম। সুতরাং এতে দোষ কি? যদি আমার রাণী আগে মারা যান, তাহলে আমাকেও এই নিয়ম-মত মরতে হবে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহারাজ! বিদেশী-দেরও কি এই নিয়মে চল্‌তে হয়?” ভূপতি একটু হাসিয়া বলিলেন, “বিদেশী লোকেরা যদি এ দেশে বিয়ে করে তাহলে তাদেরও অবশ্য এ দেশের ব্যবস্থা-মতে কাজ কর্‌তে হবে ”

রমণীর দেহকে নানারকম সুন্দর কাপড় ও গহনায় সাজাইল

এই কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয় হইল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, যদি ভাগ্য-দোষে আমার স্ত্রী আগে মারা যায়, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? যাহা হউক, তখন নিজের মনের ভাব কাহারও কাছে না জানাইয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু তখন হইতে আমার মনের স্ফূর্ত্তি একেবারে দূর হইল। স্ত্রীর সামান্য অসুখ হইলেই তাহার মরিয়া যাইবার ভয়ে আমার বুক কাঁপিত। কিন্তু আমার এম্‌নি দুর্ভাগ্য যে কিছু-

দিনের মধ্যে আমার স্ত্রীর এমন এক শক্ত অসুখ হইল যে তাহাতেই সে মারা গেল। ইহাতে আমার মাথায় যেন একেবারে বাজ পড়িল। মানুষ-খেকো রাক্ষসের পেটে যাওয়া এবং বাঁচিয়া থাকিতেই সমাহিত হওয়া তখন আমার পক্ষে সমান ভীষণ মনে হইতে লাগিল। কিন্তু উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার কিছুমাত্র সুবিধা দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে রাজা নিজের সভাসদ্‌বর্গ ও দেশের অন্যান্য বড়লোকদের সঙ্গে সেখানে আসিয়া মৃতদেহকে ভাল করিয়া সাজাইয়া সিন্দুকের মধ্যে রাখাইলেন। পরে তাহাকে গোর দিবার জন্য সকলে সেই পাহাড়ের দিকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিজের মরণ নিশ্চিত জানিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিছন পিছন চলিলাম, এবং রাজা ও তাঁহার সঙ্গের লোকদিগকে বার বার প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি বিদেশী লোক, স্বদেশে আমার স্ত্রী ছেলেপিলে সবই আছে। আমি তাদের একমাত্র সম্বল। অতএব আপনারা দয়া করে আমাকে এ-দেশের নিয়ম-মত মেরে ফেল্‌বেন না।" কিন্তু আমার সে-সমস্ত কান্নাকাটিতে কোনো ফল হইল না; তাহাদের একজনেরও মনে দয়া হইল না। তাহারা আগে আমার স্ত্রীর দেহ গর্তের মধ্যে নামাইয়া দিয়া পরে আমাকে একটু জল ও সাতখানি রুটি দিয়া অন্য এক সিন্দুকে পূরিয়া ঐ গর্তে ফেলিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া গহ্বর ফাটাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা তাহাতে কান না দিয়া গর্তের মুখ বন্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যখন আমি গহ্বরের নীচে উপস্থিত হইলাম, তখন উপর হইতে যে একটু আলো আসিতেছিল, তাহাতে দেখিতে পাইলাম ঐ গর্ত অতি প্রকাণ্ড, এবং তাহা পাহাড়ের চূড়া হইতে প্রায় ২০০ হাত গভীর। গর্তের মধ্যভাগ অসংখ্য মৃতদেহে ভরা থাকাতে সেখানে এমন দুর্গন্ধ হইয়াছিল যে, আমি সিন্দুকের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া সেখান হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম, এবং হাত দিয়া নিজের নাক বন্ধ করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে হইল যে, গর্তের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি তখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং কাহারও কাহারও কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে। সে যাহা হউক, অনেক কান্নার পর আবার আমার বাঁচিবার আশা হইল। তাহাতে আমি হাত দিয়া নাক ঢাকিয়া ধীরে ধীরে কাছে গিয়া সিন্দুকের মধ্যে যে কয়েকখানি রুটি ছিল, তাহা হইতে একটু খাইলাম। প্রতিদিন অল্প করিয়া খাওয়াতে কয়েক দিন এক-রকম আমার চলিয়া গেল। ক্রমে রুটি ও জল শেষ হইলে আমি মরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে আমার মনে হইল, যেন কোনো জন্তু ঐ গর্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাতে আমি তখনই যেখান হইতে পায়ের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে গেলাম। আমি কাছে উপস্থিত হইবামাত্র সে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিলাম। তাহাতে সে প্রাণভয়ে জোরে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে আমি অনেক দূর তাহার পিছনে দৌড়িবার পর নক্ষত্রের মত

একটি সরু আলোর রেখা আমার চোখে পড়িল। তাহাতে আমি ঐ আলো লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন তাহার কাছে আসিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম পাহাড়ের একটা ছেঁদা দিয়া ঐ আলো আসিতেছে। ঐ ছেঁদা এমন বড় যে তাহা দিয়া একজন লোক অনায়াসে গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে পারে। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ ছেঁদা দিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, আমি সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছি। এবং আমি যে জন্তুর পিছন পিছন আসিয়াছিলাম, সে এক সামুদ্রিক জীব; মড়া খাইবার জন্য ঐ ছেঁদা দিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ইহার আগে আমার এমন আশা ছিল না যে, আমি কখনও ঐ গর্ত্ত হইতে বাহির হইতে পারিব। তাই এখন নিজেকে গহ্বরের বাহিরে দেখিয়া আমার মনে যে আনন্দ হইল তাহা আপনারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। আমি আবার রক্ষা পাইয়া জগদীশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া দেখিলাম, তাহার একদিকে নগর ও অন্যদিকে সমুদ্র। কিন্তু ঐ পাহাড় এত উঁচু ও খাড়া যে তাহা পার হইয়া নগরবাসিগণের পক্ষে সমুদ্রের তীরে যাওয়া-আসা করা একেবারে অসম্ভব। সে যাহা হউক, আমি আবার গর্ত্তে ঢুকিয়া সেখান হইতে রুটি ও জল আনিয়া অনেককালের পর পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইলাম। পরে গর্ত্তের ভিতরের মৃত লোকদের সিন্দুকে যে-সমস্ত মণি মুক্তা হীরা সোনার গহনা ও ভাল ভাল কাপড়-চোপড় ছিল সে-সব একসঙ্গে বাঁধিয়া বাহিরে আনিয়া কোনো জাহাজাদি দেখিতে পাইবার আশায় সাগরের তীরেই বসিয়া রহিলাম।

দুই-তিন দিনের পর হঠাৎ সেইখান দিয়া একখানি জাহাজ যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া জাহাজের লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলাম, এবং তাহারা আমাকে দেখিতে পায়, এই মতলবে আমি নিজের পাগড়ির কাপড় উড়াইতে লাগিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে তাহারা আমার চীৎকার শুনিতে পাইয়া আমাকে জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য একখান নৌকা পাঠাইল। আমি নিজের মোট লইয়া নৌকায় চড়িয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম। জাহাজের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আমাকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "দুইদিন হল আমাদের জাহাজ ডুবে যাওয়াতে আমি এই-সমস্ত জিনিষ নিয়ে অতি কষ্টে তীরে উঠে জাহাজ আস্‌বার আশায় বসে ছিলাম।" তাহারা এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এই বিষম বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করাতে আমি খুসী হইয়া পোতাধ্যক্ষকে কয়েকখান হীরা দিলাম। কিন্তু তিনি এমন দয়ালু লোক ছিলেন যে, কিছুতেই সেগুলি লইলেন না। পরে আমি অনেক জায়গায় বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া শেষে বাগ্‌দাদনগরে পৌঁছিলাম। বাড়ীতে আসিয়া আমি প্রথমে ঈশ্বরের করুণার জন্য ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মশালায় অনেক টাকা দিলাম। পরে গরীব দুঃখী ও অনাথদের অনেক টাকা দান করিয়া বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে সব সময় আমোদ-আহ্লাদ করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ নিজের চতুর্থ বাণিজ্য-যাত্রার কথা শেষ করিয়া হিন্দবাদকে আর একশ মোহর দিয়া পরদিন আসিয়া পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্রার গল্প শুনিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন হিন্দবাদ ও আর সকলে আসিলে খাওয়া-দাওয়ার পর সিন্দবাদ এই-প্রকার পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন।

সিন্দবাদের পঞ্চম বাণিজ্য-যাত্রা

আমি চার বারের বার বাণিজ্য করিবার পর বাড়ী আসিয়া যে সুখসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলাম, তাহাতে আগের বারের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই আবার আমার নানাদেশ ঘুরিবার ইচ্ছা হইল। তাহাতে আমি বাণিজ্যের জিনিষপত্র লইয়া এক ভাল বন্দরে গেলাম। সেখানে অন্যের জাহাজে যাইতে ইচ্ছা না করাতে নিজেই একখান জাহাজ কিনিলাম। কিন্তু নিজের জিনিষপত্রে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই না হওয়াতে আমি আর কয়েকজন মহাজনকে সঙ্গে লইয়া ভাল বাতাস দেখিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলাম।

অনেক দিন ঘুরিবার পর আমরা এক বনজঙ্গল-ভরা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে রক পাখীর একটা ডিম রহিয়াছে। ঐ ডিম সেই আগের ডিমের মত খুব বড়, এবং তাহা ফুটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন কি পাখীর ছানার ঠোঁট তাহার ভিতর হইতে একটু বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য মহাজনগণও আমার সঙ্গে তীরে উঠিয়াছিল। তাহারা পাখীর ছানা দেখিবামাত্র অস্ত্র মারিয়া তাহাকে নষ্ট করিবার জোগাড় করিল। আমি বার-বার তাহাদের এই-রকম কাজ করিতে বারণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা কিছুতেই আমার কথা না শুনিয়া তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া খাইয়া ফেলিল। তাহাদের খাওয়া শেষ হইবার আগেই আকাশে দুইখণ্ড প্রকাণ্ড মেঘ দেখা দিল। তাহা দেখিয়া একজন বুড়া নাবিক চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আকাশে ঐ যে দুই খণ্ড মেঘ দেখা যাচ্ছে ওটা বাস্তবিক মেঘ নয়। যাকে তোমরা মার্‌লে সেই ছানার বাবা আর মা। ওরা এখনি এসে নিজেদের ছানাকে দেখ্‌তে না পেলে আমাদের সকলকেই মেরে ফেল্‌বে।" এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে জাহাজে চড়িয়া তখনই সেখান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলাম। এ-দিকে পাখী-দুটি ডিমের যত কাছে আসিতে লাগিল, ততই বিকট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন দেখিল ডিম ভাঙা হইয়াছে, এবং তাহার ভিতর হইতে ছানা চুরি গিয়াছে, তখন প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছায় শীঘ্র যে-দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে উড়িয়া গেল। আমরা প্রাণভয়ে দ্বিগুণ জোরে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু একটু পরেই ঐ দুই পাখী প্রত্যেকে এক-একটা পাহাড়ের চূড়া নখে করিয়া তুলিয়া আনিয়া

আমাদের জাহাজের উপরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। একটা পক্ষী কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া একটা পাহাড়ের চূড়া জাহাজের উপর ফেলিল। কিন্তু নাবিকের কৌশলে তাহা জাহাজে না পড়িয়া এমন জোরে সমুদ্রে পড়িল যে, তাহাতে সমস্ত সাগর টল্‌মল্ করিয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য পাখীটা এমন লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ের চূড়া ফেলিল যে, তাহা ঠিক জাহাজের মাঝখানে পড়িল। তাহাতে জাহাজ তখনই চুরমার হইয়া গেল, এবং নাবিক ও সওদাগরগণ সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া একসঙ্গে ডুবিয়া গেল।

আমিও জলে ডুবিয়াছিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জাহাজের একখানি কাঠ পাইয়া তাহা ধরিয়া জলের-উপর ভাসিতে ভাসিতে বাতাস ও স্রোতের সাহায্যে এক দ্বীপের তীরে উঠিলাম। ঐ দ্বীপের পাড় অত্যন্ত উঁচু ও খাড়া ছিল। তবুও আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহার উপর উঠিলাম। কিছুক্ষণ সেইখানে বিশ্রাম করিয়া আমি দ্বীপ দেখিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, ঐ দ্বীপে পাকা ও কাঁচা ফলে ভরা নানা-রকম গাছ ও পরিষ্কার জলে ভরা অনেক পুকুর আছে। তাহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিলাম। রাত্রে আমি ঘাসে ঢাকা মাটিতে শুইয়া থাকিলাম। কিন্তু সেই অচেনা নির্জ্জন জায়গায় একলা থাকাতে আমার মনে এমন ভয় হইল যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি একবারও চোখ বুজিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, সেই ভয়ানক রাত্রি কোনোরূপে ভোর হইলে, আমি ঘাসের বিছানা হইতে উঠিয়া দ্বীপের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম এক ছোট নদীর তীরে একজন বৃদ্ধ বসিয়া রহিয়াছে। তাহার শরীর দেখিতে অতিশয় রোগা ও দুর্ব্বল। তাহাতে ভাবিলাম এ-লো··টিও আমার মত বিপদে পড়িয়া কোনো-রকমে এইখানে আসিয়া থাকিবে। আমি তাহার কাছে যাইয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। তাহাতে সে নিজের মাথা একটু নীচু করিল। পরে আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে কোনো উত্তর না দিয়া সঙ্কেতে ঐ নদীর পারে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। তাহাতে আমি তাহাকে হাঁটিতে অক্ষম মনে করিয়া নিজের পিঠে লইয়া নদী পার হইলাম। পরে যখন তাহাকে আমার পিঠ হইতে নামিতে বলিলাম, তখন ঐ পাপিষ্ঠ আমার গলার দুই পাশে পা দিয়া এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে তাহাতে আমার প্রায় শ্বাস বন্ধ হইবার জোগাড় হইল! আগে আমি তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি তাহার জোরের বিলক্ষণ পরিচয় পাইলাম। আগে তাহার শরীরের চাম্‌ড়া অতিশয় নরম মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন তাহা গরুর চাম্‌ড়ার মত কর্কশ মনে হইতে লাগিল। আমি তখন অত্যন্ত ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ তবুও আমাকে ছাড়িল না। কেবল আমার নিশ্বাস বাহির হয় এমনভাবে নিজের পা-দুখানা মাঝে মাঝে আল্‌গা করিয়া ধরিতে লাগিল। আমি নিশ্বাস ফেলিবা-মাত্র আমার পাঁজরে লাথি মারিয়া আমাকে উঠিতে সঙ্কেত করিল। আমার উঠিতে একটুও ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহার লাথির চোটে বাধ্য হইয়া অগত্যা মাটি হইতে উঠিলাম। তখন সে আমার কাঁধে উঠিয়া বনে বনে বেড়াইতে আরম্ভ করিল,

আমি তখন অত্যন্ত ভয় পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ তবুও আমাকে ছাড়িল না।

এবং মধ্যে মধ্যে নানাজাতীয় ফল তুলিয়া খাইবার জন্য লাথি মারিয়া আমাকে থামিতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। এইভাবে সে সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমাকে একবারও ছাড়িল না। রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতেও শক্ত করিয়া আমার গলা ধরিয়া রহিল। ইহাতে আমার যে কি-রকম কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

একদিন আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বনের মধ্যে কতকগুলা শুক্‌না লাউ দেখিতে পাইলাম। তাহাতে একটা বড় লাউ কুড়াইয়া তাহার ভিতরটা পরিষ্কার করিলাম এবং আঙুরের রসে তাহা ভরিয়া একটা লুকান জায়গায় রাখিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে আমি আবার ঐ জায়গায় আসিয়া সেটাকে তুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতরকার আঙুরের রস মদ হইয়াছে। তাহাতে আমি তাহা পান করিলাম। পান করিবামাত্র আমার শরীর খুব সবল হইয়া উঠিল, এবং আমি নিজের সব দুঃখ ভুলিয়া প্রফুল্লমনে তাহাকে বহিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ নিজের চোখে মদের গুণ দেখিয়া নিজে তাহা পান করিবার জন্য আমাকে সঙ্কেত করিল। আমি তখনই সেই লাউয়ের পাত্র তাহার হাতে দিলাম। ইহার আগে সে কখনও মদ খায় নাই, সুতরাং স্বাদ পাইয়া সেই মদ সমস্ত পান করিল। একটু পরেই সে মাতাল হইয়া মনের আনন্দে আমার কাঁধের উপর নাচ গান আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ নাচিবার পর সে বমি করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাহার পা-দুখান আল্‌গা হইয়া পড়িল। আমি এ-রকম সুবিধা ছাড়িতে না চাহিয়া তখনই তাহাকে জোর করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। পরে এক হাতে তাহার ঘাড় ধরিয়া আর-এক হাতে একখান বড় পাথর তুলিয়া এমন জোরে তাহার মাথায় এক ঘা লাগাইলাম যে সে তখনি মারা গেল।

এইরূপে ঐ হতভাগার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। পরে সমুদ্রের তীরে যাইয়া দেখিলাম, কয়েকজন লোক জল লইবার জন্য জাহাজ নঙ্গর করিয়া ঐ দ্বীপের উপর উঠিতেছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া এবং আমার সমস্ত কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোমাকে বেঁচে থাক্‌তে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলাম; কারণ, এ পর্য্যন্ত তুমি ছাড়া অন্য কোনো লোকই বেঁচে থাক্‌তে বুড়োর হাত থেকে রক্ষা পায়নি।" এই-কথা বলিয়া তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাদের মুখে আমার কথা শুনিয়া আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়া লইয়া সেখান হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। আমরা জাহাজে চড়িবার কিছুদিন পরে এক প্রকাণ্ড নগরের বন্দরে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং দেখিলাম ঐ নগরের সকল বাড়ীই ভাল পাথর দিয়া তৈয়ারী।

আমাদের জাহাজে যে-সকল মহাজন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীদের থাকিবার জন্য ঐ নগরে যে বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে নারিকেলব্যবসায়ী কয়েকজন লোক ছিল। তিনি তাহাদের হাতে আমাকে দিয়া তাহারা যাহাতে আমাকে নিজেদের সঙ্গী করিয়া লইয়া যায় এজন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। পরে তিনি আমাকে

বলিলেন, "তুমি সর্ব্বদা এই-সব লোকের সঙ্গে থেকো, কখনও এদের ছেড়ো না, ছাড়্‌লে তোমার বিপদ্ হবে।" এই-কথা বলিয়া তিনি আমাকে কিছু টাকাকড়ি দিয়া তাহাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমি মহাজনদের সঙ্গে এক গভীর বনে ঢুকিলাম। ঐ বনে কেবল নারিকেল-গাছ। সেই সকল গাছ এমন উঁচু ও সোজা, এবং তাহাদের গোড়া এমন পিছল যে, তাহাতে চড়িয়া ফল আনা শক্ত। বনের মধ্যে অসংখ্য বাঁদর ছিল। তাহারা আমাদের দেখিবামাত্র চট্‌পট্ গাছের আগায় গিয়া উঠিল

আমি যে-সকল মহাজনের সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলাম, তাঁহারা পাথর তুলিয়া বাঁদরগুলার দিকে ছুড়িতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমিও পাথর ফেলিয়া বাঁদরদের মারিতে লাগিলাম। তাহাতে তাহারা রাগিয়া গিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় আমাদের লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত নারিকেল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা তখনই ঐ-সকল নারিকেল তুলিয়া নিজের নিজের থলিয়ার মধ্যে রাখিতে লাগিলাম, এবং এক-একবার পাথর ছুড়িয়া বানরগণকে রাগাইতে লাগিলাম। কারণ এরূপ না করিলে সেখান হইতে ফল আনা একেবারে অসম্ভব। এইরূপে আমরা যথেষ্ট নারিকেল জোগাড় করিয়া সে-জায়গা হইতে নগরে ফিরিয়া আসিলাম। আমি যাঁহার পরামর্শে বনে নারিকেল আনিতে গিয়াছিলাম, আমার সেই পরমোপকারী বন্ধু আমার সমস্ত নারিকেল লইয়া আমাকে তাহার উচিত মূল্য দিলেন।

আমি যে জাহাজে চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম অন্যান্য মহাজনগণ তাহাতে নারিকেল বোঝাই করিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। আমার টাকার বিলক্ষণ টানাটানি ছিল। কাজেই আমি তখন তাঁহাদের সঙ্গে জাহাজে যাইতে না পারিয়া অন্য একখানি জাহাজের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আর-একখানি জাহাজ নারিকেল বোঝাই লইবার জন্য সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া আমি তখনই আমার পরম বন্ধু সেই মহাজনের কাছে বিদায় লইতে গেলাম। আমার দয়ালু বন্ধু তখনি ঐ জাহাজের ভাড়া ঠিক করিয়া দিয়া যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। আমি ঐ জাহাজে চড়িয়া অনেক দ্বীপে ঘুরিয়া নারিকেল বেচার টাকায় অনেক গোলমরিচ কিনিলাম। পরে কুমারীকা অন্তরীপে যাইয়া সেখানকার সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিবার জন্য কতকগুলি লোক লাগাইলাম। তাহাতে আমি কতকগুলি বড় ঝক্‌ঝকে মুক্তা পাইলাম। তখন আমি আনন্দিত মনে জাহাজে উঠিয়া নির্ব্বিঘ্নে বালশোরায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখান হইতে বাগ্দাদনগরে আসিয়া গোলমরিচ ও মুক্তা বিক্রয় করিয়া খুব বেশী টাকা লাভ করিলাম। তাহার দশ ভাগের এক ভাগ গরীব দুঃখী অনাথগণকে বিলাইয়া পরমসুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ নিজের গল্প শেষ করিবার পর হিন্দবাদকে আর একশ মোহর দিয়া পরদিন

আবার তাহাকে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য বন্ধুগণ সিন্দবাদের বাড়ীতে আসিলে তিনি খাওয়ার পর তাহাদের কাছে নিজের ষষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা

এক বৎসর নিশ্চিন্তভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া আমার ভারী বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহাতে আবার বাণিজ্য-যাত্রার ইচ্ছা জন্মিল। আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে বারবার বারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া আবার বাণিজ্য-যাত্রার জন্য জিনিষপত্র গুছাইয়া এক বন্দরে গিয়া জাহাজে উঠিলাম। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইবেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইল। তাহাতে জাহাজ কোন্ পথে যাইতে লাগিল কেহই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে যদিও দিক্ ঠিক করা হইল, তবুও তাহাতে সকলের মনে আনন্দ না হইয়া বরং বিলক্ষণ ভয় হইল। জাহাজের মালিক হাল ছাড়িয়া দিয়া মাথা চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমরা তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমরা যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি এ জায়গা অতি ভয়ঙ্কর। আমাদের জাহাজ ক্রমে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সকলকেই মরতে হবে।" এই কথা বলিয়া সে অন্য দিকে যাইবার জন্য জাহাজের মুখ ফিরাইল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। কারণ আমাদিগের জাহাজ দেখিতে দেখিতে এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের নীচে গিয়া পড়িল এবং একেবারে গুঁড়া হইয়া গেল। কিন্তু তখনও আমাদের আয়ু শেষ না হওয়াতে আমরা কিছু খাবার ও বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া কোনো-রকমে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলাম।

আমরা যে পাহাড়ের তলায় পড়িয়াছিলাম তাহা এক প্রকাণ্ড দ্বীপের তীরে ছিল। সেখানে অসংখ্য জাহাজের টুকরা ও রাশি-রাশি মানুষের হাড় দেখিয়া বুঝিলাম, সেখানে জাহাজ ভাঙিয়া অসংখ্য লোক মারা গিয়াছে। আরও দেখিলাম সেখানে অনেক বাণিজ্যের জিনিষ ও অসংখ্য মণিমাণিক্য চারিদিকে ছড়ানো আছে। তাহা দেখিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইতে লাগিল। অন্যান্য জায়গায় নদীসকল হ্রদ বা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া স্রোত বহিয়া অনেকদূর চলিয়া যায়, এবং শেষে সমুদ্রে গিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে দেখিলাম সুন্দর জলপূর্ণ এক প্রকাণ্ড নদী সাগর হইতে বাহির হইয়া ঘোর অন্ধকার এক প্রকাণ্ড গুহায় ঢুকিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পাহাড়ে যে-সমস্ত পাথর দেখিলাম তাহা স্ফটিক, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন

সেখানে আরও দেখিলাম এক ঝরণা হইতে ক্রমাগত আল্‌কাতরা বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, দলে দলে মাছ তাহা গিলিয়া বমি করিতেছে এবং তাহা হইতে রাশি রাশি অভ্র জন্মিতেছে। উহার আগে কুমারীকা অন্তরীপে যেমন ভাল চন্দনগাছ দেখিয়াছিলাম, এখানেও সেইরকম অনেক চন্দনগাছ দেখা গেল।

সে যাহা হউক, আমরা এই বিষম বিপদে পড়িয়া অগত্যা ঐ দ্বীপে থাকিতে লাগিলাম, এবং প্রতিদিন মারা যাইবার ভয় করিতে লাগিলাম। আমাদিগের কাছে যা-কিছু খাবার ছিল, প্রথমে তাহা সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইলাম। তাহাতে কয়েক দিনের জন্য সকলের কোনো-রকমে চলিল, ক্রমে যখন তাহা ফুরাইয়া গেল, তখন আমার সঙ্গীগণ একে-একে না খাইয়া মরিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে তাহারা সকলেই মারা গেল, কেবল আমিই একমাত্র বাকী রহিলাম। আমি যে বাঁচিয়া থাকিলাম তাহার বিশেষ কারণ এই যে, আমি রোজ খুব কম করিয়া খাইতাম এবং সঙ্গীগণের সঙ্গে ভাগ করিয়া যে-খাবার পাইয়াছিলাম তাহা ছাড়া আমার নিজেরও কিছু সংস্থান ছিল, তাহা আমি নিজে খাইবার জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যে আমারও খাবার শেষ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং আমাকে ও সঙ্গীদের মত না খাইয়া মরিতে হইবে, ইহা ঠিক্ করিয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া নিজের কবর খুঁড়িয়া ঠিক করিলাম যে, তাহার ভিতর থাকিয়া মরিব। কারণ, ঐ দ্বীপে আমাকে কবর দেয় এমন দ্বিতীয় লোক আর কেহই ছিল না। কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বর এবারেও আমার প্রতি কৃপা করিলেন। পাহাড়ের গুহার মধ্য দিয়া যে নদী বহিয়া যাইতেছিল হঠাৎ তাহার তীরে যাইয়া কিছুক্ষণ তাহার বেগ দেখাতে আমার মনে এই চিন্তা আসিল যে,—নিশ্চয়ই এই নদী পাহাড়ের গুহা হইতে কোনো-না-কোনো জায়গায় বাহির হইতেছে। যদি আমি একখানি নৌকা তৈয়ারী করিয়া তাহাতে চড়িয়া স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিব। যদি তাহা না পারি তবে আমার মারা যাইবার সম্ভাবনা। তাহাতেই বা বিশেষ একটা ক্ষতি কি? এখানেও তো মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোনো উপায় নাই। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে এখান হইতে উদ্ধার পাইয়া অন্য জায়গায় পৌঁছিতে পারি তাহা হইলে আমার বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তখনই কয়েকখানা বড় কাঠ জোগাড় করিয়া একখানি ছোট নৌকা বানাইলাম। পরে হীরামুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নে ঐ নৌকা বোঝাই করিয়া পরমেশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দুই হাতে দুইটা দাঁড় লইয়া স্রোতের মুখে নৌকা খুলিয়া দিলাম।

গুহার মধ্যে নৌকা ঢুকিবামাত্র আলো একেবারে মিলাইয়া গেল। নদীর বেগে আমি

কোন্‌দিকে যাইতে লাগিলাম, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এইভাবে কয়েকদিন সেই ঘোর অন্ধকার জায়গা দিয়া যাইতে যাইতে একদিন এক জায়গায় একখানা পাথর অত্যন্ত নীচু থাকাতে তাহাতে ধাক্কা লাগিয়া আমার মাথা ভাঙিয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল। কিন্তু

নদীর বেগে আমি কোন্ দিকে যাইতে লাগিলাম তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

ঈশ্বরের দয়ায় কোনমতে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া তখন হইতে সর্ব্বদা মাথা নীচু করিয়া থাকিতাম। পাহাড়ের নীচে দিয়া যাইবার সময় যদিও আমি খুব কম করিয়া খাইতাম

তবুও অল্প দিনের মধ্যে আমার সমস্ত খাবার ফুরাইয়া গেল। তখন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু জাগিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। দেখিলাম আমি এক বড় দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সম্মুখে কলকল শব্দ করিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। ঐ নদীর তীরে আমার নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, এবং আমার চারিদিকে অসংখ্য কাফ্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি কাফ্রিদিগকে দেখিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম। তাহারা আমাকে কতকগুলি কথা বলিল, কিন্তু আমি তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে এত বেশী আনন্দ হইয়াছিল যে, আমি ঘুমাইয়া আছি কি জাগিয়া আছি অনেকক্ষণ তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, আমি চীৎকার করিয়া আরবী ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করিলাম, তাহার মানে এই—"চোখ বুজিয়া একমনে পরমেশ্বরকে ধ্যান কর, তিনি তোমার সাহায্য করিবেন। তাঁহার প্রসাদে তোমার দুর্ভাগ্য-নিশার শেষ হইয়া সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইবে।"

কাফ্রিদের মধ্যে একজন আরবী ভাষা বুঝিতে পারিত। সে ঐ কবিতা শুনিয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আমাদের এখানে দেখে অবাক্ হয়ো না। আমরা এই দেশে থাকি। এই নদী থেকে নিজের নিজের ক্ষেতে জল দেবার জন্যে আজ আমরা এখানে এসেছি। এখানে এসে আমরা নদীর দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পেলাম, তোমার এই ছোট নৌকাখানি স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। তাতে আমাদের মধ্যে একজন সাঁতার দিয়ে গিয়ে তোমার নৌকা ধরে নিয়ে এখানে এনেছে। এখন তুমি নিজের সব-কথা বল। সেগুলো অবশ্যই খুব আশ্চর্য্য হবে।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "মশায়! আমার অত্যন্ত ক্ষিদে পেয়েছে। অতএব আগে আমাকে কিছু খেতে দিন, পরে আমি নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাদের কৌতূহল মিটিয়ে দেব।" এই কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে তখনই নানা-রকম খাবার দিল। তখন আমি পেট ভরিয়া খাইয়া তাহাদের কাছে অবিকল নিজের সব-কথা বলিলাম। যে আরবী ভাষা জানিত সে সকলকে আমার কথা বুঝাইয়া দিল। তাহা শুনিয়া কাফ্রিগণ খুব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এ গল্প অত্যন্ত অদ্ভুত। মহারাজ এটা শুন্‌লে খুব আশ্চর্য্য হবেন। অতএব তোমাকে নিজে গিয়ে এই গল্প মহারাজের কাছে বল্‌তে হবে।" আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।" এই কথা শুনিয়া তাহারা তখনই একটি ঘোড়া আনাইয়া আমাকে তাহার উপর চড়াইল। পরে কতকগুলি লোক পথ দেখাইয়া আমার আগে আগে চলিল. বাকী সকলে আমার নৌকা ও আমার জিনিষপত্র লইয়া আমার পিছন-পিছন আসিতে লাগিল।

এইরূপে অনেকদূর গিয়া আমরা সরন্দীপ নগরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ঐ দেশের রাজা বাস করিতেন। কাফ্রিগণ আমাকে রাজার কাছে উপস্থিত করিলে, আমি

মাটিতে লুটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। রাজা আমাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া নিজের পাশে বসাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "আমার নাম

রাজার কাছে উপস্থিত করিলে আমি মাটিতে লুটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম

সিন্দবাদ। আমি বাগদাদনগরে থাকি। আমি বাণিজ্য করবার জন্তে অনেকবার সমুদ্রযাত্রা করেছি বলে লোকে আমাকে নাবিক নাম দিয়েছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেশে কি করে এলে?" তাহা শুনিয়া আমি তাঁহার কাছে নিজের

সকল কথা বলিলাম। রাজা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন এবং তখনই আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সোনার অক্ষরে লিখিয়া নিজের পুস্তকালয়ে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে কারিগণ আমার ছোট নৌকা ও তাহার ভিতরের জিনিষপত্র রাজার কাছে লইয়া আসিলে, তিনি সেই-সকল জিনিষের খুব প্রশংসা করিলেন। বিশেষতঃ হীরা ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ তেমন ভাল রত্ন তাঁহার ভাণ্ডারে একটিও ছিল না।

রাজাকে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে আমার রত্নগুলি দেখিতে দেখিয়া আমি তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলাম "মহারাজ! আপনার সেবার আমি যে কেবল নিজের দেহ সমর্পণ করেছি, আপনি এমন মনে করবেন না; আমার নৌকায় যা-কিছু আছে সে-সবও আপনি নিজের মনে করে ভোগ করতে পারেন।" এই-কথা শুনিয়া রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সিন্দবাদ! তোমার যে-সব জিনিষ আছে, তাতে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও লোভ হয়নি। জগদীশ্বর তোমার প্রতি দয়া করে তোমাকে যে-সব অমূল্য রত্ন দিয়েছেন তা আমার কোনোরকমেই নেওয়া উচিত নয়, বরং যাতে সে-সব আরও বাড়ে আমার সেদিকে চেষ্টা করাই উচিত। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যে-সময় তুমি আমার রাজধানী ছেড়ে নিজের দেশে যাবে, সে-সময় আমি কেবল এই-সমস্ত ধন না দিয়ে তোমার সঙ্গে আরও কিছু টাকাকড়ি পাঠাব।" ইহা শুনিয়া আমি প্রাণের সঙ্গে রাজার মঙ্গলকামনা করিয়া তাঁহার ভাল স্বভাব ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিলাম। তারপর রাজা রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে একজনকে আমার সেবায় লাগাইয়া দিলেন, এবং যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকিতে পারি, তাহার জন্য একটি সুন্দর বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। আমি প্রতিদিন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজার সঙ্গে দেখা করিতাম। বাকী সময় নগরে ঘুরিয়া সেখানকার অদ্ভুত জিনিষ দেখিয়া বেড়াইতাম। মানুষের আদিপুরুষ আদম স্বর্গ হইতে বাহির হইয়া যে পাহাড়ে গিয়া থাকেন তাহা একটি বিখ্যাত তীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য আমি ঐ পাহাড়ের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত উঠিলাম।

সেখান হইতে ফিরিয়া আমি রাজার কাছে দেশে ফিরিবার ইচ্ছা জানাইলে, তিনি তাহাতে রাজী হইলেন, এবং আমাকে অনেক ধন দিলেন। পরে যখন আমি তাঁহার কাছে বিদায় লইলাম, তখন তিনি বহুমূল্য রত্নাদি উপহার ও একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, "তুমি এই চিঠিখানি আর এই-সমস্ত জিনিষ মহারাজ হারুন-অল-রশীদের হাতে দিয়ে আমার কুশল জানিও।" আমি আদর করিয়া ঐ চিঠি ও উপহার হাতে লইয়া বলিলাম, "মহারাজের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আমি বাগদাদে পৌঁছিবামাত্র এ-সব প্রভু হারুন-অল-রশীদের হাতে দেব।" যাইবার আগে রাজা পোতাধ্যক্ষকে বলিয়া দিলেন যে, আমাকে যেন বিশেষ সম্মানের সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর জাহাজের অধ্যক্ষ ভাল বাতাস দেখিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলে আমরা অল্প দিনের মধ্যে বালশোরানগরে উপস্থিত হইলাম। পরে সেখান হইতে বাগদাদনগরে যাইয়া সবার আগে সরন্দীপের রাজার চিঠি ও উপহার লইয়া প্রভু হারুন-অল-রশীদের প্রাসাদে চলিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি নিজের আসিবার

কারণ জানাইলে, মহারাজ আমাকে সাম্‌নে ডাকাইলেন। আমি মাটিতে লুটাইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া সরন্দীপ-রাজের চিঠি ও উপহার দিলাম। রাজা চিঠি পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিঠি পড়িয়া যেমন মনে হয়, এই রাজা সত্যই কি সেইরূপ ধনী আর ক্ষমতা-শালী?" আমি আবার রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "হে ধর্ম্মপালক! রাজা যা লিখেছেন সে-সমস্তই সত্য। তিনি যেমন ধনী তেমনি জ্ঞানী আর প্রতাপশালী। তাঁর প্রজারাও তাঁরই মত।" ইহা শুনিয়া রাজা আমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

সিন্দবাদ এই গল্প শেষ করিয়া হিন্দবাদকে আর একশ মোহর দিলেন। পরদিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য সকলে আসিলে সিন্দবাদ নিজের সপ্তম বাণিজ্য-যাত্রার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের সপ্তম বাণিজ্য-যাত্রা

আমি ষষ্ঠ বাণিজ্য-যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঠিক করিলাম আর কখন কোনো জায়গায় যাইব না, বাগ্দাদনগরে থাকিয়াই জীবনের শেষ ভাগ পরম সুখে কাটাইয়া দিব। কিন্তু একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় মহারাজের একজন চাকর আসিয়া আমাকে বলিল, "মহারাজ আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চান।" এই কথা শুনিয়া আমি তখনই রাজবাড়ীতে গিয়া রাজার সিংহাসনের সাম্‌নে প্রণাম করিলাম। রাজা বলিলেন, "সিন্দবাদ! তোমাকে আমার কোনো দর্‌কারী কাজে সাহায্য কর্‌তে হবে। সরন্দীপের রাজা আমার প্রতি যে-রকম ভদ্রতা দেখিয়েছেন, তা তুমি সবই জান। এখন আমারও ফিরে ভদ্রতা করা উচিত। অতএব তুমি কিছু উপহার আর একখানি চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে একবার যাও।" রাজার এই আজ্ঞায় যেন আমার মাথায় বাজ পড়িল। আমি বলিলাম, "হে ধর্ম্মপালক! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমি অনেক-বার বাণিজ্য-যাত্রা করে নানা কষ্ট ভোগ করে এখন শপথ করেছি আর কখনও বাগ্দাদ-নগরের বাইরে যাব না।" রাজা বলিলেন, "তোমাকে আমার অনুরোধে আর একবার সরন্দীপনগরে যেতে হবে, কারণ সে-দেশ আর কোনো লোকই চেনে না।" আমি বাধ্য হইয়া সেখানে যাইতে স্বীকার করিলাম। তাহাতে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমার পথ-খরচের জন্য তখনই এক হাজার মোহর দিতে আজ্ঞা করিলেন।

তারপর আমি শীঘ্র যাইবার আয়োজন করিয়া রাজার কাছ হইতে উপহার ও চিঠি লইয়া বালশোরানগরে যাইয়া জাহাজে চড়িয়া সরন্দীপনগরে যাত্রা করিলাম। কিছুদিনের পর আমি নিরাপদে ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিলাম। রাজা আমাকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সিন্দবাদ! তুমি এখান থেকে দেশে

চলে যাবার পর আমি সর্ব্বদা তোমারই কথা ভাবতাম। আজ আমার কি সুপ্রভাত যে, আমি আবার তোমার দেখা পেলাম।" আমার প্রতি তাঁহার এই-রকম স্নেহ দেখিয়া আমি তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। পরে আমি বাগ্দাদেশ্বরের চিঠি ও উপহার তাঁহার হাতে দেওয়াতে, তিনি তাহা বন্ধুতার প্রতিদান মনে করিয়া আগ্রহ করিয়া লইলেন। ঐ নগরে কিছুদিন সুখে থাকিয়া আমি ফিরিবার ইচ্ছা জানাইলে, রাজা আমাকে অনেকরকম বহুমূল্য জিনিষ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। আমি জাহাজে চড়িয়া বাগ্দাদে যাত্রা করিলাম। কিন্তু তিন-চারি দিনের পর কপালদোষে আমাদের জাহাজ ডাকাতের হাতে পড়িল। যাত্রীদের মধ্যে যাহারা ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল, তাহারা সকলেই মারা গেল। আমি এবং আর কয়েকজন ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করি নাই, এজন্য আমাদিগকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া অনেক দূরে এক দ্বীপে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল।

আমি যে লোকের হাতে পড়িলাম, তিনি একজন বণিক্। তাঁহার বিলক্ষণ টাকাকড়ি ছিল। তিনি আমাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া ভাল কাপড় পরাইলেন এবং আমার সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন বণিক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি কোনো বিষয়কর্ম্ম জান?" আমি বললাম, "মহাশয়! আমি বাণিজ্য করতাম। কপালদোষে ডাকাতের হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব খুইয়েছি।" বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুমি তীর ছুড়তে পার কি না?" আমি উত্তর করলাম, "ছেলেবেলায় আমি সর্ব্বদা তীর ছুড়তাম। সুতরাং আমি এ-বিষয়ে একেবারে আনাড়ি নই।" এই কথায় বণিক্ তখনই আমার হাতে ধনুর্ব্বাণ দিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়া সহর হইতে অনেক দূরে এক গভীর বনে আমাকে লইয়া গেলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড গাছের কাছে যাইয়া আমাকে হাতী হইতে নামাইয়া বলিলেন, "এই বনে অসংখ্য হাতী আছে। তুমি এই গাছে চড়ে বসে থাক। যখন হাতীগুলোকে তোমার কাছ দিয়ে যেতে দেখবে, তখন তুমি তাদের দিকে বাণ ছুড়ো। তাতে যদি কোনো হাতী মরে, তাহলে তুমি শীঘ্র আমাকে খবর দিও।" এই-কথা বলিয়া মহাজন আমাকে কিছু খাবার দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি সমস্ত রাত্রি ঐ গাছের উপর কাটাইলাম, কিন্তু একটিও হাতী দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন সকালে অসংখ্য হাতী দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিয়া ক্রমাগত বাণ ছুড়িতে লাগিলাম। তাহাতে একটা হাতী মারা গেল। অন্যান্য হাতী তাহা দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। আমি সেই অবকাশে গাছ হইতে নামিয়া নিজের মনিবের কাছে গিয়া তাঁহাকে খবর দিলাম। তিনি আমার মুখে এই খবর পাইয়া খুব খুসী হইলেন এবং আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি আমার সঙ্গে বনে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঐ মৃত হাতীকে রাখিয়া দিলেন। এরকম করিবার মানে এই যে,

যখন মাংস গলিয়া যাইবে, তখন তাহার দাঁত ও হাড় বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিবেন

আমি দুইমাস ধরিয়া প্রতিদিন বনে যাইয়া এইভাবে হাতী শীকার করিতে লাগিলাম। তাহার পর একদিন সকালে দেখিলাম হাতী সকল অন্যদিনের মত এধার-ওধার না বেড়াইয়া বিকট গর্জ্জন করিতে-করিতে পালে পালে আমার গাছের দিকে আসিতেছে তাহা

হাতীসকল পালে পালে আমার গাছের দিকে আসিতেছে

দেখিয়া ভয়ে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল, এবং হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বাস্তবিক আমি যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। হাতীগুলা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে একটা প্রকাণ্ড বলবান্ হাতী আমি যে

গাছের উপর বসিয়াছিলাম, শুঁড় দিয়া তাহার গোড়া এমন জোরে টানিতে লাগিল যে, তাহা তখনই উপ্‌ড়াইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে আমিও মাটিতে পড়িয়া গেলাম। তখন হাতীটা শুঁড় দিয়া আমাকে নিজের পিঠে তুলিয়া লইল। আমি মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। সে আমাকে নিজের পিঠে লইয়া অন্যান্য হাতীর সঙ্গে জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর যাইবার পর সে আমাকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে বনের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আমার তখন কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমার জ্ঞান হইলে আমি উঠিয়া দেখিলাম,, আমি হাতীর দাঁত ও হাড়ে ভরা এক প্রকাণ্ড পাহাড়ে পড়িয়া রহিয়াছি। হাতীর স্বাভাবিক বুদ্ধির এই অদ্ভুত প্রমাণ পাইয়া আমি অবাক্ হইলাম। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, হাতীরা নিজেদের দলের কেউ মারা গেলে এই পাহাড়ে তাহার দেহ ফেলিয়া যাইত। সুতরাং আমাকে তাহারা এই মত্‌লবে ঐখানে রাখিয়া গেল যে, আমি ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর না মারিয়া ঐ পাহাড় হইতে যত ইচ্ছা হাতীর দাঁত লইতে পারিব।

তারপর আমি সেখানে আর দেরী না করিয়া তখনি নগরের দিকে যাত্রা করিলাম, এবং এক দিন ও এক রাত্রি হাঁটিবার পর নিজের মনিবের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "সিন্দবাদ! কয়েক দিন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম, আর বনে গিয়ে একটা উপ্‌ড়ান গাছ আর তোমার তীর-ধনুক মাটিতে পড়ে থাক্‌তে দেখে আমি তোমার মারা পড়্‌বার ভয় করেছিলাম। সুতরাং তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, আমার এমন আশা একটুও ছিল না। এখন বল দেখি তুমি কি বিপদে পড়েছিলে আর কি করে সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেলে?" তাহাতে আমি সমস্ত কথা বর্ণনা করিলাম। পরদিন সকালে বণিক্ আমাকে সঙ্গে করিয়া পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে রাশি রাশি হাতীর দাঁত দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পরে যে হাতীতে চড়িয়া সেখানে গিয়াছিলাম, তাহার পিঠে রাশি রাশি হাতীর দাঁত বোঝাই করিয়া বাড়ীতে আনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "ভাই সিন্দবাদ! আজ থেকে আমি তোমার দাসত্ব দূর করে দিলাম; আর তুমি আমার টাকা রোজগারের চমৎকার পথ আবিষ্কার করে দিলে, তার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরজীবন ঋণী রইলাম। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি তাঁর নামে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আজ থেকে তুমি একেবারে স্বাধীন হলে। কিন্তু তুমি ভেবো না যে, আমি তোমাকে কেবল স্বাধীনতা দিয়েই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব, আমি সাধ্যমত টাকাকড়ি দিয়ে তোমাকে খুসী কর্‌ব।"

আমি প্রভুর মুখে এই-সকল কথা শুনিয়া বলিলাম, "হে প্রতিপালক! পরমেশ্বর আপনাকে চিরজীবী করুন। আমি আপনার যে সামান্য উপকার করেছি তার জন্যে আমার ফিরে উপকার কর্‌বার দর্‌কার নেই। একমাত্র স্বাধীনতা পেয়েই আমি যথেষ্ট পুরস্কার পেলাম। তবে আমি যাতে শীঘ্র নিজের দেশে যেতে পারি, অনুগ্রহ করে সে-বিষয়ে

আপনি একটু মনোযোগী থাক্‌বেন।" বণিক্ বলিলেন, এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অল্পদিনের মধ্যে হাতীর দাঁত কিন্‌বার জন্যে এখানে ঢের জাহাজ আস্‌বে। আমি ঐ সময়ে তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।"

তার পর কিছুদিনের মধ্যে সেখানে জাহাজ আসিতে আরম্ভ করিল। তখন আমার প্রভু তাহার মধ্যে একখানি ভাল জাহাজ আমার জন্য বাছিয়া তাহার অর্দ্ধেক হাতীর দাঁতে বোঝাই করিলেন। পরে তিনি আমাকে ঢের টাকাকড়ি এবং সেই দেশের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দিলেন। আমি ঐ-সব জিনিষ পাইয়া তাঁহাকে হাজার হাজার ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া জাহাজে চড়িলাম। সৌভাগ্যক্রমে তখন বাতাস ভাল ছিল। তাহাতে আমরা নিরাপদে বাগদাদনগরে উপস্থিত হইলাম। দেশে পা দিয়াই আমি প্রথমে রাজা হারুন-অল্-রশীদের কাছে গিয়া তাঁহার কাজ সফল হওয়ার খবর দিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া কহিলেন, "সিন্দবাদ! অনেক দিনের মধ্যেও তুমি ফির্‌লে না দেখে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু তুমি যেরূপ ভদ্রলোক তাতে পরমেশ্বর যে তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।" পরে বনমধ্যে হাতীর দলের সঙ্গে আমার যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তিনি তাহার কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি এই গল্প এবং আমার অন্যান্য বাণিজ্য-যাত্রার কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সেগুলি একজন লেখককে দিয়া সোনার অক্ষরে লেখাইয়া নিজের পুস্তকাগারে রাখিতে বলিলেন। পরে খুসী হইয়া আমাকে যথেষ্ট সমাদর ও পুরস্কার দিবার পর আমি আনন্দে সেখান হইতে নিজের বাড়ীতে আসিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ নিজের সপ্তম বাণিজ্য-যাত্রার গল্প শেষ করিয়া হিন্দবাদকে বলিলেন, "ভাই হিন্দবাদ! তুমি আমার সমস্ত কথা শুন্‌লে। এখন বল দেখি, আমার মত এমন বিষম বিপদে কখন কোনো মানুষকে পড়্‌তে শুনেছ কি?" তখন হিন্দবাদ সিন্দবাদের হস্তচুম্বন করিয়া বলিল, "আপনি ভয়ানক কষ্টভোগ করেছেন। এমন কষ্টভোগের পর কিছুদিন সুখে কাল কাটাবার আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এখন বুঝ্‌তে পারলাম আমি নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে যে দুঃখ করছিলাম তা অন্যায়।"

তার পর সিন্দবাদ তাহাকে আর একশ মোহর দিয়া বলিলেন "হিন্দবাদ! তুমি নিজের ব্যবসা ছেড়ে দাও। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধুদলের একজন হলে"

নুরুদ্দীন আলি ও বেদ্‌রুদ্দীন হুসেন

অনেকদিন আগে মিশর দেশে বিখ্যাত, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও সাহসী এক সুল্‌তান বাস করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ঐ মন্ত্রীর সমসুদ্দীন মহম্মদ ও নুরুদ্দীন আলি নামে দুই ছেলে ছিল। ছেলে-দুইটি সকল বিষয়েই ছায়ার মত পিতার মতে চলিতেন। তবুও ছোট ছেলে বড় অপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন।

কিছুদিন পরে মন্ত্রী মারা গেলে সুল্‌তান দুজনকেই মন্ত্রীর পোষাক দিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাবা মারা যাওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি সম্প্রতি আমার ইচ্ছা এই যে, তোমাদের দুজনকেই মন্ত্রীর কায দি। অতএব তোমরা এখন তোমাদের বাবার মত সমস্ত কাজ দেখ্‌তে-শুন্‌তে আরম্ভ কর।" দুই ভাই এই-কথা শুনিয়া বিনীতভাবে সুল্‌তানকে ধন্যবাদ দিয়া সেই হইতে পালা করিয়া একজন তাঁহার কাছে থাকিতে লাগিল। কিছুদিন পরে একদিন বিকালে খাওয়া-দাওয়ার পর দুই ভাইয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে বড় ভাই ছোট ভাইকে বলিলেন, "দেখ ভাই, এখনও আমাদের কারও বিয়ে হয়নি; আর আমরা যেমন সুখে দিন কাটাচ্ছি, তাতে আমার ইচ্ছা যে, আমরা দুজনেই একদিনে কোনো ভাল ঘরের দুই বোন্‌কে বিয়ে করি। এতে তোমার কি মত্?" ছোট ভাই বলিলেন, "ভাই! এর চেয়ে ভাল কথা আর নেই। আপনি যা ভাল মনে কর্‌বেন, আমি তাতেই রাজী হব।" বড় ভাই বলিলেন, "আরও কিছু বল্‌বার আছে। সময়ে যদি তোমার এক ছেলে আর আমার এক মেয়ে হয়, তা হলে তাদের দুজনের সঙ্গে বিয়ে দেব।" ছোট ভাই উত্তর করিলেন, "এতে আমাদের ভাব আরও বাড়বে, আমি খুসী হয়েই এতে রাজী হচ্ছি।" তিনি আরও বলিলেন, "দাদা! যদি এই বিয়ে হয় তা হলে আপনি কি মনে করেন যে, আমার ছেলে আপনার মেয়েকে যৌতুক দেবে?" বড় বলিলেন, অবশ্য দেবে। কারণ আমার বিশ্বাস আছে যে, বিয়ের অন্যান্য জিনিষ ছাড়া তুমি আমার মেয়ের নামে অবশ্যই কম করে তিন হাজার মোহর, তিনখণ্ড জমি, আর তিনজন দাস দেবে।" ছোট ভাই উত্তর করিলেন, "না, আমি কখনই এতে রাজী হতে পারি না। আমরা কি দুইজনে ভাই নয়? আমরা দুজনে কি মান-সম্ভ্রমে সমান নয়? আমরা দুজনেই কি জানি না যে, কোন্‌টি ঠিক? ছেলে মেয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনারই মেয়ের সঙ্গে বেশী যৌতুক দেওয়া উচিত; আমি যে-রকম দেখ্‌ছি তাতে মনে হয় আপনি অন্যের ব্যয়ে নিজের কাজ উদ্ধার কর্‌তে ইচ্ছা করেন।"

যদিও নুরুদ্দীন ঠাট্টা করিয়া এই-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তবুও তাঁহার বড় ভাই অত্যন্ত রাগী ছিলেন বলিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ের চেয়ে তোমার ছেলেকে বড় বল্‌ছ অতএব তোমার ছেলের সর্ব্বনাশ হোক্। দুজনে এক কাজ করি বলে তুমি নিজেকে আমার সমান মনে কর্‌ছ। যখন তুমি

এতদূর অহঙ্কারী, তখন তোমার ছেলের সঙ্গে কোনো-রকমেই আর আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। বড় ভাইয়ের সঙ্গে এমন গর্ব্ব করে কথা বলা ছোট ভাইয়ের কখনই উচিত নয়।" ইহা বলিয়া তিনি রাগে অধীর হইয়া তখনই সেখান হইতে নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

সমসুদ্দীন পরদিন সকালে উঠিয়া সুলতানের সঙ্গে পিরামিডের কাছে মৃগয়া করিতে গেলেন। কিন্তু নুরুদ্দীনের বড় ভাই তাঁহার সঙ্গে যে-রকম কর্কশ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গে থাকা অসম্ভব মনে করিয়া নুরুদ্দীন অন্য জায়গায় যাইবার জন্য একটি তেজী ঘোড়া আনাইলেন। পরে পথের উপযুক্ত কিছু খাবার, নগদ টাকা ও রত্নাদি গুছাইয়া লইয়া বিশেষ দরকারে দুই-তিন দিনের জন্য কোনো জায়গায় যাইতেছেন নিজের লোকদের এই-কথা বলিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

পরে কায়রোনগর পার হইয়া মরুভূমি দিয়া তিনি আরবের দিকে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘোড়ার এক পা ভাঙিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে বালশোরানগরযাত্রী একজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বালশোরায় লইয়া গেল। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখিলেন, পথের মধ্যে অনেক চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া এক বড় কর্ম্মচারী যাইতেছেন, এবং সকলেই অত্যন্ত সম্মান দেখাইয়া যতক্ষণ না তিনি যাইতেছেন ততক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেছে। ইনি বালশোরার সুলতানের প্রধান মন্ত্রী। সহরের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে কি না ইহা জানিবার জন্য সেদিন তিনি সহরের মধ্যে ঘুরিতেছিলেন। হঠাৎ নুরুদ্দীনের দিকে চোখ পড়াতে মন্ত্রী তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে পথিকের বেশধারী দেখিয়া নিজের লোকজনকে সেখানে দাঁড় করাইয়া তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নুরুদ্দীন উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমি কায়রোনগরে থাকি। কোনো আত্মীয়ের কর্কশ ব্যবহারের জন্যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। আর বাড়ী ফিরে যাওয়ার চেয়ে মরণ ভাল মনে করে দেশ বেড়িয়ে দিন কাটাব প্রতিজ্ঞা করেছি।" মন্ত্রী তাঁহার কথা শুনিয়া দয়া করিয়া বলিলেন, "বাছা! এমন প্রতিজ্ঞা কোরো না। দেশে দেশে ঘোরার যে কত কষ্ট তা তুমি ভাল করে জান না। আমার সঙ্গে এস। আমার কাছে থাক্‌লে যে-কারণে দেশ ছেড়ে চলে এসেছ বোধ হয় ক্রমে তা ভুলে যাবে।"

নুরুদ্দীন তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। নুরুদ্দীনের গুণ দেখিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি মন্ত্রীর এমন ভালবাসা হইল যে, তিনি একদিন নুরুদ্দীনকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, আমি যে-রকম বুড়ো হয়েছি তাতে আর আমার বেশী দিন বাঁচবার ভরসা নেই; আমার একমাত্র মেয়ে আছে, আর তোমাকে অন্য-সকলের চেয়ে ভাল মনে হওয়াতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তোমাকেই মেয়ে দিয়ে যাই। যদি তোমার এতে মত থাকে, তা হলে তোমার সঙ্গে

মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিজের উত্তরাধিকারী করি। এই-কথা মহারাজকে জানিয়ে যাতে তিনি আমার পদ তোমাকে দেন সে-বিষয়েও অনুরোধ কর্‌ব।"

নুরুদ্দীন তাঁহার পায়ে পড়িয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার কথায় রাজী হইলে মন্ত্রী লোকজন ডাকাইয়া বাড়ী সাজাইতে ও মহোৎসবের আয়োজন করিতে আ॰! দিলেন পরে তিনি রাজ্যের বড় বড় লোকদের তাঁহার বাড়ীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি নুরুদ্দীনকে জামাই করিবার সঙ্কল্প জানাইলেন। পরে মহা আনন্দে ধূমধাম করিয়া নুরুদ্দীনের বিবাহ হইয়া গেল। সকলে বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এদিকে সমসুদ্দীন সুল্‌তানের সঙ্গে শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া কায়রো হইতে ভাইয়ের চলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং তাঁহার কর্কশ ব্যবহারই যে ভাইয়ের দেশ ছাড়িয়া যাইবার একমাত্র কারণ ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইয়া ডামস্কস ও আলিপো পর্য্যন্ত দূত পাঠাইলেন। কিন্তু নুরুদ্দীন তখন বালশোরায় থাকাতে দূতগণ কোনো খোঁজ না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। তারপর তিনি অন্যান্য জায়গায় ভাইয়ের খোঁজ করিতে লোক পাঠাইলেন। এবং যেদিনে নুরুদ্দীনের সঙ্গে বালশোরার মন্ত্রীর মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল, সেই-দিনে তিনিও কায়রোনগরের এক বড়-লোকের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিনেই কায়রোনগরে তাঁহার এক মেয়ে এবং বালশোরানগরে নুরুদ্দীনের এক ছেলে জন্মাল। নুরুদ্দীন ছেলের নাম বেদ্‌রুদ্দীন হুসেন রাখিলেন।

বালশোরার প্রধান মন্ত্রী নাতীর জন্মোপলক্ষে অনেক টাকা দান করিলেন, ও দেশের সব লোককে ভোজ দিলেন। পরে জামাতার প্রতি স্নেহ করিয়া সুল্‌তানের কাছে গিয়া নুরুদ্দীনকে তাঁহার বদলে প্রধান মন্ত্রীর কাজ দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুল্‌তান তখনই তাঁহার কথায় রাজী হইয়া নুরুদ্দীনকে মন্ত্রীর পোষাক ও সেই কাজের অন্যান্য চিহ্নাদি দিলেন।

পরদিন নুরুদ্দীনকে রাজসভায় বসিয়া ভালভাবে সমস্ত কাজ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। নুরুদ্দীন এমন দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কাজ চালাইতে লাগিলেন যে, সকলে তাঁহাকে ঐ কাজে খুবই পণ্ডিত মনে করিল। ক্রমে তিনি সুল্‌তানের প্রশংসা পাইলেন ও সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

প্রায় চারি বৎসর পরে বৃদ্ধ মন্ত্রী মারা গেলেন তাহাতে নুরুদ্দীন খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে তাঁহাদের বংশের গোরস্থানে কবর দিলেন। নুরুদ্দীন এইভাবে শ্বশুরের প্রতি নিজের শেষ কর্ত্তব্য করিয়া নিজের ছেলের শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন। ঐ ছেলেটির লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ও বুদ্ধি ছিল। সাত বৎসর বয়সে সে কোরান পড়িতে শিখিয়াছিল, এবং বার বৎসরের আগেই নানা বিষয় শিখিয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। দেখিতেও সে অতিশয় সুন্দর ছিল। বার বৎসর পার হইলে নুরুদ্দীন

তাহাকে সুল্‌তানের কাছে পরিচিত করিয়া দিলেন। সুল্‌তানও তাহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। পথে যে তাহাকে দেখিত সে-ই শত শত আশীর্ব্বাদ করিত।

যাহাতে ছেলে পরে তাঁহার কাজ করিতে পারে, নুরুদ্দীন তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি ছেলের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন নুরুদ্দীন নিজের পরিশ্রমের ফল পাইতে আশা করিতে লাগিলেন, অমনি হঠাৎ ভয়ানক জ্বরে পড়িলেন। ঐ রোগ হইতে সারিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি নিজের ছেলেকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানি বই দিয়া বলিলেন, "বৎস! এই বইখানি নাও আর সময়-মত এটা প'ড়ো। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এর মধ্যে তুমি আমার সমস্ত কথা, আমার বাড়ী, আমার আত্মীয়-স্বজন আর তোমার জন্মদিনের কথা দেখতে পাবে। বোধ হয় কোনো সময়ে এই-সমস্ত কথা তোমার উপকারে লাগ্‌বে। অতএব এই বইখানি সাবধানে রেখো।"

বেদ্‌রুদ্দীন হুসেন বাবার এই অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হাত হইতে বইখানি লইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণান্তেও কখন তিনি তাহা ছাড়িবেন না। সেই মুহূর্ত্তেই নুরুদ্দীন মূর্চ্ছা গেলেন। তাহাতে সকলেই মনে করিল তিনি মারা গিয়াছেন। কিন্তু তিনি আবার জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমার মর্‌বার সময়ে আমি তোমায় কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি, তুমি তা মন দিয়ে শোনো। তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, সব-রকমের লোকের সঙ্গে বেশী মিশো না, এবং নিজের সকল কথা সহজে বলে না ফেলে নিজের মনেই রেখে দিও। দ্বিতীয়, কারও প্রতি অত্যাচার কোরো না; তা হলে অনেক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। তৃতীয়, রাগের সময় কথা বোলো না। কারণ তখন যে লোক কথা বলে না, তার কোনো বিপদ ঘটে না। আমাদের একজন কবি এ-বিষয়ে যা বলেছেন তা তুমি জান,—শান্তভাব জীবনের অলঙ্কার ও রক্ষকস্বরূপ, আমাদের কথা সর্ব্বনাশী ঝড়ের মত হওয়া উচিত নয়। অল্প কথা বলেছি বলে কেউ কখন অনুতাপ করেনি। কিন্তু বেশী বলেছি বলে সকলে অনুতাপ করে থাকে। চতুর্থ, কখনও মদ খেয়ো না, কারণ এটা সব পাপের মূল। পঞ্চম, নিজের খরচ সব-সময় হিসেব করে কোরো। আমি তোমাকে অত্যন্ত দাতা অথবা অত্যন্ত কৃপণ হতে বল্‌ছি না। যদিও তোমার কম টাকা থাকে তবুও তাতেই যদি হিসেব করে চল তা হলে তুমি অনেক বন্ধু পাবে। আর যদি তোমার টাকা থাকে, অথচ তুমি সেই টাকা দুহাতে উড়িয়ে দাও তা হলে পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই তোমাকে ছেড়ে যাবে।"

ধার্ম্মিক নুরুদ্দীন এইরূপে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছেলেকে ভাল উপদেশ দিলেন তিনি মারা গেলে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে তাহার কবর দেওয়া হইল। বেদ্‌রুদ্দীন হুসেন বাবার মৃত্যুতে এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, শোক করিবার নিয়মিত সময় এক মাস কাটিয়া গেলেও দুই মাসের বেশী সময় পর্য্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়া নির্জ্জনে থাকিলেন, এমন কি

সুল্তানের সঙ্গেও দেখা করিলেন না। সুল্তান তাঁহার এই ব্যবহারে অত্যন্ত রাগ করিয়া অন্য একজনকে প্রধান মন্ত্রীর কাজ দিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন যে, মৃত মন্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে আনিয়া রাখ এবং বেদ্রুদ্দীনকে বন্দী কর।

নূতন মন্ত্রী তখনই লোকজন সঙ্গে লইয়া সুল্তানের আদেশ পালন করিতে চলিলেন। ঘটনাক্রমে বেদ্রুদ্দীনের চাকর সেই সময়ে বাহিরে আসিয়াছিল। সে নূতন মন্ত্রীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র তাহার মনিবকে খবর দিতে গেল। সেখানে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল, "প্রভু, শীঘ্র নিজেকে বাঁচান।" দুর্ভাগ্য বেদ্রুদ্দীন মাথা তুলিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?" সে কহিল, "আর বৃথা সময় নষ্ট কর্বেন না। সুল্তান আপনার উপর অত্যন্ত রাগ করে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও আপনাকে বন্দী কর্বার আজ্ঞা দিয়েছেন।"

এই বিশ্বাসী চাকরের কথায় বেদ্রুদ্দীন অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তিনি শীঘ্র উঠিয়া জুতা ও টুপি পরিয়া কোন্ দিকে যাইবেন কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। চলিতে চলিতে তিনি সাধারণ গোরস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া সে-রাত্রি তাঁহার বাবার কবরের উপরেই কাটাইবেন ঠিক করিলেন। সে জায়গাটি একটি খিলানে ঢাকা ছিল, এবং নুরুদ্দীন মুসলমানদিগের প্রচলিত নিয়মমত উহা নিজের মৃত্যুর আগেই তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এক ইহুদী সওদাগর কাজ হইতে ফিরিতেছিল, তাহার সঙ্গে বেদ্রুদ্দীনের সেখানে দেখা হওয়ায় সে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইল ও বিনীতভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিল।

বেদ্রুদ্দীন কি-জন্য সহর ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন তাহা জানা না থাকাতে সে বলিল, "মহাশয়! আপনার বাবার বাণিজ্যের জিনিষে ভরা অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রপথে আস্ছে। তা এখন আপনারই সম্পত্তি। অন্য বণিকের আগে আমি সেগুলি কিন্বার অনুমতি চাই। আপনার জাহাজগুলিতে যত জিনিষ আছে, আমি তার নগদ দাম দিতে পারি। প্রথমেই যেখানি নির্ব্বিঘ্নে পৌছবে যদি সেখানি আমাকে বেচেন, তা হলে আমি এখনই আপনাকে এক হাজার মোহর দিতে পারি।" এই বলিয়া নিজের কাপড়ের ভিতর হইতে হাজার মোহরের একটি তোড়া বাহির করিয়া দেখাইল।

বেদ্রুদ্দীন বাড়ী ও সমুদয় সম্পত্তি হারাইয়া এই ব্যাপারকে ঈশ্বরের দয়া বিবেচনা করিয়া তখনই তাহাতে রাজী হইলেন। তখন ইহুদী কহিল, "মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমাকে একখানি রসিদ লিখে দেন।" এই কথা বলিয়াই সে কাগজ দোয়াত ও কলম বাহির করিয়া তাঁহাকে দিল। বেদ্রুদ্দীন এই কথাগুলি লিখিলেন।—

"বালশোরানিবাসী বেদ্রুদ্দীন হুসেন আইজাক নামক ইহুদীকে নগদ একহাজার মোহরে তাঁহার যে জাহাজ প্রথমে বন্দরে পঁহুছিবে তাহার সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিলেন। এই বিক্রয়পত্রই এ বিষয়ের সাক্ষী রহিল।"

আইজাক নগরের দিকে চলিয়া গেলে, বেদ্রুদ্দীন শীঘ্র তাঁহার পিতার কবরের দিকে

চলিতে লাগিলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র তখনি মাথা নীচু করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! হতভাগ্য বেদ্‌রুদ্দীন! তোমার গতি কি হবে? যে অত্যাচারী রাজা তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তার কাছ থেকে পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে? এমন বাবা মরেই কি তোমার যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়নি?" তিনি এইভাবেই অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। শেষে উঠিয়া তাঁহার পিতার গোরের উপর মাথা রাখিবামাত্র তাঁহার দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিল। এমন কি তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে শেষে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সেইখানে এক দৈত্য থাকিত! সে প্রতিদিন ঐখানে দিন কাটাইয়া রাত্রিকালে সেখান হইতে বাহির হইত। ঐদিন বাহিরে যাইবার সময় বেদ্‌রুদ্দীনকে সেখানে ঘুমাইতে দেখিয়া তাঁহার রূপে সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

তাঁহাকে অনেকবার করিয়া দেখিয়া সে আকাশে উড়িল। পথে এক পরীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে পরস্পর নমস্কারের পর দৈত্য তাহাকে কহিল, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি যে কবরের মধ্যে থাকি তুমি একবার সেইখানে নাম; কারণ তা হলে সেখানে আমি তোমাকে এক অতি সুন্দর ছেলে দেখাতে পারি।" পরী তাহাতে রাজী হইলে উভয়ে মুহূর্তমধ্যেই সেখানে নামিয়া পড়িল। দৈত্য বেদ্‌রুদ্দীনকে দেখাইয়া কহিল, "দেখ এর চেয়ে সুন্দর ছেলে কি কখন দেখেছ?"

পরী মনোযোগ দিয়া দেখিয়া বলিল, "এ ছেলে যে অত্যন্ত সুন্দর তা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; কিন্তু আমি এইমাত্র কায়রোনগরে যে মেয়েকে দেখে এসেছি সে এর চেয়েও সুন্দর, আর যদি তুমি শুনতে চাও তা হলে আমি তার দুর্দশার কথা বলি।" দৈত্য বলিল, "তা হলে আমি নিতান্ত বাধিত হব।" পরী বলিল, "তুমি অবশ্যই জান যে, সমসুদ্দীন মহম্মদ নামে মিশরের রাজার এক মন্ত্রী আছে। ঐ মন্ত্রীর অত্যন্ত সুন্দরী আর গুণবতী এক মেয়ে আছে। সুল্‌তান তার রূপের কথা জানতে পেরে একদিন মন্ত্রীকে বল্‌লেন, 'আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব। তুমি কি এতে অরাজী হবে?' মন্ত্রী কখনই সুল্‌তানের মুখ হতে এমন কথা শোন্‌বার আশা করেননি। এবং যদিও তাঁর অবস্থায় অন্য কেহ আনন্দের সঙ্গেই এতে রাজী হত তথাপি তিনি আহ্লাদের বদলে দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন, 'হে সুল্‌তানপ্রবর, আমি আপনার এত অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র নয়। আপনি জানেন যে, আমার আর-এক ভাই ছিলেন। তিনিও সৌভাগ্যক্রমে আমার মত আপনার মন্ত্রী ছিলেন। আমাদিগের কোনো বিষয়ে ঝগড়া হওয়াতে তিনি আমাকে ছেড়ে বিদেশে চলে যান। আমি শুনেছি যে, তিনি বালসোরা রাজার প্রধান মন্ত্রীর কাজ নিয়েছিলেন আর এক ছেলে রেখে সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। আমাদের দুজনের ছেলেমেয়ের পরস্পর বিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা ছিল, আর আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, তিনি মর্‌বার সময় এই ইচ্ছা জানিয়ে গিয়েছেন এখন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে চাই। তাই

আমি বিনীতভাবে এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ভিক্ষা কর্ছি।' মন্ত্রী এইরূপে সুল্তানের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করাতে সুল্তান অত্যন্ত রেগে বল্লেন, 'তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্বার জন্যে আমি যে নিজেকে নীচু কর্ছি তার কি এই উত্তর? তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য লোককে মেয়ের বর ঠিক করতে সাহসী হয়েছ, এ-অপমানের

দৈত্য তাঁহার রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল

কি করে প্রতিশোধ নিতে হয় তা আমি বেশ জানি। আমি শপথ কর্ছি, আমার ক্রীত-দাসের মধ্যে সবচেয়ে যে অধম তারি সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে।' সুল্তান এই-কথা বলে রাগ করে মন্ত্রীকে তাঁর কাছ হতে চলে যেতে বল্লেন। মন্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। সেইদিনেই সুল্তান নিজের এক কুৎসিত কুঁজো দাসকে আনিয়ে তার সঙ্গে

প্রধান মন্ত্রীর সুন্দরী মেয়ের বিবাহ ঠিক করে নিজের সাম্‌নে সাক্ষী রেখে সম্বন্ধপত্রাদি লেখালেন। এই-বিবাহের সব আয়োজন করা হয়েছে, সেই কুঁজো বর এখান স্নানের ঘরে রয়েছে, এবং তাকে কনের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে মিশরদেশের বড় বড় যত লোকের সব চাকরবাকর জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে। যখন আমি কায়রোনগর হতে এখানে আসি সেই সময়ে দেখেছি, যেখানে ঐ কুজোর সঙ্গে মন্ত্রী-কন্যার বিবাহ হবে সেইখানে তাকে কনে সাজিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক মেয়ে এসে জুটেছে। আমি নিজের চোখে সেই মেয়েকে দেখেছি এবং নিশ্চয় বলতে পারি যে, তাকে দেখ্‌লে প্রশংসা করতেই হবে।"

পরীর কথা শেষ হইলে, দৈত্য বলিল, "তুমি যতই কেন বল না, এই ছেলের চেয়ে যে সে মেয়ে বেশী সুন্দরী তা কখনই আমার বিশ্বাস হয় না।" পরী বলিল, "আমি এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কারণ আমি স্বীকার করছি যে, এরা দুজনেই সুন্দর আর এই ছেলের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত। আমি আরও ভাব্‌ছি যে, মিশরের রাজার অবিচারে বাধা দিয়ে কুজোর বদলে এই ছেলের সঙ্গে সেই রূপবতী মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। দৈত্য বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ, আর এ-রকম ভাল কথা বলার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরবাধিত হলাম। এখন এস আমরা সুল্‌তানকে জব্দ করে দুঃখিত পিতার মনে শান্তি এনে দিই, আর তাঁর মেয়ে এখন নিজেকে যে পরিমাণে অসুখী মনে করছে তাকে সেই পরিমাণে সুখী করি। এ-জাগ্‌বার আগেই আমি একে কায়রোনগরে নিয়ে যাচ্ছি আর তার পর সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।"

এইরূপে দুজনে নিজেদের কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ ঠিক করিলে, দৈত্য আস্তে আস্তে বেদ্‌রুদ্দীন হুসেনকে তুলিয়া আকাশে উড়িয়া চলিল। যেখানে চাকরেরা কুঁজোর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সেইখানে যাইয়া স্নানের ঘরের দরজায় তাঁহাকে নামাইয়া দিল। বেদ্‌রুদ্দীন জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে অজানা জায়গায় দেখিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিবার জোগাড় করিতেছেন এমন সময় দৈত্য তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে বারণ করিল। পরে দৈত্য তাঁহার হাতে এক মশাল দিয়া বলিল, "তুমি এই আলো নিয়ে স্নানের ঘরের দরজায় যে-সব লোক আছে তাদের সঙ্গে মিলে যাও; তারা বিয়ে দিতে যাচ্ছে, যতক্ষণ বিয়ের সভায় না পৌঁছবে ততক্ষণ তাদের পিছন পিছন যেও। বর কুঁজো, সুতরাং তুমি তাকে অনায়াসেই চিন্‌তে পার্‌বে। যাবার সময়ে তুমি সকলের ডানদিকে থেকো। তোমার পকেটে যে মোহরের থলি আছে সেটা খুলে রেখো আর যাবার সময় গায়িকা আর নাচ-ওয়ালীদের মোহর বিলিও। বিয়ের সভায় পৌঁছেও সেখানে কনের দাসীদের মোহর দিও! প্রত্যেকবারেই মুঠি ভরে তুলতে যেন মনে থাকে। আমি যেমন বল্‌লাম সেইরকম সব কোরো; কারও কাছে ভয় পেও না। বাকী কাজের ভার আমাদের উপর রইল।"

বেদ্‌রুদ্দীন কি করিতে হইবে সব ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া স্নানের ঘরের দরজার দিকে চলিলেন। সেখানে প্রথমেই নিজের মশাল জ্বালিয়া চাকরদের সঙ্গে মিলিয়া গেলেন।

পরে কুঁজো বর আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিলে তিনিও সকলের সঙ্গে তাহার পিছন পিছন চলিলেন।

বরের সাম্নের গায়িকা ও নাচওয়ালীদের কাছে গিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে মোহর বিলাইতে লাগিলেন। তিনি যে-রকম ভদ্রতার সঙ্গে সকলকে মোহর দিতেছিলেন তাহাতে সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল।

শেষে সকলে সমসুদ্দীনের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। তাঁহার ভাইপোও যে এইসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সমসুদ্দীন ইহা স্বপ্নেও জানিতেন না। সে যাহা হউক, দারোয়ানগণ গোলমাল বন্ধ করিবার জন্য মশালদারদের ভিতরে ঢুকিতে দিল না। সুতরাং বেদ্রুদ্দীনও যাইতে পাইলেন না। কিন্তু গায়িকা ও নাচওয়ালীরা তাঁহাকে না লইয়া ঢুকিতে রাজী হইল না। তাহারা কৌশল করিয়া তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে লইয়া দারোয়ানদিগকে লুকাইয়া ভিতরে ঢুকিল। পরে তাহারা তাঁহার হাত হইতে মশাল লইয়া তাঁহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। তার পর মন্ত্রীর মেয়ের সাম্নের দামী গদী-মোড়া আসনে সমাসীন কুঁজো বরের ডান পাশে তাঁহাকে বসাইয়া দিল।

কুঁজো বরের ডান পাশে তাহাকে বসাইয়া দিল

মন্ত্রীকন্যা যদিও অতিশয় রূপবতী ছিলেন তবুও সে-সময় তাঁহার মুখে কেবল বিরক্তি ও দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নাই। বর ও কনে মাঝখানে সবার উঁচু আসনে বসিয়া

ছিলেন ; তাঁহার দু-পাশে নিজের নিজের মর্য্যাদা-মত রাজ্যের অন্যান্য বড়ঘরের মেয়েরা এক-এক বাতি হাতে করিয়া বসিয়া ছিলেন।

বেদরুদ্দীনের চেহারা এমন সুন্দর ছিল যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; তাঁহার মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সকলেই তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল, এবং প্রত্যেকেই তাঁহাকে মনে মনে স্নেহ ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

বেদরুদ্দীন ও কুঁজো বরের এ-রকম চেহারার প্রভেদ দেখিয়া সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল যে, "এই সুন্দর ছেলেটিই বর হবার উপযুক্ত পাত্র।" তাহারা ঠাট্টা করিয়া কুঁজো বরকে অত্যন্ত অপ্রতিভ করিতে লাগিল ; ইহাতে সকলে আহ্লাদিত হইয়া এমন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল যে, কিছুক্ষণের জন্য সেখানে গান বন্ধ হইয়া গেল। শেষে গায়কগণ আবার গান আরম্ভ করিল, এবং দাসীরা আসিয়া কনের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল।

সেখানকার নিয়ম অনুসারে বিবাহের সময় কনেকে সাতবার পোশাক বদলাইতে হয়। মন্ত্রীকন্যা নিজের দাসীদের সঙ্গে কুঁজোর দিকে একবারও না চাহিয়া প্রত্যেকবারে [illegible] পোশাক পরিয়া বেদরুদ্দীনের সামনে আসিতে লাগিলেন। বেদরুদ্দীন ও দৈত্যের উপদেশমত গায়িকা, নাচওয়ালী ও দাসীদের মোহর বিলাইতে লাগিলেন।

পোশাক বদলানো শেষ হইলে সঙ্গীত বন্ধ হইল, এবং সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেল ; বর, বেদরুদ্দীন ও অন্যান্য কয়েকজন লোক ছাড়া সেখানে আর কেহই ছিল না। কনে বাসরঘরে চলিয়া গেলেন, কাপড় ছাড়াইবার জন্য তাঁহার দাসীরাও তাঁহার সঙ্গে চলিল। বেদরুদ্দীন এখন সেখানে অপেক্ষা করা অন্যায় মনে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে-ছিলেন, কিন্তু তিনি এই-ঘরের বাহিরে আসিতে-না-আসিতেই দৈত্য ও পরী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বারণ করিল, এবং তাঁহাকে বলিল, "এরপর তুমিই সেই সুন্দরী মন্ত্রীকন্যার বর হবে।"

যে সময়ে পরী এই-রকম বেদরুদ্দীনকে উৎসাহিত করিতেছিল ও তাঁহাকে কি করিতে হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দিতেছিল, সেই সময়ে বর সেখান হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। ঐ অবসরে দৈত্য এক ভয়ানক বিড়ালের রূপ ধরিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বর তাহাকে তাড়াইবার জন্য হাততালি দিল, কিন্তু পালানো দূরে থাকুক, সে পিছনের পায়ে ভর দিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। তাহার চোখ হইতে যেন আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইতে লাগিল। আরও জোরে চীৎকার করিতে করিতে সে কিছুক্ষণ পরেই এক গাধার মূর্ত্তি ধরিল। ইহা দেখিয়া কুঁজো অত্যন্ত ভয় পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটিও কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। তখনই দৈত্য এক বড় মহিষের চেহারা ধরিল। বর আগেই খুব ভয় পাইয়াছিল ; এখন আবার এই রূপ দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া মাটিতে পড়িয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "হে মহিষবর !

আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?” দৈত্য বলিল, “তোমার সর্ব্বনাশ হোক্! আমার মনিবের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে চাও, এত স্পর্দ্ধা ?” সে বলিল, “প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি আমাকে যা বল্‌বেন আমি তাই কর্‌ব।” দৈত্য বলিল, “যদি তুমি এখান থেকে কোথাও যাও অথবা সূর্য্য উঠ্‌বার আগে একটিও কথা বল তা হ'লে তোমার জীবন নষ্ট হবে।” এই বলিয়া দৈত্য মানুষের মূর্ত্তি ধারিয়া তাহার মাথা নীচে ও পা উপরে করিয়া দেয়ালের কাছে তাহাকে রাখিয়া বলিল, “আমি তোমাকে যেমন বলেছি যদি সূর্য্য উঠ্‌বার আগে অন্য কিছু কর তা হলে তোমাকে মেরে ফেল্‌ব।”

ওদিকে দৈত্য ও পরীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বেদ্রুদ্দীন আবার সেইখানে ফিরিয়া গেলেন; পরে সেখান হইতে কনের ঘরে উপস্থিত হইয়া সেখানে বসিয়া নিজের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার আশা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক বুড়ী দাসীর সঙ্গে কনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়ী তাঁহাকে দরজার কাছে রাখিয়াই চলিয়া গেল, ঘরের ভিতর বেদ্রুদ্দীন কি কুঁজো বর আছে সে তাহা চাহিয়াও দেখিল না।

মন্ত্রীকন্যা কুঁজোর বদলে ঐ সুন্দর লোকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। যুবক বলিলেন, “সুন্দরী! আমি কি করে তোমার সাম্‌নে এসেছি এখন সেই কথা বল্‌বার সময় হয়েছে। তোমার বাবার সঙ্গে কেবল ঠাট্টা কর্‌বার জন্যে সুল্‌তান এ-রকম কৌশল করেছিলেন। বাস্তবিক তিনি অনুগ্রহ করে আমাকেই তোমার বর ঠিক করেছেন। এই মজার ব্যাপারে সকলেই যে কি-রকম আহ্লাদিত হয়েছে তা বোধ হয় তুমি নিজের চোখে দেখেছ। সেই কুঁজোকে আগেই আমরা এখান থেকে বিদায় করে দিয়েছি। সে আর এখানে আস্‌বে না, অতএব তার ভাব্‌না ভেবে আর মনকে বৃথা কষ্ট দিও না।”

মন্ত্রীর মেয়ে ঘরে ঢুকিবার সময়ে একেবারে গম্ভীর হইয়া ছিলেন, এখন এই-কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহাতে তাঁহার মুখ এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে, বেদ্রুদ্দীন সেই রূপ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সূর্য্য উঠিবার একটু আগে যখন বর কন্যা দুজনেই ঘুমাইতেছে, সেই সময়ে দৈত্য পরীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, “এখন এই ছেলেটিকে অন্য জায়গায় নিয়ে চল।”

তখন পরী বেদ্রুদ্দীনকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তুলিয়া লইয়া আকাশের পথে সিরিয়া দেশের ডামস্কস্ নগরের দরজায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেখানে নামাইয়া রাখিল। সেই সময়ে মস্‌জীদের কর্ম্মচারিগণ সকলকে নমাজ পড়িবার জন্য ডাকিতেছিল। নগরের দরজা খোলা হইলে সেখানে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। বেদ্রুদ্দীনকে সেই অবস্থায় মাটিতে ঘুমাইতে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত অবাক্ হইল। বেদ্রুদ্দীনও জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে এক নগরের দরজায় অনেক লোকের মধ্যে দেখিয়া তাহাদেরই মত অবাক্ হইলেন। পরে তিনি বলিলেন, “আমি কোথায় এসেচি এবং তোমরাই বা কে ?” তাহাতে ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল, “তুমি কি জান না যে, তুমি ডামস্কস্ নগরের দরজায় রয়েছ ?” বেদ্রুদ্দীন

বলিলেন, "ডামস্কস্ নগরের দরজায়! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ, কারণ গত রাত্রিতে ঘুমাইবার সময় আমি কায়রোনগরে ছিলাম।" একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস! তুমি এ কি অসম্ভব কথা বলছ? আজ সকালে যখন ডামস্কসে রয়েছ, তখন গত রাত্রিতে তোমার কায়রোনগরে থাকা কি করে সম্ভব হতে পারে?" বেদ্‌রুদ্দীন বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বল্‌ছি, আর আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, কাল সমস্ত দিন আমি বালশোরায় কাটিয়েছি।" তাঁহার এই কথা শেষ হইতে-না-হইতেই সকলে চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং একজন বলিল, "বৎস! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েছ; তুমি কিছুই ভেবে বলছ না। এও কি কখন সম্ভব হতে পারে যে, তুমি কাল দিনের বেলা বালশোরায় ও রাত্রিতে কায়রোতে ছিলে আর আজ ডামস্কে উপস্থিত হয়েছ? নিশ্চয়ই তুমি এখনও ঘুমচ্ছ; সম্প্রতি এখন জেগে ওঠ।" বেদ্‌রুদ্দীন বলিলেন, "আমি যা বল্‌ছি তা এতদূর সত্য যে, কাল রাত্রিতে কায়রোতে আমার বিয়ে পর্য্যন্ত হয়েছে; এবং প্রত্যেক বারেই নূতন পোষাক পরে সাতবার আমার স্ত্রী আমার সাম্‌নে এসেছিলেন আর আমি তাঁকে এক কুঁজো বরের হাত থেকে রক্ষা করেছি। তা ছাড়া কায়রোতে আমার যে পোষাক আর মোহরের থলি ছিল তাই বা কোথায় গেল, জান্‌তে পার্‌ছি না।"

বেদ্‌রুদ্দীন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই-সকল কথা বলিয়া নগর-মধ্যে ঢুকিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পিছন হইতে 'পাগল, পাগল' বলিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ জান্‌লা, কেহ বা দরজা হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; কেহ কেহ বা ভিড়ের মধ্য হইতে আসিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া পথের পাশের এক মিঠাইওয়ালার দোকানে ঢুকিলেন। তিনি কে এবং কি-জন্য সেখানে আসিয়াছেন, মিঠাইওয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। বেদ্‌রুদ্দীন নিজের বিষয় যাহা জানিতেন, সমস্তই অবিকল তাহার কাছে বলিলেন।

মিঠাইওয়ালা বলিল, 'তোমার ইতিহাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য। তুমি যদি আমার পরামর্শ নাও তা হলে তুমি এ-সব কথা আর কারও কাছে না বলে যতদিন না কপাল ফেরে ততদিন চুপ করে থাক। তুমি ততদিন আমার কাছে থাক্‌লে আমি খুব খুসী হব। আমার ছেলে নেই। যদি তোমার মত হয়, তা হলে আমি তোমাকে পোষ্যপুত্র নিই। তা হলে তুমি স্বচ্ছন্দে শহরে চলতে ফির্‌তে পার্‌বে, কেউই তোমাকে বিরক্ত কর্‌তে পার্‌বে না।"

নিজের অবস্থা দেখিয়া বেদ্‌রুদ্দীন অগত্যা তাহার এই কথায় রাজী হইলেন। তাহাতে মিঠাইওয়ালা তাঁহাকে কাপড়চোপড় দিয়া কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে কাজীর কাছে গিয়া তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইল। তার পর হুসেন নাম লইয়া বেদ্‌রুদ্দীন তাহার কাছে থাকিয়া তাহার ব্যবসায় শিখিতে লাগিলেন।

এদিকে মন্ত্রীর কন্যা সকালে উঠিয়া বেদ্‌রুদ্দীনকে সেখানে না দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, পাছে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার স্বামী আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া

বাহিরে গিয়াছেন কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। এমন সময় মন্ত্রী সুল্‌তানের সেইরূপ অন্যায় ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নিজের চোখে মেয়ের দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য তাঁহার দরজায় আসিয়া ঘা দিতে লাগিলেন। তিনি মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকাতে মেয়ে বাবার গলার স্বর চিনিতে পারিয়া শীঘ্র উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার হস্তচুম্বন করিয়া এমন আনন্দ দেখাইতে লাগিলেন যে, মন্ত্রী তাহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

মন্ত্রীর কন্যা তাঁহার আনন্দে পিতাকে অসন্তুষ্ট হইতে দেখিয়া কহিলেন "বাবা, আমি মিনতি কর্‌ছি আপনি আমাকে শুধু-শুধু বক্‌বেন না। সেই হতভাগা দাসের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। সকলেই তাকে ঘৃণা আর ঠাট্টা করে এমন অপ্রতিভ করেছিল যে, সে লজ্জা পেয়ে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়েছে, আর তার বদলে এক সুন্দর, বড়ঘরের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।" সম্‌সুদ্দীন বলিলেন, "তুমি আমাকে কি গল্প শোনাচ্ছ?" কর্কশ-স্বরে এই কথা বলিয়া তিনি ঐ সুন্দর ছেলেকে খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, সেই কুৎসিত দাস পা উপরে ও মাথা নীচে করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি! কে তোমাকে এমনভাবে রেখেছে?" সে বলিল, "মশায়। সূর্য্য উঠ্‌বার আগে আমার কোথাও যাবার বা কিছু বল্‌বার অধিকার নেই। কাল রাত্রিতে আমি যখন আপনার এই খাড়ীতে ছিলাম, সেই সময় হঠাৎ এক বেরাল সাম্‌নে এসে মুহূর্ত্তের মধ্যেই এক মহিষের রূপ ধর্‌ল। সে আমাকে যা বলেছে আমি এখনও তা ভুলিনি। অতএব আমাকে একলা রেখে অনুগ্রহ করে আপনি এখান থেকে চলে যান!" মন্ত্রী তাহার কথায় সেখান হইতে না গিয়া তাহার হাত ধরিয়া সোজা করিয়া দাঁড় করাইলেন। কিন্তু সেই কুঁজো সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র পিছন দিকে একবার চাহিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে সুল্‌তানের কাছে হাজির হইয়া সব-কথা বলিল। সুল্‌তান তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সম্‌সুদ্দীন আরও আশ্চর্য্য হইয়া মেয়ের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৎসে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের বিষয়ে তুমি কি আমাকে আর কিছুই বেশী বল্‌তে পার না?" কন্যা বলিলেন, "বাবা, আমি যা বলেছি তার বেশী আর কিছুই জানি না। এখানে আমার স্বামীর পোষাক রয়েছে। বোধ হয় এইগুলির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যাতে আপনার সন্দেহ দূর হতে পারে।" এই-কথা বলিয়া মন্ত্রীর কন্যা বেদ্রুদ্দীনের পাগ্‌ড়ী সম্‌সুদ্দীনের হাতে দিলেন। তিনি তাহার সমস্ত ভাগ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো মন্ত্রীর পাগ ড়ী হবে, পরে তাহার মধ্যে কোনো জিনিষ আছে, এই ভাবিয়া তিনি পাগড়ী খুলিয়া ফেলাতে দেখিতে পাইলেন, নুরুদ্দীন মরিবার সময়ে ছেলেকে যে বইখানি দিয়াছিলেন তাহা উহার মধ্যে রহিয়াছে।

সম্‌সুদ্দীন তাহা খুলিয়া তাঁহার ভাইয়ের হাতের লেখা দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং "আমার পুত্র বেদ্রুদ্দীন হুসেনের জন্য" এই কয়টি কথা পড়িলেন। এমন সময় তাঁহার

বস্তা পোষাকের মধ্যে যে মোহরের থাল ছিল, তাহা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সুমুদ্দীন খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহা মোহরে ভরা রহিয়াছে। যদিও বেদরুদ্দীন সারাক্ষণই মোহর বিলাইয়াছিলেন, তবু ও দৈত্য ও পরীর অনুগ্রহে তাহা কিছুই কমে নাই। তিনি তাহার ভিতরের একখানি কাগজে "আইজাক ইহুদীর এক হাজার মোহর" এই কয়টি কথা

সেই কুৎসিত দাস পা উপরে ও মাথা নীচে করিয়া রহিয়াছে

পড়িলেন, এবং তাহার নীচে আবার ইহুদীর হাতে লেখা "আমার প্রভু বেদরুদ্দীন হুসেনকে তাঁহার পিতার যে বাণিজ্যজাহাজ সবার আগে বন্দরে পৌঁছিবে। তাহার মূল্যস্বরূপ দেওয়া হইল" এই অংশটি পড়িলেন। তিনি এই-সকল পড়িবামাত্র একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পরে সমসুদ্দীন নিজের মেয়ে ও দাসীদের সেবায় আবার জ্ঞান লাভ করিয়া বলিলেন, "বৎসে! আমার প্রিয় ভাইপোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। আর এই এক হাজার মোহর

দেশে যৌতুক নিয়ে আমাদের সেই ঝগ্‌ড়ার কথাও এখন মনে পড়্‌ছে। যাঁর অনুগ্রহে এই-সব আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটেছে, এখন সেই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।" তার পর তিনি ভাইয়ের হাতের লেখা কাগজখানি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তিনি ঐ বইখানি সমস্ত পড়িয়া সব-কথা জানিতে পারিলেন। উহাতে তাঁহার ভাইয়ের বালশোরায় যাওয়া, বিয়ে এবং ছেলের জন্মের তারিখ স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে। তখন নিজের বিবাহ ও কন্যার জন্মের তারিখের সঙ্গে ঐ তারিখগুলি মিলিয়া যাইতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন।

বিধাতার এই আশ্চর্য্য বিধান দেখিয়া তিনি এত আহ্লাদিত হইলেন যে, তখনই সেই বই ও থলি লইয়া সুল্‌তানের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। তাহাতে সুল্‌তান মন্ত্রীর আগেকার অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়রা যাহাতে এ-সব কথা জানিতে পারে সেইজন্য বিবাহের সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিলেন।

এদিকে সম্‌সুদ্দীন কিছুতেই তাঁহার ভাইপোর চলিয়া যাওয়ার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহ তাঁহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সমস্ত কায়রোনগর খোঁজ করাইলেন। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তাঁহার সংবাদ পাইলেন না দেখিয়া তাঁহার চিন্তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

তিনি এইরূপে যখন একেবারে নিরাশ হইলেন, তখন মনে মনে বলিলেন, "সমস্ত ঘটনার মধ্যে এই বিষয়টি সবচেয়ে আশ্চর্য্য।" পরে কন্যার মুখে যেমন শুনিয়াছিলেন সেই-সব কথা নিজের হাতে লিখিয়া রাখিলেন, এবং বেদরুদ্দীনের পাগ্‌ড়ী, মোহরের থলি ও অন্যান্য পোষাক একসঙ্গে করিয়া এক-ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরে যথাসময়ে মন্ত্রীর কন্যার একটি ছেলে হইল, সম্‌সুদ্দীন দৌহিত্রের নাম আজীব রাখিলেন। আজীব বড় হইয়া নিজের সমান বয়সের অন্যান্য ছেলেদের বাপের আদর পাইতে ও বাপের কোলে চড়িতে দেখিয়া মায়ের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমার বাবা কোথায়, তিনি কেন এসে আমায় কোলে নেন না?" ইহাতে মন্ত্রীর কন্যার দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিল। এই-রকম প্রায়ই ঘটিত। একদিন মন্ত্রী হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে গিয়া মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজীব যেভাবে নিজের পিতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহার মা তাহা সমস্তই বলিলেন। সম্‌সুদ্দীন ইহাতে মহা দুঃখিত হইয়া তখনই সুল্‌তানের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বেদরুদ্দীনের খোঁজ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন।

সুল্‌তান তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার কথায় রাজী হইলেন, এবং বেদরুদ্দীন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন সে-বিষয়ে সাহায্য করিতে অন্তর্দেশী রাজাদের এক-একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। সম্‌সুদ্দীন তাহা হাতে করিয়া সুল্‌তানের

কাছে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিদেশে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, এবং চারি দিন পরে তিনি কন্যা ও দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া কায়রোনগর হইতে বাহির হইলেন।

তাঁহারা উনিশ দিন ক্রমাগত চলিবার পর কুড়ি দিনের দিন ডামস্কসের কাছে এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সেখানে তাঁবু ফেলিলেন। মন্ত্রী সেখানে দুই দিন থাকিবেন ঠিক করিয়া সঙ্গের লোকজনকে নগর দেখিতে যাইবার অনুমতি দিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা শুধু সহর দেখিতে, কেহ বা মিসরদেশীয় জিনিষ বেচিবার ইচ্ছায়, কেহ বা সেখানকার জিনিষ কিনিবার ইচ্ছায় নগরের মধ্যে ঢুকিল। মন্ত্রী-কন্যাও একজন চাকর সঙ্গে দিয়া আজীবকে নগর দেখাইতে পাঠাইলেন।

আজীব দামী পোষাক পরিয়া বেত্রধারী চাকরের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা নগরের মধ্যে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই আজীবের রূপে মুগ্ধ হইয়া চারিদিক হইতে লোক তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বেদ্‌রুদ্দীনের দোকানের সাম্‌নে আসিয়া ভিড় এত বেশী হইল যে, তাহারা আর চলিতে পারিল না।

যে-মিঠাইওয়ালা বেদ্‌রুদ্দীনকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিল সে কয়েক বৎসর আগে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বেদ্‌রুদ্দীনকে দিয়া মারা গিয়াছিল। সুতরাং বেদ্‌রুদ্দীন এখন নিজেই সেই দোকান চালাইতেছিলেন। তিনি এমন ভালভাবে নিজের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সে-সময়ে ডামস্কস্ নগরে তাঁহার খুব নামডাক হইয়াছিল। বেদ্‌রুদ্দীন নিজের দরজার কাছে আজীবকে দেখিবার জন্য এমন ভিড় জমিতে দেখিয়া নিজেও ব্যাপার কি দেখিবার জন্য একটু বাহিরে আসিলেন।

আজীবকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি বেদ্‌রুদ্দীনের অত্যন্ত স্নেহ হইল। তাহাতে তিনি নিজের কাজ ছাড়িয়া তাহাকে বলিলেন, "আপনারা দয়া করে যদি একবার আমার দোকানে পায়ের ধূলো দিয়ে একটু মিষ্টিমুখ করেন, তা হলে আমি কৃতার্থ হই।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজীব তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "এই লোকটি অত্যন্ত কাতরভাবে আমাদের ডাক্‌ছে, এস আমরা এর দোকানে গিয়ে একটু মিঠাই খেয়ে আসি।" রক্ষক বলিল, "তোমার মত মন্ত্রীর ছেলের মিঠাইওয়ালার দোকানে বসে খাওয়া মোটেই উচিত নয়।" বেদ্‌রুদ্দীন এই কথা শুনিবামাত্র রক্ষককে বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু! তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, তোমার প্রভু আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাতে চাইছেন তাতে তাঁকে বারণ কোরো না। তা হলে আমি তোমার চেহারা বদ্‌লে ফরসা করে দেব।" এই-কথায় আজীবের চাকর হাসিয়া উঠিল, এবং আজীবকে সঙ্গে লইয়া বেদ্‌রুদ্দীনের দোকানে গিয়া ঢুকিল। বেদ্‌রুদ্দীন ইহাতে অতিশয় খুসী হইলেন, এবং নিজের আল্‌মারী হইতে একখানি পিঠা লইয়া তাহার উপর চিনি এবং ডালিমের রস দিয়া একটি থালায় করিয়া আজীবের সাম্‌নে রাখিলেন। আর ঐ-রকম একখণ্ড রক্ষককে দিলেন। তাহারা দুজনেই সেই পিঠার অত্যন্ত প্রশংসা করিল

যখন তাহারা দুজনে পিঠা খাইতেছিল, সেই সময় বেদ্‌রুদ্দীন মন দিয়া আজীবকে দেখিতেছিলেন। বার বার দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, স্ত্রীর কাছ হইতে হঠাৎ চলিয়া না আসিলে, বোধ হয় আমারও এতদিনে এরকম একটি ছেলে হইত। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি আজীবকে তাঁহার ডামস্কসে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সময় ছিল না বলিয়া বালক তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। কারণ, তাহার চাকর খাওয়া শেষ হইবামাত্র তাহাকে লইয়া নিজেদের তাঁবুতে চলিয়া গেল। সম্‌সুদ্দীন নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ডামস্কসে আসিবার তিন দিনের পরই সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং নদী পার হইয়া শেষে বালশোরায় উপস্থিত হইলেন। সুল্‌তান তাঁহাকে নিজের কাছে আসিতে অনুমতি দিলেন এবং আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বালশোরায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্‌সুদ্দীন বলিলেন, "রাজন্! আপনার আগেকার মন্ত্রী আমার ভাই। নুরুদ্দীনের এক ছেলে ছিল। সম্প্রতি আমরা তার খবর নিতে এসেছি।" সুল্‌তান বলিলেন, "অনেকদিন হল নুরুদ্দীন মারা গিয়েছেন। তাঁর মারা যাবার দুমাস পরেই বেদ্‌রুদ্দীন হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছে, অনেক খোঁজ করেও এ-পর্য্যন্ত তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার মা আমার আর-এক মন্ত্রীর মেয়ে, এখনও বেঁচে আছেন আর তাঁর স্বামী যে-বাড়ীতে থাক্‌তেন সেই বাড়ীতেই আছেন।" সম্‌সুদ্দীন তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীকে মিসরদেশে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, এবং অনুমতি পাইবামাত্র সেই দিনই তাঁহার বাড়ী খোঁজ করিয়া মেয়ে এবং দৌহিত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর দরজায় ঢুকিবামাত্রই যে-পাথরের উপর তাঁহার ভাইয়ের নাম সোনার অক্ষরে লেখা ছিল তাহা চুম্বন করিলেন। তিনি ভাই-বৌয়ের সঙ্গে কথা বলিতে চাওয়াতে চাকর আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেল। মন্ত্রীর স্ত্রী অনেকদিন হইল ছেলের কোনো খবর না পাইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে ঠিক করিয়া তাহার সমাধিস্বরূপ একটি ঘর তৈয়ারী করিয়া দিনরাত কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। সম্‌সুদ্দীন তাঁহার কাছে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার ছেলের কবরের উপর ক্রমাগত চোখের জল ফেলিতেছেন, এবং শোকে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ভাইয়ের স্ত্রীকে উচিত সম্মান দেখাইলেন এবং দুঃখ করিতে বার বার বারণ করিলেন। তাঁহার কাছে নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আপনার ছেলে আজও বেঁচে আছে আর তার খোঁজ করাই আমার বালশোরায় আস্‌বার প্রধান উদ্দেশ্য।" নুরুদ্দীনের স্ত্রী এই-কথা শুনিয়া অতিশয় খুসী হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিয়া চাকরদের জিনিষপত্র গুছাইতে আজ্ঞা দিলেন। ইহার মধ্যে সম্‌সুদ্দীন সুল্‌তানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিয়া সেখানে অনেক সম্মান পাইয়া আবার ডামস্কস্ নগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

ডামস্কসের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি সহরের এক দরজার বাহিরে নিজের তাঁবু ফেলিবার আজ্ঞা দিয়া আগের বারের মত সেখানে তিন দিন থাকিবার ইচ্ছা জানাইলেন।

যে-সময় তিনি বড় বড় বণিকদের কাছে ভাল ভাল জিনিষ কিনিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে আজীব আগের বার সময় ছিল না বলিয়া যে-সকল জিনিষ দেখিতে পায় নাই, তাহা দেখিবার জন্য ও সেই মিঠাইওয়ালার কি হইয়াছে জানিবার জন্য তাহাকে নগরে লইয়া যাইতে রক্ষককে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল। রক্ষক মন্ত্রী-কন্যার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আজীবকে লইয়া নগরে ঢুকিল।

তাহারা প্রধান প্রধান দেখিবার জায়গা দেখিয়া নগরের এক প্রধান মস্‌জীদে গিয়া আপনাদিগের বিকালের উপাসনাদি করিল। পরে বেদ্‌রুদ্দীনের দোকানের সাম্‌নে দিয়া যাইবার সময় আজীব বেদ্‌রুদ্দীনকে ডাকিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনাকে নমস্কার, আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পারেন?" বেদ্‌রুদ্দীন তাহার কথা শুনিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্র আগের মত স্নেহের ভরে একেবারে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এ-জীবনে আমি আপনাকে কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না। অনুগ্রহ করে আপনার চাকরের সঙ্গে একবার আমার দোকানে এসে একখানি পিঠে খেয়ে যান্‌।" তাঁহার কথায় আজীব রক্ষকের সঙ্গে দোকানে ঢুকিল।

বেদ্‌রুদ্দীন প্রথমবারের মত এবারেও তাহাদের সুমিষ্ট পিঠা দিলেন। তিনি ঐ পিঠা নিজে না খাইয়া তাহা দিয়া কেবল অতিথি-সেবা করিতেন। খাওয়া শেষ হইলে বেদ্‌রুদ্দীন তাহাদের হাত ধুইতে জল দিলেন। তাহার পর তিনি একটি পাত্রে বরফ-মিশানো সর্‌বৎ ঢালিয়া তাহা আজীবের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা গোলাপ-জলের সর্‌বৎ। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি আপনি কখনই এমন ভাল সর্‌বৎ পান করেননি।" আজীব আহ্লাদের সহিত তাহা পান করিলে বেদ্‌রুদ্দীন তাহার হাত হইতে পাত্র লইয়া আবার তাহা ভরিয়া রক্ষকের হাতে দিলেন। রক্ষকও তাহা আগ্রহ-সহকারে পান করিল।

শেষে দেরি হইয়া যাওয়াতে আজীব ও রক্ষক দুজনেই বেদ্‌রুদ্দীনকে ধন্যবাদ দিয়া নিজেদের তাঁবুর দিকে চলিল। তাহারা ফিরিবামাত্র আজীবের ঠাকুরমা মহানন্দে আজীবকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার ছেলের চেহারা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিত। সুতরাং আজীবকে কোলে লইবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমার মত তোমার বাবাকে কোলে পেলে আমার আনন্দের আর সীমা থাক্‌ত না।" তিনি আজীবকে নিজের কাছে বসাইয়া তাহাদের নগর-বেড়ানোর অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে আজীবের ক্ষুধা পাওয়াতে তিনি তাহাকে নিজের হাতের তৈয়ারী সুমিষ্ট পিঠা খাইতে দিলেন। কিন্তু আজীব তাহা খাইয়া বিশেষ প্রশংসা না করাতে তিনি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার নিজের হাতের পিঠের এত অনাদর কর্‌ছ কেন? তুমি নিশ্চয় জেনো যে, আমি আর

আমার ছেলে ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ এমন পিঠে কর্‌তে পারে না।" আজীব বলিলেন, "আপনি রাগ কর্‌বেন না, আজ আমরা এই সহরের এক মিঠাইওয়ালার দোকানে যে পিঠে খেয়েছি তা এর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট।" কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য আজীব এমন কথা বলিতেছে, তাঁহার পিতামহী এই ভাবিয়া বলিলেন, "আমার পিঠের চেয়ে যে তার পিঠে ভাল তা আমি নিজে পরীক্ষা করে না দেখলে বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়ে সেই মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে আমার জন্যে একখানি পিঠে কিনে আন।"

চাকর তৎক্ষণাৎ বেদ্‌রুদ্দীনের দোকানে গিয়া একখানি ভাল পিঠা কিনিল এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তাহা নুরুদ্দীনের স্ত্রীর হাতে দিল। তিনি তাহা খাইবামাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িলেন। পরে জ্ঞান লাভ করিয়া বলিলেন, "এই পিঠে নিশ্চয়ই আমার ছেলে বেদ্‌রুদ্দীনেরই হাতের তৈরী।"

"এই পিঠে আমার ছেলের তৈরী" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া সমসুদ্দীন খুব খুসী হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাজ ভুল করিয়া থাকিতেও পারেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার ছেলের মত কি পৃথিবীতে আর কেউ পিঠে কর্‌তে পারে না?" তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, পৃথিবীতে এমন লোক থাক্‌তে পারে যে এইরকম ভাল পিঠে কর্‌তে জানে। কিন্তু আমি যে মসলা দিয়ে পিঠে করি, তা কেবল আমার ছেলেই আমার কাছে শিখেছে। কাজেই আমি জান্‌তে পার্‌লাম, এ পিঠে আমার ছেলে ছাড়া আর কারও তৈরী নয়। ভাই! এস এখন আমরা সকলে আমোদ-প্রমোদ করি, এতদিনের পর আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হল।" মন্ত্রী বলিলেন, "বোন্! এখন একটু ধৈর্য্য ধরে থাকা উচিত, অল্পক্ষণের মধ্যেই এ কথা ঠিক কি না বোঝা যাবে। এখন মিঠাইওয়ালাকে এখানে নিয়ে আসা দর্‌কার। তা হলে, আপনি আর আমার মেয়ে দুজনেই সে ব্যক্তি আপনার ছেলে কি না, তাকে দেখ্‌বামাত্র চিন্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু আপনাদের সে না দেখতে পায়, এজন্যে আপনাদের দুজনকেই লুকিয়ে থাক্‌তে হবে, কারণ ডামস্কসনগরে তার কাছে নিজের পরিচয় দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমার ইচ্ছা যে কায়রোনগরে গিয়ে সব কথা জানানো হয়।"

এই কথা বলিয়া সমসুদ্দীন পঞ্চাশজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক-একগাছি লাঠি নিয়ে রক্ষকের সঙ্গে এই নগরের এক মিঠাইওয়ালার দোকানে যাও। সেখানে গিয়ে দোকানের সমস্ত জিনিষ ভেঙে ফেলো। মিঠাইওয়ালা কোন কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে তাকে জিজ্ঞাসা কোরো তার দোকান থেকে যে পিঠে আনা হয়েছে, তা তার নিজের হাতের তৈরী কি না? যদি সে ঐ পিঠে তার নিজের তৈরী বলে স্বীকার করে, তা হলে তাকে তখনি বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিন্তু সাবধান, যেন তাকে কোন-রকম যন্ত্রণা দেওয়া না হয়।"

তাহারা মন্ত্রীর আজ্ঞামত তখনই রক্ষকের সঙ্গে বেদ্‌রুদ্দীনের দোকানে উপস্থিত হইয়া

সাম্‌নে যাহা দেখিতে পাইল তাহাই ভাঙিতে আরম্ভ করিল। বেদ্‌রুদ্দীন হঠাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "তোমরা কি-জন্যে আমার উপর এমন অত্যাচার কর্‌ছ? আমি তোমাদের কি করেছি?" তাহারা বলিল, "তুমিই কি রক্ষকের কাছে পিঠে বেচেছিলে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমিই তাকে পিঠে বেচেছি। কিন্তু কে আমার পিঠের নিন্দে কর্‌তে পারে? আমি গর্ব্ব করে বল্‌তে পারি, কেউ আমার চেয়ে ভাল পিঠে কর্‌তে পারে না।" এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাহারা একে একে দোকানের সব জিনিষ ভাঙিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া সেখানে অনেক লোক জমিয়া গেল এবং বেদ্‌রুদ্দীনের প্রতি অন্যায় হইতেছে দেখিয়া তাঁহার দিকে দাঁড়াইল। কিন্তু কোতোয়ালের লোক আসিয়া ভিড় ভাঙিয়া দিল, এবং বেদ্‌রুদ্দীনকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেও রক্ষকের অনেক সাহায্য করিল। ইহার কারণ এই যে, আগেই সমসুদ্দীন নগরের কোতোয়ালের কাছে গিয়া নিজের কাজের সুবিধা করিবার জন্য মিশরের রাজার নাম করিয়া তাহার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন।

সমসুদ্দীন কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করিয়া ফিরিয়া আসিবার একটু পরে বেদ্‌রুদ্দীনকে তাঁহার সাম্‌নে উপস্থিত করা হইল। বেদরুদ্দীন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু! আমি আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে ধরে আনা হল?" মন্ত্রী বলিলেন, "তুমি আমাকে যে পিঠে পাঠিয়েছিলে তা কি তোমার নিজের হাতের তৈরী?" বেদ্‌রুদ্দীন বলিলেন, "হাঁ, আমি তা তৈরী করেছি; কিন্তু তাতে আমার কি অপরাধ হল?" সমসুদ্দীন বলিলেন, "আমি তোমার গুণের উপযুক্ত শাস্তি দেব। আমাকে এ-রকম পিঠে পাঠানোর জন্যে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" বেদ্‌রুদ্দীন বলিলেন, "ভাল পিঠে করা কি এমন গুরুতর অপরাধের মধ্যে গণ্য হল?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, এতে তোমার প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য দণ্ড হতে পারে না।"

যখন তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই সময়ে বেদ্‌রুদ্দীনের মা ও স্ত্রী দুজনে আড়ালে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। যদিও অনেকদিন হইল তাঁহাদের সঙ্গে বেদ্‌রুদ্দীনের দেখা হয় নাই তবুও দেখিবামাত্র তাঁহারা বেদ্‌রুদ্দীনকে চিনিতে পারিলেন। বেদ্‌রুদ্দীনকে দেখিয়াই তাঁহারা আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইলেন। জ্ঞান লাভের পর তাঁহারা আনন্দে বেদ্‌রুদ্দীনের কাছে উপস্থিত হইতেন, কেবল মন্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা তখন সাম্‌নে না আসিয়া কোনোরকমে চুপ করিয়া রহিলেন।

সমসুদ্দীন সেই রাত্রেই সেখান হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া সকলকে যাত্রার উদ্যোগ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি বেদ্‌রুদ্দীনকে এক খাঁচায় বন্ধ করিয়া উটের পিঠে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিতে বাহির হইয়া তাঁহারা ক্রমাগত সমস্ত রাত্রি ও তার পরদিন চলিলেন। বিকালে যেখানে তাঁহারা বিশ্রাম করিতে থামিলেন, সেখানে বেদ্‌রুদ্দীনকে খাবার দিবার জন্য কেবল একবার খাঁচা হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

এইরূপে কুড়ি দিন চলিয়া তাঁহারা কায়রো-নগরের কাছে আসিলেন। সেখানে তাঁবু ফেলিয়া সমসুদ্দীন বেদ্রুদ্দীনকে ডাকিয়া তাঁহার সাম্‌নে এক শূল বানাইবার আদেশ দিলেন। বেদ্রুদ্দীন বলিলেন, "মহাশয়! আপনি শূল নিয়ে কি কর্‌বেন?" মন্ত্রী বলিলেন, "তোমাকে ওর উপর চড়িয়ে পিঠেতে মরিচ না দেওয়া অপরাধের জন্যে সমস্ত নগর ঘোরানো হবে।" বেদ্রুদ্দীন বলিলেন, "পিঠেতে মরিচ দিইনি বলে কি আমার সমস্ত জিনিস লুট

বেদরুদ্দীনকে এক খাঁচায় বন্ধ করিয়া উটের পিঠে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন

করা হল আর শেষে আমাকে এই-রকম কঠিন শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে? কি কুক্ষণেই আমি জন্মেছিলাম! জন্মাবামাত্রেই কেন আমার মরণ হল না।"

তখন রাত্রি বেশী হওয়াতে সমসুদ্দীন তাঁহাকে খাঁচায় বন্ধ করিয়া নিজের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য চাকরদের অনুমতি দিলেন। পরে সকলে হাজির হইলে, সমসুদ্দীন লোক-জনদের বিবাহরাত্রির মত তাঁহার বাড়ী সাজাইতে আদেশ দিলেন। সব সাজানো হইলে, তিনি বেদ্রুদ্দীনের পাগড়ী, অন্যান্য পোষাক এবং মোহরের থলি ঠিক জায়গায় রাখিয়া মেয়েকে আবার বাসরঘরে বেদ্রুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে যে-ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, সেই ঘরের পাশের এক ঘরে বেদ্রুদ্দীনকে রাখিয়া দিয়া চাকরদের সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

এত দুঃখের সময়েও বেদ্রুদ্দীনের এমন গাঢ় ঘুম হইয়াছিল যে, চাকরেরা তাঁহাকে ঐ ঘরে আনিবার সময় তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে ঘুম ভাঙিলে নিজেকে সেই ঘরে একলা দেখিয়া বিবাহের রাত্রির সমস্ত ব্যাপার তাঁহার মনে পড়িল। তারপর পাশের ঘরে গিয়া সেখানে নিজের আগেকার পোষাক দেখিয়া তিনি আরও আশ্চর্য্য হইয়া নিজের চোখ মুছিয়া বলিলেন, "আমি ঘুমাচ্ছি না জেগে আছি ?"

তাঁহার স্ত্রী এতক্ষণ মজা দেখিতেছিলেন। এখন মশারির এককোণ তুলিয়া নিজের মাথা বাহির করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "স্বামীন্! দরজার কাছে কি কর্‌ছেন ? এখানে এসে আবার শয়ন করুন। আপনি অনেকক্ষণ হল ঘরের বাহিরে গিয়েছেন। আমি জেগে উঠে আপনাকে পাশে না দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মুখের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। তিনি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নিজের পাগড়ী, পোষাক ও মোহরের থলি তুলিয়া সেগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমি এই-সব আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।" তাঁহার স্ত্রী ইহাতে আরও আনন্দিত হইয়া আবার বলিলেন, "স্বামিন্! আপনি কি-জন্যে দেরী কর্‌ছেন ?" এই কথা শুনিয়া তিনি বিছানার কাছে গিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে অনুনয় কর্‌ছি, আপনি বলুন দেখি আমি কি বেশী দিন আপনার কাছে ছিলাম ?" তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "আপনার কথায় আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে। আপনি কি এইমাত্র আমার পাশ থেকে উঠে গেলেন না ?" বেদ্রুদ্দীন বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে যে, আমি আপনার সঙ্গে বিছানায় ছিলাম। কিন্তু আমার এও মনে হচ্ছে, যে, আমি দশ বৎসর ডামাস্কসে ছিলাম। সেখানে এক মিঠাইওয়ালা আমাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিল। আমার জিনিষ লুট করা হয়েছে, আর আমি খাঁচায় বন্ধ হয়ে উটের পিঠে চড়ে এখানে এসেছি। সুতরাং আমাদের দুজনের কথা পরস্পর উল্টো। দয়া করে বলুন এখন আমি কি করি। আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ কি কোন মায়ার কাজ, অথবা আমার এখান থেকে চলে যাওয়াটাই স্বপ্ন ?" এমন সময়ে রাত্রি ভোর হওয়াতে সমসুদ্দীন দরজায় ঘা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া ভাইপোকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমাকে আমি জেনেও যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো সৌভাগ্যের পরিচয় না দিয়ে তোমাকে এখানে আনাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।" তারপর কি করিয়া দৈত্যের দ্বারা তাঁহাদের দুই ভাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল, কি করিয়া তাঁহাকে নিজের ভাইয়ের ছেলে বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, এবং কত যত্ন করিয়া তাঁহার খোঁজ করিয়াছিলেন এই-সকল বিষয় বেদ্রুদ্দীনকে জানাইয়া আবার বলিলেন, "বৎস! এখন নিজের লোকদের সঙ্গে থেকে নিজের বর্ত্তমান এবং ভাবী সুখের চিন্তা করে আগের দিনের দুঃখ সমস্ত ভুলে যাও। তুমি পোষাক পর, আমি এই অবসরে তোমার মাকে সব কথা বলে

আসি, আর যাকে তুমি ডামস্কসে দেখে নিজের ছেলে মনে করে ভালবেসেছিলে, তোমার সেই ছেলেকেও নিয়ে আসি।"

মা ও ছেলেকে দেখিয়া বেদ্‌রুদ্দীনের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাঁহার মা ছেলেকে হারাইয়া কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, কত কাঁদিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন। আজীব আহ্লাদে তাহার পিতার কোলে চড়িয়া বসিল। বেদ্‌রুদ্দীন একদিকে মা ও অন্যদিকে ছেলে এই দুজনকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। সমসুদ্দীন এমন সময়ে নিজের সফলতার কথা জানাইবার জন্য সুল্‌তানের কাছে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি সমস্ত পরিবারের সঙ্গে খাইতে বসিলেন। তাঁহার বাড়ীর সকলেই সেদিন আনন্দোৎসব করিয়া দিন কাটাইল।

কুঁজোর কথা

সেকালে তাতার দেশের কাছে কাসগর শহরে এক দর্জী ছিল। তাহার স্ত্রী খুব ভাল মেয়ে ছিল বলিয়া সে তাহাকে খুব ভাল বাসিত। একদিন দর্জী দোকানে বসিয়া কাজ করিতেছে, এমন সময়ে এক কুঁজো তাহার কাছে আসিয়া বাঁয়া তবলা বাজাইয়া গান করিতে লাগিল। দর্জী তাহার গান শুনিয়া বেজায় খুসী। তাই স্ত্রীকে একটু আমোদ দিবার জন্য তাহাকে সন্ধ্যা-বেলা নিজেদের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেদিন দর্জীর গৃহিণী একটা বড় মাছ রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। সে স্বামীকে এক কুঁজোর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া তাহাদের মাছ খাইতে দিল। কুঁজো দর্জীর অনুরোধে মাছ খাইতে লাগিল। কিন্তু কপালদোষে তাহার গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেচারা মরিয়া গেল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কুঁজোকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন উপায়েই সে বাঁচিল না। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দর্জী ও তাহার স্ত্রী ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল, এবং সেখানকার বিচারকর্ত্তার শাস্তির হাত এড়াইবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিয়া এই উপায় স্থির করিল :—তাহাদের বাড়ীর কাছেই একজন ইহুদী চিকিৎসক থাকিত। রাত্রি অনেক হইলে তাহারা দুজনে কুঁজোর মৃতদেহ ঘাড়ে করিয়া ঐ চিকিৎসকের বাড়ীর সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিল। তাহাতে এক ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দর্জী বলিল, "আমরা চিকিৎসা করাবার জন্য একজন খুব পীড়িত লোককে নিয়ে এসেছি।" ইহা বলিয়া ঝির হাতে কয়েকটা টাকা দিয়া আবার বলিল, "তোমার প্রভুকে এই দিয়ে খবর দাও, আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম।"

ঝি টাকা লইয়া প্রভুকে এই খবর দিবার জন্য তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। এদিকে তাহারা দুজনে কুঁজোর মৃত দেহ লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া সকলের উপরের

সিঁড়িতে তাহা রাখিয়া পলাইয়া গেল ঝি কবিরাজকে সমস্ত খবর দিয়া তাঁহার হাতে টাকা গুলি দিল। তাহাতে কবিরাজ খুব খুসী হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এ রোগীর চিকিৎসা করিলে অনেক লাভ হইবে। কাজেই এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়। এই ভাবিয়া সে ঝিকে একটা আলো আনিতে বলিল। কিন্তু মহা আনন্দে অস্থির হইয়া আলো

দর্জী দোকানে বসিয়া কাজ করিতেছে এমন সময়ে এক কুঁজো তাহার কাছে আসিয়া বাঁয়া-তবলা বাজাইয়া গান করিতে লাগিল

আনিবার অপেক্ষায় থাকিতে না পারিয়া, অন্ধকারেই নীচে যাইবার যোগাড় করিল; এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে পা ফেলিবামাত্র সাম্‌নের সেই মড়াটার গায়ে পা লাগিয়া যাওয়াতে সেটা উপরের সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া গেল। কবিরাজ

মহা ব্যস্ত হইয়া, "শীঘ্র আলো আন্, শীঘ্র আলো আন্" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঝিকে ডাকিতে লাগিল। ঝি আলো আনিলে পর বৈদ্য নীচে গিয়া দেখিল, একটা মড়া পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! আমি কি হতভাগ্য! কেনই বা অন্ধকারে নীচে যেতে ব্যস্ত হয়েছিলাম? যে বেচারা রোগ সারাবার জন্য আমার কাছে এসেছিল, আমি তাকেই লাথি-মেরে মেরে-ফেল্‌লাম। এখনি এই হত্যার অপরাধে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।" চিকিৎসক এমনিভাবে নিজেকে মহা বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়া অন্য লোকে পাছে জানিতে পারে, এই ভয়ে আগে বাড়ীর দরজা বন্ধ করিল। পরে মড়াটা তুলিয়া নিজের স্ত্রীর ঘরে লইয়া গেল। তাহার স্ত্রী মৃতদেহ দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিতে লাগিল "এ কি সর্ব্বনাশ! লোকটিকে মেরে ফেল্লে কি করে? কাল সকালেই যে আমাদের ফাঁসী হবে, তার আর সন্দেহ নাই।" ইহুদী বলিল, "এখন আমার কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি নাই। তুমি বুদ্ধিমতী; কি সদুপায় আছে, ঠিক করে বল, নইলে আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।" চিকিৎসকের স্ত্রী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "ভয় নাই, আমি এর এক ভাল উপায় স্থির করেছি। আমাদের বাড়ীর সঙ্গে লাগান এক মুসলমান ভাঁড়ারীর বাড়ী আছে। এস আমরা ছাদের উপর থেকে তার বাড়ীর ভিতরে ফেলে দি। তা হলেই, আমরা উপস্থিত বিপদ থেকে নিস্তার পেতে পারি।" চিকিৎসক বলিল, "বেশ পরামর্শ ঠিক করেছ।" তাহার পর বৈদ্য ও তাহার স্ত্রী দুজনে মিলিয়া মৃতদেহটা লইয়া ছাদের উপরে গেল, এবং মড়ার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া যে পথে ধোঁয়া বাহির হইত সেই পথ দিয়া সেটাকে আস্তে আস্তে ভাঁড়ারীর ঘরে নামাইয়া দিল। তাহারা এত সাবধান হইয়া কাজ করিল যে, মড়ার পিঠটা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়া রহিল এবং তাহাতে সেটাকে ঠিক জীবিত মানুষের মত দেখাইতে লাগিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, মড়াটা ঠিক দাঁড়াইয়া আছে, তখন দড়িটা উপরে তুলিয়া লইল এবং নিজেদের ঘরে ঢুকিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে লাগিল।

মুসলমান সেইদিন বিবাহ-উপলক্ষ্যে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। রাত্রি অনেক হইলে সে বাড়ী ফিরিয়া আলো লইয়া সেই ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পাইল একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে সে বেজায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমার এই ভাঁড়ারে মাখন ও নানারকম ঘি তেল থাকে। আমি মনে করতাম ইঁদুরেই আমার সব খেয়ে যায়, তা নয়। তুই ছাদ দিয়ে এসে চুরি করে নিয়ে যাস্, দাঁড়া আজ তোকে উচিত শাস্তি দিচ্ছি।" এই বলিয়া একটা মস্ত লাঠি লইয়া চোর ভাবিয়া তাহাকে ভয়ানক জোরে মারিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে মড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তবুও ভাঁড়ারীর মারের চোট আর থামে না। তাহার পর চোরকে একেবারে চুপ্ করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মার থামাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল, লোকটা মরিয়াছে। তখন তাহার রাগ কোথায় উড়িয়া গেল, ভয়ে বেচারা অস্থির। সে ভয় পাইয়া বলিতে লাগিল,

"হায়! আমি কি দুষ্টু, কি করিলাম! সামান্য অপরাধের জন্যে একটা মানুষকে মেরেই ফেললাম। ওরে কুঁজো! তুই যদি আমার সর্ব্বস্ব চুরি করেও কোনমতে ধরা না পড়তিস, আমার পক্ষে তা মঙ্গল ছিল। কারণ তা হলে, আমাকে আর এমন করে হায় হায় করতে হত না।" এমনি করিয়া কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিবার পর, মনে মনে ফন্দি আঁটিয়া মড়াটা কাঁধে করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং পথের ধারে এক দোকানে ঠেসাইয়া রাখিয়া, নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল।

ভোর হইবার কিছু আগে একজন ধনী খৃষ্টীয়ান সারারাত্রি মদ খাইয়া ও আমোদ প্রমোদ করিয়া স্নান করিতে যাইতেছিল। কোন মুসলমান তাহাকে অমন মাতাল দেখিলেই কয়েদ করিবে, এই ভয়ে সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাইতে যাইতে টলিয়া পড়িয়া যেমন ঐ দোকান ধরিয়া দাঁড়াইল, অমনি মড়াটা তাহার কাঁধে আসিয়া পড়িল। তাহাতে খৃষ্টীয়ান মনে করিল একটা ডাকাত বুঝি তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ সেই মড়াটাকে মারিতে মারিতে "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকারের শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই জায়গায় চৌকীদার আসিয়া দেখিল, একজন খৃষ্টীয়ান এক মুসলমানকে ধরিয়া মারিতেছে। তাহাতে চৌকীদার জিজ্ঞাসা করিল, "এই মুসলমানকে মারবার কারণ কি?" খৃষ্টীয়ান উত্তর দিল, "এ লোকটা আমাকে খুন করবার মতলবে আমার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়েছিল।" "তুমি ওকে যে রকম মেরেছ তাতে যথেষ্ট প্রতিফল দেওয়া হয়েছে।" এই কথা বলিয়া চৌকীদার কুঁজোটাকে তুলিতে গিয়া দেখিল, লোকটা মরিয়া গিয়াছে। সে আর কথাটি না বলিয়া খৃষ্টীয়ানের হাত বাঁধিয়া তাহাকে বিচারকর্ত্তার কাছে লইয়া গেল। তাহারপর বিচারপতি সমস্ত কথা শুনিয়া ঐ নিরপরাধীকেই খুনী ঠিক করিয়া রাজার কাছে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। রাজা বলিলেন, "এই দণ্ডেই এর উচিত দণ্ড বিধান কর। সে মুসলমানকে খুন করে তার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত।" বিচারকর্ত্তা রাজার আদেশ পাইয়া একটা ফাঁসিকাঠ তৈরী করাইয়া শহরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, একজন মুসলমানকে খুন করার অপরাধে একজন খৃষ্টীয়ানের প্রাণদণ্ড হইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া শহরের সব লোক ফাঁসি দেখিতে আসিয়া জুটিল। পরে খৃষ্টীয়ানের গলায় দড়ি দিয়া ফাঁসিকাঠে তুলিবার সময়ে, মুসলমান ভাঁড়ারী ভিড়ের ভিতর হইতে সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি ঐ কুঁজোটাকে খুন করেছি। আমাকেই ফাঁসি দিন। আমারি হাতে একজন মুসলমান মারা পড়েছে। আমি আবার একজন নিরপরাধী খৃষ্টীয়ানের মৃত্যুর কারণ হতে ইচ্ছা করি না।"

বিচারকর্ত্তা ভাঁড়ারীর মুখে সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, যে, খৃষ্টীয়ানের কোনো দোষ নাই, এবং তাহার বদলে ভাঁড়ারীকে ফাঁসি দিতে হুকুম করিলেন। ভাঁড়ারীর গলায় দড়ি পরাইবার সময়ে ইহুদী চিকিৎসক ফাঁসিকাঠের কাছে আসিয়া মহা বিনয় করিয়া বলিল, "আমিই কুঁজোকে মেরে ফেলেছি। অতএব আমার অপরাধের জন্য এ নিরপরাধী

লোকটিকে ফাঁসি দিবেন না। আমিই দণ্ড পাবার যোগ্য, আমাকেই দণ্ড দিন।" এই বলিয়া সে কেমন করিয়া কুঁজোকে মারিয়া তাহার মৃত দেহটা ভাঁড়ারীর ঘরে ফেলিয়া দিয়াছিল, একেবারে সমস্ত কথা বলিয়া গেল। তখন বিচারকর্ত্তা মুসলমানকে ছাড়িয়া দিয়া ইহুদীর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। কিন্তু শেষকালে যখন বৈদ্যকেও ফাঁসি দিতে যায়,

চৌকিদার কুঁজোটাকে তুলিতে গিয়া দেখিল লোকটা মরিয়া গিয়াছে

তখন দর্জ্জী আসিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আমার জন্যই বেচারী কুঁজো মরেছে। আপনি আসল দোষীকে ধরতে না পেরে তিনজন নির্দ্দোষ লোককে ফাঁসি দিতে যাচ্ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে।" এই বলিয়া কুঁজোর মৃত্যুর সবকথা ঠিক-ঠিক বর্ণনা করিয়া বলিল, "এর হত্যার জন্যে যদি কোনো লোককে দোষী হতে হয় তবে সে আমি। অতএব কবিরাজকে শাস্তি না দিয়ে আমারই প্রাণদণ্ড করুন।" দর্জ্জী নিজের মুখে নিজের

অপরাধ স্বীকার করিলে বিচারকর্তা বৈদ্যকে ছাড়িয়া দিয়া দর্জীকেই ফাঁসি দিতে আদেশ করিলেন। যখন দর্জীর প্রাণদণ্ডের যোগাড় হইতেছে, সেই সময় রাজা সমস্ত খবর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে বিচারকর্তার কাছে এই-কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "সমস্ত খুনীদের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিচারকর্তা শীঘ্র রাজসভায় উপস্থিত হইবেন।" দূত তাড়াতাড়ি বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ প্রচার করিবামাত্র বিচারক আর দেরি না করিয়া দর্জীর বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন, এবং দর্জী, ইহুদী চিকিৎসক, মুসলমান ভাঁড়ারী ও খৃষ্টীয়ান এই চারিজন লোককে সঙ্গে করিয়া এবং কুঁজোর মৃতশরীরটা এক মুটের পিঠে চড়াইয়া রাজসভায় হাজির হইলেন। রাজা বিচারকের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং রাজসভার উপন্যাস-লেখকদিগকে এই ঘটনা লিখিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পরে সভার সব লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কখন এমন অদ্ভুত গল্প শুনেছ কি ?" তাহাদের মধ্যে একজন বাচাল নাপিত ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে, শুনেছি বইকি মহারাজ, হয় কি নয় শুনে বিচার করুন।"

নরসুন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার কথা

নাপিত বলিল, "মহারাজ ! বাক্‌বাক্ নামে আমার তৃতীয় সহোদর জন্মান্ধ ছিলেন। বড় গরীব বলিয়া দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম ছিল ভিক্ষা করিতে গিয়া কোনো কথা না বলিয়া গৃহস্থের দরজায় ঘা দিতেন। দরজা খুলিবার আগে ঘরের ভিতর হইতে কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে কখনই তাহার উত্তর দিতেন না। এক দিন আমার ভাই এক গৃহস্থের দরজায় উপস্থিত হইয়া দরজায় ঘা দিতে লাগিলেন। তাহাতে "কে দরজায় ঘা দিচ্ছে ?" এই-কথা বলিয়া গৃহস্থ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কোনো উত্তর না দিয়া অনবরত দরজা ঠেলিতে লাগিলেন। গৃহস্থ বার-বার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং উপর হইতে নীচে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কি চাও ?" বাক্‌বাক্ বলিলেন, "আমি জন্মান্ধ, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাই।" গৃহস্থ বলিল, "তুমি আমার হাত ধরে ভিতরে এস।" ভাই কিছু পাইবার আশায় তাহার হাত ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু গৃহস্থ তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও ?" ভ্রাতা বলিলেন, "আপনাকে আগেই বলেছি আমি কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাই।" গৃহস্থ বলিল, "হে অন্ধ ! আমি তোমাকে আর কি দিব, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তোমার দিব্য চক্ষু হোক !" ভ্রাতা বলিলেন, "আমাকে দরজায়ই এই-কথা বলে বিদায় করে দেওয়া উচিত ছিল, উপরে

এনে কেন অকারণ কষ্ট দিলেন?" গৃহস্বামী মহা চটিয়া বলিল, "তুই এখান থেকে দূর হয়ে যা।" অন্ধ বলিলেন, "আমাকে নীচে নামিয়ে না দিলে আমি যেতে পারব না।" গৃহস্থ বলিল, "সিঁড়ি দিয়ে আপনি নীচে নেমে চলে যা।" ভ্রাতা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সিঁড়ি দিয়া নামিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল। তাহাতে তিনি সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে-গড়াইতে নীচে পড়িয়া গিয়া মাথায় ও পিঠে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। দুষ্ট গৃহস্থ তাই দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর ভ্রাতা বাড়ীর-বাহিরে আসিয়া গৃহস্থকে অভিসম্পাত করিতে-করিতে আর দুইজন অন্ধ সহচরের সহিত চলিয়া গেলেন।

ভ্রাতা ভিক্ষার আশায় যাহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সে একজন ডাকাত। সে অতি শীঘ্র নীচে আসিয়া অন্ধদিগের পিছন-পিছন যাইতে লাগিল। কিছুদূর যাইবার পর অন্ধেরা একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে ইতিমধ্যে ডাকাতটাও অন্ধদের জানিতে না দিয়া ঐ বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। পরে অন্ধেরা এক জায়গায় জুটিয়া নিজেদের সঞ্চিত ধনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। বাক্‌বাক্ বলিলেন, "শোন ভাই! আমরা তিনজনে যে রোজগার করেছি তা আমি অতি যত্নে রেখে দিয়েছি। এখন সবসুদ্ধ আমাদের দশহাজার টাকা হয়েছে। ঐ দশহাজার টাকা দশটা তোড়াতে রেখেছি। তোমাদের না জানিয়ে আমি একটি টাকাতেও হাত দিই না।" এই বলিয়া কতকগুলো জঞ্জালের ভিতর হইতে একে-একে দশটা তোড়া বাহির করিয়া আনিয়া সঙ্গী অন্ধদের বলিলেন, "তোমরা হাত দিয়ে তোড়া তুলে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, প্রত্যেক তোড়াতে ঠিক হাজার টাকা আছে কি না। তাতে যদি বিশ্বাস না হয়, তবে এক-একটি করে সমস্ত টাকা গুণে দেখ।" আর দুই অন্ধ বলিল, "আর গুণে দেখ্‌বার দরকার নেই। আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না।" পরে একটা তোড়া খুলিয়া ঐ তিনজনের প্রত্যেকে দশ-দশ টাকা বাহির করিয়া লইল। তাহার পরে তোড়াগুলি যথাস্থানে রাখিয়া একজন অন্ধ বলিল, "আজ কোনো খাবার কিন্‌বার দরকার নেই। আমি ভিক্ষা করে যে খাবার এনেছি, তাতে তিনজনেরই যথেষ্ট হবে।" এই-কথা বলিয়া ঝুলি হইতে রুটি, পনির এবং ফলমূল বাহির করিয়া তিনজনেই খাইতে আরম্ভ করিল। দস্যু লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাহার ভিতর হইতে ভাল-ভাল খাবার তুলিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু খাইবার সময়ে তাহার মুখের শব্দ শুনিতে পাইয়া আমার ভাই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওহে ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমাদের মধ্যে নূতন একটা লোক এসেছে।" এই-কথা বলিয়া হাত বাড়াইয়া দস্যুকে ধরিয়া "চোর, চোর" বলিয়া তাহাকে মারিতে লাগিলেন। অন্য দুই অন্ধও আমার ভাইকে সাহায্য করিল। দস্যুও প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য "চোর, চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতিবাসীরা এই গোলযোগ শুনিয়া দরজা ভাঙিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে আমার ভাই বলিলেন, "ভদ্রলোকগণ! যাকে আমি ধরে আছি সে একটা চোর; আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে ঢুকে আমাদের জমানো টাকা চুরি করবার মতলব করেছে।" চোর প্রতিবাসীদের দেখিবামাত্র ছল করিয়া চোখ বুজিয়া অন্ধ সাজিয়া বলিল, "ভাই প্রতিবাসীরা! এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। আমি শপথ করে বলছি, আমি এদের একজন সঙ্গী। এরা আমাকে আমার প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত কর্‌বার জন্ত এইরকম কথা বলছে। মহাশয়গণ! আপনারাই এর বিচার করুন।" প্রতিবাসীরা অন্ধদিগের ঝগড়া মিটাইতে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের চারিজনকেই বিচারপতির কাছে লইয়া গেল।

তাহারা সকলেই বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, দস্যু অন্ধের মত চোখ বুজিয়া বলিতে লাগিল, "হে ধর্ম্মাবতার! মহারাজ আপনাকে বিচারকের পদে অভিষিক্ত করেছেন। আমরা চারজনেই সমান দোষী। আমরা পরস্পরের কাছে সত্য করেছি, আমাদের দোষের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ কর্‌ব না। তবে পীড়ন কর্‌লে অগত্যা স্বীকার করতে হবে।" এই-কথা শুনিয়া বিচারপতি তাহাকে মারিতে হুকুম দিলেন। দস্যু বিশ ত্রিশবার বেতের ঘা সহ্য করিয়া, আর সহ্য করিতে পারে না, এই-রকম ভঙ্গী দেখাইয়া ক্রমে চোখ খুলিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার, দোহাই, আর মার সহ্য করিতে পারি না। অনুগ্রহ করে আর মারতে বারণ করুন।" বিচারক ঐ অন্ধকে চোখ খুলিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তবে রে পাজি! এ আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ কি?" দস্যু বলিল, "হে ধর্ম্মাবতার! যদি আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে স্বীকার করেন, তা হলে আমি আপনার সাক্ষাতে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলি।" বিচারক দস্যুকে ক্ষমা করিবেন স্বীকার করিলে পর, দস্যু বলিল, "মহাশয়! আসলে আমরা কেহই অন্ধ নই, কেবল ছল করে অন্ধের মত শহরে শহরে ঘুরে বেড়াই। এরকম করবার কারণ এই যে, আমরা অনায়াসে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের বাড়ীতে গিয়ে সহজেই তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করতে পার্‌ব। এই উপায়ে আমরা দশহাজার টাকা সংগ্রহ করেছি। আজ আমি এই সঙ্গীদের কাছে আমার অংশের ২৫০০ টাকা চেয়েছিলাম। তাতে এরা আমার প্রাপ্য অংশ দিতে স্বীকার কর্‌ল না, এবং পাছে এইসমস্ত অন্যায় কাজের কথা প্রকাশ করি, এই ভয়ে এরা তিনজনে জুটে আমাকে মেরে আমার হাড় গুঁড়ো করেছে। প্রতিবাসীরা সমস্তই দেখেছে। এখন যাতে আমি নিজের প্রাপ্য অংশ পাই, আপনি তার কোনো উপায় করে দিন। আর এরা তিনজনে বাস্তবিক অন্ধ কি না এদের মার্‌তে অনুমতি করলেই তা জান্‌তে পারবেন।"

আমার ভাই এবং তাহার দুই সঙ্গী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বিচারককে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কানও না দিয়া সেই জুয়াচোর দস্যুর মিথ্যাকথায় ভুলিয়া গিয়া তাহাদের প্রত্যেককে দুই শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। মারিবার সময় দস্যু তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "ওরে নির্ব্বোধেরা! এখনও চোখ খোল বল্‌ছি। কেন নিরর্থক এত মার সহ্য কর্‌ছিস্?" পরে বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়!

এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে কোনোমতেই চোখ খুল্‌ব না। অতএব এদের আর মেরে কোনো ফল হবে না। আমার সঙ্গে কোনও লোককে পাঠিয়ে দিন, আমি গুপ্তস্থান থেকে দশ হাজার টাকা এনে আপনার কাছে উপস্থিত কর্‌ছি।" এই-কথা শুনিয়া বিচারপতি তাহার সঙ্গে একজন চাকর পাঠাইয়া দিলেন। দস্যু, চাকরের সঙ্গে অন্ধদের বাড়ী গিয়া, সেখান হইতে দশ হাজার টাকা আনিয়া উপস্থিত করিল। বিচারক দস্যুকে ২৫০০ টাকা দিয়া বাকি টাকা আপনি লইলেন, এবং আমার ভাইকে ও তাহার দুই সঙ্গীকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। আমি ভ্রাতার এই বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, এবং লুকাইয়া তাঁহাকে শহরে আনিয়া রাখিলাম।

নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা

মহারাজ! আমার চতুর্থ সহোদরের নাম আলকৌজ, তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ। কি করিয়া তাঁহার ঐ চোখ নষ্ট হয়, তাহা পরে বলিব। আলকৌজ একজন মাংসওয়ালা ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। একদিন তাঁহার দোকানে শাদা শাদা দাড়ী লইয়া এক বৃদ্ধ আসিয়া তিন সের ভাল মাংস কিনিয়া তাঁহাকে কয়েকটা চক্‌চকে টাকা দিয়া চলিয়া গেল। তিনি কয়েকটি ভাল টাকা পাইয়া খুসী হইয়া তাহা সিন্দুকে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিলেন। ঐ বৃদ্ধ ক্রমাগত পাঁচ মাস রোজ মাংস লইয়া সেইরকম টাকা দিতে লাগিল। ভ্রাতাও সেই সমস্ত টাকা সেইরকম আলাদা করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ মাস পরে, আলকৌজ কতকগুলি ভেড়া কিনিয়া তাহার দাম দিবার জন্য বৃদ্ধের দেওয়া টাকার সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন টাকা নাই, কেবল কতক-গুলো টাকার আকারের পাতা পড়িয়া আছে। তাহাতে তিনি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং রাগিয়া বলিলেন, "সেই বুড়ো ভণ্ড প্রতারক যদি আবার আমার কাছে আসে, তা হলে তার উচিত প্রতিফল দেবো।" এই-কথা বলিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সেই বৃদ্ধ আসিতেছে। দূর হইতে বৃদ্ধকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি গিয়া তার হাত ধরিয়া "তুই আমাকে প্রতারণা করেছিস্" এই-কথা বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চীৎকারে অনেক লোক জড়ো হইয়া গেল। তিনি তাহাদের সব-কথা জানাইলেন। বৃদ্ধ বলিল, "আমার হাত ছেড়ে দাও, আমাকে অসম্ভ্রম করো না। আমার অপমান করলে, আমি তোমার অপমান কর্‌তে ক্রটি কর্‌ব না।" আলকৌজ বলিলেন, "তুই আমার কি কর্‌বি? আমি তোর ত কিছুই করিনি।" তখন বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিয়া পথিকদের বলিল, "হে ভদ্র মহাশয়গণ! এই লোকটা ভেড়ার মাংস বলে নরমাংস বেচে। যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে আমার সঙ্গে এর দোকানে আসুন; সেখানে দেখিয়ে দেবো,

একটা মানুষ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছে।” আলকৌজ একটু আগে একটা ভেড়া কাটিয়া চামড়া ছাড়াইয়া বেচিবার জন্য দোকানে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলেন। পথিকেরা বৃদ্ধের কথায় সন্দেহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলকৌজের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সত্যই একটা মাথাকাটা মানুষ ঝুলিতেছে। ঐ বৃদ্ধ যাদুবিদ্যা জানিত। যাদুবিদ্যার জোরে সে দর্শকদের ঐরকম দৃষ্টিভ্রম জন্মাইয়াছিল। মানুষের শরীর দেখিয়া একজন পথিক রাগিয়া আমার ভাইএর কাণে এক ঘুসি মারিল, এবং বৃদ্ধও এমন এক চড় মারিল যে, তাহাতে আমার ভাইয়ের একটি চোখ বাহির হইয়া পড়িল। অন্যান্য লোকেরাও চড় চাপড় লাথি কিল মারিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সকলে সেই মড়াটা সঙ্গে করিয়া তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেল। ভ্রাতা বৃদ্ধের প্রতারণার বিষয় বলিলেন, কিন্তু বিচারপতি তাঁহার কথায় কান না দিয়া পথিকদের কথা-মত তাহাকেই প্রবঞ্চক ঠিক করিলেন এবং তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে পাঁচশত বেত লাগাইয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

আলকৌজ এইরকম অকারণ দণ্ডভোগ করার পর কোনো লুকানো জায়গায় রহিলেন এবং ঘাগুলি ঔষধ দিয়া আরোগ্য হইলে, অন্য এক অপরিচিত শহরে গিয়া লুকাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া শহরের শেষ সীমায় দেখিলেন, একদল ঘোড়সওয়ার তাঁহার দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে। তাহারা তাঁহাকেই ধরিতে আসিতেছে, এই মনে করিয়া তিনি কাছেই একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু উঠানে যাইবামাত্র বাড়ীর দুইজন চাকর তাহার ঘাড় ধরিয়া বলিল, “পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা, তুই নিজে এসে আমাদের ধরা দিলি, ভালই হয়েছে। তোর জ্বালায় আমরা গত তিন রাত্রি ঘুমতে পারিনি।” আলকৌজ এই-কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “ভাই! তোমাদের মতলব বুঝতে পার্‌ছি না। বোধ হয়, তোমরা ভুল করে আমাকে অন্য এক ব্যক্তি ভাব্‌ছ।” ভৃত্যেরা বলিল, “তুই আর তোর সঙ্গীরা আমাদের প্রভুর সর্ব্বস্ব চুরি করে তাকে ভিখারী করে ছেড়েছিস। তাতেও খুসী না হয়ে আবার তাঁর প্রাণবধ কর্‌তে ইচ্ছা করেছিলি। তুই গত রাত্রে যে অস্ত্র দিয়ে আমাদের মার্‌তে এসেছিলি সেই অস্ত্রটা নিশ্চয়ই তোর কাপড়ে লুকানো আছে।” এই-কথা বলিয়া তাঁহার কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে একখান ছুরি দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “ওরে বেটা, তবে নাকি তুই সাধু পুরুষ?” পরে তাঁহাকে মারিতে মারিতে তাঁর পিঠে বেতের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, “তুই নিশ্চয় চোর, আগে আর-একবার চুরির শাস্তি পেয়েছিস্।”

পরে ভৃত্যেরা তাঁহাকে কাজির কাছে লইয়া গেলে, কাজি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, “ওরে পাপিষ্ঠ! তুই এদের বাড়ীতে গিয়ে অস্ত্র দিয়ে এদের মার্‌তে চেষ্টা করেছিলি। তোর এ সামান্য সাহস নয়।” ভ্রাতা বলিলেন, “মহাশয়! আমি কোনো-মতে অপরাধী নই, তবে পৃথিবীতে আমার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই।” তাহাতে একজন

ভৃত্য বলিল, "যে পরের বাড়ীতে ঢুকে মানুষ খুন করতে যায়, তার কোনো কথা কি বিশ্বাস করা যেতে পারে? যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে এর পিঠ খুলে দেখুন।" কাজি তাহার পিঠে বেতমারার চিহ্ন দেখিয়া অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন, এবং তখনই একশত বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়া তাঁহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। আমি কতকগুলি লোকের মুখে তাঁহার এই শেষ দুরবস্থার কথা শুনিয়া লুকাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়া সুস্থ করিলাম।

মহারাজ! এখন আমি আর দুই ভাইএর বিবরণ একে একে বলিতেছি শুনুন।

নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথা

মহারাজ! আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আলনস্কর। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে তিনি বেজায় কুঁড়ে অলস ছিলেন, এমন কি নিজের খাওয়া পরা চালাইবার জন্যও কোনো কাজ করিতেন না। তিনি রোজ সন্ধ্যায় ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, পরদিন তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর, আমরা তাঁহার সম্পত্তি সাতশত টাকা পাইয়া সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলাম। তাহাতে প্রত্যেকে এক-এক শত টাকা পাইলাম। আলনস্কর জন্মাবধি কখন এক শত টাকা দেখেন নাই, সুতরাং অত টাকা লইয়া কি করিবেন, প্রথমে কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে কাচের জিনিষের ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা করিয়া এক মহাজনের কাছে গ্লাস, বোতল প্রভৃতি নানারকম কাচের জিনিষ কিনিয়া আনিলেন। পরে একখানি ছোট দোকান খুলিয়া সমস্ত জিনিষ একটা ঝুড়িতে করিয়া সাম্‌নে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া খরিদ্দারদের আশায় বসিয়া রহিলেন, এবং মনে-মনে-মনে কল্পনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সমস্ত জিনিষ বেচে নিশ্চয় দু'শ টাকা পাব। তাতে আবার এইরকম জিনিষপত্র কিন্‌ব। এমনি করে পাঁচ সাতবার কেনাবেচা কর্‌লে দশ হাজার টাকার মালিক হতে পার্‌ব। তা হলে, বহুমূল্য মণিমুক্তার দোকান কর্‌ব। এইরকমে ক্রমশঃ এক লক্ষ টাকা হবে। লক্ষপতি হয়ে মন্ত্রীর কাছে তাঁর মেয়েকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌ব। তাতে মন্ত্রী অবশ্যই খুসী হয়ে আমাকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেন। তার পরে একটা বড় বাড়ী তৈরী করিয়ে সেটা বহুমূল্য আসবাব দিয়ে সাজাব। মন্ত্রীও তাঁর কন্যাকে মহামূল্য অনেক জিনিষ যৌতুক দেবেন। আমি মন্ত্রীর মেয়ের স্বামী হয়ে তাকে খুব অবজ্ঞা কর্‌ব। তাতে সে অনেক বিনয় করে আমার সাধ্যসাধনা কর্‌তে থাক্‌বে। কিন্তু কিছুতেই তার বশীভূত হব না, বরং তাকে অবজ্ঞা করে এক লাথি মারব।" আলনস্কর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে এতই ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে

হইল, মন্ত্রীকন্যা বাস্তবিকই তাঁহার সাম্‌নে বসিয়া আছে এবং তাঁহাকে তিনি লাথি মারিতেছেন। তিনি মনে মনে যাহা ভাবিয়াছিলেন, কাজে তাহাই করিয়া বসিলেন। তাহাতে তাঁহার সাম্‌নের কাচের জিনিষগুলিতে লাথি লাগায় সমস্ত জিনিষ রাস্তায় পড়িয়া ভাঙিয়া চুরিয়া গেল। একজন দর্জী ঐ দোকানের কাছে বসিয়া তাঁহার কাল্পনিক কথাগুলি

মন্ত্রী অবশ্যই খুসি হয়ে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন

শুনিতেছিল। কাচের জিনিষ পথে গিয়া পড়িল দেখিয়া, সে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আহা! তুমি কি জন্যে স্ত্রীকে লাথি মারলে? তার ত কোনো অপরাধ নেই। মন্ত্রীর কন্যা কেমন সুন্দরী! আহা! তার উপর কি তোমার একটু দয়া হল না? তুমি কি নিষ্ঠুর! আমি যদি মন্ত্রী হতাম তা হলে তোমাকে একশত কোড়া মারতাম।" এই

ঘটনার পর ভ্রাতার চৈতন্য হইল, তিনি দেখিলেন তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, দুঃখে অধীর হইয়া তিনি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই দেখিয়া দোকানের সাম্‌নে খুব লোকের ভিড় জমিয়া গেল। সেই সময়ে একজন বড়ঘরের মেয়ে চমৎকার সাজপোষাক করিয়া ঘোড়া চড়িয়া ঐখান দিয়া যাইতেছিলেন। আলনস্করের কান্না শুনিয়া দয়া হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটি কে? এর কি হয়েছে? পথিকেরা বলিল, "এ লোকটি বড় গরীব। কতকগুলি কাচের বাসন কিনে দোকানে সাজিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ পড়ে গিয়ে সমস্ত বাসন ভেঙে গিয়েছে।" এই-কথা শুনিয়া ঐ রমণী সঙ্গের চাকরকে ইসারা করিলেন। তাহাতে সে একশত টাকা আমার ভাইকে দান করিল। আলনস্কর মহা কৃতজ্ঞ হইয়া মহিলাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাহার পর দোকান বন্ধ করিয়া ঘরে আসিলেন। আলনস্কর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নানারকম চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহাকে বলিল, "তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। নমাজের সময় হয়েছে। অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ জল দাও। আমি হাত পা ধুয়ে এইখানেই নমাজ করি।"

আলনস্কর তাহাকে বাড়ীর ভিতরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া জল দিলেন। বৃদ্ধা হাতপা ধুইয়া নমাজ করিতে লাগিল। ভ্রাতা যে কয়েকটি টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে এই ইচ্ছায় গেঁজেতে রাখিলেন। বুড়ী নমাজ করিতে করিতে তাহা দেখিতে পাইল। নমাজ শেষ হইলে বুড়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে ভ্রাতা তাহার গরীবের মত পোষাক দেখিয়া সদয় হইয়া তাহাকে একটি টাকা দিতে গেলেন। তাহাতে বৃদ্ধা অবজ্ঞা করিয়া বলিল, "তুমি কি আমাকে নিতান্ত দুঃখিনী মনে করেছ? আমি যে মনিবের কাছে থাকি, তিনি যেমন রূপবতী, তেমনি ধনবতী। তাঁর কাছে থাকাতে আমার দরকারী কোনো জিনিষেরই অভাব নেই।" আলনস্কর বলিলেন, "তুমি সেই মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পার?" বুড়ী বলিল, "এ আর কি বিচিত্র কথা; তিনি তোমাকে পেলে, তোমার বিশেষ সমাদর করবেন এবং হয়ত তোমাকে বিবাহ করে তাঁর সর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়ে তোমার বশীভূত হয়ে থাক্‌বেন। যদি এরকম সৌভাগ্যশালী হতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে এস।" আমার ভাই বুড়ীর কথায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া টাকা কয়টা কোমরে বাঁধিয়া লইয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া বুড়ী একটা বাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইল। তিনি ঘরের সাজসজ্জা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ভাবী স্ত্রী নিশ্চয় একজন বড়ঘরের লোক। অল্পক্ষণ পরে আলনস্কর দেখিলেন, মণি-মুক্তায় গা সাজাইয়া একটি তরুণী রমণী আসিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। যুবতী একটু হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া নিজে তাঁহার পাশে বসিয়া বলিল, "তোমাকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। অতএব তুমি আমায় বিবাহ কর। ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া অন্য এক ঘরে লইয়া

গেল, এবং সেখানে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া তাহার পর তাঁহাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া "এখনি আসছি" বলিয়া চলিয়া গেল।

আলনস্কর মেয়েটির ফিরিবার আশায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই তরুণীর বদলে লম্বা-চওড়া কালো-মতন একটা লোক খড়্গ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাঁহার কাপড় কাড়িয়া লইল, টাকাগুলি কাড়িয়া লইল ও তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। ভ্রাতা খড়্গের আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

আলনস্কর মরিয়া গিয়াছেন কি না জানিবার জন্য সেই লোকটা তাঁহার ক্ষতস্থান নুন দিয়া ঘসিতে লাগিল। তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হইলেও তিনি মড়ার মত পড়িয়া থাকিলেন। তাই দেখিয়া সেই লোকটা সেখান হইতে চলিয়া গেল। পরে সেই বৃদ্ধা আসিয়া খিড়কির দরজা খুলিল এবং তাঁহার একটা পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া মানুষের মৃতদেহে পূর্ণ একটা গর্ত্তে তাঁহাকে ফেলিয়া দিল। তারা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষতগুলিতে নুন দেওয়াতে হঠাৎ মৃত্যু হয় নাই। এবং ঐ নুনঘসাই এক-রকম তাঁহার প্রাণরক্ষার কারণ হইল। ভ্রাতা ক্রমশঃ সবল হইয়া দুই দিনের পর রাত্রিবেলা বাড়ীর পিছনের দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন এবং ভোরবেলা আমার কাছে আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

আমি ঔষধ দিয়া তাঁহার ক্ষতগুলি সারাইয়া দিলাম এবং ঐ পাপিষ্ঠাদের উচিত শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেইজন্য পাঁচ শত টাকা ধরে এমন একটা থলিয়াতে ভাঙা কাচ পুরিয়া ভ্রাতাকে দিলাম ও তাঁহাকে একটা যুক্তি বলিয়া দিলাম। ভ্রাতা আমার পরামর্শ শুনিয়া ঐ থলিয়া কোমরে বাঁধিয়া মেয়ে সাজিয়া কাপড়ের মধ্যে একখান ধারাল অস্ত্র লুকাইয়া লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলেন। এক দিন সেই বুড়ীকে দেখিতে পাইয়া আলনস্কর মেয়েদের মত গলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো মা! তোমার কাছে কি নিক্তি আছে? আমাকে সেটা একবার দিতে পার? আমার বাড়ী পারস্যদেশে। আমার সঙ্গে পাঁচশ টাকা আছে, সেগুলা ঠিক আছে কি না ওজন করে দেখ্‌বার প্রয়োজন হয়েছে।" বুড়ী বলিল, "আমার সঙ্গে এস। আমার এক ছেলে বণিকের ব্যবসা করে থাকে, তার কাছে তোমায় নিয়ে গেলে, সে নিজের হাতে তোমার সমস্ত টাকা ওজন করে দেবে, তোমাকে কোনো কষ্ট পেতে হবে না।" তাই শুনিয়া ভ্রাতা তাহার পিছন পিছন চলিতে আরম্ভ করিলেন। বুড়ী তাহাকে সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিল, "তুমি কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্র ছেলেকে ডেকে আন্‌ছি।" এই কথা বলিয়া, সে সেখান হইতে চলিয়া গেল তারপর সেই কালো লোকটা সেখানে আসিয়া বুড়ীর ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিল, "ওগো বিদেশিনি! তুমি আমার সঙ্গে এস।" আলনস্কর তাহার পিছনে যাইতে যাইতে অস্ত্র বাহির করিয়া তাহার গলায় এমন এক ঘা দিলেন যে, একেবারে তাহার মাথা ও ধড় দুইখান হইয়া গেল। তখন ভ্রাতা, একহাতে কাটামুণ্ড ও অন্য হাতে ধড়টা লইয়া অন্তঃপুরের দরজা খুলিয়া সেই গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। পরে সেই বুড়ী ও একজন

দাসীও তাহার হাতে অমনি করিয়া যমের বাড়ী গেল। তখন একমাত্র সেই মেয়েটি ঐ বাড়ীতে অবশিষ্ট রহিল। সে এই-সমস্ত কাণ্ড কতক বুঝিতে পারিয়াছিল; সেইজন্য তাহাকে অস্ত্র লইয়া কাছে আসিতে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইল ভ্রাতা তাহাকে অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি! তুমি কিজন্য এমন অসৎসংসর্গে বাস কর?"

মেয়েটি বলিল, "আমি একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের স্ত্রী ছিলাম। ঐ বুড়ী মধ্যে মধ্যে প্রতিবেশিনীর মত আমার কাছে যেত। সে সময় আমি তার কোনো দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝ্তে পারিনি। একদিন সে আমাকে বল্ল, 'আজ আমাদের বাড়ীতে মহাসমারোহ করে একটা বিয়ে হবে। আপনি দয়া করে সেখানে উপস্থিত হলে, আমি কৃতার্থ হব।' আমার ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ভেবে মজা দেখতে কতকগুলি মোহর নিয়ে তার সঙ্গে এই বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম, এবং সেই অবধি তিন বছর হল, ঐ কাফ্রি আমাকে জোর করে এখানে রেখেছে। আমি অবলা, কি করি কোনো উপায় না দেখে সেই থেকে এখানে বাস কর্ছি।" তারপরে ভ্রাতা জিজ্ঞাসা কর্লেন, "তুমি কি মনে কর যে সেই ডাকাতটা চুরি করে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছে?" যুবতী বলিল, "হ্যাঁ, তার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে। তুমি যদি সেই সমস্ত ধন নিয়ে যাও, তা হলে খুব ধনী হতে পার। আমার সঙ্গে এস, সেইসমস্ত অর্থ তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া একটা ঘরে ঢুকিল। ভায়া সেখানে গিয়া অবাক্ হইয়া দেখিলেন কতকগুলা সিন্দুক সোনায় ভরপূর রহিয়াছে। মেয়েটি বলিল, "মুটে এনে শীঘ্র এইসমস্ত টাকা নিয়ে যাও।" ভ্রাতা আর একটুও দেরি না করিয়া মুটে ডাকিতে গেলেন, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দশজন মুটে সঙ্গে লইয়া সেখানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, দরজা খোলা, কিন্তু সেই যুবতী ও সোনার সিন্দুক কিছুই নাই। তখন আর কি করিবেন? সমস্ত তৈজসপত্রাদি বাহকদের দিয়া আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে মুটেদের যাওয়া-আসা করিতে দেখিয়া প্রতিবাসীরা সন্দেহ করিয়া কাজিকে খবর দিল।

আলনস্কর সে রাত্রি সুখে কাটাইলেন বটে, কিন্তু পরদিন বাড়ীর বাহির হইবামাত্র কুড়ি-জন পদাতিক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কাজির কাছে লইয়া গেল। তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাল রাত্রে যে-সমস্ত জিনিষপত্র এনেছ, তা কোথায়?" "সে সকল জিনিষ আমার বাড়ীতে আছে।" এই কথা বলিয়া ভ্রাতা বিচারপতির কাছে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। বিচারক তাহা শুনিয়া চাকরদের দিয়া সব জিনিষ নিজের বাড়ীতে আনিয়া ভ্রাতাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা

মহারাজ! আমার ষষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাক্‌বাক্। তাঁহার খরগোসের মতন গন্নাকাটা ঠোঁট ছিল। তিনি প্রথম অবস্থায় ব্যবসায় করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করেন। পরে দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। একদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া খাবারের সন্ধানে পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দরজায় গিয়া দরোয়ানের কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা বলিল, "বাড়ীর মধ্যে ঢুকে প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাও, তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূর্ণ হবে।" সাক্‌বাক্ আহ্লাদিত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন, একটি দালানের মধ্যে সুন্দর খাটের উপর এক বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী স্বাগত বলিয়া তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা নিজের দুঃখের বর্ণনা করিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিলেন। কর্ত্তা তাঁহার এই কথা শুনিয়াই হাত পা ধুইবার জল আনিতে বলিলেন। ভ্রাতা মনে মনে আপন ভাগ্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, কেহই জল লইয়া আসিল না। কিন্তু কে যেন তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছে, তাহাতে তিনি হাত ধুইতেছেন, এই-রকম ভাবভঙ্গী করিয়া গৃহস্বামী ভ্রাতাকে কহিলেন, "এস, হাত ধোও, চাকর অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।" ভ্রাতা কি করেন, কর্ত্তাকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাঁহার নকল করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই-রকম মিথ্যা খাওয়ার ভাণ করিতে দুজনে বসিলেন। বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে খাবারের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আমার ভাইও বুড়োকে খুসী করিবার জন্য তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার পর অমনি ভাবে মদ খাওয়াও চলিল। ভায়া আগের মত পান করিয়া পাগলের মত টলিতে টলিতে বুড়োর গালে প্রচণ্ড এক চড় কসাইয়া দিলেন। গৃহস্বামী রাগিয়া চটিয়া বলিলেন, "তবে রে পাজি! আমার সঙ্গে এ কিরকম চালাকি হচ্ছে?" ভ্রাতা বলিলেন, "প্রভু! মদ খেয়ে মাতাল হয়েই এরকম কুকার্য্য করেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।" গৃহস্বামী তাঁহার কথায় খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি অনেক দিন থেকে তোমার মত একজন সুরসিক পুরুষ খুঁজছিলাম, আজ আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হল। তুমি আজ থেকে আমার সহচর হলে।" তিনি এই-কথা বলিয়াই চাকরদের নানা-রকম সত্যিকারের ভাল ভাল খাবার আনিতে বলিলেন। ভায়া সেইদিন হইতেই সেই লোকটির সহচর হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ গৃহস্বামীর মৃত্যু হইল। তাঁহার সন্তান ছিল না, কাজেই সমস্ত সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে গিয়া পড়িল।

সাক্‌বাক্ আবার অসহায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন,

ভাবিয়া আকুল। সেই সময়ে কতকগুলি লোক মক্কা যাইতেছিল। তিনি তাহাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করিলেন কিন্তু পথে একদল ডাকাত যাত্রীদের আক্রমণ করিল ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া বিধিমত কষ্ট দিল। তিনি অত কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া দস্যুদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে কেন অনর্থক যন্ত্রণা দিচ্ছ? আমার কাছে একটা কানাকড়িও

মিথ্যা খাওয়ার ভাণ করিতে দুজনে বসিলেন

নেই যে, তা দিয়ে তোমাদের হাত থেকে মুক্ত হই। তবে আমি তোমাদের আজ্ঞাধীন। যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে বেচতে পার।" ডাকাতের সর্দ্দার টাকা-কড়ি কিছু না পাইয়া মহা চটিয়া একখান ছোরা লইয়া তাঁহার ঠোঁট দুটি কাটিয়া দিল এবং তাঁহাকে চিরদাস করিয়া বাড়ীতে রাখিল। সেই অবধি তাঁহার খরগোসের মত ঠোঁট হইয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া কিছুদিন কাটিবার পর ডাকাতের সর্দ্দারটা কোনো কারণে খড়্গ দিয়া সাক্‌বাক্কের সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া উটে চড়াইয়া এক জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে রাখিয়া আসিল। ভাগ্যগুণে কতকগুলি পথিক সেই পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিল, তাহারা দয়া করিয়া আমাকে খবর দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম।"

কাসগরের রাজা এই-সমস্ত বিবরণ শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া দর্জ্জী প্রভৃতি সকলেরই

অপরাধ ক্ষমা করিলেন, এবং সেই নাপিতকে দেখিবার কৌতূহল হওয়ায় তাহাকে ডাকাইয়া সভায় আনাইলেন।

নাপিত রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! ইহুদী, দর্জী ও খ্রীষ্টয়ান সাধু এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আর কুঁজোটাই বা এমন ভাবে পড়ে আছে কেন? আমি কুঁজোর বিষয় শুনতে চাই।" এই কথায় রাজা বৃদ্ধ নাপিতকে কুঁজোর কথা শুনাইতে আজ্ঞা করিলেন। ধূর্ত্ত নাপিত আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া বলিল, "মহারাজ কুঁজোর যে মৃত্যু হয়নি, তা এই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করে দিতে পারি। এ-কথায় যদি আমাকে পাগল মনে করেন করুন, কিন্তু আমি সত্য বলছি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কুঁজোর গলা হইতে কাঁটা বাহির করিয়া নানারকম ঔষধ দিতে লাগিল। আস্তে আস্তে কুঁজো বাঁচিয়া উঠিল। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া সভাসদেরা এবং রাজা যে কি-রকম অবাক হইলেন তাহা বলা যায় না। নাপিত রাজার আদেশে রাজসভার একজন সভ্য হইয়া মরণকাল পর্য্যন্ত রাজপ্রসাদ ভোগ করিতে লাগিল।

রাজপুত্র জেইন-এলাস্নাম এবং এক দৈত্যেশ্বরের কাহিনী

সেকালে বালশোরা শহরে এক রাজা ছিলেন তাঁহার ধনেরও সীমা নাই, প্রজাদের কাছে সুনামও খুব। তিনি পুত্রকামনায় নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম্ম করাতে রাজমহিষীর একটি সুন্দর পুত্র হইল। রাজা ঐ পুত্রের নাম রাখিলেন এলাস্নাম। রাজকুমার ক্রমে নানাবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রাজা হঠাৎ মৃত্যুশয্যায় শুইলেন। তিনি যুবরাজকে নানারকম ভাল পরামর্শ দিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। রাজকুমার জেইন কিছুদিন পিতার জন্ত শোক করিয়া পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তা না করিয়া কেবল মর্দ্দ সঙ্গে দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং অকারণে ও নানা কুকার্য্যে অপব্যয় করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। এই-রকমে অশেষ দুর্দ্দশায় পড়িয়া যখন অনুতাপ করিয়া যারপরনাই মনোদুঃখে দিন কাটাইতেছেন, তখন একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একজন বৃদ্ধ তাঁহার কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "জেইন! দুঃখের শেষে সুখ আছে। অমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে থেকো না। উঠে মিসরদেশের অন্তর্গত কায়রো-নগরে যাত্রা কর। সেখানে তোমার দুঃখের অবসান হবে।"

রাজকুমার স্বপ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাকে সব কথা বলিলেন। মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাছা! স্বপ্নে বিশ্বাস করে কি মিসরদেশে যেতে যাও?" জেইন উত্তর দিলেন

"সব স্বপ্নই ত আর মিথ্যা নয়। আমার দুঃখের যে শেষ হবে তাতে আর সন্দেহ নাই। তাই আমি স্বপ্ন অনুসারে কাজ করব ঠিক করেছি।" এই বলিয়া যুবরাজ মাকে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া নিজে একলাটি রাত্রিবেলা কায়রো শহরের দিকে যাত্রা করিলেন।

তিনি কায়রো শহরে পৌছিয়া একটি মসজিদে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সেইখানে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাছা! তুমি যে আমার কথার বিশ্বাস করে এত দূরদেশে এসেছ, তাতেই আমি তোমার উপর খুব খুসী হয়েছি। এখন তুমি আবার বালশোরায় ফিরে যাও। সেখানে নিজের বাড়ীতেই অজস্র ধনরত্ন পাবে।" তাহার পর রাজকুমারের ঘুম ভাঙিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি যা ভেবেছিলাম, তা সত্য হল না। যা হোক, এখানে থেকে কি হবে? বালশোরায়ই ফিরে যাওয়া উচিত। ভাগ্যে মা ছাড়া অন্য কারু কাছে এ কথা প্রকাশ করিনি, তা হলে সকলেই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করত।" জেইন দেশে ফিরিয়া আসিয়া মায়ের কাছে খুলিয়া বলিল, রাণী পুত্রকে নানারকমে প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "বাছা! এখন সব কুস্বভাব ছেড়ে দিয়ে কেবল প্রজাদের সুখের চেষ্টা কর। তাদের সুখেই রাজার সুখ। তা ছাড়া অন্য চিন্তা করো না।"

যুবরাজ জেইন বাড়ী ফিরিবার পর আবার রাত্রে সেই বৃদ্ধের মুখে এই কয়েকটি কথা শুনিতে পাইলেন, "ওহে সাহসী জেইন! তোমার সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হয়েছে। তুমি কাল ভোরে বিছানা থেকে উঠে তোমার পিতার গুপ্ত ঘরের মেজে খুঁড়লেই সেখানে অনেক টাকাকড়ি পাবে।"

রাজকুমার এইকথা শুনিয়া পরদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া জননীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে স্বপ্নের সব কথা জানাইলেন। তিনি ছেলেকে অমনকাজ করিতে বার বার বারণ করিলেন। কিন্তু জেইন কিছুতেই তাঁহার কথা না শুনিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরের মাঝখানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ খুঁড়িবার পর শ্বেত পাথরে ঢাকা একটি দরজা দেখিতে পাইলেন। ঐ দরজা খুলিবামাত্র কয়েকটি সিঁড়ি দেখা গেল। জেইন একটা আলো লইয়া ঐ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া মোহর ঠাসা চল্লিশটা জালা পাইলেন। একটা জালার ভিতর হইতে কয়েকটা মোহর লইয়া রাণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলাতে রাণী বলিলেন, "বাছা, রাজকোষের অনেক টাকা অপব্যয় করে নষ্ট করেছ। সুতরাং এখন যে টাকা পেলে, এটা যেন আর অপব্যয় করো না।" তাহার পর রাণী ও যুবরাজ মাটির তলার ঘরে নামিয়া সেখানে আর কি কি আছে সমস্ত খোঁজ করিতে লাগিলেন। সেখানে একটা সোনার চাবি পাওয়া গেল। তাই দিয়া আর-একটা দরজা খুলিয়া অন্য ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল, তাহার ভিতরে প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার জন্য নয়টি সোনার থাম আছে। তার মধ্যে আটটির উপরে আটটি হীরার প্রতিমূর্ত্তি বসানো। ঐ-সমস্ত মূর্ত্তির আলোয় ঘরটি একেবারে ঝলমল করিতেছে। তাই দেখিয়া যুবরাজ জেইন বিস্মিত হইয়া

বলিলেন, "আহা! বাবা আমার কি করে এমন দুর্লভ মূর্ত্তি সংগ্রহ করেছেন!" নবম প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার থামটির কাছে গিয়া দেখিলেন, তাহার উপর প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল তাহা একখানি শাদা কাপড় দিয়া ঢাকা, এবং ঐ কাপড়ের উপরে এই কয়েকটি কথা লেখা—"হে প্রিয় পুত্র! আমি বহু কষ্টে এই আটটি প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। যদিও ইহাদের শোভা অত্যন্ত অদ্ভুত, তবু নবম প্রতিমূর্ত্তিটি সর্ব্বপ্রধান। তাহা এই পৃথিবীর মধ্যেই আছে। যদি নবম মূর্ত্তিটি দেখিতে চাও তাহা হইলে, মোবারক নামক আমার এক পুরাতন ভৃত্যের

যুবরাজ জেইন আবার রাত্রে সেই বৃদ্ধের মুখে শুনিলেন—

খোঁজে কায়রো নগরে যাও। সেখানে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কাছে তোমার পরিচয় দিও এবং তাহা হইলে যেখানে নবম প্রতিমূর্ত্তিটি পাওয়া যাইবে, সে তোমাকে সেই জায়গায় লইয়া যাইবে।" এই কথাগুলি পড়িয়া রাজকুমার রাণীর অনুমতি লইয়া নবম প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশে কায়রো নগরে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন, মোবারক

শহরের মধ্যে একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কাজেই অনায়াসেই তাহার বাড়ীর খোঁজ করিয়া লইতে পারিলেন। মোবারকের কাছে গিয়া নিজের পরিচয় দিতেই সে মহা সমাদরের সঙ্গে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আপনার পিতা আমার প্রভু ছিলেন। আপনার জন্মের আগেই আমি সেখান থেকে এসেছি। সুতরাং আপনি যে আমার প্রভুপুত্র, এখন আর তা কি করে বুঝব বলুন?" ইহা শুনিয়া যুবরাজ আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বর্ণনা করিলেন। মোবারক তখন বুঝিলেন যে, ইনি সত্যই বালশোরার রাজার পুত্র। তাহার পরে রাজপুত্রকে সেই অদ্ভুত নবম প্রতিমূর্ত্তির নিকটে লইয়া যাইতে স্বীকার করিয়া কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার আমোদ-আহ্লাদে একদিন কাটাইয়া মোবারককে বলিলেন, "আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে, এখন তুমি নবম মূর্ত্তির খোঁজে নিয়ে চল।"

মোবারক যুবরাজকে কোনোমতে থামাইয়া রাখিতে না পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নবম প্রতিমূর্ত্তির সন্ধানে চলিল। ক্রমাগত বহুদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারা একটি সুন্দর জায়গায় উপস্থিত হইলেন। মোবারক সঙ্গীদের সেখানে অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয়া রাজকুমারকে বলিল, "এখন আসুন, আমরা দুজনে সেখানে যাই। আমরা প্রায় প্রতিমূর্ত্তির কাছে এসে পড়েছি।" সেখান হইতে কিছুদূর যাইবার পর তাঁহারা এক সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র দিশাহারা হইয়া বলিলেন, "মোবারক! আমরা কি ক'রে এই সমুদ্র পার হব? এতে ত' একখানা নৌকাও নেই।" মোবারক উত্তর করিল, "মহাশয়, সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না, এখনি আমাদের জন্য দৈত্যপতির একখানি মায়া-নৌকা আসবে। তাতে চড়ে আমরা অনায়াসেই সাগর পার হতে পারব। কিন্তু আপনাকে আমি আগেই বলে রাখি, আপনি সে সময়ে কথা বলবেন না, কথা বললেই নৌকাডুবি হবে।" তাঁহারা যখন এই-রকম কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সেই সময় এক বিকটাকার দৈত্য একখানি নৌকা লইয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা তাহাতে চড়িয়া পরপারে গিয়া উঠিবামাত্র ঐ তরীখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। এমনি করিয়া তাঁহারা দৈত্যরাজের উপদ্বীপে নামিয়া সেখানকার নানারকম মনোহর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাজবাড়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মোবারক যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজকুমার! আমার প্রার্থনা অনুসারে দৈত্যপতি আমাদের কাছে আসিবামাত্র আপনি তাঁর কাছে এই বলে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন যে, আপনি আমার পিতার প্রতি যে-প্রকার দয়া দেখাতেন, আমার প্রতিও সেই-রকম করবেন। তার পর তিনি যখন আপনার কি প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করবেন তখন বিনীতভাবে বলবেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে নবম প্রতিমূর্ত্তিটি দান করুন।" মোবারক রাজকুমারকে এই-রকম পরামর্শ দিবার ঠিক পরেই সেখানে দৈত্যরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্যরাজকে দেখিবামাত্র যুবরাজ মোবারকের উপদেশ অনুসারে তাহাকে নমস্কার করিয়া তাহার কাছে আপনার মনের কথা

জানাইলেন। দৈত্যরাজ হাসিয়া বলিল, "হে বৎস! আমি তোমার পিতাকে ভালবাসতাম বটে, এবং তিনি যখন-তখন আমাকে সম্মান দেখাতে এখানে এসেছিলেন, আমিই তাঁকে প্রতিবারে এক-একটি প্রতিমূর্ত্তি দিয়েছি। তুমি যে লেখা পড়ে এখানে এসেছ, তোমার পিতার মৃত্যুর কয়েক দিন আগে আমার আদেশেই তা লেখা হয়েছে। আমিই বৃদ্ধের রূপ ধরে তোমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম। এখন, যে-মেয়ে কখনো কোনো পুরুষকে ভালবাসেনি, এমন একটি পনেরো বছরের অসামান্যা সুন্দরীকে আমার কাছে আন্‌তে পারলেই, তোমাকে সেই নবম প্রতিমূর্ত্তিটি দেব। কিন্তু সাবধান, যেন তাকে এই উপদ্বীপে আন্‌বার সময়ে তুমি মনে-মনেও তাকে ভালবেসে ফেলো না।" যুবরাজ দৈত্যরাজের ইচ্ছামত কাজ করিতে রাজী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দৈত্যরাজ! আমি কি করে সেই মেয়েটিকে চিন্‌তে পারব?" তাহা শুনিয়া দৈত্যরাজ বলিলেন, "আমি তোমাকে একখানি আয়না দিচ্ছি। পনেরো বছরের মেয়ে দেখ্‌তে পেলেই তার সাম্‌নে ঐ আয়না ধর্‌বে। যদি সেই মেয়ে কাউকে কখন ভালো না বেসে থাকে, তা হলে ঐ আয়না পরিষ্কার থাকবে, না হ'লে উল্টারকম হবে। দেখো মেয়েটিকে আন্‌বার কথাটি যেন ভুলো না, তা হলে তোমায় মেরে ফেলব।" তাহার পর যুবরাজকে আয়না দিয়া যুবরাজ ও মোবারককে বিদায় করিয়া দিল। তাঁহারা আগের মত উপায় অবলম্বন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আবার কায়রো নগরে আসিয়া হাজির হইলেন।

তখন তাঁহারা দৈত্যরাজের আদেশ অনুসারে যে কাহাকেও কখন ভালবাসে নাই এমন সুন্দরীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যত মেয়েকে আনা হয় তাহার মধ্যে একটিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না দেখিয়া, তাঁহারা দুজনেই ঐরূপ নারীর খোঁজে বাগদাদ-নগরে চলিলেন, এবং নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেখানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে পাড়াতে বাড়ী ভাড়া করিলেন, সেখানে বোবেকর নামে একজন অহঙ্কারী হিংসুটে পুরোহিত বাস করিত। সে রাজপুত্র জেইনের উদারতার কথা শুনিয়া হিংসায় জ্বলিয়া গিয়া একদিন মস্‌জিদে প্রার্থনা করিবার সময়ে সকল লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে বন্ধুগণ, সম্প্রতি যে বিদেশী লোকটা এই পাড়াতে রয়েছে, সে বড় ভাল লোক নয়। লোকটা দেশে দস্যুবৃত্তি করে এখানে পালিয়ে এসেছে। অতএব এই খবর রাজার কানে তুলে ওকে উচিত শাস্তি দিতে হবে।" পুরোহিত যখন এই কথা বলিতেছিল, সেই সময়ে মোবারক সেই মন্দিরে উপস্থিত ছিল। অতএব সে রাজপুত্রকে এই অকারণ শাস্তির হাত হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় পরদিন ঐ মৌলবীর বাড়ী গিয়া তাহার হাতে পাঁচশত মোহর দিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি যুবরাজ জেইনের কাছ থেকে আস্‌ছি। তিনি লোকমুখে আপনার গুণের পরিচয় পেয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ইচ্ছা করেন।" সে এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, "কাল তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।" পরদিন সকালে মৌলবী মস্‌জিদে গিয়া সকলের সাম্‌নে রাজকুমারের সম্বন্ধে নিজের ভুল স্বীকার করিয়া তাহাদের

শান্ত করিল। তারপর যুবরাজ জেইনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তার পর বৌবেকর রাজপুত্রকে সেখানে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ উত্তর করিলেন, "একটি পনেরো বছরের অপূর্ব্ব সুন্দরী কুমারী মেয়ের আশায় আমি এখানে বাস কর্‌ছি।" একথা শুনিয়া মৌলবী বলিল, "ঐ-রকম কুমারী একটি মেয়ে আমার সন্ধানে আছে। ঐ মেয়েটির পিতা আগে মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেকদিন ধরে তিনি বাড়ীতেই থেকে কেবল সেই মেয়েটির সুশিক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন। বোধ হয়

একটিও মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না

আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটির বিবাহ দেবার জন্য প্রস্তাব করলেই তিনি খুসী হয়ে তাতে মত দেবেন।" ইহা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, "আগে তাঁর গুণের পরীক্ষা না করে আমি সে মেয়েকে বিবাহ করব না।" এই কথা শুনিবামাত্র বৌবেকর রাজপুত্রকে মন্ত্রীর বাড়ী

লইয়া গেলেন। মন্ত্রী যুবরাজের পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে সেখানে আনিয়া তাহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিলেন। রাজকুমার মন্ত্রিকন্যার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আয়নাখানি বাহির করিয়া তাহার সাম্‌নে ধরিবামাত্র বুঝিলেন সে কোনো পুরুষকেই এখনও ভালবাসে নাই।

মন্ত্রী যুবরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিলে, রাজপুত্র খুসী হইয়া মন্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিলেন। এই-রকম করিয়া বিবাহ হইয়া গেলে, রাজকুমার ও মোবারক মন্ত্রিকন্যাকে সঙ্গে লইয়া কায়রো নগরে ফিরিয়াই আবার দৈত্যরাজের উপদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ঐ-দ্বীপে পৌঁছিলে মন্ত্রিকন্যা মোবারককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা এখন কোথায় এসেছি? আমার স্বামীর রাজধানী এখান থেকে আর কতদূর?" তাহাতে মোবারক উত্তর করিল, "দৈত্যরাজের হাতে সমর্পণ কর্‌বার জন্য রাজকুমার তোমাকে বিবাহ করেছেন, বালশোরার রাণী কর্‌বার জন্য নয়।" এইকথা শুনিবামাত্র মন্ত্রিকন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,"আমি বিদেশিনী,সুতরাং আমার আর কোনো উপায় নেই। তোমরা আমার উপর দয়া করে এ-রকম বিশ্বাসঘাতকতা থেকে ক্ষান্ত হও।" কিন্তু তাঁহারা মন্ত্রিকন্যার এত অনুনয়-বিনয়ে কান'ও না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দৈত্যেশ্বরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈত্যরাজ মন্ত্রিকন্যাকে একবার দেখিয়াই যুবরাজকে বলিলেন, "আমি তোমার ব্যবহারে বড় খুসী হয়েছি। তুমি এখন নিজের রাজ্যে ফিরে যাও। আমি দৈত্যদের দিয়ে নবম প্রতিমূর্ত্তিটি তোমার মাটির নীচের ঘরে পাঠিয়ে দেব। তুমি সে-ঘরে ঢুকবামাত্র সেটি দেখ্‌তে পাবে, এ-কথার অন্যথা হবে না।" রাজকুমার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া মোবারকের সঙ্গে আবার কায়রো নগরে ফিরিয়া সেই নবম প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। পথে রাজকুমার মনে-মনে এমনি করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মন্ত্রিকন্যা! আমি তোমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। হে সুন্দরী! আমিই তোমাকে বিবাহ করে দৈত্যের হাতে দান করে তোমার সকল যন্ত্রণার মূল হয়েছি।" শেষে রাজকুমার বাড়ী আসিয়া মাকে সব-কথা বলিলেন। তখন মা ও ছেলে দুজনে মাটির তলার ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইয়া দেখিলেন সেই নবম থামের উপর হীরার প্রতিমূর্ত্তির বদলে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি দৈত্যের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই দাঁড়াইয়া আছে। যুবরাজকে অমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ যুবতী বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি কি এখন হীরার মূর্ত্তির বদলে আমাকে এখানে দেখে আপনার সমস্ত পরিশ্রম বিফল মনে করছেন?" তাই শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "আমি কেবল প্রতিজ্ঞাপালন কর্‌বার জন্য তোমাকে সেখানে ফেলে এসেছিলাম, নইলে পৃথিবীর সমস্ত রত্নের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী ভালবেসেছি। তোমাকে আবার দেখে আমি যে কি খুসী হয়েছি, তা বলা যায় না।" এই কথা শেষ হইতে না-হইতে হঠাৎ দৈত্যরাজ সেখানে উপস্থিত হইয়া যুবরাজের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে

লাগিল, "আমি আপনার ছেলের জিতেন্দ্রিয়তা দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে এই নবম প্রতিমূর্ত্তিটি দান করেছি।" তারপরে জেইনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে ভাগ্যবান জেইন! এখন এই সতীই তোমার স্ত্রী হল। অতএব তুমি আর কাউকে ভাল না বেসে কেবল এঁকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসো।" এই-কথা বলিয়াই দৈত্যরাজ অদৃশ্য হইলেন। পরে ঐ দম্পতী পরস্পরকে ভাল বাসিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নিদ্রোত্থিতের কথা

হারুন-অল-রশীদ রাজার রাজত্বের সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধনী বণিক্ বাস করিতেন। আবুলহাসন নামে তাঁহার এক ছেলে ছিল। ছেলের বয়স ত্রিশ বৎসর হইলে বণিক তাহাকে সমস্ত ধনসম্পত্তি দিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য সমবয়স্ক ছেলেরা যে-রকম আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়, অনেক দিন হইতে আবুলহাসনের সেই-রকম ভাবে দিন কাটাইবার ইচ্ছা ছিল। পিতা ছিলেন মিতব্যয়ী, কাজেই তিনি বাঁচিয়া থাকিবার সময় ছেলে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন নাই। এখন নিজে কর্ত্তা হইয়া, অনেক দিনের সাধ মিটাইবার ইচ্ছায় হাতের সমস্ত টাকা দুই ভাগ করিলেন; এক অংশে বাড়ী ঘর জমি প্রভৃতি কিনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে যে উপস্বত্ব হইবে, তাহাতে কোনো মতেই হস্তক্ষেপ করিবেন না, সেটা কেবল জমাই থাকিবে; বাকী অর্দ্ধেক পূর্ব্বে পিতার শাসনে থাকাতে যে-সমস্ত আমোদ-প্রমোদে বঞ্চিত ছিলেন সেইসব আমোদ-প্রমোদে খরচ করিয়া তাহার শোধ তুলিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আবুলহাসন অনেকগুলি সমবয়স্ক ও নিজের দলের লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া প্রতিদিন তাহাদের নানারকমে ষোড়শ উপচারে ভোজ দিতে লাগিলেন। তাঁহার খরচেই প্রতিদিন মদখাওয়া গানবাজনা প্রভৃতি সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ হইত। এই-রকম অপব্যয়ে এক বৎসরের মধ্যে আবুলহাসনের সমস্ত টাকা-কড়ি ফুরাইয়া গেল। কাজেই তিনি দায়ে পড়িয়া আমোদ-প্রমোদ সব ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহার সঙ্গীরা একে-একে সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেহই আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল না। এমন কি পথে হঠাৎ দেখা হইলে তাঁহার সঙ্গে কথাও না বলিয়া একটা মিথ্যা কারণ দেখাইয়া চলিয়া যাইত।

বন্ধুদের এই-রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আবুলহাসন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মায়ের ঘরে গিয়া বসিলেন। তাঁহার মা ছেলের অমন বিমর্ষ ভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বাছা! সমস্ত টাকা-কড়ি খরচ হয়ে গেছে বলে বোধ হয় তুমি দুঃখিত

হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার বিলক্ষণ স্থাবরসম্পত্তি আছে, তখন এত চিন্তা কর্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই।" হাবুলহাসন বলিলেন, "মা! আমি যে-বন্ধুদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হলাম, তারা সকলেই এখন আমাকে ছেড়ে গেছে দেখেই এত দুঃখিত হয়েছি। ভাগ্যে পৃথক্ সম্পত্তি রেখেছিলাম, না হলে আমাকে যার পর নাই কষ্টভোগ করতে হত। যা হোক, এখন বিশেষ করে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য, একবার তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কিছু টাকা চাইব।" ইহা বলিয়া একে-একে সকল বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন। তাহারা কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেউ তাঁহার কথায় কানও দিল না দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিলেন, "মা! আমার বন্ধুরা আমার সাহায্য করা দূরে থাক, আমার সঙ্গে একটি কথাও বল্‌ল না। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আজ থেকে আর ঐ কপট বন্ধুদের মুখদর্শন কর্‌ব না; আর বাগ্দাদনগরের কোনো লোককেও আর ভোজ দেব না; কেবল জমানো টাকা থেকে নিজের এবং আর-একজনের সন্ধ্যা-বেলায় খাওয়ার ঠিক যা খরচ হতে পারে, তাই প্রতিদিন বের করে নেব। আমি নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে বাগ্দাদের কোনো লোককে ভোজ না দিয়ে প্রতিদিন একজন বিদেশী অতিথিকে খাওয়াব। তাকে এক রাত্রি বাড়ীতে রেখে পরদিন সকালে বিদায় করে দেব।"

আবুলহাসন এই-রকম ঠিক-ঠাক করিয়া স্থাবর বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নিজের আর একটি বিদেশী অতিথির খাবারের উপযোগী জিনিষপত্রের আয়োজন করিয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাগ্দাদের সাঁকোর উপর গিয়া বসিয়া থাকিতেন, নূতন বিদেশী লোককে দেখিতে পাইলেই তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া যাইতেন; এবং তাহার সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে রাত্রি তাহাকে সেখানে থাকিতে দিয়া ভোরবেলা বিদায় করিয়া দিতেন, কস্মিন্‌কালে আর তাহার সঙ্গে কথাও বলিতেন না।

এমনি করিয়া কিছুদিন যাইবার পর, একদিন সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছু পূর্ব্বে আবুলহাসন সেতুর উপর গিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহারাজ হারুন-অল-রশীদ মোসলদেশীয় এক বণিকের বেশ ধরিয়া একটি কালো ক্রীতদাস সঙ্গে লইয়া নৌকা হইতে কূলে উঠিলেন। আবুলহাসন তাঁহাকে দেখিবামাত্র সওদাগর মনে করিলেন এবং উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার শুভাগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট হলাম। কোনো বিদেশী এখানে পদার্পণ করিলেই প্রথমতঃ আমি তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অতিথিসেবা করি। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রিতে বিশ্রাম করেন।" মহারাজ আবুলহাসনের এই নিয়মের কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার কথায় সম্মতি দিয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন। আবুল-হাসন ছদ্মবেশী রাজাকে লইয়া গিয়া একটি ঘরের ভিতর একখানি পালঙ্কের উপর বসাইলেন। তাহার পর তাঁহার মাতা যে-সমস্ত খাবার রাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-সমস্ত আনিয়া অতিথির সঙ্গে একত্র খাইতে বসিলেন। খাওয়ার পর মহারাজের ক্রীতদাস হাত

ধুইবার জল আনিয়া দিল। ইতিমধ্যে আবুলহাসনের মা নানাপ্রকার ফল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সন্ধ্যার পর আবুলহাসন একপাত্র মদ্য ঢালিয়া পান করিলেন, এবং ঐ ছদ্মবেশী রাজাকে বণিক্ মনে করিয়া তাহাকেও মদ্যপান করিতে দিলেন। মদ খাইতে খাইতে দুজনে নানা-প্রকার আমোদজনক কথা সুরু করিয়া দিলেন। মাতাল হইয়া উঠিলে আবুলহাসন তাঁহার গোপন কথা বলিয়া ফেলিবেন, এই ভাবিয়া রাজা বার বার অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে খুব মদ খাওয়াইতে লাগিলেন। খানিক পরে আবুলহাসন মদের নেশায় কিঞ্চিৎ উল্লসিত হইলে, রাজা তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আবুলহাসন নিজের নাম, ধাম, এবং পৈতৃক সম্পত্তিসম্বন্ধে সব-কথা বলিয়া গেলেন। টাকা পাইয়া তাহার এক অংশ দিয়া কেমন করিয়া জমিজমা কিনিয়া, অপর অংশ কিরূপে অপব্যয় করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার সঙ্গে কি-রকম কুব্যবহার করিয়াছিলেন, তার পর তাহাদের নীচতা দেখিয়া বাগদাদ শহরের আর কোনো লোকের সঙ্গে আহার করিবেন না এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে একটি বিদেশী অতিথিকে খাওয়াইয়া সেই রাত্রির জন্য তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে থাকিতে দিবেন, ইত্যাদি কত নিয়ম করিয়াছিলেন, কোনোটাই বলিতে বাকী রহিল না।

বাগদাদের মহারাজা এই-সকল কথা শুনিয়া মহা খুসী হইয়া আবুলহাসনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আবুলহাসন। আমি তোমার এই-রকম সুনীতির কথা শুনে বড় প্রীত হলাম। তোমার মত যুবাপুরুষেরা এই বয়সে ত আপনাদের ইন্দ্রিয় বশে রাখ্‌তে পারে না। তুমি যে সে-পথ ছেড়ে দিয়ে এমন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেছ, তাতে তোমাকে আমি হাজার মুখে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

নানারকম কথাবার্ত্তা বলিতে-বলিতে রাত্রি অধিক হইলে রাজা বলিলেন, "কাল ভোরে তোমার ঘুমভাঙার আগেই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব। তাই তখন আর মিছামিছি তোমার ঘুম না ভাঙিয়ে, আমার যা বল্‌বার তা এ-সময়েই বলে রাখি। তুমি আমার সঙ্গে যে-রকম ভদ্র ব্যবহার কর্‌লে ও যেমন করে আতিথ্য দেখালে তাতে আমি তোমার উপর ভারি খুসী হয়েছি। এখন আমার ইচ্ছা যে, তোমার কোনো প্রত্যুপকার করি। তুমি যে অবস্থার লোক, তাতে তোমার কোনো-না কোনো বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাক্‌তে পারে। আমাকে সেটা অকপটে খুলে বল। আমি যদিও একজন সামান্য বণিক্ বটে, তবু আমার নিজেকে দিয়েই হোক, কি কোনো বন্ধুর সাহায্যেই হোক, তোমার প্রত্যুপকার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব।" ইহা শুনিয়া আবুলহাসন তাঁহাকে মোসলদেশীয় একজন সওদাগর মনে করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আমি যে অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি, এতে আমি বেশ খুসীই আছি, আমার কিছুমাত্র অভাব নেই। আপনার এই অশেষ দয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার যে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুখ আছে তাই বলছি, শুনুন! আপনি নিশ্চয় জানেন এই বাগদাদনগর যে-কয় ভাগে বিভক্ত, তাহার প্রত্যেক অংশে এক-একটি মসজিদ আছে।

ঐ মস্‌জিদগুলিতে এক-একজন মৌলবী আছেন। তাঁরা নিয়মিত সময়ে সকলের সাম্‌নে ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আমি যে-পাড়ায় বাস করি, এ-পাড়ার মৌলবী অত্যন্ত বৃদ্ধ আর তার মত ভণ্ড বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর নেই। এই গ্রামে ঐ ধরণের আর চারজন বুড়ো আছে। তারা প্রতিদিন ঐ পুরোহিতের বাড়ী গিয়ে রাজ্যের লোকের হিংসা, নিন্দাবাদ আর অপযশ করে আসে। তাতে সবাই বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন।" রাজা বলিলেন, "যাতে এই অত্যাচার নিবারণ হয়, তুমি বুঝি তাই চাও?" আবুলহাসন উত্তর করিলেন, "এই কুরীতি দূর করার আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি যদি একদিনের জন্য মহামহিম হারূন-অল-রশীদ নৃপতির সিংহাসনে বস্‌তে পেতাম, তা হলে ভদ্রলোকদের খুসী কর্‌বার জন্য ঐ চার বুড়োকে একশ করে আর মৌলবীটাকে একহাজার বেত লাগাতাম। তা হলে, ভদ্রপ্রতিবাসীদের অকারণ নিন্দবাদ করাতে যে কেমন ফলভোগ করতে হয়, তা একবার তারা বিলক্ষণ টের পেত।"

রাজা এই-কথা শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া আবুল-হাসনকে বলিলেন, "তোমার এ ইচ্ছা উত্তম বটে; কারণ যাতে দুষ্টের দমন হয়,'তাই তোমার ইচ্ছা। কাজেই তোমার এ মনস্কামনা সিদ্ধ হবার পথেও বাধা নেই। কারণ আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে, বাগদাদাধিপতি তোমার এই সদভিপ্রায়ের কথা জান্‌তে পারলে, অবশ্যই একদিনের জন্যে ইচ্ছা করে তোমার হাতে নিজের রাজ্যের ভার তুলে দিতে পাবেন। সে যাহোক, এখন আর সে আলাপের প্রয়োজন নেই। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হয়েছে, চল শোওয়া যাক্।" আবুলহাসন বলিলেন, "এখনও কিছু মদ আছে, ওটা খেয়ে শুতে গেলেই ভাল হয়। আপনাকে আরও একটি কথা বলে রাখি, আপনি যখন ভোরে উঠে যাবেন তখন অনুগ্রহ করে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন।" রাজা আবুলহাসনের কথামত একটি পাত্রে মদ্য ঢালিয়া নিজে পান করিলেন, এবং আর-একটি পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া লুকাইয়া তাহাতে এক-প্রকার গুঁড়া মিশাইয়া দিয়া আবুলহাসনের হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি ক্রমাগত মদ ঢেলে দিয়েছ, এখন আমি একবার ঢেলে দিলাম, আমার অনুরোধে এটা পান কর।" আবুলহাসন তৎক্ষণাৎ ঐ মদ্য পান করিলেন, এবং পান করিবামাত্র গুঁড়ার গুণে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন রাজা তাঁহার ক্রীতদাসকে বলিলেন, "তুই ঘুমন্ত আবুলহাসনকে পিঠে চড়িয়ে আমার সঙ্গে চল্, আর এই বাড়ী চিনে রাখ্। কারণ এইভাবে একে আবার এখানে রেখে যেতে হবে।" আজ্ঞামাত্র ক্রীতদাস আবুলহাসনকে পিঠে তুলিয়া রাজার পিছন-পিছন, চলিল। রাজা যাইবার সময় ভুল করিয়া আবুলহাসনের বাড়ীর দরজা বন্ধ করিলেন না। কাজেই সেটা খোলা রহিল। পরে তিনি এক গুপ্ত দরজা দিয়া আপনার শুইবার ঘরে উপস্থিত হইয়া চাকরদের আজ্ঞা করিলেন, "এই ঘুমন্ত লোকটিকে কাপড় ছাড়িয়ে একে আমার বিছানায় শুইয়ে রাখ্।" চাকরেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র আবুলহাসনকে রাজশয্যাতে শয়ন করাইয়া দিল। তখন রাজা রাজবাড়ীর সমস্ত দাসদাসী ও কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই ঘুমন্ত লোকটি কাল সকালে

বিছানা থেকে উঠলেই তোমরা সকলে ওর কাছে গিয়ে আমাকে যেমন সম্মান কর, একেও তেমনি করবে। এ ব্যক্তি যখন যে আজ্ঞা করবে, তৎক্ষণাৎ তা পালন করবে, এবং কথায়-বার্ত্তায় আমার মতন মান্য করবে। দেখো যেন কোনো বিষয়ে ত্রুটি না হয়।" রাজা যে

ক্রীতদাস আবুলহাসনকে পিঠে তুলিয়া রাজার পিছন পিছন চলিল

কেবল মজা দেখিবার জন্য এ-রকম আজ্ঞা দিলেন, পরিচারক ও পরিচারিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

এদিকে নৃপতি বাহিরে গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "জাফর! কাল তুমি রাজসভায় এসে আমার ঘরে যে-ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে পাছে বিস্মিত হও, তাই আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করে রাখছি। আমার সঙ্গে যেমন কথাবার্ত্তা বলে থাক ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও সেইরকম বলবে। আর ঐ ব্যক্তি দানশীলতা

দেখাবার জন্য যখন যে আজ্ঞা করবে, তাতে যদি আমার ধনাগার শূন্য হয়েও যায় তবু ওর আজ্ঞা লঙ্ঘন করো না। মোট কথা, তোমরা সকলেই ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে, যেন সে কোনোমতেই এ-মজার অভিসন্ধি বুঝতে না পাবে।" এই-কথায় প্রধান মন্ত্রী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে আবুলহাসন ঘুম ভাঙিয়া কি করে এই মজা দেখিবার জন্য রাজা মস্রুর নামক প্রধান ভৃত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ মস্রুর, তুমি আবুলহাসনের ঘুম ভাঙিবার আগেই আমাকে জাগিয়ে দিয়ো" এই বলিয়া নিজে আর-এক ঘরে গিয়ে শয়ন করিয়া রহিলেন।

মস্রুর নির্দিষ্ট সময়ে রাজাকে জাগাইয়া দিলে, তিনি আবুলহাসনের শুইবার ঘরের পাশের এক ঘরে লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজা উঠিবার আগে রাজভৃত্য ও দাসীরা নিজ নিজ নিয়মিত কাজ করিবার জন্য শুইবার ঘরে গিয়া প্রতিদিন যেমনভাবে সার দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত আজও সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সূর্য্য উঠিবার আগেই নমাজ পড়িবার জন্য আবুলহাসন জাগিয়া চোখ মেলিয়া জানালার অল্প আলোতে দেখিলেন যে, তিনি একটি প্রকাণ্ড সুন্দর সাজানো ঘরে শুইয়া আছেন। ঘরের দেওয়াল সোনা-রূপায় মোড়া, আর বিছানার চাদরে মহামূল্য মুক্তা ও হীরার মালা দুলিতেছে। আবার খাটের চারিপাশে সুন্দরী মেয়েরা নানা-রকম বাজনা হাতে করিয়া এবং বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ খোজা মহামূল্য পোষাক পরিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে; তা ছাড়া শয্যার নিকটেই এক মছলন্দের উপরে একপ্রস্থ রাজবেশ এবং মহারাজ হারুন-অল্-রশীদের একটি মুকুট রহিয়াছে। আবুল-হাসন এই-সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া এমনি হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হইলেন যে, তাহা বলাই যায় না। তিনি একবার মনে করিলেন, আমি বুঝি বাগদাদাধিপতি হইয়াছি। আবার নিজের অবস্থা মনে হওয়াতে ভাবিলেন, "না, এটা স্বপ্নমাত্র। গত রাত্রে আমার নিমন্ত্রিত লোকটির কাছে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, বোধ হয় সেইজন্যেই মনের আবেগে এই-রকম বোধ হচ্ছে।" নানা-রকম ভাবিয়া যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান ভৃত্য সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার, রজনী প্রভাত হয়েছে, গাত্রোত্থান করতে আজ্ঞা হোক, নমাজ পড়বার সময় অতীত হয়।" এই-সকল কথায় আবুলহাসন আরও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি জেগে আছি, না, ঘুমচ্ছি? না না, আমি নিশ্চয়ই জেগে আছি, কারণ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কোনো কথা শুনতে পাওয়া যায় না।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বণিকনন্দন চোখ মেলিয়া হাসিমুখে শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

বন্দিনীরা আবুলহাসনের সম্মুখে আসিয়া বীণা প্রভৃতি নানা-রকমের যন্ত্র বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। তাই শুনিয়া তিনি এতই মোহিত হইলেন, যে, এই-সমস্ত যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, তাহা স্বপ্ন কি সত্য ঘটনা স্থির করিতে না পারিয়া, মাথা হেঁট করিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে মনে মনে বলিলেন "এসব কি দেখছি?

আমি কোথায়? এই অট্টালিকাই বা কার? এই-সব দাসদাসী ও গায়িকারাই বা কোথা থেকে এল? আমি জেগে আছি, কি স্বপ্নাবস্থায় আছি, তার কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এরই বা কারণ কি?" এই-রকম নানা চিন্তা করিয়া আবুলহাসন চোখ মেলিয়া মাথা তুলিবামাত্র মস্‌রুর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার উঠতে বিলম্ব হওয়াতে নমাজ পাঠের সময় অতীত হয়ে গিয়েছে, আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন মহারাজের রাজসিংহাসনে বসবার সময় উপস্থিত হয়েছে। রাজসভাসদ্‌গণ আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করছেন।" খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া আবুলহাসন মস্‌রুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করছ? আমাকে বুঝি তুমি চেন না? আর কোনো লোকের বদলে ভুল করে আমাকে এ-রকম সম্বোধন করছ?" আর কোনো ভৃত্য হইলে হঠাৎ এই-রকম কথার উত্তর দিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু মস্‌রুর তৎক্ষণাৎ আবুলহাসনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিল, "হে প্রভু! আমার পরীক্ষা করবার জন্য কি আপনি এমন কথা বললেন? বাস্তবিক আপনি কি সর্ব্বেশ্বর মহারাজা নন? এতকাল সুখস্বচ্ছন্দে মহারাজের সেবা করেও দীনহীন ক্রীতদাস মস্‌রুর কি মহারাজকে ভুলে যেতে পারে? তবে যদি এ-দাস আপনার অসন্তোষভাজন হয়ে থাকে, তা হলে আমার মত হতভাগ্য এ জগতে আর নেই, এখন অভয়দান করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

আবুলহাসন খোজাধ্যক্ষের এই-সকল কথা শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাই দেখিয়া রাজা মহা খুসী। কিন্তু পাছে এত শীঘ্র মজা ভাঙিয়া যায় এই আশঙ্কায় অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলেন। আবুলহাসন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে?" ক্রীতদাস বলিল, "আপনি বাগ্‌দাদাধিপতি মহারাজ হারুন-অল্‌-রশীদ।" এ-কথা শুনিয়া বণিক্‌নন্দন রাগিয়া উঠিয়া মস্‌রুরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অনেক বকিবার পর সামনের একটি মেয়েকে বলিলেন, "তুমি আমার আঙুলটা কামড়াও দেখি, তা হলে আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত তা বুঝতে পারব।" মেয়েটি রাজাকে আমোদ দিবার জন্য আবুলহাসনের আঙুলটা নিজের মুখে পুরিয়া এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে, বণিক্‌পুত্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহার মুখ হইতে হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "হাঁ! আমি জেগে আছি বটে, ঘুমইনি।" কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে কি-প্রকারে বাগ্‌দাদেশ্বর হইলেন, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে না পারিয়া আবুলহাসন আবার সেই যুবতীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে শপথ করে বল দেখি, আমি কি সত্যিই মহারাজ হারুন-অল্‌-রশীদ?" রমণী বলিল, "আপনি কেন যে এ-কথা বিশ্বাস করছেন না, এতে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছি।" আবুলহাসন বলিলেন, "তুমি আমাকে প্রতারণা করছ। আমি যে কে, নিজে সেটা আমি বিলক্ষণ জানি।"

তাহার পর মস্‌রুর আবুলহাসনের হাত ধরিয়া বিছানা হইতে উঠাইবামাত্র চারিদিক

হইতে অনবরত "মহারাজের জয়, মহারাজের জয়," এই শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কাল রাত্রে আমি আবুলহাসন ছিলাম, আর আজ সকালে মহারাজ হলাম!" এদিকে প্রধান ভৃত্য অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সাহায্যে তাঁহাকে রাজবেশ পরাইল। তার পর সারি সারি দাসী ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া রাজসভায় লইয়া গিয়া সিংহাসনের উপর বসাইল। তখন মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ একত্র হইয়া অত্যন্ত সম্মান দেখাইলেন।

ইতিমধ্যে হারুন অল্‌-রশীদ এ পর্য্যন্ত যে-ঘরে ছিলেন সেখান হইতে সভার কাছে এমন আর-একটি কুঠরীতে গিয়া বসিলেন যেখান হইতে রাজসভার সমস্ত ব্যাপার দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

আবুলহাসন সিংহাসনে বসিবামাত্র প্রধান মন্ত্রী জাফর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মাবতার! পরমেশ্বর ইহকালে আপনাকে সুখী করে পরকালে সুখময় স্থান স্বর্গধামে নিয়ে যান এই আমার একান্ত অভিলাষ।"

রাজসভাসদ্ এবং কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজ-নিজ জায়গায় বসিবার পর প্রধান মন্ত্রী একখানি কাগজ হাতে করিয়া রাজার সম্মুখে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রাজকার্য্য-সম্বন্ধে নানা-প্রস্তাব পাঠ করিলেন। আবুলহাসন সে-সমস্ত কাজ সুন্দর করিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শান্তিরক্ষককে ডাকাইয়া বলিলেন, 'শান্তিরক্ষক! তুমি এখনি অমুক পাড়ার অমুক গলিতে যাও। সেখানে গিয়ে দেখবে এক মস্‌জিদ আছে। ঐ মস্‌জিদে এক বুড়ো মৌলবী আর-চারজন পাকা-দাড়ি বুড়োর সঙ্গে বসে আছে। তাদের ধরে ধর্ম্মযাজককে চারশত আর বাকি চারিজনের প্রত্যেককে এক একশ কশাঘাত কর। তার পর ঐ পাঁচজনকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে উটের উপর পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বসিয়ে সহরময় নিয়ে বেড়াও, আর তাদের সঙ্গে এক ব্যক্তিকে দিয়ে এই বলে ঘোষণা করাও যে, 'যারা পরনিন্দা এবং প্রতিবাসীদের কুৎসা করে সকলের মনে কষ্ট দেয় ও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটায় তাদের এই-প্রকার দণ্ড হয়ে থাকে।' এবং এও আমার ইচ্ছা যে, তুমি ঐ কয়েক জনকে বলে দাও, ভবিষ্যতে তারা যেন ঐ পাড়ায় আর না আসে।" আজ্ঞা মাত্র শান্তিরক্ষক আবুলহাসনকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইল।

মহারাজা হারুন-অল্‌-রশীদ আবুলহাসনকে মৌলবী ও তাহার সঙ্গী চারিজন ভণ্ডের প্রতি এইরূপ দৃঢ়ভাবে দণ্ডাজ্ঞা করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে শান্তিরক্ষক রাজ-আজ্ঞা পালন প্রমাণ করিবার জন্য সেই পাড়ার কতকগুলি ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত একখানি কাগজ নূতন রাজার হাতে দিল। আবুলহাসন ঐ কাগজে তাঁহার পরিচিত কয়েকটি লোকের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া মহা খুসী হইলেন। তার পর মন্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি ধনরক্ষকের কাছ থেকে এক হাজার মোহর নিয়ে বিখ্যাত অপব্যয়ী আবুলহাসনের জননীর হাতে এই বলে দিয়ে এস যে, মহারাজ হারুন-অল্‌-রশীদ

তোমাকে এই ধন পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে-পাড়াতে শান্তিরক্ষককে এইমাত্র পাঠিয়েছিলাম, সেই পাড়াতেই তিনি থাকেন।" জাফর মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ধনরক্ষকের নিকট হইতে এক সহস্র মুদ্রা আনিয়া আবুলহাসনের মাতাকে দিয়া আসিলেন। আবুলহাসনের জননী ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মহারাজের দানশীলতায় বিস্মিতা হইয়া মোহরগুলি লইলেন। পরে মস্‌রুর আসিয়া সভাসদ্‌ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ইঙ্গিত করিয়া সভাভঙ্গের সময় হইয়াছে জানাইলে, সভ্যগণ ও কর্ম্মচারীরা সিংহাসনের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গেলেন।

আবুলহাসন সিংহাসন হইতে নামিয়া যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইখানে গেলেন। রাজমন্ত্রী পরিচারকদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

প্রধান ভৃত্য মস্‌রুর আবুলহাসনকে অন্তঃপুরে সোনা-মোড়া অপূর্ব্ব একটি ঘরে লইয়া গেল সেখানে কয়েকটি রমণী বাদ্যযন্ত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা আবুলহাসনের আগমনে এমনি গীত বাদ্য আরম্ভ করিল যে, তাহা শুনিয়া আবুলহাসন মুগ্ধ হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এটা যদি স্বপ্ন নাই হয় তবু আমার কেন এমন মনে হচ্ছে না যে, আমি যথার্থই মহারাজ হয়েছি।" ঘরের মাঝখানে একটি মেজের উপর বড়-বড় সোনার থালায় ও রেকাবিতে নানা-রকম সুবাসিত সুস্বাদু খাবার সাজানো ছিল, তাহার সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হইয়াছিল। মেজের চারিদিকে সাতজন সুন্দরী সুন্দর বেশভূষা করিয়া খাইবার সময় আবুলহাসনকে হাওয়া করিবার জন্য পাখা হাতে দাঁড়াইয়া ছিল।

খাওয়া শেষ হইলে মস্‌রুর আবুলহাসনকে সঙ্গে লইয়া আর-একটা সুসজ্জিত ঘরে ঢুকিল। বণিকপুত্র সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র আলাদা আলাদা সাতদল পরিচারিকা গান বাজনা আরম্ভ করিল। ঘরে বসিবার পর, তিনি আগে যে-রকম সাতটি রূপবতী রমণীর সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক সুন্দরী আর-সাতজন যুবতী আসিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে আরম্ভ করিল। আবুলহাসন নানা-রকম ফল খাইবার পর, মস্‌রুর তাঁহাকে অন্য এক ঘরে লইয়া গেল। সেখানেও তিনি আগের মত আশ্চর্য্য নানাবিধ সুখকর ব্যাপার দেখিলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পরে মস্‌রুর আবুলহাসনকে সঙ্গে লইয়া আর-একটি ঘরে ঢুকিল। সেখানে সোনায়-মোড়া বড়-বড় সাতটি ঝাড় জ্বলিতেছিল, এবং আগের মত কয়েকটি গায়িকা এবং মেজের চারিদিকে সাতজন অনুপমা সুন্দরী যুবতী পাখা হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। আর মেজের উপর সাতখান সোনার পাত্রে নানারকম শুষ্ক ফল, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য পানীয় সাজানো ছিল। তাহার উপর এই ঘরে অতি উৎকৃষ্ট মদে পরিপূর্ণ সাতটা কুঁজো ছিল, এবং তাহার কাছে অতি সুন্দর গঠনের সাতটি কাচের পানপাত্র ছিল। অন্য তিন ঘরে খাইবার সময় মদের নামমাত্র ছিল না। তাহার কারণ এই যে, বাগ্দাদনগরে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কি ছোট, কি বড়, কি রাজকর্ম্মচারী, আপামরসাধারণ কেহই

দিনের বেলা মদ্যপান করে না। ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যদি কেউ দিনের বেলা সুরাপান করিত, তাহা হইলে, সে দিনের বেলা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। ঐ প্রথানুসারে বণিকপুত্রও এ পর্য্যন্ত কেবল জলপান করিয়া আসিতেছিলেন।

আবুলহাসন খাইতে বসিলে এক পরিচারিকা মদ্যাধার হইতে এক পাত্র মদ্য লইয়া তাহাতে এমনি লুকাইয়া আগের মত এক-রকম গুঁড়া মিশাইয়া দিল যে, আবুলহাসন তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। সে ঐ-পাত্র তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "মহারাজ! মদ্যপান

ঐ পাত্র তাঁহার হাতে দিয়া......বাঁশী বাজাইয়া... গান করিল

করবার আগে আমার রচিত একটি নূতন গান শুনুন!" এই-কথা বলিয়া বাঁশী বাজাইয়া সুরতানলয়সংযোগে একটি গান করিল। তাহাতে আবুলহাসন মোহিত হইয়া আবার আর-একটি গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। মেয়েটি আবার গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহা

শুনিয়া আবুলহাসন আরও মোহিত হইয়া ঐ গুঁড়ামিশ্রিত মদ্যপান করিলেন। হঠাৎ ঘোর নিদ্রায় তাঁহার চোখদুটি বন্ধ হইয়া গেল, মাথা মেজের উপর নত হইয়া পড়িল, এবং হাত হইতে সেই মদ্যপাত্রটি নীচে পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া হারুন-অল্-রশীদ মহারাজ মহানন্দে গুপ্তস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া যে ক্রীতদাসের দ্বারা আবুলহাসনকে রাজবাড়ীতে আনাইয়াছিলেন, তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, "একে এর আগের পোষাক পরিয়ে এর বাড়ীর যে ঘর থেকে এনেছিলে সেই ঘরে শুইয়ে রেখে এস, আর আসবার সময় যেন দরজা খোলা থাকে।" আজ্ঞামাত্র ক্রীতদাস আবুলহাসনকে পিঠে লইয়া তাঁহার ঘরে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া আসিল ও ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে খবর দিল। তিনি ভাবিলেন, আবুলহাসন পরনিন্দাকারী ধর্ম্মযাজক এবং তাহার বন্ধু চারিজন বুড়োকে শাস্তি দিবার জন্য একদিনের জন্য রাজা হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

এদিকে আবুলহাসন পর দিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া গুঁড়ার মাদকতা-শক্তি দূর হইলে জাগিয়া দেখিলেন, আপনার ঘরেই আছেন। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাজপুরীর রমণীদের নাম ধরিয়া "মতিদশনা, শুকতারা, চন্দ্রাননা তোমরা কোথায় গেলে? এখানে এস।" বলিয়া তাহাদিগকে এমন জোরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার মাতা অন্য ঘর হইতে তাহা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কাকে ডাকছ? তোমার কি হয়েছে?" আবুলহাসন জননীর এই-প্রকার কথা শুনিয়া মহা চটিয়া তাঁহার দিকে গর্ব্বিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "হাঁগো বুড়ী! তোমার ছেলে কে?" তাঁহার মাতা ইহা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি কি আমার ছেলে আবুলহাসন নও?" আবুলহাসন বলিলেন, "ওরে বুড়ী! তুই কি বলছিস্! আমি তোর ছেলে আবুলহাসন নই। আমি মহামহিমান্বিত বাগ্দাদাধিপতি।" তখন তাঁহার মা বলিলেন, "বাছা ক্ষান্ত হও, এমন কথা বলো না, শুনলে লোকে তোমাকে পাগল বলবে।" আবুলহাসন বলিলেম, "তুই বুড়ী আপনি পাগল। আমি পরমেশ্বরের প্রতিনিধি ধর্ম্মাবতার বাগ্দাদাধিপতি।" তাঁহার জননী কহিলেন, "বাছা! তোমার বুদ্ধির দোষ ঘটেছে, নইলে এমন কথা কখন বলতে না।" আবুলহাসন জননীর মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া মনে মনে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করিয়া জননীকে বলিলেন, "মা! আপনার কথাই সত্য, আমি আবুলহাসনই বটে। বুঝতে পারি না, কিজন্য এমন ভাব মনে উদিত হল।" আবুলহাসনের মাতা তখন মনে করিলেন, তাঁহার পুত্রের ভুল দূর হইয়াছে। ইতিমধ্যে আবুলহাসন হঠাৎ এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মায়াবিনী বুড়ী! তোর কথা সত্য নয়, আমি তোর ছেলে নই, আমি মহারাজ বাগ্দাদাধীশ্বর।"

বণিক-গৃহিণী পুত্র আবুলহাসনের এই-প্রকার বিপরীত ভাব দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্য কথা তুলিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য কাল সেই পাড়ার ধর্ম্মযাজক

ও তাহার সঙ্গী চারিজন বৃদ্ধ তাঁহাদের কুস্বভাবের জন্য অত্যন্ত অপমানিত হইয়া যে-রকম রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে, সেই-সমস্ত কথা আগাগোড়া বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আবুলহাসনের মনের ভাব না বদলাইয়া আগের কথা মনে পড়াতে তিনি যে সত্যই বাগদাদাধিপতি এই দৃঢ় সংস্কার তাঁহার মনে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তখন আবুলহাসন বলিলেন, "আমার আজ্ঞাতেই তো ধর্ম্মযাজক ও আর-চারজন ভণ্ড প্রতারকের দণ্ড হয়েছে। অতএব আমিই যে ধর্ম্মপালক বাগদাদেশ্বর, তাতে আর সন্দেহ নেই।" আবুলহাসনের মাতা এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাছা! তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। পরমেশ্বর কৃপা করে তোমাকে ভাল করুন, এই আমার প্রার্থনা। তুমি এমন অসঙ্গত কথা আর মুখেও এনো না।" আবুলহাসন মাতার এই-রকম সস্নেহ-কথা শুনিয়া আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওরে বুড়ী! আমি তোকে কথা বলতে বারণ করেছি, তবু এককথা বারবার বলছিস। আমার কথা অবিশ্বাস করলে তোকে এখনি উচিত শাস্তি দেব।"

আবুলহাসনের মা ছেলের এমন দুর্দ্দশা দেখিয়া মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবুলহাসন আবার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে বুড়ী! আমি কে তা বল্।" তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি সত্যিই আমার ছেলে আবুলহাসন। আমাদের দেশের রাজা মহারাজ হারুন-অল্-রশীদের উপাধি পুণ্যাত্মাপালক। সে উপাধি তোমার কি করে হতে পারে? আর তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, মহারাজের আমাদের প্রতি এমন দয়া যে কাল প্রধান মন্ত্রীকে দিয়ে আমাকে এক হাজার মোহর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এতে রাজার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে তুমি কিনা তাঁর অপমানজনক কথা বলতে সুরু করেছ?" এই কথায়, আবুলহাসন নিজেই মন্ত্রীকে দিয়া টাকা পাঠাইয়াছিলেন, মনে পড়াতে আরও ক্ষেপিয়া উঠিলেন, এবং নিজে যে স্বয়ং মহারাজ, তাহা স্থির করিয়া বার বার তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কথা কহার জন্য একগাছি বেত আনিয়া মাকে নিষ্ঠুরের মত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখিনী মা ছেলের এমন নির্দ্দয় প্রহারে আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা সেখানে আসিয়া দেখিল, আবুলহাসন যতবার তাঁহার জননীকে বেত মারিতে মারিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বল্ আমি পুণ্যাত্মাপ্রতিপালক মহারাজ হারুন-অল-রশীদ কি না?" ততবারই তাঁহার জননী ধীরে ধীরে বলিতেছেন, "না বাছা, তুমি রাজা নও, তুমি আমার ছেলে আবুলহাসন।" বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া প্রতিবাসীরা আবুলহাসনের হাত হইতে বেত কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আবুলহাসন! তুমি কি করছ? ধর্ম্মভয় ছেড়ে গর্ভধারিণী মাকে প্রহার করতে লজ্জা হচ্ছে না?" আবুলহাসন বলিলেন. "তোমরা দূর হও, তোমরা আবুলহাসন বলে কাকে সম্বোধন করছ? আমি আবুলহাসন নই, আমি ধর্ম্মাত্মাপ্রতিপালক মহারাজ হারুন-অল্-রশীদ।"

এই-কথা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আবুলহাসনকে পাগল বিবেচনা করিয়া তাঁহার হাত পা

বাঁধিয়া দুইজন ছুটিয়া গিয়া পাগলা-গারদের রক্ষককে খবর দিল। সে খবর পাইবামাত্র বেড়ি, হাতকড়ি, একগাছা চাবুক এবং কতকগুলি লোক লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আবুলহাসন তাহাকে দেখিবামাত্র প্রথমত বাঁধন খুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রক্ষক তাঁহাকে দুই তিন ঘা চাবুক মারিবার পর, তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। তখন রক্ষক তাঁহাকে শিকল পরাইয়া কারাগারে লইয়া গেল, এবং লোহার খাঁচায় পুরিবার আগে তাঁহাকে আরও পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারিল। তিনি যে মহারাজ নহেন এই জ্ঞান জন্মাইবার জন্য রক্ষক রোজই আবুলহাসনকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারিত। তাহাতে আবুলহাসন কোনো কোনো সময়ে কোনো উত্তর করিতেন না, কেবল চুপ করিয়া থাকিতেন, এবং কখন কখন বলিতেন, "আমি বাস্তবিক পাগল নই, কেবল তোমার নিষ্ঠুর আচরণেই আমাকে পাগল হতে হয়েছে।"

আবুলহাসনের মা প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। ছেলের পিঠ ও গলার কালো রং ও ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন দেখিয়া ও ছেলের শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছে দেখিয়া তাঁহার এত কষ্ট হইত যে, প্রায়ই কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপ নিদারুণ প্রহার ও যন্ত্রণাতে তিন দিন কাটিয়া যাইবার পর একদিন আবুলহাসন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি যথার্থই বাগদাদাধীশ্বর হতাম, তা হলে আমার দাসদাসী রাজমন্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত অনুচরেরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত, এবং কখনই আমাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হত না। অতএব এটা যে কেবল স্বপ্ন মাত্র তাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মঠধারী ও তার সঙ্গীদের দণ্ডভোগ এবং মার কাছে হাজার টাকা পাঠান, এ সমস্ত ব্যাপার যখন আমার আজ্ঞাতেই হয়েছে, তখন আবার এটাকে স্বপ্ন বলেও ঠিক বোধ হয় না।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মাতা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুলহাসন জননীকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন। বণিক-পত্নী পুত্রের এই সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে বোধ করিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাছা! তুমি কেমন আছ? উপদেবতার অত্যাচারে তোমার যে রোগ হয়েছিল, তার কি শান্তি হয়েছে?" এই কথায় আবুলহাসন স্থিরভাবে ও ম্লানমুখে বলিলেন, "মা, আমি ভুল ক'রে আপনাকে বিস্তর যন্ত্রণা দিয়ে নিতান্ত গর্হিত কাজ করেছি, অতএব আমার সে গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

আবুলহাসনের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার মা মহা সুখী হইয়া বলিলেন, "বাছা! তোমার মুখে এ-সকল কথা শুনে আমার মন যে কি খুসী হল, তা আর বলে কি বোঝাব। এখন আমি তোমার অসুখের একটি কারণ ঠিক করেছি। বোধ হয়, তোমার মনে থাকতে পারে, অল্পদিন হল তুমি একজন বিদেশী বণিক্‌কে ঘরে এনেছিলে। সে লোকটি ফিরে যাবার সময় তোমার ঘরের দরজা খোলা রেখে যায়। মনে হয়, সেই সুযোগেই কোনো উপদেবতা ঘরে ঢুকে তোমাকে এমন অস্থির করেছে। এখন তার হাত থেকে মুক্তিলাভের

জন্তে পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন আর এমন বিপাকে পড়তে না হয়।" আবুলহাসন বলিলেন, "মা, তোমার কথা সত্যি বটে। আমি সেইরাত্রেই ঐ দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমি ঐ বণিক্‌কে দরজা বন্ধ করে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে উল্টো কাজ করাতেই কোনো উপদেবতা আমার শরীরে ঢুকে আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। এইবার পরমেশ্বরের কৃপায় সেরে উঠেছি। এখন শীঘ্র এই কারাগার থেকে উদ্ধার কর, নইলে আমি নিশ্চয় মরব।"

আবুলহাসনের মা ছেলের ভ্রম দূর হইয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দিত হইয়া রক্ষকের নিকট যাইয়া এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করাতে সে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া আবুলহাসনকে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিল।

আবুলহাসন মাতার সঙ্গে কারাগার হইতে বাড়ী আসিয়া কয়েক দিন উত্তমরূপে আহারাদি করিতে লাগিলেন। তার পরে আগের মত বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলে একলাটি বাড়ী বসিয়া থাকা অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিয়া আগের নিয়ম অনুসারে নূতন অতিথির খোঁজে বাহির হইয়া বাগদাদের সাঁকোর উপর গিয়া বসিয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে বাগদাদাধিপতি আগের মত মোসলদেশীয় বণিকের বেশে একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুলহাসন দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহাকে আপনার সমস্ত যন্ত্রণার মূল কারণ মনে করিয়া তাঁহার মুখ দেখিবেন না স্থির করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। রাজা আগেই আবুলহাসনের সমস্ত বিবরণ শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলেন, যে, তিনি তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়াছেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়া বলিলেন, "ভাই আবুলহাসন! নমস্কার, এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" আবুলহাসন মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "তুমি কে হে? আমি তোমার সেলাম নিতে কি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চাই না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।" রাজা বলিলেন, "কি হে? তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? তোমার মনে নেই, গত মাসের প্রথম দিনে আমি তোমার বাড়ীতে অতিথি হয়ে কত আমোদ-আহ্লাদ করে গিয়েছিলাম।" আবুলহাসন বলিলেন, "যাও যাও, মিছে বোকো না।"

রাজা যদিও আবুলহাসনের অতিথিসৎকারের নিয়ম ভাল করিয়াই জানিতেন, তবু আবার তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইবার ইচ্ছায় বলিলেন, "তুমি যে এত অল্পদিনের মধ্যে আমাকে ভুলে গিয়েছ ইহা ত আমার কোনোমতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। বোধ হয় তোমার কোনো বিপদ ঘটে থাকবে, তাই আমার উপর অমন রাগ হয়েছে। এখন আমি কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্তে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করছি।"

আবুলহাসন বলিলেন, "যাও যাও, আর বিরক্ত কোরো না, তোমার আর মঙ্গল প্রার্থনা করতে হবে না। তুমি এমনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করেছিলে যে আমাকে পাগল হতে হয়েছিল।"

রাজা বলিলেন, "যদি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সঙ্গে আবার দেখাই হয়েছে, তবে আমাকে আগের মত বাড়ীতে নিয়ে চল।"

আবুলহাসন বলিলেন, "তুমি কি আমার নিয়ম জান না? আমি এক লোককে দুবার অতিথি করি না; বিশেষতঃ তোমাকে একবার অতিথি করাতেই আমাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।" তখন রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই! আমার দ্বারা তোমার কি অপকার ঘটেছে, তা আমায় খুলে বল। আমি নিশ্চয়ই তার যথাবিধি প্রতিকার করতে চেষ্টা করব।"

রাজা বার বার অত করিয়া অনুরোধ করাতে আবুলহাসন তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইয়া তাঁহার কাছে দুর্ঘটনার আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। বিশেষতঃ নিজের মায়ের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও প্রতিবেশীদের গালাগালি দেওয়া এবং কারাগারে আপনার দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ বর্ণনা করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন। রাজা এই সমস্ত কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন দেখিয়া আবুলহাসন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না? আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি? এই দেখ আমার পিঠে মারের চিহ্ন রয়েছে।" এই বলিয়া পিঠের কাপড় খুলিয়া মারের চিহ্ন দেখাইলেন। রাজা তাই দেখিয়া আবার বিস্মিত হইয়া অনেক অনুতাপ করিয়া তাঁহাকে আবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "চল ভাই, এখন বাড়ী চল, কাল এর প্রতিকার করা যাবে।"

যদিও আবুলহাসনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে, এক লোককে দুইবার অতিথি করিবেন না, তবু তিনি ভূপতির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি শপথ কর, কাল ফিরে যাবার সময় দরজা বন্ধ করে যাবে, তা হলে আমি তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে অতিথি করতে পারি।" রাজা শপথ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যাইতে স্বীকার করিলে, আবুলহাসন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলেন। রাজার সেই ক্রীতদাসও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাড়ী আসিতে-আসিতে সন্ধ্যা হইল, আবুলহাসন বাড়ী ঢুকিয়া মাকে ডাকিয়া আলো আনিতে বলিলেন এবং রাজাকে একখানি পালঙ্কের উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে খাবার তৈরী হইলে, তাঁহারা খাইলেন। তার পর আবুলহাসনের মা ফলমূল ও মদ আনিয়া উপস্থিত করিলে, আবুলহাসন প্রথমে একটি পাত্রে মদ ঢালিয়া নিজে পান করিলেন, তার পর একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া রাজাকে পান করিতে দিলেন। এমনি করিয়া দুজনে কিছুক্ষণ মদ খাইবার পর রাজা আবুলহাসনের কিঞ্চিৎ নেশা হইয়াছে দেখিয়া নানা-কথা তুলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ?" আবুলহাসন বলিলেন, "বিবাহের প্রতি আমার বিলক্ষণ বিদ্বেষ আছে। তবে বিশেষ গুণবতী মেয়ে পেলে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তেমন মেয়ে আমার মত লোকের ভাগ্যে পাওয়া সহজ নয়।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে-রকম ইচ্ছা প্রকাশ করলে, ভদ্রলোক মাত্রেই সেইরকম ইচ্ছা করে থাকেন। তাই আমি অঙ্গীকার করছি যে, যাতে তোমার এই বাসনা পূর্ণ হয়, সেজন্যে আমি বিশেষ

চেষ্টা করব।" রাজা এই-কথা বলিয়া একটা পাত্রে খানিকটা মদ ঢালিয়া তাহাতে আগের মত গুঁড়া মিশাইয়া পাত্রটা আবুলহাসনের হাতে দিয়া বলিলেন, "যে মেয়েকে দিয়ে ভবিষ্যতে তোমার উন্নতি হবার সম্ভাবনা, তার কুশলের জন্যে তুমি আগে এই মদটুকু খাও।" রাজা এই-কথা বলিবামাত্র আবুলহাসন হাসিমুখে তাঁহার হাত হইতে পানপাত্রটা লইয়া বলিলেন, "তোমার এই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করলে, নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পায়, তাই তোমার কথায় পান করছি।" এই বলিয়া আবুলহাসন ঐ মদ পান করিতে-না-করিতেই একেবারে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আপন শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাকে কাঁধে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য ক্রীতদাসের প্রতি রাজা আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র ভৃত্য আবুলহাসনকে কাঁধে লইয়া আগে আগে চলিল, রাজাও নিজের কথামত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভৃত্যের পিছনে চলিলেন। রাজা প্রাসাদে পৌঁছিয়া আবুলহাসনকে আগের মত রাজবস্ত্র পরাইয়া পালঙ্কের উপর শোওয়াইলেন। তারপর দাসদাসী, কর্ম্মচারী ও গায়িকারা আবুলহাসনের ঘুম ভাঙিলে যাহাতে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকে সেইজন্য রাজা তাহাদের আজ্ঞা দিয়া নিজে ঘুমাইতে গেলেন, এবং প্রধান খোজাকে বলিয়া রাখিলেন খুব ভোরে সে যেন তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া দেয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খোজাধ্যক্ষ রাজাকে জাগাইয়া দিলে, রাজা মজা দেখিবার জন্য শয্যা হইতে উঠিয়া যে-ঘরে আবুলহাসন ঘুমাইয়া ছিলেন, তাহার পাশের একটি ঘরে গিয়া বসিলেন। মসরুর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এবং গায়িকার দল আবুলহাসনের শয্যার চারিপাশে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

গুঁড়ার নেশা কাটিয়া আসিলে, আবুলহাসনের ঘুম ভাঙিল। সেই সময়ে গায়িকারা নানারকম বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। গান শুনিয়া আবুলহাসন মোহিত হইয়া চোখ মেলিবা মাত্র আগে স্বপ্নে যে-সমস্ত মেয়েদের দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার সামনে গীতবাদ্য করিতেছে দেখিয়া এবং যে সুসজ্জিত গৃহে আগে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহেই ঘুমাইতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! একমাস আগে আমি যে-রকম স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন আবার সেইরকম স্বপ্নই দেখছি। আবার বুঝি আমাকে লোহার খাঁচায় বন্ধ হয়ে সেইরকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে? হে পরমেশ্বর! আমি তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করলাম, এখন তোমার মনে যা আছে কর।"

এই-কথা বলিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এবং আবার চোখ চাহিয়া চারিদিক দেখিয়া বলিলেন, "হে জগদীশ্বর! আমাকে রক্ষা কর।" ইহা বলিয়া আবার চোখ বুজিয়া থাকিলেন। তখন একজন সুন্দরী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "মহারাজ! উঠুন, নমাজ পাঠের সময় বয়ে যায়।" তাই শুনিয়া আবুলহাসন বলিলেন, "তুমি কি আমাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করছ? আমি মহারাজ নই, আমি আবুলহাসন।" মেয়েটি বলিল,

"আবুলহাসনকে আমরা চিনি না, আপনি ধর্ম্মাত্মাপালক মহারাজ হারুন-অল্-রশীদ, এইমাত্র জানি।" তাহা শুনিয়া আবুলহাসন আরও ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "হে জগদীশ্বর! আমাকে এই উপদেবতার হাত থেকে নিস্তার কর।" বণিক্‌পুত্রের এই-কথা শুনিয়া রাজা হাসিতে লাগিলেন। আবুলহাসন এই-কথা বলিয়া আবার চোখ বুজিতেই ঐ মেয়েটি আবার বলিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনাকে জাগাবার জন্য আমাদের যা বলা উচিত তা বললাম, এখন রাজকার্য্যের সময় অতীত হয়ে যাচ্ছে। অতএব আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করি।" এই বলিয়া ঐ রমণী তাঁহার হাত ধরিয়া আর-একটি মেয়েকে তাঁহার আর-একটা হাত ধরিতে বলিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া ঘরের মাঝখানে লইয়া গিয়া বসাইল। তার পর সব ক'টি মেয়ে হাত ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং বাদ্যকারিণী রমণীরা বাজনা বাজাইয়া গান সুরু করিল।

তখন আবুলহাসন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মুক্তাদশনা ও শুকতারা নামের মেয়ে দুটিকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা সত্য করে বল দেখি আমি কে? কিছুতেই মিথ্যা বলো না।" শুকতারা বলিল, "মহারাজ, আপনার কথা শুনে আমরা অবাক্ হলাম। আপনি কি জানেন না যে, আপনি ধর্ম্মাত্মাপালক এবং পরমেশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ মহারাজ হারুন-অল্-রশীদ।" তাহার কথা শুনিয়া আবুলহাসন আরও চিন্তিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন. "হে পরমেশ্বর! আমি আবুলহাসন কি বাগ্দাদাধিপতি আমার মনে এই সন্দেহ উঠেছে। অতএব আমাকে সত্যজ্ঞান দিয়ে আমার এ ভ্রান্তি দূর কর।" তার পর পিঠের কাপড় তুলিয়া মেয়েদের দেখাইয়া বলিলেন, "স্বপ্নে কি কখন এমন মারের দাগ হতে পারে?" এই বলিয়া রাজবেশ ছিঁড়িয়া এবং মাথা হইতে রাজমুকুট দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া এক লাফে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং দুইজন মেয়ের হাত ধরিয়া পাগলের মত তাহাদের সঙ্গে নাচগান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা আর হাসি চাপিতে না পারিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন, "ওহে আবুলহাসন! ক্ষান্ত হও, তোমার কাণ্ড দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারি না। হাসতে হাসতে আমার প্রাণ বেরোবার উপক্রম হয়েছে।"

রাজার গলার স্বর শুনিবামাত্র রমণীগণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইলে আবুলহাসন দেখিলেন, বাগ্দাদাধিপতি, যিনি মোসলদেশীয় বণিকের বেশে তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনের ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি রাজসমীপে গিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মোসলদেশীয় বণিক্! আমার রঙ্গ দেখে হাসতে হাসতে তোমার প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়েছে। কিন্তু তোমার জন্যই আমি আমার মাকে মারলাম, তোমার জন্যই আমি কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলাম, আর তুমিই আমার সমস্ত কষ্টের মূল, অথচ তোমার কোনো দোষ না হয়ে সমস্ত দোষ আমার হল?" তখন রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আবুলহাসন! তোমার কথাই

সত্য, আমি যথার্থই দোষী বটে, তাই পরমেশ্বরের কাছে শপথ করে বলছি, আমার সেই দোষ দূর করবার জন্য তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করতে প্রস্তুত আছি।" ইহা বলিয়া রাজা চাকরদের দিয়া আবুলহাসনকে অতি সুন্দর পোষাক পরাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আবুলহাসন! আজ হতে তুমি আমার ভাই হলে। এখন

দুইজন মেয়ের হাত ধরিয়া পাগলের মত তাহাদের সঙ্গে নাচগান করিতে আরম্ভ করিলেন

তোমার কি মনোবাঞ্ছা আছে প্রকাশ করে বল, আমি এখনি পূর্ণ করব।" আবুলহাসন বলিলেন, "হে ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাকে কি করে এবং কি অভিপ্রায়ে এমন ভ্রান্তমতি করেছিলেন, তা আমাকে প্রকাশ করে বলুন, তা হলেই আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

এই-কথা শুনিয়া বাগদাদাধিপতি, আবুলহাসনকে খুসী করিবার জন্ত গত মাসের প্রথম দিনে নগরের লোকদের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি দেখিবার জন্ত ছদ্মবেশে শহরময় ঘুরিতে ঘুরিতে কেমন করিয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া একদিনের জন্ত তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা জানিয়াছিলেন, এবং কি করিয়া তাঁহাকে না জানাইয়া মদ্যের সঙ্গে একরকম গুঁড়া মিশাইয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া রাজবাড়ীতে আনিয়াছিলেন, সব-কথা আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "তার পরে যা যা ঘটেছিল, সে ত তুমি নিজের মুখেই বলেছ। আমার জন্তে যে তোমাকে এত যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতাম না। এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমাকে তোমার কি করতে হবে বল।"

আবুলহাসন বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যে-সমস্ত দুঃখের কথা শুনেছেন, তাতেই আমার সকল কষ্ট দূর হয়েছে। এখন আমার অভিলাষ এই যে, আপনার শ্রীচরণ দর্শনে যেন কেউ আমায় বাধা না দেয়, এই বিষয়ে আপনার অনুমতি থাকলেই চরিতার্থ হব।"

আবুলহাসনের এই-রকম নির্লোভ কথা শুনিয়া রাজা তাহার উপর অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন, "আবুলহাসন! তোমার যখনই ইচ্ছা হবে তখনই নির্ব্বিঘ্নে রাজবাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। এ-বিষয়ে কেউ তোমাকে বারণ করবে না।" এই বলিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আবুলহাসনকে একটি আলাদা ঘর দিয়া তাঁহার খরচের জন্ত যখন যে টাকার দরকার হইবে, তাহা দিবার জন্ত কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন। তার পর তাঁহাকে একহাজার মোহর দিয়া মাতার সঙ্গে দেখা করিতে অনুমতি করিলেন।

আবুলহাসন এমনিভাবে রাজার অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী গিয়া জননীর কাছে নিজের সৌভাগ্যের বিষয় আগাগোড়া বর্ণনা করাতে তিনিও অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন

এমনি করিয়া সর্ব্বদা আবুলহাসন রাজার কাছে থাকাতে ক্রমে তাঁহার এমনি স্নেহপাত্র হইয়া উঠিলেন যে, রাজা কখন কখন তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রধানা মহিষী জোবেদীর কাছেও লইয়া যাইতেন।

কিছুদিন পরে রাজা আবুলহাসনের বিবাহের কথা স্মরণ করিয়া পূর্ণমুখানাম্নী নিজ অন্তঃপুরের এক পরিচারিকার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত রাজবাড়ীতে নানা-রকম নৃত্যগীত ও আমোদ চলিতে লাগিল। রাজমহিষী পরিচারিকার সন্তোষের জন্ত তাহাকে বিস্তর মহামূল্য উপহার দিলেন, এবং রাজাও আবুলহাসনকে যৌতুক-স্বরূপ অজস্র টাকা দান করিলেন। আবুলহাসন রাজার অনুগ্রহে অন্তঃপুরের মধ্যে যে-ঘর পাইয়াছিলেন, সেই গৃহেই নববিবাহিতা বধূরও ঠাঁই মিলিল। এমনি করিয়া তরুণ দম্পতী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া পরমসুখে রাজভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে একজনও খরচের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এমন আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন যে, অপব্যয়ের জন্ত এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা

ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কি করেন, রাজা ও রাণীর কাছ হইতে যৌতুক-স্বরূপ যে-সমস্ত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পাইয়াছিলেন, সমস্ত বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইলেন। আবুলহাসন এই-প্রকারে এক বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "রাজা আমাকে রাজবাড়ীতে থাকতে আজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন আমার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমি ধনরক্ষকের কাছে প্রার্থনা করবামাত্র তখনি তা পাব। কিন্তু যখন এমন অপব্যয় করে রাজা ও রাণীর দেওয়া সমস্ত অর্থ নষ্ট করেছি, আর রাজকোষ থেকে মধ্যে মধ্যে যা নিয়েছিলাম, তাও অনর্থক ব্যয় করেছি, তখন আমার এই উপস্থিত দুরবস্থার বিষয় রাজার কাছে নিবেদন করলে, তাঁর কাছে কেবল অপব্যয়ী নাম কেনা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না। অতএব একথা কোনোক্রমে তাঁর কর্ণগোচর করা হবে না। যার কাছে গেলেও যথেষ্ট টাকা পেতে পারি। কিন্তু আমি যে আবার অপব্যয় করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, তা তিনি জানতে পারলে তাঁর কাছেও যথেষ্ট অপমানিত হব। কাজেই সেখানে যাওয়ারও সুবিধা নেই।"

আবুলহাসন নিস্তব্ধভাবে এই-রকম নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে, তুমিও আমার মত অর্থাভাবের জন্য চিন্তিত হয়েছ। তাই এখন রাজারাণীর কাছে টাকা না চেয়ে আমাদের কষ্ট নিবারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করেছি। তাতে আমাদের দুজনেরই সাহায্যের দরকার। এ-বিষয়ে তোমার মত কি?" এই কথা শুনিয়া পূর্ণসুধা বলিলেন, "নাথ! আমিও টাকার জন্য অত্যন্ত কষ্টভোগ করছি। আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। আপনার মনের কথা খুলে বলুন।"

আবুলহাসন বলিলেন, "আমার মতলব এই যে, আমি কপটতা করে মড়ার মত শুয়ে থাকব, তুমি একখানি শাদা কাপড়ে আমার শরীর ঢেকে শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাণীর কাছে গিয়ে আমার মৃত্যুসংবাদ দিও। তা হলে তিনি আমার জন্যে খুব দুঃখ করে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে একশত মোহর আর এক প্রস্থ ভাল সাটিন কাপড় দিয়ে তোমাকে রাজবাটী থেকে বিদায় দেবেন। তুমি সে-সমস্ত নিয়ে বাড়ী ফিরে আসবামাত্র আমি উঠে পড়ব। তার পর তোমাকে মাটিতে শুইয়ে আমি রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে এই খবর দিলে, তিনিও দয়া করে তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমাকে একশ মোহর ও এক প্রস্থ সাটিন কাপড় দেবেন। তা হলেই আমরা কিছুদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাতে পারব।

পূর্ণসুধা এই পরামর্শ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আবুলহাসন মড়ার মত মাটিতে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত শরীর একখানা শাদা কাপড়ে ঢাকা দিয়া ছিন্নবেশে এলোচুলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে রাজপ্রিয়া জোবেদীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী পূর্ণসুধার কান্না শুনিয়া মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘরের দরজায় আসিয়া

পূর্ণমুখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণমুখা! তুমি কিজন্য এত কাঁদছ?" রাজ্ঞীর মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র পূর্ণমুখা জোবেদীর পায়ে পড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আরও উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কপট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "ঠাকুরাণী! দুঃখের কথা আর কি বলব? আপনার অনুগ্রহে যে-বণিকপুত্রকে স্বামী বলে পেয়েছিলাম, সেই হতভাগ্য আবুলহাসনের মৃত্যু হয়েছে।" রাজ্ঞী এই-কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া পূর্ণমুখাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণমুখা! তুই বলিস্ কি; সেই বণিকপুত্রের মৃত্যু হয়েছে? হা কপাল! এত শীঘ্র যে তার মৃত্যু হবে তা আমি স্বপ্নেও জানতাম না।"

রাজমহিষী বণিক্‌নন্দনের শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের ধনরক্ষিকাকে কাছে ডাকাইয়া আবুলহাসনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং একখান সাটিন কাপড় আনিতে অনুমতি করিলেন।

আজ্ঞামাত্র টাকা ও কাপড় আসিলে, রাজরাণী তৎসমুদায় পূর্ণমুখার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুমি এই কাপড় আর টাকা দিয়ে স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে ঘরে গিয়ে বাস কর, সেজন্যে আর দুঃখ কি খেদ কোরো না। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর রইল।" এই-কথা শুনিয়া পূর্ণমুখা খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিবামাত্র আবুলহাসন উঠিয়া বসিলেন এবং দুজনেই আনন্দে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন।

তার পর পূর্ণমুখা মড়ার মত মাটিতে শুইলে, আবুলহাসন তাঁহার সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে রাজার দরবারে হাজির হইয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাই দেখিয়া রাজা মহা ব্যাকুল হইয়া আবুলহাসনের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুলহাসন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার সুখোন্নতির জন্য অনুগ্রহ করে যাকে আমার সঙ্গিনী করে দিয়েছিলেন সেই পূর্ণমুখা—" ইহা বলিয়া আর কোনো কথা বলিতে না পারিয়া কেবল অঝোরে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। আবুলহাসন যে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ দিবার জন্য রাজবাড়ী আসিয়াছেন, রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া পূর্ণমুখার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য ধনরক্ষকের কাছ হইতে একশত মোহর ও একখানি সাটিন কাপড় আনাইয়া আবুলহাসনের হাতে দিলেন। আবুলহাসন তাহা লইয়া রাজাকে নমস্কার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ঘরের দরজা খুলিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুশয্যা হইতে ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে ত'?" স্ত্রীর মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র আবুলহাসন রাজার দেওয়া সমস্ত জিনিষ তাঁহার হাতে দিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া দুজনে গল্প করিতে লাগিলেন।

রাজা জানিতেন, পূর্ণমুখা রাজমহিষীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিল, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে রাণী নিশ্চয় অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া থাকিবেন। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য

খোজাধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। সেখানে রাণীকে শোকে ভাঙিয়া পড়িতে দেখিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আর বৃথা শোক কোরো না। পূর্ণসুখার অনেক গুণ ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য শোক করলে আর কি হবে? তার আবার বেঁচে উঠবার কোনো আশা নাই।" জোবেদী ভূপতির মুখে পূর্ণসুখার মৃত্যুর কথা শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কি করে আমার প্রিয়সখী পূর্ণসুখার মৃত্যুর কথা বলছেন? তার ত মৃত্যু হয়নি, সে বেঁচেই আছে। আমি আপনার প্রিয়পাত্র আবুলহাসনের পরলোক-যাত্রার সংবাদ পেয়ে দুঃখ করছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি ত তার জন্যে একটুও শোক করছেন না।"

রাজা আবুলহাসনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং রাণীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আবুলহাসনের জন্যে বৃথা অশ্রুপাত কোরো না, তার মৃত্যু হয়নি। সে এইমাত্র আমার কাছ থেকে তার স্ত্রীর শ্রাদ্ধের জন্যে একশ' মোহর আর একখান সাটিন নিয়ে গেল।" রাণী বলিলেন, "মহারাজ! এখন ঠাট্টা করবার সময় নয়, আমি আপনাকে নিশ্চয় বলছি, আবুলহাসনেরই মৃত্যু হয়েছে। তার বিধবা স্ত্রী আমাকে ঐ সংবাদ দিয়ে এইমাত্র আমার কাছ থেকে তার সদ্গতির জন্যে একশ' মোহর নিয়ে যাচ্ছে। সে সময় আমার দাসীরা উপস্থিত ছিল। আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করলেই সব জানতে পারবেন।"

জোবেদীর এই-সমস্ত কথা শুনিয়া রাজা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি শপথ করে বলছি, তোমার প্রিয় সখীরই মৃত্যু হয়েছে।"

রাণী বলিলেন, "আমিও পরমেশ্বরের নামগ্রহণ করে বলছি, আবুলহাসনই পরলোকে গিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ এই-রকম তর্কবিতর্কের পর রাজা অত্যন্ত রাগিয়া আবুলহাসন ও পূর্ণসুখা দুজনের মধ্যে কাহার মৃত্যু হইয়াছে, এ-বিষয়ের খাঁটি খবর জানিবার জন্য মস্‌রুরকে আবুল-হাসনের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

আবুলহাসন জানালা দিয়া মস্‌রুর আসিতেছে দেখিয়া, তাহাকে নিশ্চয় রাজা পাঠাইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া পূর্ণসুখাকে আবার মড়ার মত মাটিতে শুইতে বলিয়া, নিজে তাহার সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া ম্লানমুখে তাহার পাশে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তার পর মসরুর ঘরে ঢুকিবামাত্র তিনি উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দেখ ভাই, আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে, এর চেয়ে শোকের বিষয় আর কি আছে?" মস্‌রুর এই-কথা শুনিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া আবুলহাসনকে বলিতে লাগিলেন, "আবুলহাসন! রাজা আর রাণী তোমার ও পূর্ণসুখার মৃত্যু নিয়ে মহা তর্কবিতর্ক করেছেন। শেষে তাঁদের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্যে রাজা আমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি যা দেখলাম,

তাই গিয়ে বলব। কিন্তু বোধ হয়, রাণী আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না. কারণ মেয়েদের কেমন একটি চমৎকার স্বভাব, তাদের একবার একটা সংস্কার জন্মে গেলে, তারা তাই ধ্রুব-সত্য জ্ঞান করে রাখে, তার উল্টো কথা সত্য হলেও তাতে কান দেয় না। আমি রাজাকে খবর দিয়ে এখনই আসছি। তুমি আমার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরো। আমি তোমার সঙ্গে গোরস্থানে যাব।" খোজাধ্যক্ষ এই-কথা বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন আবুলহাসন স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখ প্রেয়সী! আমার বোধ হচ্ছে জোবেদী মস্‌রুরের কথায় বিশ্বাস না করে নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তাঁর কোনো বিশ্বাসী ক্রীতদাসীকে পাঠিয়ে দেবেন। অতএব আমাকে দেখছি আর একবার মরতে হল।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ঢাকা দিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মস্‌রুর রাজা এবং রাণীর কাছে উপস্থিত হইয়া পূর্ণসুখার মৃত্যু সংবাদ নিবেদন করিলে রাজা হাসিয়া বলিলেন, "দেখ রাণী! আমার কথাই সত্য হল, তোমার প্রিয়তমা সঙ্গিনীই বেঁচে নেই।" জোবেদী বলিলেন, "আমি ও-চাকরটার কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ আমি পূর্ণসুখাকে স্বচক্ষে দেখেছি।"

মস্‌রুর বলিল, "রাজ্ঞী! আমি শপথ করে বলছি, পূর্ণসুখারই মৃত্যু হয়েছে।" ইহা শুনিয়া জোবেদী চটিয়া বলিলেন, "দূর হ মিথ্যাবাদী! তোর কথা যে মিথ্যা, আমি এখনি তা প্রমাণ করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ধাত্রীকে কাছে ডাকাইয়া আবুলহাসনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। আজ্ঞামাত্র বুড়ী বণিক্‌পুত্রের বাড়ী গিয়া দেখিল, পূর্ণসুখা মৃতস্বামীর পাশে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "হে প্রিয় আবুলহাসন! হে প্রাণনাথ! আমি তোমার কি করেছি যে, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। ইহা শুনিয়া ধাত্রী বিস্তর শোক প্রকাশ করিয়া আবুলহাসনের মুখের কাপড় তুলিয়া তাঁহার মুখ দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং পূর্ণসুখাকে অনেক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাড়াতাড়ি রাজা ও রাজমহিষীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবুলহাসনের মৃত্যুসংবাদ দিল। জোবেদী এই-কথা শুনিবামাত্র ধাত্রীকে বলিলেন, "মহারাজ আমাকে নেহাৎ পাগল মনে করেছিলেন। ওঁর কাছে আর একবার স্পষ্ট করে খাঁটি খবরটা দাও। শুনে পাজি কালো কৃষ্ণবর্ণ মস্‌রুরেরও চৈতন্য হোক।" ইহাতে প্রধান নপুংসক ও ধাত্রী দুজনে মহা ঝগড়া লাগিয়া গেল। মস্‌রুর রাণীর সামনে ধাত্রীকে যারপরনাই অপমান করিতে উদ্যত হইলে রাজমহিষী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি খোজাধ্যক্ষের আচরণ স্বচক্ষে দেখলেন, অতএব এর বিচার করুন।" ইহা শুনিয়া বাগ্দাদেশ্বর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "রাজমহিষী! প্রথমতঃ আমি, দ্বিতীয়তঃ তুমি, তৃতীয়তঃ প্রধান নপুংসক এবং চতুর্থতঃ বুড়ী ধাই, আমরা সকলেই মিথ্যাবাদী হয়েছি. কেউ কারুর কথা বিশ্বাস করতে

পারছি না। তা' চল আমরা একবার সকলেই আবুলহাসনের ঘরে গিয়ে সত্যমিথ্যা জেনে আসি, তা হলে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হবে।" রাজা এই-কথা বলিবামাত্র চারিজনেই উঠিয়া আবুলহাসনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

এদিকে আবুলহাসন রাজবাড়ী হইতে কখন কে আসে সতর্কভাবে তাহাই লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। তাই জানালা দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র স্ত্রীকে আগের মত মরিয়া পড়িয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া নিজেও সেইভাবে তাহার পাশে পড়িয়া রহিলেন। রাজা, রাণী প্রভৃতি সকলেই ঐ ঘরে ঢুকিয়া যখন দেখিলেন আবুলহাসন এবং পূর্ণসুখা দুজনেই পরলোকে গিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

জোবেদী বলিলেন, "হে মহারাজ, আমার বোধ হচ্ছে, আবুলহাসনেরই নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটেছে, এবং আমার প্রিয়সখী স্বামীর শোকে কাতর হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছে।"

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "না প্রিয়ে! ও কথা বলো না, পূর্ণসুখাই আগে দেহত্যাগ করেছে, তার পরে তার শোকে আবুলহাসনের মৃত্যু হয়েছে, এতে আর সন্দেহ নাই।"

এই-কথা লইয়া আবার একটি নূতন ঝগড়ার সূত্রপাত হইল। স্বামি-স্ত্রীতে অনেক তর্কবিতর্ক করিবার পর, রাজা নিজে মড়ার কাছে আসিয়া কে আগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা ঠিক জানিবার ইচ্ছায় উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে শপথ করে বলছি যে, যে-ব্যক্তি বলতে পারবে এদের মধ্যে কে আগে প্রাণত্যাগ করেছে, আমি তাকে একহাজার মোহর পুরস্কার দেব।" রাজার মুখ থেকে এই-কথা বাহির হইতে-না-হইতেই আবুলহাসন কাপড়ের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমাকেই ঐ হাজার মোহর দিন, আমিই আগে ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলাম।" ইহা বলিয়া উঠিয়া রাজার পায়ে পড়িলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রীও কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজমহিষীর পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাণী, আমাকেই ঐ হাজার মোহর দিন, আমিই আগে মরেছিলাম।" রাজ্ঞী তাহার কথায় কোনো উত্তর না দিয়া প্রিয় পরিচারিকাকে পুনর্জ্জীবিতা দেখিয়া মহা খুসী হইয়া কহিলেন, "পূর্ণসুখা! তোর জন্যে আমি বিস্তর কষ্ট ভোগ করেছি। কিন্তু তুই যে সত্যি-সত্যিই মরিস্‌নি তাতে আমি যারপরনাই আহ্লাদিত হলাম।" রাজা আবুলহাসনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আবুলহাসন! তুমি দ্বিতীয়বার আমাকে হাসিয়ে আমার প্রাণবধ করবার অভিপ্রায়ে এরকম উপায় উদ্ভাবন করেছ।" আবুলহাসন বলিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার কাছে কোনো কথা গোপন না রেখে অকপটে সমস্ত বলছি; শুনুন। আমি যে কেমন খাওয়া-দাওয়ার ভক্ত তা আপনি বিলক্ষণ জানেন; আর আমাকে যে স্ত্রী দান করেছেন, সেটিও ততোধিক। তাই আপনি আমাদের ভরণপোষণের খরচের

জন্য যে-টাকা দান করেছিলেন, যদিও তাতে অন্য লোকের সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটতে পারত, তবু আমার নিজের অপব্যয়ের জন্যে তাতে আমার অনটন নিবারণ না হওয়াতে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হয়ে এবং ঐ ঋণ শোধ করবার জন্যে সোনারূপা যা-কিছু ছিল, সমস্ত বেচে ফেলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়লাম। এ-বিষয় মহারাজের কর্ণগোচর করতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ হওয়াতে

সকলেই দেখিলেন আবুলহাসান এবং পূর্ণসুখা
দুজনেই পরলোকে গিয়াছেন

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে টাকার জন্যে এই উপায় অবলম্বন করেছি। মহারাজ! অনুগ্রহ করে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"

ইহা শুনিয়া রাজা মহা খুসী হইয়া আবুলহাসনকে নিজের কথামত এক হাজার মোহর

দান করিলেন এবং রাজমহিষীও নিজের প্রিয় পরিচারিকাকে বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক হাজার মোহর পুরস্কার দিলেন।

তার পর আবুলহাসন এবং পূর্ণসুখা দুজনেই রাজা ও রাণীর পরম স্নেহাস্পদ হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা

চীনরাজ্যে কোনো রাজধানীতে মুস্তাফা নামে এক দর্জী বাস করিত। তাহার এক স্ত্রী ও একটি পুত্র ছিল। সে এমনি গরীব যে, দর্জীর কাজ করিয়া প্রতিদিন যাহা রোজগার করিত, তাহা দিয়া তাহার এই ছোট পরিবারেরও ভরণপোষণ হইয়া উঠিত না। দর্জীর ছেলের নাম আলাদিন। আলাদিন ছেলেবেলা বড় দুষ্ট এবং পিতামাতার অবাধ্য ছিল, সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল সমবয়স্ক দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পথে পথে খেলা করিয়া দিন কাটাইত। যখন কাজ শিখিবার সময় উপস্থিত হইল, দর্জী তখন তাহাকে কাজ শিখাইবার জন্য নিজে দোকানে লইয়া যাইত। কিন্তু মিষ্ট কথা কি বকুনি কিছুতেই সে সে-দিকে মনোযোগ দিত না। পিতাকে একবার অন্যমনস্ক দেখিলেই সে সমস্ত দিনের জন্য কোথায় পলাইয়া যাইত। এইজন্য মুস্তাফা তাহাকে সর্ব্বদা বকিত। কিন্তু কোনো-রকমেই তাহার সে কুস্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া দর্জী অত্যন্ত মনোবেদনায় অল্পদিনের মধ্যে এমন পীড়িত হইয়া পড়িল, যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

দর্জী মারা যাইবার পর, আলাদিনের মা, ছেলেকে কাজকর্ম্মে অত্যন্ত অমনোযোগী দেখিয়া দোকানপাট তুলিয়া দিয়া দোকানের কাপড়-চোপড় বেচিয়া ফেলিয়া একটি চর্কা কিনিল, আর তাই দিয়া সূতা কাটিয়া কোনো-প্রকারে আপনার ও ছেলেটির খাওয়া-পরা চালাইতে লাগিল। এদিকে আলাদিন পিতার শাসনের ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মাতার অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়াও তাঁহার কোনো কথা শুনিত না, এবং তাহার মা কাজকর্ম্মের কোনো কথা তুলিলেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।

এক দিন আলাদিন এমনি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কয়েকটি মন্দ ছেলের সঙ্গে রাজপথে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে আফ্রিকাদেশের একজন বিখ্যাত মায়াবী আপনার কোনো কার্য্যসিদ্ধির মতলবে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে আলাদিনকে দেখিবামাত্র ঐখানে দাঁড়াইল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া যখন বুঝিল যে, তাহাকে দিয়াই স্বকার্য্য সাধন হইতে পারিবে, তখন সে প্রতিবাসী লোকদের কাছে তাহার পরিচয়াদি

আনিয়া আসিল। তার পর সে আলাদিনের কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও হে ছোক্‌রা! তুমি কি মুস্তাফা দর্জ্জীর ছেলে?" আলাদিন উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, আমি তাঁরই ছেলে বটে, কিন্তু অনেক দিন হল, তিনি মারা গেছেন।"

এই-কথা শুনিবামাত্র, মায়াবী আলাদিনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। আলাদিন তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বাছা! আমি তোমার কাকা, তোমার বাবা আমার বড় ভাই ছিলেন। আমি অনেকদিন দেশভ্রমণের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আশায় দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু তোমার মুখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে যে কি পর্য্যন্ত শোক পেলাম, তা আর কি বলব।" মায়াবী এই কপট শোক প্রকাশ করিয়া আলাদিনকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা এখন কোথায়?" আলাদিন নিজেদের বাড়ীর পরিচয় দিল। তাই শুনিয়া মায়াবী আলাদিনের হাতে কয়েকটি মোহর দিয়া বলিল, "বৎস! এই কয়েকটা টাকা তোমার মার হাতে দিয়ে তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। যদি আমি অবকাশ পাই, তা হলে কাল এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।" এই বলিয়া মায়াবী সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আলাদিন টাকা পাইয়া খুসী হইয়া বাড়ী গিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার কি কোনো খুড়া আছে?" তাহার জননী বলিল, "না বাছা, তোমার কাকা, কি মামা কেউ নেই।" ইহা শুনিয়া আলাদিন বলিল, "অল্পক্ষণ হল, একটি লোক এসে আমাকে বল্লেন, আমি তোমার কাকা, আর আমার বাবা স্বর্গে গিয়েছেন শুনে তিনি কতই কাঁদতে লাগলেন। তার পর আমার মুখে চুমু দিয়ে আমার হাতে এই কয়েকটি টাকা দিয়ে কাল এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে চলে গেলেন।" আলাদিন এই-কথা বলিয়া মাতার হস্তে টাকাগুলি দিল। তাহার মা অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা! তোমার একজন খুড়া ছিল বটে, কিন্তু অনেক দিন হল তার মৃত্যু হয়েছে।" তার পর তাহারা সেদিন এ-কথার কোনো উল্লেখ করিল না।

পরদিন জাদুকর আলাদিনকে শহরের আর-এক পাড়ায় সেই-রকম খেলা করিতে দেখিয়া তাহাকে আগের মত আলিঙ্গন করিয়া তাহার হাতে দুইটি মোহর দিয়া বলিল, "বাছা! তুমি এই দুইটি টাকা তোমার মাকে দিয়ে বলো, তিনি যেন আমাদের খাওয়ার জন্যে সামান্য কিছু আয়োজন করে রাখেন, আমি আজ রাত্রে তোমাদের বাড়ী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। এখন আমাকে তোমাদের বাড়ীটা দেখিয়ে রাখ।" আলাদিন মায়াবীকে নিজেদের বাড়ী দেখাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মাতার কাছে গিয়া তাঁহার হাতে সেই দুইটি মোহর দিয়া খুড়ার ইচ্ছা জানাইল। আলাদিনের জননী টাকা পাইয়া তখনি সমস্ত খাবার তৈরী করিয়া, বাড়ীতে নিজেদের যে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহা প্রতিবাসীদের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনিল, এবং সন্ধ্যার পর বলিল, "আলাদিন! বোধ হয় তোমার

খুড়া আমাদের বাড়ীর খোঁজ করতে পারেননি। যাও তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।" আলাদিন যদিও তাহার কপট কাকাকে সকালে বাড়ী দেখাইয়া রাখিয়াছিল, তবু মাতার আজ্ঞায় বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দরজায় ঘা দেওয়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। মায়াবী নানা-রকম ফল-মূল সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। সে-সমস্ত আলাদিনের হাতে দিয়া তাহার জননীকে নমস্কার করিয়া তাহার সহোদর মুস্তাফা যেখানে বসিতেন, সেই জায়গাটা দেখাইয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। আলাদিনের মাতা সেই জায়গাটি দেখাইয়া দিলে, জাদুকর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া মাটিটা কয়েকবার চুম্বন করিল। তার পর জলভরা চোখে বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "ভাই! আমার কি দুর্ভাগ্য যে, তোমার মরণকালে আমি একবার তোমার শ্রীচরণ দর্শন করতে পারলাম না।"

আলাদিনের মাতা মায়াবীকে তাহার ভ্রাতার আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "এই আসনে যখন আমার বড় ভাই বসতেন, তখন তাঁর আসনে বসা আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি এমন জায়গায় বস্‌ছি যেখান থেকে অনায়াসেই তাঁর আসন দেখতে পাওয়া যায়।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা ও-বিষয়ে আর কোনো কথা বলিলেন না। সে তখন নিজেই বসিবার জায়গা ঠিক করিয়া লইল।

তার পর মায়াবী আলাদিনের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ! তুমি আমাকে কখন দেখনি। প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমি দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব ও মিশর প্রভৃতি নানাদেশ ঘুরে জন্মভূমি দর্শন আর ভাই ভাজ ভাইপো প্রভৃতি আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছায় এইখানে আবার আসামাত্র দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনে যারপরনাই মনস্তাপ পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পর আলাদিনের মুখ দেখে আমার শোকের অনেক লাঘব হয়েছে।" এই-সকল কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের জননী স্বামীকে স্মরণ করিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলেন। তাই দেখিয়া জাদুকর আর সে-কথা না তুলিয়া আলাদিনের কাজকর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আলাদিনের মাতা তাহার কুরীতি ও কুসংসর্গের কথা এবং তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যে তাহাকে নিজের ব্যবসায়ের কিছুই শিখাইতে পারেন নাই, সেই-সব কথা বলিতে লাগিলেন। তাই শুনিয়া মায়াবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "আলাদিন! এ বড় নিন্দার কথা, এখন তোমাকে জীবিকা-নির্ব্বাহের চিন্তা করতেই হবে। তবে যদি তোমার পৈতৃক ব্যবসা মনে না ধরে, তাতে কোনো হানি নেই। আমি তোমাকে একখানা রেশমী কাপড়ের দোকান করে দিতে প্রস্তুত আছি। তাই দিয়ে অনায়াসেই তোমাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হতে পারবে। এ-বিষয়ে তোমার কি মত বল?" আলাদিন এই-প্রস্তাবে রাজি হইলে, মায়াবী আবার বলিল, "আমি কাল তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এক প্রস্থ পোষাক কিনে দেব। দোকানের বিষয় পরে বিবেচনা করা যাবে।" আলাদিনের মা এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই যে, মায়াবী তাঁহার স্বামীর সহোদর। কিন্তু

তাহার এই-প্রকার সস্নেহ কথা শুনিয়া সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রহিল না। তিনি আলাদিনকে সর্ব্বদা খুড়ার অনুগত থাকিতে পরামর্শ দিয়া জাদুকরের সঙ্গেই খাইতে বসিলেন। খাওয়ার পর মায়াবী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন জাদুকর আবার আসিয়া আলাদিনকে বাজারে লইয়া গিয়া তাহার মনের মত এক-প্রস্থ কাপড় কিনিয়া দিল। তাহাতে আলাদিন মহা সন্তুষ্ট হইয়া কাকাকে যথোচিত ধন্যবাদ দিল। তার পর মায়াবী আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া শহরের নানা-জায়গায় ঘুরিয়া শেষে তাহাকে আপনার বাসায় লইয়া আসিল। সেখানে নিজের পরিচিত কতকগুলি ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া তাহাদের সঙ্গে নিজের ভাইপোর আলাপ করাইয়া দিল। রাত্রি হইলে আলাদিন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য বিদায় চাহিল; মায়াবী কিন্তু তাহাকে একলাটি যাইতে না দিয়া নিজে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার নিকট আনিয়া দিল। আলাদিনের জননী ছেলের সুন্দর পোষাক দেখিয়া মহা খুসী হইয়া জাদুকরকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "ভাই! আমার ছেলের উপর তুমি এত দয়া করাতে আমি চিরদিন তোমার কাছে ঋণী রইলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সদুপদেশ দিয়ে ওর স্বভাবটাও সংশোধন কর, এই আমার প্রার্থনা।"

মায়াবী বলিল, "আলাদিন বোকা নয়, ওর বুদ্ধিশক্তি বিলক্ষণ আছে, সুতরাং ভাল করেই কাজ চালাতে পারবে। আমি যে বলেছি, ওকে একখানা দোকান করে দেব, তা কাল হবে না, কারণ কাল শুক্রবার, সব দোকানই বন্ধ থাকবে। শনিবারে সেটা করা যাবে। কাল এসে ওকে শহর, বাগান আর অন্যান্য নানা-রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাবার জন্যে নিয়ে যাব।" ইহা বলিয়া মায়াবী সেদিন চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে আলাদিন বাগান দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া কাকার আগমনের প্রতীক্ষায় বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, জাদুকর আসিবামাত্র সে মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। মায়াবী আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া কত-রকম সুন্দর প্রাসাদ ও বাগান দেখাইতে দেখাইতে তাহাকে অনেক দূর লইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে বিশ্রাম করিবার জন্য পথে এক জায়গায় বসিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে ফল ও মিঠাই বাহির করিয়া দুজনে খাইল। খাওয়ার পর সেখান হইতে উঠিয়া তাহাকে লইয়া আবার যাইতে আরম্ভ করিল। আলাদিন পথ চলিতে চলিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "খুড়া! আমি আর চলিতে পারি না! আপনি সমস্ত বাগান পার হয়ে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আর বেশী দূর গেলে, আমি কোনোমতেই পথ চিনে বাড়ী ফিরে যেতে পারব না।" মায়াবী তাহাকে সাহস দিয়া বলিল, "আলাদিন! তুমি ভয় কোরো না, আমার সঙ্গে আর কিছুদূর গেলেই একটি সুন্দর বাগান দেখতে পাবে।" মায়াবী এমনি করিয়া প্রবোধ দিয়া নানা-প্রকার গল্প করিতে করিতে আলাদিনকে লইয়া দুইটি ছোট পাহাড়ের মাঝখানের একটি জায়গায়

আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়াবী আফ্রিকা হইতে যে উদ্দেশ্যে চীনদেশে আসিয়াছিল, তাহা সুসিদ্ধ হইবার এই স্থান। সেইখানে আসিয়া সে আলাদিনকে বলিল, "আমাদের আর যেতে হবে না, এইখানেই তোমাকে এমন এক অদ্ভুত জিনিষ দেখাব যে তেমন জিনিষ কেউ কখনও চোখেও দেখেনি। কিন্তু প্রথমে আগুন জালবার দরকার আছে। তুমি আগে কতকগুলি

মেঘের মত ধোঁয়া উঠিতে লাগিল

ঘাস পাতা আর শুকনো কাঠ জোগাড় কর।" আজ্ঞামাত্র আলাদিন কাঠকুটো আনিয়া হাজির করিল। মায়াবী তৎক্ষণাৎ চকমকিতে আগুন বাহির করিয়া সেই-সমস্ত জালিয়া দিল। তাহার পর উহাতে ধুনা ফেলিতেই মেঘের মতন ধোঁয়া উঠিতে লাগিল।

তখন জাদুকর নানারকম মন্ত্রতন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করাতে ঐখানের মধ্যে একহাত লম্বা একহাত চওড়া একখানা পাথর উঁচু হইয়া উঠিতে দেখা গেল।

তাই দেখিয়া আলাদিন মহা ভীত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া যেই পলাইতে যাইবে অমনি মায়াবী তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহার কানে এক কিল মারিয়া বলিতে লাগিল, "আমি তোমার বাপের ভাই খুড়ো. বাপের সমান, আমার কথায় কিছুতেই অবাধ্য হয়ো না। দেখলে আমার মন্ত্রবলে কি হল? এই পাথরের তলায় যে অজস্র টাকা লুকানো আছে, সে টাকা তোমার ভাগ্যেই আছে। তা পেলে এই পৃথিবীর অতি বড় রাজাও তোমার মতন হতে পারবে না। তুমি ছাড়া এই পাথর ছোঁবার আর কারও অধিকার নেই। এস, এখন আগে এই পাথরখানা তোল, তার পর যা যা করতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।"

আলাদিন অনেক টাকার আশায় মায়াবীর কথা অনুসারে পাথরখানি তুলিবামাত্র দেখিতে পাইল, তাহার নীচে একটি ছোট সুড়ঙ্গ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে যাওয়া-আসার জন্য একটি সিঁড়ি এবং সব শেষে একটি ছোট দরজা খোলা আছে। মায়াবী আলাদিনকে বলিল, "দেখ বাপু! এখন তোমাকে যা করতে হবে তা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে তুমি নির্ভয়ে ঢুকে ঐ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে একটি দরজা দেখতে পাবে। ঐ দরজার ভিতর দিয়ে একটি বড় খিলান-করা দালানে গিয়ে পড়বে। ঐ দালানের মধ্যে তিনটা বড় বড় ঘর দেখতে পাবে। তার প্রত্যেক ঘরের মধ্যে সোনায় রূপায় ভরা চারখানা বড় পিতলের পাত্র আছে। তা দেখে তোমার লোভ হবে। কিন্তু লোভ সংবরণ করে দূরে থেকো, কোনোমতেই সেগুলো স্পর্শ কোরো না। প্রথম ঘরে ঢুকে আগে পরণের কাপড়খানা ভাল করে জড়িয়ে রেখো, যেন উড়ে কিছুতে না লাগে। এমন করে প্রথম ঘর দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে, দ্বিতীয় ঘর দিয়ে তৃতীয় ঘরে যাবে, কিন্তু সাবধান যেন কোনো জায়গায় দাঁড়িও না, দেয়াল ছুঁয়ো না, কারণ তা হলেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। তৃতীয় ঘরে উপস্থিত হয়ে একটি দরজা দেখতে পাবে। তার ভিতর দিয়ে ফলফুলে-পরিপূর্ণ একটি বাগানে যাওয়া যায়। ঐ বাগানের মধ্যে একটি পথ আছে। ঐ পথ দিয়ে ক্রমাগত চলে গেলে পাঁচটা সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হবে। তার পরে সিঁড়ি দিয়ে একটা ছাদে উঠে দেখবে সেখানে একটা দেয়ালের কুলঙ্গীতে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপটা নিবিয়ে তার তেল সলাত ফেলে দিয়ে সেটা তোমার বুকের কাপড়ের মধ্যে পূরে আমার কাছে নিয়ে এস। ঐ তেলে তোমার কাপড় নষ্ট হবার ভয় কোরো না, কারণ ওটা তেল নয়, এক-রকম তরল জিনিষ, ওটা ফেলে দিলেই প্রদীপ শুকিয়ে যাবে। যদি ঐ বাগানের ফল দেখে তোমার নিতে ইচ্ছা হয় তবে ফেরবার সময় যত খুসী নিয়ে এস। এই-কথা বলিয়া মায়াবী নিজের আঙুল হইতে একটা আংটি খুলিয়া আলাদিনের আঙুলে পরাইয়া দিয়া বলিল, "বাপু, সাহস করে ভিতরে ঢুকে পড়, কোনো ভয় নেই, প্রদীপ আনতে পারলেই অতুল ধনের অধিকারী হবে।"

মায়াবীর এই সকল উপদেশ শুনিয়া আলাদিন লাফ দিয়া সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া দেখিল কপাট

কাকার কথামত তিনটি ঘর আছে। কাজেই সাবধানে ঐ ঘর তিনটি অতিক্রম করিয়া বাগানের মধ্য দিয়া গিয়া কুলঙ্গী হইতে প্রদীপ লইল এবং তাহার সলিতা ও তেল ফেলিয়া দিয়া বুকের জামার মধ্যে রাখিল। তাহার পর ফিরিবার সময় বাগান হইতে যত ইচ্ছা নানা-রঙের ফল সংগ্রহ করিয়া জামার জেব পরিপূর্ণ করিয়া লইল। ঐসব ফল বাস্তবিক ফল নয়, হীরা, মাণিক্য, প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন। আলাদিন যদিও ঐ সমস্তকে বাস্তবিক রত্ন বলিয়া জানিত না, তবুও সেগুলির শোভা দেখিয়া মহা তুষ্ট হইয়া যথাসাধ্য ছিঁড়িয়া লইল এবং সুড়ঙ্গের মুখে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশী কাকাকে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "কাকা মহাশয়! আমাকে হাত ধরে উপরে তুলুন।" মায়াবী বলিল, "তুমি আগে প্রদীপটা আমার হাতে দাও, তা না হলে সহজে উঠতে পারবে না।" আলাদিন বলিল, "আমার দুই হাত বন্ধ, আমি উপরে না উঠলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারব না।" মায়াবী নিজের হাতে প্রদীপ না পাইলে আলাদিনকে উপরে তুলিতে সম্মত হইল না। আলাদিনও ফলের ভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি উপরে না উঠিলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারব না।" এমনি ভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ হইবার পর, যখন জেদী আলাদিন কোনোমতেই প্রদীপ দিতে রাজী হইল না, তখন জাদুকর আলাদিনের উপর ভয়ানক চটিয়া বাকি ধূনাগুলি আগুনে ফেলিয়া দিয়া কয়েকটি মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র আগে যে-পাথর দিয়া সুড়ঙ্গের মুখ ঢাকা ছিল সেটা তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের মুখে পড়িয়া গেল, সুড়ঙ্গের আর কোনো চিহ্ন রহিল না।

মায়াবী ছেলেবেলা হইতে মায়াবিদ্যা আলোচনা করিয়া জানিয়াছিল যে, এই পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি প্রদীপ আছে, যাহা দিয়া সসাগরা বসুন্ধরার সকল রাজার চেয়েও বেশী ক্ষমতাশালী হইতে পারা যায়। খড়ি পাতিয়া গুনিয়া যেখানে ঐ প্রদীপ ছিল, তাহার সন্ধান করিয়া আফ্রিকা হইতে সে এইস্থানে আসিয়াছিল। কিন্তু জায়গার খোঁজ মিলিলেও মাটির তলায় ঢুকিয়া ঐ অমূল্য নিধি নিজেই সংগ্রহ করিয়া আনিবার অধিকার তাহার ছিল না। কাজেই অন্যকে দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার ইচ্ছায় সে আলাদিনকে ঐখানে লইয়া গিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকাইয়াছিল, এবং কে প্রদীপ আনিল তাহা কেহ জানিতে না পারে, এই ইচ্ছায় আলাদিনের হাত হইতে প্রদীপ লইয়া তাহাকে তাহার মধ্যে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবার মতলব করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল আলাদিন তাহার হাতে প্রদীপ দিল না, তখন সে আশায় বঞ্চিত হইয়া তাহাকে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে রাখিয়াই মন্ত্রের জোরে সুড়ঙ্গের মুখ আগের মত বন্ধ করিয়া দেশে চলিয়া গেল। সে যখন আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া আসে, তখন অনেকেই আলাদিনকে দেখিয়াছিল। সুতরাং ফিরিবার সময় তাহাকে একলা দেখিয়া যদি কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে সেবার আর শহরের মধ্যে না ঢুকিয়া অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেল।

আলাদিন মাটির তলায় চাপা পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, এবং কাকাকে বারবার ডাকিতে লাগিল, "কাকা মহাশয়! আমি প্রদীপ দিচ্ছি, আপনি সুড়ঙ্গের মুখ খুলে দিন।"

কিন্তু মায়াবী সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই আলাদিনের কান্নাকাটি শুনিতে পাইল না। অগত্যা তাহাকে সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই থাকিতে হইল।

আলাদিন বাগানে যাইবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘোর অন্ধকারে পথ চিনিয়া কোনোমতেই তাহার ভিতর ঢুকিতে পারিল না। ছুই দিন সেইখানেই অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় দিন পরমেশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিয়া জোড় হাতে বলিতে লাগিল,·"হে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর! আমাকে রক্ষা কর, এখন তোমা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।" প্রার্থনার সময় হাত জোড় করাতে মায়াবী তাহার আঙ্গুলে যে আংটি পরাইয়া দিয়াছিল সেটা অন্য হাতে ঘসিয়া গেল। তখনি পাতাল হইতে এক বিকটাকার প্রকাণ্ড দৈত্য বাহির হইয়া তাহার কাছে আসিয়া নিবেদন করিল, "প্রভু! এখন আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন। যিনি এই আংটি পরেন, আমি তাঁরই আজ্ঞাকারী।" অন্য সময়ে ঐ ভয়ানক দৈত্যকে দেখিলে আতঙ্কে আলাদিন যে কথাটি বলিত না সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময় তাহার ভয় ছিল না। সে সাহস করিয়া বলিল, "তুমি যে হও, আমাকে এই উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার কর।" এই-কথা বলিবামাত্র পৃথিবী ফাঁক হইয়া গেল। আলাদিন দেখিল মায়াবী তাহাকে যে-সুড়ঙ্গের দরজায় আনিয়াছিল সে আবার সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আলাদিন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরমেশ্বরকে অসংখ্য ধন্তবাদ দিয়া যে-পথ দিয়া সেখানে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

বাড়ী পৌছিয়া মাকে দেখিবামাত্র আলাদিনের অত্যন্ত আহ্লাদ হইল বটে, কিন্তু তিন দিন তাহার আহার-নিদ্রা হয় নাই বলিয়া সে দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার মাতার অনেক যত্নে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিবার পর, সে বলিল, "মা! আমি তিন দিন না খেয়ে আছি। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবার এনে দাও, আমি পেটটা ঠাণ্ডা করি।" তাহার মাতা এই-কথা শুনিবামাত্র ঘরে যা' খাবার ছিল, তখনি আনিয়া দিয়া বলিল, "বাছা! আগে খাও, তার পরে একটু সুস্থ হলে যা যা ঘটেছিল, আমাকে বলো।" আলাদিন খাইয়া উঠিয়া একটু সবল হইয়া বলিল, "মা তুমি আমাকে যার হাতে সমর্পণ করেছিলে, সে আমার কাকা নয়, সে একটা ভয়ঙ্কর ঠক, সে আমাকে মেরে ফেলবার খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেবল পরমায়ু আছে বলে' বেঁচে এসেছি।" ইহা বলিয়া মায়াবী তাহাকে যেখানে লইয়া গিয়াছিল, তাহার প্রতি যে-রকম অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, এবং শেষ কালে যে উপায়ে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, সমস্তই বলিল। তাহার মা ছেলের এই-রকম দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মায়াবীকে অনেক গালাগালি দিয়া বলিল, "বাছা! মায়াবীরা পৃথিবীর যম, তার হাতে পড়েও যে জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা হয়েছে তাতেই তাঁকে বার বার ধন্তবাদ দাও।"

আলাদিন এবং তাহার জননী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই-বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা বলিবার

পর আলাদিনের ঘুম পাওয়াতে তাহার মাতা তাহাকে ঘুমাইতে বলিল। আলাদিন দুই তিন দিন একবারও চোখ বোজে নাই। কাজেই বিছানায় পড়িতে-না-পড়িতেই অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন ভোরে বিছানা হইতে উঠিয়া মাতাকে বলিল, "মা! আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খাবার এনে দাও।" আলাদিনের মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাছা! ঘরে এমন কোনো জিনিষ নেই যে তোমাকে খেতে দিই। যা ছিল কাল খেয়েছ। এখন আমার যে অল্প সূতা আছে তাই বেচে তোমায় খাবার এনে দেব, একটু দেরি কর।" আলাদিন বলিল "মা! তবে কাল যে প্রদীপটা এনেছি, সেইটা আমাকে এনে দাও; আমি সেটা বেচে আসি, তাতে আমাদের আজকার দু'বেলার খাবার উপায় হতে পারবে।" এই-কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা প্রদীপ বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু সেটা অত্যন্ত অপরিষ্কার রহিয়াছে দেখিয়া বলিল, "বাছা! প্রদীপটা বড় অপরিষ্কার রয়েছে। এটা মেজে ঘষে পরিষ্কার করে দিলে একটু বেশী দামে বিক্রী হতে পারে।" এই-কথা বলিয়া খানিকটা বালি আর জল লইয়া প্রদীপটা ঘষিবামাত্র এক ভয়ঙ্কর দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "আমাকে কি করতে হবে বল, এই প্রদীপ যার আমি তার আজ্ঞাকারী।" আলাদিনের মা দৈত্যের মূর্ত্তি দেখিয়া কোনো কথা বলিতে না পারিয়া একেবারে ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আলাদিন ইহার আগেই একবার এই-রকম দৈত্যকে দেখিয়াছিল। তাই তাহার মাতার হাত হইতে প্রদীপটা লইয়া সাহস করিয়া বলিল, "আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি, অতএব তুমি আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এস।" এই-কথা শুনিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল এবং কিছুক্ষণ পরেই একটা মস্ত রূপার থালের উপর বারটা বড় বড় রূপার বাটীতে নানা-রকম মাংসের তরকারী আর দুইখানা রূপার রেকাবীতে ছয়খানা শাদা রুটি মাথায় করিয়া এবং এক হাতে দুই বোতল সরবৎ ও আর একহাতে দুইটা রূপার গেলাস লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঘরের মধ্যে একটা মেজের উপর ঐ-সমস্ত জিনিষ রাখিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আলাদিনের মাতা তখনও মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আলাদিন জল আনিয়া মাতার মুখে ছিটাইয়া দিলে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙিল। তখন আলাদিন বলিল, "মা! যা দেখলে তা আর মনে কোরো না। ও কিছুই নয়। এখন উঠে খাও দাও, খেলেই তোমার দুর্ভাবনা দূর হবে, আর আমারও পেটের জ্বালা জুড়োবে। আর দেরি কোরো না, শীঘ্র উঠে এস, নইলে এমন সুস্বাদু মাংসের তরকারী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

আলাদিনের মাতা রূপার পাত্রে ঐ-সমস্ত জিনিষ দেখিয়া এবং মাংসের তরকারীর গন্ধ পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! এ-সমস্ত খাবার কোন্ মহাত্মা পাঠিয়েছেন? আমাদের রাজ্যেশ্বর কি আমাদের দৈন্যদশা দেখে দয়া করে এমন অনুগ্রহ করেছেন? আলাদিন বলিল, "মা! এখন ও-সব কথার দরকার নেই, এস আগে আমরা খাই। খাওয়া হয়ে গেলে সমস্ত কথা ভাল করে খুলে বলব।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের

জননী খাইতে বসিল, এবং অনেক খাবার পাইয়া মায়ে ছেলেতে পেট পূরিয়া খাইল। তৎপরে আলাদিনের মাতা বাকি খাবারগুলি পর দিনের জন্য জমা করিয়া রাখিয়া খাটের উপর বসিয়া ছেলেকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আলাদিন! সত্যি করে বল দেখি, আমি যখন মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিলাম, তখন তুমি দৈত্যকে নিয়ে কি কর্‌লে? ইহা শুনিয়া আলাদিন মাতাকে

আলাদিনের মা দৈত্যের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল

সব কথা বলিল। আলাদিনের জননী বলিল, "বাছা! তোমাকে যে-দৈত্য সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করেছিল, একি সেই দৈত্য?" আলাদিন বলিল, "না মা, এ সে দৈত্য নয়। সে দৈত্য আংটিওয়ালার আজ্ঞাকারী। কিন্তু এ দৈত্য প্রদীপ-ওয়ালার আজ্ঞাবহ দাস। বোধ হয় তুমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলে,বলে এর কথা কিছুই শুনতে পাওনি।" তখন আলাদিনের মাতা আবার বলিল, "বাছা! তবে বুঝি এই প্রদীপটাই দৈত্য আসার মূল কারণ। যা হোক

আমি আর কখনও ওটা ছোঁব না। আর তুমিও যদি আমার পরামর্শ শোন তবে এই প্রদীপ আর তোমার আংটিটা এখনি বিক্রী করে এস। দৈত্যের সঙ্গে তোমার কোনো সংস্রব রাখা উচিত নয়, যেহেতু ওরা পরের অনিষ্টকারী উপদেবতা মাত্র।" আলাদিন জননীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল, "মা! আমি তোমার আজ্ঞায় এখনই এই প্রদীপটা বিক্রী করতে পারি, কিন্তু এটার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করে দেখ এর জন্যই আমার মায়াবী কপট কাকা আফ্রিকা থেকে বহু কষ্টে এই দেশে এসেছিল। সে এটা পেলে পৃথিবীর সমস্ত বহুমূল্য রত্ন হতেও এটার বেশী আদর করত. কারণ এর গুণ তার বিলক্ষণ জানা ছিল। যা হোক, সৌভাগ্যগুণে ঘটনাক্রমে যখন আমিও এর অলৌকিক গুণ জানতে পেরেছি তখন একে ছাড়া কোনোমতেই উচিত নয়। দৈত্য দেখে তুমি মহা ভয় পাও, তা আমি এটা কোনো লুকানো জায়গায় রেখে দেব, এবং প্রয়োজন হলে তোমার অসাক্ষাতে ব্যবহার করব। আংটিও ছাড়তে অনুমতি কোরো না, কারণ ওর সাহায্যেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। যদি আবার কখনো কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে এর দ্বারা আমার উপকার হবার সম্ভাবনা।" আলাদিনের মা ছেলের মুখে এই-সমস্ত যুক্তিসিদ্ধ কথা শুনিয়া সে-বিষয়ে আর কোনো কথা না তুলিয়া কেবল এইমাত্র বলিল, "বাছা! তুমি দৈত্য নিয়ে যা ইচ্ছে তাই কর, কিন্তু আমি ওর কোনো সংস্রবে থাকব না।"

পরদিন রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা মায়ে ছেলেতে বাকি খাবারগুলি খাইল। তাহার পর খাবারের আর কোনো সংস্থান না থাকাতে পরদিন সকালে আলাদিন একটি রূপার বাটি লইয়া তাহা বিক্রয় করিতে বাজারে গেল। পথে একজন ইহুদী ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহাকে ঐ বাটীটি দেখাইল। ধূর্ত্ত ইহুদী তাহা দেখিবামাত্র তাহার দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আলাদিন তাহার উপরে দাম ঠিক করিবার ভার দিল। তাহাতে, আলাদিন যে এ-বিষয়ে কিছুই জানে না, ইহুদী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ঐ বাটীর মূল্যস্বরূপ একটি মোহর মাত্র দিল। কিন্তু তাহার আসল দাম ষাট মোহরের কম নয়।

আলাদিন ঐ টাকা পাইয়া আনন্দিত হইয়া তাই দিয়া কয়েকখানি রুটি এবং অন্যান্য নানারকম খাবার কিনিয়া হাসিমুখে মাতার কাছে আসিল। এমনি করিয়া আলাদিন ক্রমে ক্রমে সমস্ত রূপার বাসন ঐ ইহুদীকেই অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া কিছুদিন চালাইল। তাহার পর নিরুপায় হইয়া আলাদিন আবার সেই প্রদীপ বাহির করিয়া বালি দিয়া ঘসিল। তাহাতে সেই ভীষণমূর্ত্তি দানব আবার তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমাকে কি করতে হবে, আজ্ঞা কর।" আলাদিন কহিল, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়েছি, আমাকে কিঞ্চিৎ খাবার এনে দাও।" এই-কথা শুনিয়া দৈত্য তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই-রকম রূপার থালে নানা-রকম খাবার সাজাইয়া আনিয়া মেজের উপর রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

আলাদিনের মাতা দৈত্য আসিবে জানিয়া সেই সময় একটা কাজের উপলক্ষ্য করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। পরে ঘরে আসিয়া ঐ-সমস্ত খাবার এবং রূপার বাসন দেখিয়া আগের মতই বিস্মিতা হইল এবং প্রদীপের অনেক প্রশংসা করিল। তাহার পর ছেলের সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিল। খাওয়ার পর যাহা বাকি রহিল, তাহা তুলিয়া রাখিল, তাই দিয়া আরো দুই তিন দিন অনায়াসে কাটিয়া গেল। তাহার পর আলাদিন আবার আগেকার পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে কিছু দিন সংসারের খরচ চালাইল। মোট কথা যদিও আলাদিন ও তাহার মাতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ঐ-প্রদীপটি অক্ষয় ধনের আকর এবং উহার সাহায্যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারা যায়, তবুও তাহারা অল্প খরচেই আগের মত দিন কাটাইতে লাগিল। আলাদিন কেবল আগেকার চেয়ে একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরিতে আরম্ভ করিল, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু তাহার জননী তাহাও না করিয়া আগে যেমন কাপড় পরিয়া চরকা কাটিয়া দিন কাটাইত, এখনও ঠিক তেমনি করিতে লাগিল। আলাদিন মধ্যে মধ্যে প্রদীপ ঘষিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এমনি করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেলে, একদিন আলাদিন শহরে বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতে পাইল যে, যখন রাজকন্যা বেদ্রোলবদোর স্নান করিতে যাইবেন, তখন শহরের সমস্ত লোককে আপন আপন দোকান ও বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, কেহই বাহির হইতে পারিবে না। আলাদিন এই সুযোগে রাজকুমারীর শ্রীমুখ দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া গোপনে স্নানাগারের মধ্যে গিয়া এক দরজার পাশে লুকাইয়া থাকিল। আলাদিন এমনিভাবে লুকাইয়া দাঁড়াইবার ঠিক পরেই রাজকুমারী বহু দাসদাসী ও প্রহরী-পরিবেষ্টিতা হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্নানাগারে ঢুকিয়াই নিজের মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। আলাদিন এই সুযোগে কপাটের আড়াল হইতে বেদ্রোলবদোরের ভুবনমোহন রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইল। কিন্তু রাজ-কুমারীকে আর-একবার দেখিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়াও তাহার মন কিছুমাত্র ঠাণ্ডা হইল না, অনবরত কেবল চোখ বুজিয়া রাজকন্যার কথাই ভাবিতে লাগিল। আলাদিনের জননী হঠাৎ পুত্রের এরকম ভাবান্তর দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে যখন তাহার মা ঘরে আসিয়া চরকা কাটিতেছিল, তখন আলাদিন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "মা! কাল থেকে আমার বিমর্ষভাব দেখে তুমি মনে করে থাকবে আমার কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে, কিন্তু তা নয়। রাজকুমারীর রূপলাবণ্য দেখেই আমার এমন মন খারাপ হয়েছে।" তাহার পর মায়ের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত আগা-গোড়া বর্ণনা করিয়া আবার বলিল, "মা! সেই রাজনন্দিনীর প্রতি আমার যে কি-রকম অনুরাগ জন্মেছে, তা প্রকাশ করে বলতে পারি না। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে,

তাঁকেই বিবাহ করব।" ইহা শুনিয়া তাহার মা হাসিয়া বলিল, "বাছা! তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি এমন দীন দুঃখী হয়ে কি সাহসে রাজকুমারীকে ঘরে আন্‌তে চাও? যদি নিতান্তই রাজকন্যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়ে থাক, তবে বল দেখি রাজার কাছে গিয়ে সাহস করে একথা বলতে পারে এমন লোক কে আছে?" আলাদিন বলিল, "মা! তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? অতএব তোমাকেই যেতে হবে।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা বিস্মিতা হইয়া উত্তর করিল, "বাছা! আমি কি করে এমন কথা রাজাকে গিয়ে বলব? রাজারা রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে কন্যা সম্প্রদান করেন না। তুমি একজন সামান্য দর্জীর ছেলে। রাজা তোমার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবেন এও কি কখন সম্ভব হতে পারে?" আলাদিন বলিল, "মা! তুমি যা বলছ, তা ঠিক বটে। কিন্তু আমিও ঠিক বলছি, তুমি কোনোপ্রকারেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারবে না। এখন যদি আমার মরণ দেখবার সাধ না থাকে, তবে যাতে বেদ্রোলবদোর আমার স্ত্রী হয় তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।" আলাদিনের মা ছেলের এই-সকল কথা শুনিয়া মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল, এবং কত রকমে ছেলেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া শেষে বলিল, "বাছা! আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক, আমি তোমার কথা-মত রাজার সামনে যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলি, রাজার কাছে কোনো প্রার্থনা করতে হলে আগে তাঁকে উপহার দিতে হয়, তা তুমি কি জান না? উপহার দেওয়া হলে, প্রার্থনা শুনানো হয়, প্রার্থনা সিদ্ধ হওয়া-না-হওয়া সে ত' পরের কথা। কিন্তু রাজাকে উপহার দেবার মত তোমার কি আছে বল দেখি? আর তুমি যে-প্রার্থনা করবার জন্যে আমাকে রাজার কাছে পাঠাচ্ছ, তার উপযুক্ত উপহারও যৎসামান্য হতে পারে না। তাই বলছি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, তুমি যে আশা করছ তা কেবল দুরাশা মাত্র কি না।" আলাদিন বলিল, "মা! যখন রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরকে বিবাহ করা ছাড়া আমার বাঁচবার অন্য উপায় নেই, তখন যে উপায়েই হোক তোমাকে এই কাজ করতেই হবে। রাজাকে উপহার দেবার উপযুক্ত আমার কোনো জিনিষই নেই, তুমি একথা কি করে বললে? আমি সুড়ঙ্গ থেকে যে-সমস্ত জিনিষ এনেছি, তা কি মহারাজকে উপহার দেবার যোগ্য নয়? আমি প্রথমে ওগুলিকে নেহাৎ যা'-তা' মনে করেছিলাম। কিন্তু শেষে বণিক্‌দের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছি ওগুলি মহামূল্য পাথর আর ওসব রাজভাণ্ডারেরই উপযুক্ত জিনিষ। তুমি আমাদের সেই বড় চীনের বাসনখানা আন দেখি, তাতে ঐ-সমস্ত পাথর সাজালে কেমন শোভা হয় দেখা যাক্।"

আলাদিনের মা তৎক্ষণাৎ চীনের বাসনখানা আনিয়া দিল। আলাদিন থলিয়া হইতে সমস্ত মণিমাণিক্য বাহির করিয়া একে একে তাহার উপর সাজাইল। আলাদিনের মা ঐ-সমস্ত পাথরের রূপ আর আলো দেখিয়া অবাক হইয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তখন আলাদিন বলিল, "এখন আর বলতে পারবে না যে, উপহার দেবার উপযুক্ত কিছু

আমার নেই।" ইহাতেও আলাদিনের মাতা বিধিমতে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু সে বেদ্রোলবদোরের প্রতি এমনি অনুরক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার মন প্রবোধ মানিল না। তখন আলাদিনের মাতা কি করে, অগত্যা স্নেহের বশে ছেলের মনোমত কাজ করিতে রাজি হইল।

পরদিন সকালে আলাদিনের মা পোষাক পরিয়া হীরামাণিক-ভরা চীনের বাসনখানা ভাল রুমালে বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া রাজসভায় চলিল। তাই দেখিয়া আলাদিনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আলাদিনের মা রাজসভায় গিয়া দেখিল সভা আরম্ভ হইয়াছে, আর সভা লোকে এমন ঠাসা যে, তাহার ভিতর ঢুকে কাহার সাধ্য। তবুও সে বহুকষ্টে সেই ভিড়ের ভিতর যেখানে মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের মাঝখানে রাজা সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, ক্রমশঃ সেইখানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাপড়ে মোড়া চীনের বাসন হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

রাজা বিচার-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বিচার শেষ হইলেই সভা ভঙ্গ করিয়া সভ্যদেরই বিদায় দিয়া মন্ত্রীর সঙ্গে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আলাদিনের মা সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আলাদিনকে বলিল, "বাছা! আমি আজ রাজসভায় গিয়া রাজাকে দর্শন করেছি। আর বোধ হয়, তিনিও আমাকে দেখে থাকবেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলেন, তার পর ক্লান্ত হয়ে সিংহাসন থেকে হঠাৎ উঠে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, তাইতে অনেকেই নিজেদের প্রার্থনা জানাতে পারল না। সুতরাং আমাকেও চলে আসতে হল। কাল আবার রাজসভায় যাব।" আলাদিন মায়ের কথায় সেদিন ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল।

পরদিন সকালে আলাদিনের মা রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিল, সভা ঘরের দরজা বন্ধ, তাহাতে বুঝিল একদিন অন্তর সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। তাই সেদিনও ফিরিয়া আসিল। আলাদিন এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিমর্ষ হইল। এমনি করিয়া আলাদিনের মা ছয় দিন রাজসভায় যাইয়াও কোনো দিনই রাজাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না।

সপ্তম দিনে রাজা সভাভঙ্গ করিয়া আপন কুঠরীতে বসিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ মন্ত্রী- একজন স্ত্রীলোক রুমালে বাঁধা কোনো জিনিষ নিয়ে প্রতিদিনই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কোনো কারণ বুঝতে পারি না। সে আবার যদি কাল রাজসভায় আসে, তা হলে তাকে সবার আগে আমার কাছে এনো, আমি সবার আগে তার প্রার্থনা শুনব।" আলাদিনের মা ছেলের মন ভুলাইবার জন্য পরদিন নিয়মিত সময়ে রাজসভায় গিয়া রাজসম্মুখে আগের মত দাঁড়াইতেই, রাজা সেই দিকে চাহিয়াই সকলের আগে তাহার প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে কাছে আনিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র আলাদিনের মাতাকে রাজার কাছে লইয়া আসিলেন। আলাদিনের জননী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। রাজা তাহাকে উঠিতে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "হাঁগো বৃদ্ধা, অনেক দিন ধরে তোমাকে এখানে যাতায়াত করতে দেখছি,

এখন তোমার বাসনা কি বল দেখি।" রাজার এই-রকম করুণা-মাখা কথায় আলাদিনের মা আবার প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "হে রাজাধিরাজ! আমি যে প্রস্তাব করতে আপনার কাছে এসেছি, তা এমনি অসম্ভব যে, সেজন্য আগে ক্ষমা প্রার্থনা না করে তা প্রকাশ করতেও আমার গা কেঁপে উঠছে।" ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে অভয় দান করিয়া মন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত লোককে সেখান হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজা পাছে তাহার অসঙ্গত অভিপ্রায় শুনিয়া রাগিয়া উঠেন এই আশঙ্কায় আলাদিনের মা আবার বলিল, "মহারাজ! আমি যা প্রার্থনা করব তা যদি কোনো অংশে আপনার অসঙ্গত বোধ হয়, সেজন্য আগেই আজ্ঞা হোক যে আমার সমস্ত অপরাধ মর্জ্জনা করবেন, তা হলে আমার মনের কথা বলতে পারি।" রাজা বলিলেন, "সেজন্যে তোমার চিন্তা নাই, তুমি সে-বিষয় নির্ভয়ে আমার কাছে বল, আমি অঙ্গীকার করছি, তোমার দোষ মার্জ্জনা করব।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের মা, তাহার ছেলে যে উপায়ে রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরকে দেখিয়াছিল, এবং তাহাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভালবাসিয়া যে-রকম পাগল হইয়াছে, সে-সমস্ত ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল, "মহারাজ! আমি ছেলেকে এ-বিষয়ে ক্ষান্ত করবার জন্য বিধিমতে বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কোনোমতেই প্রবোধ না মেনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। সুতরাং কেবল তার জীবনরক্ষার জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি। এখন কেবল আমাকে নয়, আমার অবোধ সন্তান আলাদিনকেও ক্ষমা করুন।"

রাজা এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিয়া তাহার কোনো উত্তর না দিয়া আলাদিনের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার রুমালে কি বাঁধা রয়েছে?" আলাদিনের জননী তৎক্ষণাৎ চীনের বাসনের ঢাকা খুলিয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য-সমেত সেই পাত্রখানি রাজার হাতে তুলিয়া দিল। রাজা ঐ বহুমূল্য রত্নগুলি একে একে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী! বল দেখি, যে-ব্যক্তি এ-রকম বহুমূল্য উপহার দিতে পারে, তাকে কন্যা সম্প্রদান করা যায় কি না?" ইতিপূর্ব্বে রাজা মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে এই অসামান্য উপহার পাইয়া তাঁর মন বদলাইয়া যায়, এই ভয়ে মন্ত্রী রাজাকে কানে কানে বলিলেন, "মহারাজ? যে-ব্যক্তি এই উপহার দিচ্ছে, তাকে অবশ্যই রাজকন্যা সম্প্রদান করা যেতে পারে, কিন্তু আলাদিন অতি হীনবংশের সামান্য লোক, আপনি তাকে বিশেষ জানেন না। অতএব আমার নিবেদন এই যে, আপনি তিন মাস অপেক্ষা করুন। এর মধ্যে যদি আমার ছেলে এর চেয়েও বহুমূল্য উপহার দিতে না পারে, তবে আপনার যাকে ইচ্ছা কন্যা সম্প্রদান করবেন। "যদিও রাজা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্রীর পুত্র কখনই এমন উপহার দিতে পারিবে না, তবু বৃদ্ধ মন্ত্রীর মন রাখিবার জন্যই তাহার কথায় সম্মত হইয়া আলাদিনের মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো বাছা! তুমি গিয়ে তোমার ছেলেকে বল, আমি তার সঙ্গে কন্যার

বিবাহ দিতে সম্মত আছি। কিন্তু তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। ওই সময় কেটে গেলে, তুমি আবার এখানে এসো।"

আলাদিনের মা যে-প্রার্থনা নিতান্ত অসম্ভব মনে করিয়া এত ভয় পাইয়াছিল, সে-বিষয়ে রাজার মুখে এই-রকম সদয় কথা শুনিয়া মহা খুসী হইয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল। আলাদিন মায়ের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে?" আলাদিনের মা এই-কথা শুনিয়া আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিল, "বাছা! কেবল উপহারের সাহায্যেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, নইলে এরকম ঘটবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাজা এখনি রাজকন্তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী তাঁকে কানে কানে কি পরামর্শ দিলেন, তাতেই কার্য্যসিদ্ধির একটু দেরি হল। যা হোক, রাজার কথা কখনই অন্তথা হবার নয়।"

আলাদিন এই শুভসংবাদ শুনিয়া আপনাকে মহাভাগ্যবান্ ও সুখী মনে করিয়া জননীকে শত শত ধন্যবাদ দিল। কিন্তু রাজকুমারীর প্রতি তাহার অনুরাগ এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, তিনমাস তাহার পক্ষে যেন কতশত যুগযুগান্তর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে, এই ভাবিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া দিন গণনা করিতে আরম্ভ কারল।

দুই মাস কাটিয়া গেলে এক দিন সন্ধ্যাকালে আলাদিনের মা তেল কিনিতে গিয়া দেখিল যে, সমস্ত শহরে মহা আনন্দোৎসব হইতেছে, রাজকর্ম্মচারিগণ সুসজ্জিত হইয়া মহা সমারোহ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া আলাদিনের মা তেল-ওয়ালাকে এই-সমস্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "তুমি কোথা থেকে আসছ গো? তুমি কি জান না আজ রাত্রিতে মন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরের বিবাহ হবে?" এই-কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া বলিল, "বাছা! তোমার সকল আশা-ভরসা বিফল হল। তুমি রাজার কথার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত আছ, কিন্তু আমি এইমাত্র শুনে এলাম যে, আজ রাত্রে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে তোমার মনোনীত রাজকুমারীর বিবাহ হবে।" এই বলিয়া তেলওয়ালার কাছে যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল, সমস্ত ছেলেকে বলিল। জননীর মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কেমন একটা ভয়ানক হিংসা জন্মিল, তাহাতে সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া মন্ত্রীর পুত্রকে ইহার উচিত প্রতিফল দিবার জন্য পরমোপকারী প্রদীপ ঘষিল। ঘষিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দৈত্য আলাদিনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "প্রভু! আমাকে কি করতে হবে, এখনি আজ্ঞা করুন?" আলাদিন বলিল, "রাজা আমার সঙ্গে তাঁর কন্যা বেদ্রোলবদোরের বিবাহ দিতে স্বীকার করে, আমাকে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু ঐ সময় পূর্ণ না হতেই তিনি নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আজ রাত্রে মন্ত্রীর পুত্রকে সেই কন্যা সম্প্রদান

করতে যাচ্ছেন। অতএব আমি তোমাকে এই আদেশ করছি যে, বরকন্যা একত্র একসঙ্গে শোবামাত্র তাদের খাটশুদ্ধ তুলে আমার কাছে নিয়ে আসবে।" দৈত্য "যে আজ্ঞা প্রভু" বলিয়া অদৃশ্য হইল। তাহার পর আলাদিন জননীর সঙ্গে খাওয়া শেষ করিতেই, তাহার মা শুইতে গেল। আলাদিনও নিজের শোবার ঘরে গিয়া বরকন্যা লইয়া দৈত্যের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল।

এদিকে রাজবাড়ীতে রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত নাচ গান ভোজ প্রভৃতি নানারকম আনন্দোৎসব হইল। তাহার পর মন্ত্রীর পুত্র বাসর-ঘরে বাসরশয্যায় শুইতে গেল। তাহার একটু পরেই রাজমহিষী পরিচারিকাদের সঙ্গে রাজকুমারীকে আনিয়া বাসর-শয্যায় শোয়াইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। একজন পরিচারিকা বাসর-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাণীর পিছন পিছন চলিয়া গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ হইবামাত্র হঠাৎ সেই দৈত্য আর-কয়েকটি দৈত্য সঙ্গে লইয়া বাসর-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং বরকন্যাকে কথা বলিবারও অবসর না দিয়া তাহাদের খাটসুদ্ধ তুলিয়া আলাদিনের ঘরে আনিয়া উপস্থিত করিল।

বরকন্যাকে আনা হইলে আলাদিন তাহাদিগকে আলাদা রাখিবার ইচ্ছায় দৈত্যকে হুকুম করিল, "হে দৈত্যরাজ! তুমি বরকে এক কুঠরীতে বন্ধ করে রাখ আর কাল সূর্য্য ওঠবার আগেই আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য মন্ত্রীর পুত্রকে বিছানা হইতে তুলিয়া আলাদিনের মনোনীত জায়গায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার গায়ে নিশ্বাস ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার চলিবার ক্ষমতাও লোপ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আলাদিন যদিও রাজকন্যাকে খুব ভালবাসিত, তবু তাঁহার কাছে বসিয়া কেবল এইটুকু বলিল, "হে পূজনীয় রাজকুমারী! তোমার কোনো ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। যদিও তোমার রূপলাবণ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তবু তোমার উপর আমি কোনো অত্যাচার করব না। তোমার বাবা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে যে কাজ করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন, কেবল সেইটে নিবারণ করবার জন্যেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি।"

রাজকন্যা দৈত্য দেখিয়া এতই ভয় পাইয়াছিলেন, যে, আলাদিনের কথাগুলি কেবল শুনিলেন মাত্র, তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। আলাদিনও রাজকন্যার সঙ্গে আর কথা না বলিয়া তাঁহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া খাটের উপর শুইয়া থাকিল।

পরদিন ভোরে দৈত্য আলাদিনের কাছে আসিয়া বলিল, "প্রভু! ভৃত্য উপস্থিত, এখন আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিল, "মন্ত্রীর পুত্রকে এনে এই বিছানায় শুইয়ে তাকে আর রাজকুমারীকে শয্যাসমেত রাজঅন্তঃপুরে আবার রেখে এস।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর পুত্র ও রাজকুমারীকে পালঙ্কসুদ্ধ তাদের ঘরে রাখিয়া অন্তর্হিত হইল।

সকাল বেলা রাজা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বাসর-ঘরে আসিলেন। মন্ত্রীর পুত্র সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া থাকিয়া শীতে আধ-মরা হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজা দরজা খুলিবামাত্র লজ্জায় শয্যা হইতে উঠিয়াই অন্য এক ঘরে চলিয়া গেলেন।

রাজা খাটের কাছে গিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! কাল রাত্রি কেমন করে কাটালে?" রাজকুমারী পিতার কথার কোনো উত্তর না দিয়া কেবল বিমর্ষভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

রাজা মনে করিলেন, কন্যা লজ্জায় কথা বলিল না। সুতরাং সেখান হইতে রাণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। রাণী কহিলেম, "মহারাজ! বিয়ের কনেরা স্বামীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করে এই-রকম ভাব দেখায়, এ কিছু নূতন নয়। যা হোক, আমি এখনি কন্যাকে দেখতে যাচ্ছি।" এই বলিয়া রাজমহিষী বাসর-ঘরে যাইয়া মশারি তুলিয়া কন্যার মুখচুম্বন করিয়া তাহার পাশে বসিলেন। কিন্তু রাজকুমারী ম্লান মুখেই বসিয়া রহিলেন, মাতার সহিত কোনো কথা কহিলেন না। রাণী কন্যার এ-রকম ভাব দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বাছা! আমি তোমাকে আদর করলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অভ্যর্থনা না করে কেবল চুপ করেই রইলে, কি আশ্চর্য্য! মায়ের সঙ্গে কি এরকম ব্যবহার করা উচিত? আমার মনে হচ্ছে কোনো গুরুতর দুর্ঘটনার জন্যেই তুমি এরকম হয়ে গিয়েছ। তোমার কিসের দুঃখ আমায় খুলে বল।" তখন রাজকুমারী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা! কাল রাত্রে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার আতঙ্কে আমি এখন পর্য্যন্তও হতবুদ্ধি হয়ে আছি। আমার চৈতন্য নেই বললেই হয়।" এই বলিয়া মায়ের কাছে আদ্যোপান্ত গত রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। রাণী মনোযোগ দিয়া কন্যার সমস্ত কথা শুনিয়া তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি যে এ-কথা রাজাকে বলনি তা' ভালই করেছ। এ-কথা আর কারও কাছে প্রকাশ করো না, যিনি শুনবেন তিনিই তোমাকে পাগল মনে করবেন।" বেদ্রোলবদোর বলিলেন "মা! আমি যা বলছি তা সত্যি কি না আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।" রাণী বলিলেন, "আমি কারও কথায় বিশ্বাস করব না। এখন ওকথা ছেড়ে বিছানা থেকে ওঠ। এই বলিয়া যাহাতে কন্যার মনের ভাব বদলায় সেজন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এদিকে আলাদিন, পরদিন রাত্রিতেও মন্ত্রীর পুত্রকে রাজকন্যার সঙ্গসুখে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে আবার ডাকিয়া বলিল, "ওহে দৈত্য! আজ রাত্রিতেও বরকন্যাকে তেমনি করে রাজবাটী থেকে আমার কাছে নিয়ে এস।" আজ্ঞা পাইয়া দৈত্য উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে আলাদিনের ঘরে আনিয়া দিল। আবার পরদিন ভোরে দৈত্য আলাদিনের আজ্ঞানুসারে বরকন্যাকে লইয়া রাজবাড়ীতে রাখিয়া আসিল। রাজা আগের দিন বরকন্যাকে বড় ম্রিয়মাণ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অতএব সেদিন কন্যা কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিবার জন্য বাসরঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মন্ত্রীর পুত্র রাজার পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া গেলেন। রাজা রাজকুমারীর মুখচুম্বন করিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! বল দেখি, কাল কি করে রাত কাটালে?"

রাজকুমারী কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কন্যাকে আবার বলিলেন, "বাছা! তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বল।" তখন রাজকুমারী রাত্রির সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "বাবা! যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে মন্ত্রীর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, তা হলে আপনার সংশয় দূর হবে।" এই-কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কন্যাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, কাল তুমি আমার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপার কেন গোপন করেছিলে?"

রাজা বাড়ী গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে কাছে ডাকাইয়া কন্যার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে-সমস্ত তাঁহার কাছে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী! তুমি শীঘ্র গিয়ে তোমার ছেলের কাছে এ-বিষয়ে সমস্ত জেনে এসে আমাকে বল।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট যাইয়া রাজার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন সে-সমস্ত তাহার কাছে বলিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা যা জান আমার কাছে প্রকাশ করে বল।" মন্ত্রীর পুত্র বলিলেন, "বাবা! রাজকন্যা যা যা বলেছেন তাঁর একটি কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু তিনি আমার দুঃখের বিষয় কিছুই জানেন না।" এই বলিয়া গত দুই রাত্রিতে নিজে যে-রকম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া সজল চোখে পিতার কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন; "বাবা! আমি আপনাকে মিনতি করে বলছি, যাতে আমাদের এই বিবাহ ভঙ্গ হয়, সেজন্য আপনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করুন। রাজকন্যাও এতে রাজী আছেন। কারণ তাঁরও যন্ত্রণার সীমা নেই। এরকম বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল।"

মন্ত্রী রাজকুমারীর সঙ্গে ছেলের বিবাহ হওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলের এই-রকম যন্ত্রণার কথা শুনিয়া অগত্যা তিনি রাজার কাছে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ শুনাইলেন এবং ছেলেকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন রাজাও সে-বিষয়ে সম্মত হইয়া সেই-দিন হইতেই রাজপুরীতে ও সমস্ত শহরের মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে যে আমোদ-আহ্লাদ হইতেছিল, তাহা বন্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। শহরের লোকে এই আকস্মিক রাজাদেশের কিছুই কারণ ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু আলাদিন তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া এবং বিবাহভঙ্গের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজা এবং মন্ত্রী আলাদিনের প্রার্থনা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং এই দুর্ঘটনার জন্য তাহার উপর তাঁহাদের কোনো সন্দেহ জন্মিল না।

আলাদিন তিন মাসের পর রাজাকে বিবাহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য মাকে রাজসভায় পাঠাইলেন। আলাদিনের মাতা রাজসভায় যাইয়া রাজার সামনে আগের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে-দিকে চোখ পড়িবামাত্র রাজা তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং যেজন্য তাহার আগমন, তাহাও তাঁহার মনে পড়িল। তাহার পর রাজকার্য্য বন্ধ রাখিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "যে-স্ত্রীলোকটি কয়েকমাস আগে, বহুমূল্য উপহার এনেছিল, সে আবার

এসেছে। ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।" আলাদিনের মা রাজার কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনি আমার পুত্র আলাদিনের সঙ্গে রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের বিবাহ দিতে রাজি হয়ে আমাকে তিন মাসের পর আসতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তাই আমি এসেছি।" রাজা এই কথায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মন্ত্রীকে এ-বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! যদি আলাদিনকে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজী না হন, তবে রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহের জন্য এমন উপহার দেবার প্রস্তাব করুন যে, আলাদিন যেন তা দিতে অসমর্থ হয়। তা হলে, ওরা দুজনেই এ-বিষয় থেকে একেবারে নিরস্ত হবে এবং আপনার উপরেও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দোষারোপ করতে পারবে না।"

রাজা মন্ত্রীর এই পরামর্শ সুবিধাজনক মনে করিয়া আলাদিনের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো বৃদ্ধা! আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা পালন করতে রাজি আছি। কিন্তু আলাদিনকে গিয়ে বল, সে যেন প্রথমে যে-রকম উপহার পাঠিয়েছিল, চল্লিশখান বড় সোনার থালে সেই-রকম রত্ন সাজিয়ে চল্লিশজন কালো ক্রীতদাসকে দিয়ে ঐ-সমস্ত বইয়ে রাজ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়, এবং প্রত্যেক কালো দাসের আগে আগে যেন এক-একটি সুসজ্জিত গৌরবর্ণ ক্রীতদাস থাকে; তা হলেই, আমি তার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেবো।"

রাজার এই-কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজসভা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আলাদিনকে ডাকিয়া বলিল, "বাছা! রাজা এই এই সামগ্রী চেয়েছেন, তুমি তা দিতে না পারলে, রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরকে বিয়ে করতে পারবে না।" আলাদিন বলিল, "মা! তার জন্যে চিন্তা কি? রাজা যা চেয়েছেন তা অতি সামান্য।"

তখন আলাদিনের মা খাবার জিনিষ কিনিতে বাজারে গেল। ইতিমধ্যে আলাদিন প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে আনাইয়া বলিল, "রাজা আমার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে স্বীকার করেছেন, কিন্তু আমি আগে তাঁকে যে-রকম মণিমুক্তা ও প্রবাল উপহার দিয়েছিলাম, তিনি সেই-রকম রত্নে পরিপূর্ণ আর চল্লিশখান বড় বড় সোনার পাত্র চেয়েছেন। অতএব আমি যে-বাগান থেকে প্রদীপ এনেছিলাম, তুমি শীঘ্র সেই বাগানে গিয়ে চল্লিশখান বড় বড় সোনার থালে নানারকম রত্ন সাজিয়ে চল্লিশজন কালো ক্রীতদাসের মাথায় দিয়ে আর চল্লিশজন ভাল-পোষাক-পরা গৌরবর্ণ ক্রীতদাসকে তাদের সঙ্গে দিয়ে রাজবাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান যেন কোনোমতে সভাভঙ্গের সময় হয়ে না যায়।"

এই-কথা শুনিবামাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিল এবং আলাদিনের হুকুম মত সমস্ত জিনিষ আনিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিনের মা বাজার হইতে আসিয়া অনেক ক্রীতদাস ও স্তূপাকার রত্ন দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইল। আলাদিন বলিল, "মা! তুমি এখনি এই-সমস্ত জিনিষ নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাও, কিছুতেই দেরি কোরো না। সভাভঙ্গের আগে উপস্থিত হতে পারলেই ভাল হয়।" এই বলিয়া নিজের হাতে

বাড়ীর দরজা খুলিয়া চাকরদের উপহার লইয়া যাইতে আদেশ করিল। আজ্ঞামাত্র তাহারা প্রত্যেকেই রত্নাদিপূর্ণ এক এক স্বর্ণথাল মাথায় লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আলাদিনের মাতা সকলের পিছনে যাইতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজপথের সমস্ত লোক তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

ক্রীতদাসেরা রাজসভায় পৌঁছিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া সারি দিয়া তাঁহার দুই পাশে দাঁড়াল। এমন সময়ে আলাদিনের মা রাজসিংহাসনের কাছে আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার পুত্র আলাদিন যদিও রাজকুমারীর যোগ্য উপহার পাঠাতে পারেনি, তবু আপনি অনুগ্রহ করে এইটুকুই গ্রহণ করুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

রাজা যাহা কখনও চক্ষে দেখেন নাই, এমন রত্নাদিতে পরিপূর্ণ চল্লিশখান স্বর্ণপাত্র এবং ক্রীতদাসদের বহুমূল্য ও অত্যাশ্চর্য্য পোষাক দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মন্ত্রী! যে-ব্যক্তি এমন উপহার দিতে সক্ষম, তাকে কন্যা সম্প্রদান করা যায় কি না?" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ যে মত প্রকাশ করিলেন, রাজা সেই অনুসারে আলাদিনের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্রকে গিয়ে বলো, আমি নিশ্চয়ই তার সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দেবো। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার আলাদিনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

আলাদিনের মাতা এই-কথা শুনিয়া খুসী হইয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইল। রাজা সভাভঙ্গ করিয়া দাসগণকে রাজকন্যার মহলে সোনার থালাগুলি লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, এবং নিজেও কন্যার সঙ্গে একত্রে বসিয়া ঐসকল রত্নাদি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পিছন পিছন চলিলেন। রাজকুমারীকে আশীজন ক্রীতদাসের অপূর্ব্ব বেশভূষা দেখাইবার জন্য তাহাদেরও অন্তঃপুরের মধ্যে আনাইলেন। রাজকুমারী পর্দার আড়াল হইতে দাসদের বেশভূষা এবং রূপলাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন।

এদিকে আলাদিনের জননী হাসিমুখে বাড়ী ফিরিতেই, আলাদিন তাঁহার বাহিরের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিল যে, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মা বলিলেন, "বাছা! এতদিনে তোমার আশালতা ফলবতী হয়েছে বলা যায়, কারণ রাজা সভাসদ্‌দের সঙ্গে পরামর্শ করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, তুমিই কন্যার পাণিগ্রহণের যোগ্যপাত্র, এবং তোমাকে তিনি শীঘ্র রাজসভায় যেতে অনুমতি করেছেন; এখন যাবার আয়োজন কর।" আলাদিন এই-সমস্ত কথা শুনিবামাত্র মহানন্দে মাতিয়া প্রদীপ ঘষিতে লাগিল। অমনি সেই আজ্ঞাকারী দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিন তাঁহাকে বলিল, "আমাকে প্রথমতঃ স্নান করাতে হবে, তার পরে আমাকে এমন মহামূল্য অপূর্ব্ব পোষাক পড়িয়ে দেবে যে, তা কোনো রাজাধিরাজও কখন পরেননি।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য তাহাকে লইয়া একটি চমৎকার পাথরে-

বাঁধানো সুন্দর স্নানাগারে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে নানারকম-সুগন্ধদ্রব্য-মিশানো গরম-জলে কে যে তার গা ধোয়াইয়া স্নান করাইল, আলাদিন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্নানের পর আলাদিন অত্যন্ত সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া স্নানাগারের পাশের এক দালানে ঢুকিয়া দেখিল, সেখানে এক প্রস্থ অতি সুন্দর পোষাক রহিয়াছে, তাহার আলোয় সমস্ত ঘর আলোকময় হইয়া আছে। দৈত্য আলাদিনকে ঐ মনোহর পরিচ্ছদ পরাইয়া তাহার ঘরে লইয়া আসিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে আর কি করতে হবে আজ্ঞা করুন ?" আলাদিন বলিল, "রাজার আস্তাবলে যে-সমস্ত ঘোড়া আছে, তার চেয়েও সুন্দর একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া আমাকে এনে দাও, তার লাগাম ও জিন সোনার-কাজ-করা আর খুব ভাল হবে। তা ছাড়া আমার আগে পিছনে সারি বেঁধে যেতে পারে এমন চল্লিশজন সুসজ্জিত ক্রীতদাস এনে দাও আর রাজকুমারীর পরিচারিকা হবার যোগ্য সুন্দর-বেশভূষা-করা ছ'জন ক্রীতদাসী আমাকে এনে দাও। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাজকুমারীর যোগ্য এক এক প্রস্থ কাপড় থাকবে। আর দশটি থলেতে দশ হাজার মোহর চাই। তুমি এই-সমস্ত শীঘ্র এনে দাও।"

দৈত্য আজ্ঞামাত্র অন্তর্হিত হইল, এবং কিছুক্ষণ পরে আলাদিনের ইচ্ছামত সমস্ত জিনিষ আনিয়া উপস্থিত করিল আলাদিন তাহার ভিতর হইতে চারি হাজার মোহর লইয়া আপনাদের রোজকার খরচের জন্য মায়ের হাতে দিল এবং আর ছয় হাজার মোহর ক্রীতদাসদের হাতে দিয়া আজ্ঞা করিল, "যখন আমি রাজবাড়ীতে যাব, তখন তোমরা এই-সমস্ত মোহর মুঠো মুঠো করে পথে ছড়িয়ে যাবে।"

তার পর আলাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া মহাসমারোহ করিয়া রাজবাড়ীর পথে যাত্রা করিল। রাজপথে অত্যন্ত লোকারণ্য হইল। তাহারা সকলেই আলাদিনের এমন দানশীলতা দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আলাদিন রাজবাড়ীতে পৌছিলে, রাজা তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া যত না চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া তার চেয়ে অনেক বেশী সন্তুষ্ট হইলেন। আলাদিনের মায়ের আগেকার যৎসামান্য বেশ দেখিয়া রাজা কখনো মনে করেন নাই যে, তাঁহার পুত্রের এমন সুন্দর মূর্ত্তি এবং এমন বেশভূষা হইবে। আলাদিন রাজার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা তাঁহাকে মহা সমাদর করিয়া আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনের উপর নিজের পাশে বসাইয়া তাঁহার সঙ্গে নানা-রকম বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা বাদ্যকরদের বাজনা বাজাইতে অনুমতি দিয়া আলাদিনকে লইয়া অন্য একটি সুসজ্জিত ঘরে ঢুকিলেন। সেখানে অনেক-রকম ভাল ভাল খাবার জিনিষ প্রস্তুত ছিল। রাজা আলাদিনের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন, প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদেরা আপন আপন পদানুসারে চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। খাওয়ার পর রাজা সেইদিনেই আলাদিনের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, আলাদিন বিনয় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! যদিও আমি রাজকন্যার

পাণিগ্রহণের জন্যে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়েছি, তবু এ পর্য্যন্ত তাঁর উপযুক্ত বাসস্থান প্রস্তুত করতে পারিনি। তাই আমার ইচ্ছা এই যে, যে পর্য্যন্ত রাজকুমারীর বাসের উপযুক্ত সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদের বিবাহ স্থগিত রেখে রাজবাড়ীর কাছেই আমাকে এমন একটি স্থান দান করতে আজ্ঞা হয়, যেখানে আমি বাড়ীঘর তৈরী করিয়ে রোজ আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি।" রাজা এই-কথা শুনিবামাত্র নিজের প্রাসাদের সাম্‌নে আলাদিনের মনোমত জায়গা দিলেন।

আলাদিন রাজার কাছে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পথে তাহাকে দেখিবার জন্য আগের মতই ভিড় হইল, এবং সমস্ত লোকেই খুসী হইয়া তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। আলাদিন বাড়ী আসিয়াই নিজের ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে ডাকিবামাত্র দৈত্য তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "প্রভু! আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিল, "দৈত্য! আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তখনই তা এনে দিয়েছ। কিন্তু এখন রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের বাসের উপযোগী একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে দাও। বাড়ীটি এমন চমৎকার হবে যেন কোনোখানে কিছু খুৎ না থাকে। বাড়ীর সকলের উপর একটি গোল নাট্যশালা নির্ম্মাণ করতে হবে, তার চারদিকে যেন এক-রকমেরই বারাণ্ডা থাকে। তার ভিত্তি ইটের বদলে সোনা আর রূপোর হবে, এবং প্রত্যেক বারাণ্ডায় ছ' ছ'টি করে মহামূল্য-রত্ন বসানো জানলা থাকবে। মোটকথা প্রাসাদটি এমনি করে তৈরী করবে যেন, সেটা ভূমণ্ডলের মধ্যে অদ্বিতীয় বলে পরিচিত হয়।"

আলাদিন সন্ধ্যার সময়ে দৈত্যকে এই-সমস্ত আজ্ঞা দিয়া সেখান হইতে বিদায় করিয়া নিজে শুইবার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরদিন ভোরে আলাদিন শয্যা হইতে উঠিবামাত্র, দৈত্য তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! অট্টালিকা প্রস্তুত হয়েছে।" আলাদিন দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠাতে দৈত্য সেই-দণ্ডেই তাহাকে তাহার ভিতরে লইয়া গেল। আলাদিন বাড়ীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া এমনি আশ্চর্য্যান্বিত হইল যে, কি বলিয়া তাহার প্রশংসা করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দৈত্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একে একে সমস্ত জায়গা দেখাইল। আলাদিন দেখিল, কোনো স্থানে কোনো ত্রুটি হয় নাই। যেখানে যে সাজ শোভা পায়, সেখানে সেই সাজ দেওয়া হইয়াছে, এবং যেখানে যে জিনিষের দরকার সেখানে সেই জিনিষই সাজানো রহিয়াছে। দ্বারী, প্রহরী এবং ভৃত্যগণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত আছে। অশ্বশালায় ভাল ভাল ঘোড়া রহিয়াছে। ধনাগারে ধনে এবং খাদ্যভাণ্ডার নানা-রকম খাবারে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আলাদিন এই-সমস্ত, বিশেষতঃ বাড়ীর চূড়ার উপরের অপূর্ব্ব নাট্য-শালাটি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দৈত্যকে বলিল, "হে দৈত্যরাজ! তোমার উপর আমি যে কি-রকম সন্তুষ্ট হয়েছি, তা বলা যায় না। কিন্তু আমি একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। যেখানে রাজকুমারী থাকবেন, সেখান থেকে রাজবাটী পর্য্যন্ত একখানি বড় গালিচা পেতে

দিতে হবে, রাজকুমারী তার উপর দিয়ে হেঁটে রাজবাড়ী থেকে আমার কাছে আসবেন।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য সেখান হইতে অদৃশ্য হইল, এবং কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া একখানি প্রকাণ্ড গালিচা বিছাইয়া দিল। তাহার পরে রাজবাড়ীর দরজা খুলিবার আগেই তাঁহাকে লইয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া রাজবাড়ীর দ্বারীরা দরজা খুলিবমাত্র সামনেই একটি প্রকাণ্ড অপূর্ব্ব অট্টালিকা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। প্রধান মন্ত্রীও ঐ বাড়ীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাজার কাছে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এই বাড়ী যে মায়াবিদ্যার প্রভাবে প্রস্তুত হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই।" রাজাও ঐ পুরী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রী! আমার বোধ হচ্ছে রাজকুমারীর বাসের জন্যই নিশ্চয় আলাদিন এই পুরী নির্ম্মাণ করেছে। এক রাত্রির মধ্যে এই বাড়ী প্রস্তুত হয়েছে, এতে মায়া বোধ হতে পারে বটে, কিন্তু আলাদিন আমাকে যে-রকম অদ্ভুত রত্নাদি অকাতরে দান করেছে, তাতে যে সে ব্যক্তির দ্বারা এক রাত্রির মধ্যে এমন অট্টালিকা নির্ম্মিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে?"

এদিকে, আলাদিন বাড়ী আসিয়া দৈত্যের আনা বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিয়া মাকে দৈত্যের দেওয়া ছয়জন ক্রীতদাস সঙ্গে দিয়া রাজকুমারীকে নূতন বাড়ীতে আনিবার জন্য রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। নিজেও পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া, যে প্রদীপের সাহায্যে তাঁহার এত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে মহা যত্নে সেই প্রদীপটি নিজের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া মহা সমারোহ করিয়া নূতন বাড়ীতে আসিয়া রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

এদিকে আলাদিনের মা রাজবাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র দাসেরা রাজার আদেশে মহাসমাদর করিয়া তাহাকে রাজকন্যার ঘরে লইয়া গেল। রাজকুমারী তাহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পালঙ্কের উপর নিজের পাশে বসাইলেন। রাজাও রাজবাড়ীতে এবং সহরের সর্ব্বত্র নানারকম আনন্দোৎসব করিতে অনুমতি দিয়া কন্যার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছায় অন্তঃপুরে ঢুকিলেন।

সন্ধ্যা হইতেই রাজকুমারী সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া রাজা ও রাণীর নিকটে বিদায় লইয়া আলাদিনের মাতার সঙ্গে নূতন অট্টালিকাতে যাত্রা করিলেন। রাজকুমারীর দাসীরাও ভাল-রকম সাজসজ্জা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজকন্যা সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র, আলাদিন তাঁহাকে মহাসমাদর করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। আলাদিনের মা রাজকন্যাকে সুন্দর আসনে বসাইয়া অতি যত্নে নানারকম সুস্বাদু খাবার খাইতে দিলেন। খাইবার সময় সুন্দরী মেয়েরা নানারকম বাদ্যযন্ত্র লইয়া গান বাজনা করিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারী আলাদিনের এমন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, "আমি এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও চোখেও দেখিনি।"

তাহার পর আলাদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়, চীনদেশীয় রীতি অনুসারে প্রিয়তমা

রাজকুমারীর হাত ধরিয়া মহানন্দে নাচিতে নাচিতে বাসর-ঘরে ঢুকিলেন। তখন রাজকুমারীর দাসীরা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ বদলাইয়া দিয়া তাঁহাকে বাসর-শয্যায় শোয়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। রাজকুমারী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন সকালে আলাদিন শয্যা হইতে উঠিয়া ভাল ভাল পোষাক পরিয়া একটি সুন্দর ঘোড়ায় উঠিয়া দাসদের সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ীতে গেলেন। রাজা তাঁহাকে মহাসমাদর করিয়া আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনের উপরে নিজের পাশে বসাইয়া চাকরদের খাওয়ার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলাদিন বলিলেন, "মহারাজ! আজ আপনাকে অনুগ্রহ করে প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ীতে গিয়ে আহার করতে হবে। আমি আপনাকে নিতে এসেছি।"

রাজা আলাদিনের এই-কথা শুনিয়া খুসী হইয়া তখনি পারিষদদের সঙ্গে লইয়া আলাদিনের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন। রাজা আলাদিনের প্রাসাদের কাছে আসিয়াই তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর বাড়ীতে ঢুকিয়া আলাদিনের নাট্যশালার মনোহর শোভা ও সেখানকার জানালায় মণিমুক্তা প্রভৃতি নানা রকমের বহুমূল্য পাথর ঝুলিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আলাদিন রাজাকে একে একে বাড়ীর সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া অবশেষে তাঁহাকে রাজকন্যার ঘরে লইয়া গেলেন। রাজকুমারী রাজাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা বুঝিলেন যে, এই বিবাহে কন্যা সুখী হইয়াছেন। তাহার পর ভৃত্যেরা দুইটি মেজে নানারকম সুন্দর সুন্দর খাবার সাজাইয়া দিলে রাজা রাজকন্যা, আলাদিন এবং রাজমন্ত্রী একটি মেজের এবং বাকী সব রাজকর্ম্মচারীরা আর-এক মেজের কাছে বসিয়া খাইতে লাগিলেন। রাজা নানারকম ভাল খাবার খাইয়া খুব খুসী হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রী! আমি এমন ভাল জিনিষ খাওয়া দূরে থাক্, কখন চোখেও দেখিনি!"

খাওয়ার পর রাজা নিজের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রাজমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদিনের অপূর্ব্ব অট্টালিকা-সম্বন্ধে নানারকম কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সেদিন হইতে রাজা প্রতিদিন সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই আগে জানালা দিয়া আলাদিনের অট্টালিকার দিকে চাহিতেন। বিবাহের পর আলাদিন কেবল বাড়ীতে বদ্ধ থাকিয়া সময় না কাটাইয়া কখন বা দেবালয় দর্শন, কখন বা মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইত। বাড়ী হইতে বাহির হইলেই তাহার দুই পাশে দুইজন ভৃত্য মুঠোমুঠো করিয়া টাকা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত। সুতরাং আলাদিনকে দেখিলেই সেখানে অনেক লোকের সমাগম হইত। তা ছাড়া আলাদিনের কাছে যখন যে যত টাকা চাহিত, তখনই সে তত টাকা পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইত। এমনি করিয়া আলাদিন নিজের দানশক্তির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকল লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

এদিকে আফ্রিকাদেশীয় মায়াবী, সুড়ঙ্গের মধ্যেই আলাদিনের মৃত্যু হইয়াছে ঠিক

করিয়া, বহুদেশে ঘুরিয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গেল। এবং কয়েক বৎসর পরে আলাদিনের বাস্তবিক মৃত্যু হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া একদিন গণনা করিয়া দেখিল যে, আলাদিনের মৃত্যু হয় নাই; সে গহ্বর হইতে উঠিয়া, সেই প্রদীপের সাহায্যে মহাঐশ্বর্য্যশালী হইয়া চীনদেশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে কাল কাটাইতেছে। ইহা জানিতে পারিয়া মায়াবী রাগে জ্বলিয়া পুড়িয়া বলিল, "হায় হায়! আমি মনে করেছিলাম আলাদিন মরেছে। কিন্তু তা না হয়ে, সেই ছোঁড়াই প্রদীপের গুণ জানতে পেরে আমার বিদ্যা আর পরিশ্রমের ফল ভোগ করছে। ভাল, ভাল, শীঘ্রই এর প্রতিকার করতে হচ্ছে। এতে যদি আমার প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।"

মায়াবী এই-রকম পণ করিয়া পরদিন সকালেই একটা ঘোড়ায় চড়িয়া চীনদেশের দিকে যাত্রা করিল। পথে একটুও দেরি না করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই চীনদেশের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম দিন এক দোকানে বাসা করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিয়া শহরে ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় কয়েকজন ভদ্রলোক একসঙ্গে বসিয়া পানাদি করিতেছে দেখিয়া, মায়াবী সেখানে উপস্থিত হইল। তখন তাহাদের ভিতর হইতে একজন তাহাকে একপাত্র মদ্যপান করিতে দিল। মায়াবী যখন ঐ মদ খাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন সেখানকার কোনো লোক আলাদিনের বাড়ীর কথা তুলিয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

মায়াবী ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ অট্টালিকার এত প্রশংসা করছ?" সে বলিল, "তুমি বুঝি বিদেশী? আমরা আলাদিনের প্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা বলছি, তেমন আশ্চর্য্য অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। তোমার সেটা দেখা উচিত।" মায়াবী বলিল, "আমি দূরদেশ থেকে আসছি, আলাদিনের অট্টালিকার পথ জানি না। আপনি যদি অনুগ্রহ করে ঐ বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেন, তা হলে আমি আপনার কাছে চিরবাধিত হই।" মায়াবীর এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি তাহাকে আলাদিনের বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিল। মায়াবী সেখান হইতে উঠিয়া আলাদিনের বাড়ীর উদ্দেশে চলিল।

মায়াবী আলাদিনের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার চারিদিক দেখিয়া মনে মনে ঠিক বুঝিতে পারিল, যে, এই অট্টালিকা আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায্য ছাড়া আর কিছুতেই তৈরী হয় নাই। কিন্তু ঐ প্রদীপ আলাদিনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, অথবা সে অন্য কোনো জায়গায় রাখিয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য বাসায় গিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিল, এবং ঐ গণনায় প্রদীপ যে অট্টালিকার মধ্যেই আছে, ইহা জানিতে পারিয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

একদিন মায়াবী এক দোকানদারের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখে শুনিল যে, আলাদিন সেই সময়ে আট দিনের জন্য মৃগয়ায় যাইতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার কার্য্যসিদ্ধির এই উত্তম সুযোগ ঘটেছে। এই সময়ে যে-কোনো-প্রকারে হোক প্রদীপটা দখল করতেই হবে।" এই ভাবিয়া মায়াবী কার্য্যসিদ্ধির জন্য এক প্রদীপওয়ালার কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই,

আমাকে বারোটি তামার প্রদীপ দিতে পার ?" প্রদীপওয়ালা বলিল, "এখন আমার কাছে এত প্রদীপ তৈরী নেই। যদি দরকার থাকে তবে কাল এস, যত ইচ্ছা ততই দিতে পারব।" মায়াবী বলিল, "আচ্ছা ভাই, তুমি প্রদীপগুলি তৈরী করে রাখ, আমি কাল এসে নিয়ে যাব। কিন্তু দেখো, প্রদীপগুলি যেন সুন্দর আর পরিষ্কার হয়। প্রদীপ ভাল হলে, দাম

কেউ পুরানো প্রদীপ বদল দিয়ে নূতন প্রদীপ নেবে গো ?

বেশী দেব, সেজন্য কিছু চিন্তা নেই।" এই বলিয়া মায়াবী সেদিন বাসায় আসিল। পরদিন প্রদীপওয়ালার কাছে বারোটি সুন্দর প্রদীপ কিনিয়া একখান চাঙারীতে ঐসমস্ত সাজাইয়া তাহা কাঁধে লইয়া আলাদিনের বাড়ীর দিকে চলিল। ঐ বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া খুব জোরে বারবার এই কথা বলিতে লাগিল, "কেউ পুরানো প্রদীপ বদল দিয়ে নূতন প্রদীপ নেবে গো ?"

এই-কথা শুনিয়া যত বালক ও পথিক তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া হাততালি দিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিল।

মায়াবী তাহাতে কান না দিয়া বারবার উচ্চস্বরে সেই কথাই বলিতে থাকিল। ক্রমে রাজকুমারী অট্টালিকার মধ্য হইতে ঐ গোলমাল শুনিয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। দাসী বাহিরে আসিয়া মায়াবীর প্রদীপ বদলের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর কাছে ফিরিয়া গিয়া বলিল, "ঠাকৃরুণ! একজন কতকগুলি নূতন প্রদীপ বেচতে এসেছে। সে কেবল বলছে, কেউ পুরানো প্রদীপ বদল দিয়ে নূতন প্রদীপ নেবে গো? এই-কথা শুনে পথের যত লোক তাকে পাগল মনে করে তার চারিধারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে, এ জন্যেই এত গোল হচ্ছে।" এই-কথা শুনিয়া রাজকন্যার আর-এক দাসী বলিল, "ঠাকরুণ! আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না বলতে পারি না, এই ঘরের কারনিশের উপর একটা পুরানো প্রদীপ আছে। তার বদলে একটি নূতন প্রদীপ নিয়ে রাখলে ক্ষতি কি?"

ক্রীতদাসী যে-প্রদীপের কথা বলিল, সেটা আলাদিনের সেই আশ্চর্য্য প্রদীপ। পাছে কেউ ঐ প্রদীপ নাড়ে-চাড়ে, সেই ভয়ে আলাদিন সেটা অতি সাবধানে কারনিশের উপর রাখিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিল। রাজকুমারী ঐ প্রদীপের আশ্চর্য্য গুণ কিছুই জানিতেন না। সুতরাং অনায়াসেই একজন দাসকে অনুমতি দিলেন, "তুমি ঐ প্রদীপটা বদল দিয়ে ওর বদলে একটা নূতন প্রদীপ এনে রাখ।" ভৃত্য আজ্ঞামাত্র বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া মায়াবীকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি এই প্রদীপটার বদলে আমাকে একটা নূতন প্রদীপ দাও।" জাদুকর ঐ প্রদীপটিকে আশ্চর্য্য প্রদীপ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহা লইয়া নিজের বুকের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিল, এবং চাঙারী হইতে একটি নূতন প্রদীপ তাহাকে দিল।

প্রদীপ হস্তগত হইবামাত্র মায়াবী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিয়া চাঙারী-সুদ্ধ অন্য প্রদীপগুলা এক নির্জ্জন জায়গায় ফেলিয়া দিয়া লুকাইয়া শহর হইতে বাহির হইয়া লোকালয় ছাড়িয়া এক নির্জ্জন জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে সন্ধ্যা হইলে, মায়াবী আপনার বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে প্রদীপটা বাহির করিয়া ঘষিবামাত্র সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন, আমি এই প্রদীপস্বামীর আজ্ঞাকারী।" মায়াবী বলিল, "শোন, আমি তোমাকে আজ্ঞা করছি, তুমি এবং এই প্রদীপের অন্যান্য আজ্ঞাকারী দৈত্যেরা মিলে চীন রাজধানীতে যে অট্টালিকা তৈরী করেছ, এখন তোমরা সবাই মিলে সেই অট্টালিকা ও তার ভিতরে যা যা আছে, সবসুদ্ধ আমাকে নিয়ে আফ্রিকা দেশের অমুক জায়গায় রেখে এস।" এই-কথা শুনিয়া দৈত্যরা তৎক্ষণাৎ আলাদিনের অট্টালিকা এবং মায়াবীকে আফ্রিকা দেশে লইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জানালায় মুখ দিয়া দেখিলেন, আলাদিনের বাড়ী যেখানে ছিল সেখানে ঘরের চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল আগের মত

শূন্য জমি পড়িয়া আছে। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কাল আলাদিনের বাড়ী ঐখানে স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু আজ তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, এরই বা কারণ কি? যদি ভূমিকম্প অথবা অন্য কোনো নৈসর্গিক ঘটনায় এমন ঘটত, তা হলে অবশ্যই বাড়ীর কোনো-না-কোনো চিহ্ন থাকত। আমি কি তা হ'লে ভুল করে এমন প্রলাপ বকছি? না, না, প্রলাপই বা কি করে হবে? আমি বেশ জ্ঞানের সঙ্গে দেখছি যে, ঐখানে অট্টালিকার চিহ্নমাত্রও নেই। আর আগে যে ওখানে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল, সে বিষয়েও ত কোনো সংশয় হচ্ছে না।" এই-রকম নানা চিন্তা করিয়া শেষে রাজা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবেন ও কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রী আসিবামাত্র রাজা তাঁহাকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী! তুমি বল দেখি, আলাদিনের অট্টালিকা কোথায় গেল?" মন্ত্রী এই-কথা শুনিয়া জানালায় গিয়া দেখিলেন আলাদিনের অট্টালিকার কোনো চিহ্ন নাই, কেবল শূন্য জমি পড়িয়া আছে। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি ত আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে, এমন অদ্ভুত প্রাসাদ কেবল মায়াবিদ্যার প্রভাবেই তৈরী হয়েছে, কিন্তু তখন আপনি আমার কথায় মনোযোগ দেননি।" তখন রাজা আলাদিনের উপর অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, "সে দুরাত্মা প্রতারক কোথায়? আমি এখনি তার মাথা কেটে ফেলব।" মন্ত্রী বলিলেন "দু তিন দিন হল, সে আপনার অনুমতি নিয়ে মৃগয়ায় গিয়েছে।" রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী! তুমি এখনি জনকয়েক ঘোড়-সওয়ার পাঠিয়ে সেই পাপিষ্ঠকে শিকল দিয়ে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এস।" মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। সৈন্যরা শহর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে যাইয়া আলাদিনকে দেখিতে পাইল। কিন্তু সে সময় তাঁহাকে কোনো কথা না বলিয়া কেবল এই মাত্র বলিল, "যুবরাজ! রাজা আপনাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন, সেইজন্য আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।"

আলাদিন তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দ মনে শিকার করিতে করিতে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। যখন রাজবাড়ীতে পৌঁছিবার আর আধ ক্রোশ মাত্র পথ বাকি আছে, তখন প্রধান সেনাপতি আলাদিনকে রাজার হুকুম জানাইয়া তাঁহাকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাজার কাছে আনিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ জল্লাদকে তাঁহার মাথা কাটিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু আলাদিন নিজের দানের গুণে সর্ব্বসাধারণের এমনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতি রাজার এমন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হইয়া জোর করিয়া পাঁচিল ডিঙাইয়া রাজবাড়ীতে ঢুকিবার জোগাড় করিল। তখন প্রধান মন্ত্রী তাড়াতাড়ি রাজার কাছে আসিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলে, রাজা তখনকার মত আলাদিনের প্রাণদণ্ড বন্ধ রাখিলেন।

আলাদিন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ ! আমি আপনার কাছে এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি যে, তার জন্তে আপনি আমার প্রাণদণ্ড করবেন ?" ইহা শুনিয়া রাজা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "ওরে বিশ্বাসঘাতক ! তোর দোষ কি ? তা কি তুই জানিস্ না ? তোর সেই অট্টালিকা এখন কোথায় ? আর আমার প্রাণাধিকা কন্তাই বা কোথায় ? তাকে এখনি এনে দিতে না পারলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোর মাথা কেটে ফেলব।" তখন আলাদিন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হে পূজনীয় মহারাজ ! রাজকুমারীর যে কি হয়েছে, আমি তার কিছুই জানি না, কিন্তু যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে চল্লিশ দিনের জন্য ক্ষমা করেন, তা হলে আমি তাঁর খোঁজে যাই। এই সময়ের মধ্যে যদি তাঁর কোনো খোঁজ করতে না পারি তা হলে আমার প্রাণদণ্ড করবেন।" রাজা কি করেন, অগত্যা আলাদিনের প্রার্থনাতেই রাজি হইলেন।

আলাদিন বিমর্ষভাবে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া "তোমরা কেউ বলতে পার আমার অট্টালিকা আর রাজকুমারী কোথায় গেল ?" পাগলের মত যাহাকে-তাহাকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তিন দিন অনাহারে এবং অনিদ্রায় সমস্ত শহর ঘুরিলেন। কিন্তু কোথাও কোনো খবর না পাইয়া শেষে শহর ছাড়িয়া গ্রামের দিকে যাইতে যাইতে এক নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মনের যন্ত্রণা এমন অসহ্য হইয়াছিল যে, তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু আত্মহত্যার আগে একবার পরমেশ্বরের আরাধনা করা উচিত মনে করিয়া হাত মুখ ধুইতে যেমন নদীতে নামিবেন, অমনি একখানি পাথরে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। যে আংটির গুণে সুড়ঙ্গের ভিতর তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল, এতদিন সেই আংটি তাঁহার আঙুলেই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আলাদিন মাটিতে পড়িবামাত্র তাঁহার আঙুলের আংটি পাথরের গায়ে ঘষিয়া গেল, আর অমনি যে দৈত্য গহ্বরের ভিতর তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সেই দৈত্য হঠাৎ তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয় ! আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন, আমি এই আংটির অধিকারীর আজ্ঞাকারী।" আলাদিন দৈত্যের মুখে এই-কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "হে দৈত্য ! যদি তুমি অনুগ্রহ করে আমার অট্টালিকা আগে যেখানে তৈরী হয়েছিল, সেইখানে এনে দাও, তা হলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।" দৈত্য বলিল, "মহাশয় ! আপনি যে আজ্ঞা করলেন, তা সম্পন্ন করা প্রদীপের আজ্ঞাকারী দৈত্যগণ ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নয়।" আলাদিন এই-কথা শুনিয়া আবার বলিলেন, "যদি তুমি তা না পার তবে পৃথিবীর যেখানে সেই অট্টালিকা আছে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চল, আর রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরের ঘরের জানালার কাছে রেখে এস।" এই-কথা শুনিবামাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে কাঁধে করিয়া আফ্রিকা দেশে লইয়া গিয়া রাজকুমারীর ঘরের পাশে রাখিয়া দিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

তখন যদিও রাত্রির জন্য চারিদিক অন্ধকার হইয়াছিল, তবু আলাদিন ঐ অট্টালিকার চারিদিক দেখিয়া নিজের বাড়ী ও তাহার ভিতরে রাজকন্যার ঘর চিনিতে পারিলেন। কেবল রাত্রি অনেক হইয়াছিল বলিয়া তিনি বাড়ীতে ঢুকিতে না পারিয়া একটি গাছতলায় বসিয়া রহিলেন। অত্যন্ত দুর্ভাবনার জন্য আলাদিন কয়েক দিন ঘুমাইতে পারেন নাই, এখন আগের চেয়ে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া সেই গাছতলাতেই শুইয়া রাত কাটাইলেন। পরদিন ভোরে পাখীর কলরবে জাগিয়া আলাদিন ঐ অট্টালিকার দিকে চাহিবামাত্র তাঁহার মনে বড়ই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল এবং অট্টালিকা ও রাজকুমারীকে আবার ফিরিয়া পাইবার আশাও মনে ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিল।

তথা হইতে উঠিয়া প্রাসাদের কাছে এদিক-ওদিক করিতে করিতে "সেই প্রদীপটা আমার যত দুর্ঘটনার মূল, প্রদীপটি কাছ-ছাড়া না করলে আমাকে কখনই এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হতো না," মনে মনে এই-রকম নানা-বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমারীর একজন দাসী খুব ভোরে রাজকন্যার বেশবিন্যাস করিতে করিতে জানালা দিয়া আলাদিনকে দেখিয়া রাজকন্যার কাছে সব কথা বলিল। রাজকুমারী এই-কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জানালার কাছে আসিয়া প্রিয়তম স্বামীকে দেখিয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া দাসীকে তাঁহাকে অট্টালিকার মধ্যে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসীরা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে রাজকুমারীর ঘরে লইয়া গেল। আলাদিন ও রাজকুমারী কখনই মনে করেন নাই যে, তাঁহাদের আবার মিলন হইবে। কিন্তু এখন পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাদের মনে যে কি-রকম আনন্দ হইল, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা দুইজনেই কাঁদিতে-কাঁদিতে পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিবার পর, আলাদিন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সত্য করে বল দেখি আমি মৃগয়ায় যাবার আগে ঘরের কারনিশের উপর যে একটি পুরানো প্রদীপ রেখেছিলাম সেটা কি হল?" রাজকন্যা বলিলেন, "হে প্রাণনাথ! এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, সেই প্রদীপ হতেই আমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে, আর আমিই এই অনর্থের মূল।" আলাদিন এই-কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এতে আর তোমার দোষ কি, তুমি প্রদীপের গুণ কিছুমাত্র জানতে না, সুতরাং আমার দোষেই যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে তার আর কোনো সন্দেহ নেই।"

তাহার পর রাজকন্যা যে-রকম করিয়া পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইয়াছিলেন আগাগোড়া সেই-সব কথা বর্ণনা করিলেন। আলাদিন বলিলেন, "রাজকন্যা! যে বিশ্বাসঘাতক প্রতারণা করে তোমাকে এখানে এনেছে তার অসদ্ব্যবহারের কথা কি আর বলব। তুমি বলতে পার সে ঐ প্রদীপ কোথায় রেখেছে?" রাজকন্যা বলিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি সে ঐ প্রদীপ তার বুকের কাপড়ের মধ্যে রেখেছে, কারণ একবার তার কাপড়ের ভিতর থেকে আমাকে ঐ প্রদীপ দেখিয়েছিল।" আলাদিন রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! এখন বল দেখি ঐ দুরাত্মা প্রতিদিন তোমার সঙ্গে কি-রকম

ব্যবহার করে?” রাজকন্যা বলিলেন, “হে নাথ! সে দুঃখের কথা আর কি বলব। ঐ দুরাত্মা প্রতিদিন এক-একবার এখানে আসে, আর আমাকে এই বলে বোঝায় যে, তোমার বাবা তোমার স্বামীর মাথা কেটে ফেলেছেন। তার সঙ্গে তোমার মিলনের আর কোনো আশা নেই। তুমি এখন আমাকেই বিবাহ কর।” আলাদিন বলিলেন, “প্রেয়সী! এখন তোমার উদ্ধার করবার এক যুক্তি স্থির করেছি। অতএব একবার আমাকে বাইরে যেতে হবে, অতি শীঘ্র ফিরে এসে তোমাকে যা যা করতে হবে, তা বলে দেব।” এই বলিয়া আলাদিন তৎক্ষণাৎ শহরে ঢুকিয়া এক দোকানে গিয়া একরকম গুঁড়া কিনিয়া আনিলেন, তাহার পর অট্টালিকার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন, “হে রাজকন্যা! আজ তোমাকে আমার পরামর্শ অনুসারে একটি কাজ করতে হবে। তুমি খুব সুন্দর বেশবিন্যাস করে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে, তার পর ঐ প্রতারক বাড়ীতে ঢুকতেই তার প্রতি এমন ভাব দেখাবে, যেন সে অনায়াসে বুঝতে পারে তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ। তার পর যখন সে খাওয়া-দাওয়া করতে থাকবে, তখন তাকে লুকিয়ে মদের সঙ্গে এই গুঁড়া মিশিয়ে তাকে পান করতে দিও, তা হলেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।” রাজকন্যা রাজি হইলে, আলাদিন তাঁহার হাতে ঐ গুঁড়া দিয়া একটি গুপ্ত জায়গায় গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন।

মায়াবী রাজকুমারীকে আফ্রিকা দেশে আনা অবধি প্রিয়তম পতি এবং স্নেহময় পিতার বিচ্ছেদে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি নিজের বেশবিন্যাসের দিকে একটুও লক্ষ্য রাখেন নাই। আজ ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া মণিমুক্তায় গা সাজাইয়া রূপে ঘর আলো করিয়া দুরাত্মার আগমনের প্রতীক্ষায় দালানে বসিয়া থাকিলেন। নিয়মিত সময়ে মায়াবী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজকুমারী মহা সমাদর করিয়া তাহাকে সুন্দর আসনে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, “আজ আমার এমন ভাবান্তর দেখে তোমার বোধ হয় আশ্চর্য্য লেগেছে। কয়েক দিন আমি বড় মনঃকষ্টে ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলিনি। কিন্তু এখন মনে মনে নানা-বিষয় আন্দোলন করে স্থির করেছি আমার স্বামী আলাদিন চীনেশ্বরের কোপে পড়ে নিশ্চয়ই প্রাণ হারিয়েছেন। তা স্বামীর জন্য স্ত্রীর যেমন শোক করা উচিত তা ত' করা হয়েছে। সুতরাং আর বৃথা শোক করে কি হবে? তাঁকে ত ফিরে বাঁচাতে পারব না, এখন নিজের সুখচিন্তা করা কর্ত্তব্য। মনে মনে এই-সমস্ত বিবেচনা করে দেখে পতিশোক ভুলে তোমার সঙ্গে একত্রে খাওয়া দাওয়া করবার জন্য সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি। আমার কাছে চীনদেশের মদ ছাড়া অন্য কোনো মদ নেই। কিন্তু আমার একান্ত বাসনা যে, আফ্রিকা-দেশের মদ পান করি। তুমি কি আমাকে এদেশের সব চেয়ে সেরা মদ আনিয়ে দিতে পার?” এই-কথা শুনিবামাত্র মায়াবী একেবারে আনন্দে পাগল হইয়া বলিল, “আমার ঘরে একপাত্র মদ আছে, সেটা খুব পুরানো ও সুপক্ব, তেমন ভাল মদ বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই। আমি এখনি এনে দিচ্ছি।” এই বলিয়া মায়াবী সেখান হইতে হাওয়ার মত ছুটিয়া চলিয়া গেল

এই অবসরে রাজকুমারী আলাদিনের কেনা গুঁড়া একপাত্র মদে মিশাইয়া আলাদা করিয়া রাখিলেন। মায়াবী মদ লইয়া আসিলে, রাজকন্যা তাহার সহিত একত্রে খাইতে বসিলেন। কিছুক্ষণ খাইবার পর একটা পাত্রে খানিকটা মদ ঢালিয়া নিজে পান করিলেন এবং সেই মদে পূর্ণ আর-একটি পাত্র তাহাকে দিয়া বলিলেন, "এই মদ ভারি চমৎকার। আমি এমন মদ কখনো খাইনি।" মায়াবী বলিল, "হে রাজকুমারী! তোমার এই প্রশংসা-বাক্যে এ মদ আরো সুন্দর হয়ে উঠল।" এই বলিয়া পাত্রের সমস্ত মদ খাইল। এমনি করিয়া দুই তিন পাত্র মদ খাইবার পর যখন রাজকুমারী দেখিলেন যে, তাঁহার আচার ব্যবহার ও মিষ্টালাপে মায়াবী একেবারে মুগ্ধ হইয়াছে, তখন দাসীকে ইঙ্গিত করিয়া বিষাক্ত মদের পাত্রটা আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসী পাত্রটা রাজকন্যার হাতে আনিয়া দিল; রাজকুমারী ঐ পাত্র হাতে করিয়া অন্য একপাত্র মায়াবীর হাতে দিয়া বলিলেন, "আমাদের চীনদেশে এই-রকম প্রথা প্রচলিত আছে যে, পরস্পর প্রণয় প্রকাশ করার জন্য পুরুষ নিজের পাত্র রমণীকে এবং রমণী নিজের পাত্র পুরুষকে দিয়া দুজনে দুজনের মঙ্গলাচরণ করে।" এই-কথা বলিয়া নিজের হাতের বিষাক্ত পাত্র মায়াবীকে দিয়া তাহার হাতের পানপাত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন। জাদুকর যারপরনাই আনন্দিত হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পাত্র বদলাইয়া হাতে করিয়া মদ খাইবার আগে বলিল, "হে রাজকুমারী! তোমার কাছে আমি যথেষ্ট অনুগ্রহ পেলাম।" এই বলিয়া মায়াবী তৎক্ষণাৎ

মায়াবী তৎক্ষণাৎ মদ পান করিয়া পাত্র শূন্য করিল

মদ পান করিয়া পাত্র শূন্য করিল। পানের পরেই তাহার মাথা নীচু হইয়া পড়িল, এবং চোখ ঘুরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হইল। মায়াবীর মৃত্যু হইলে, দাসীরা

রাজকন্যার আদেশে আলাদিনকে সেইখানে লইয়া আসিল। আলাদিন আসিয়া দেখিলেন মায়াবী পালঙ্কে পড়িয়া আছে। তার পর আলাদিন রাজকন্যাকে ও দাসীদিগকে অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া মায়াবীর বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে সেই প্রদীপটি বাহির করিয়া ঘষিতে লাগিলেন। অমনি সেই ভীষণমূর্ত্তি দৈত্য আলাদিনের সামনে আসিয়া বলিল, "আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিলেন, "এই অট্টালিকা তুমি চীনদেশের যেখান থেকে এনেছিলে, আবার সেইখানে নিয়ে যেতে হবে, এইজন্য তোমাকে ডেকেছি।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তাহার পরই প্রাসাদ চীনদেশে রওনা হইল। অট্টালিকা আবার চীনদেশে আসিয়া পড়িলে, আলাদিন রাজকন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! কাল আমাদের মহানন্দের দিন হবে, কারণ ভোর হলেই আমরা আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবদের দর্শনলাভ করব।" তাই শুনিয়া রাজকুমারীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহার পর দুজনে খাওয়া-দাওয়া করিয়া ঘুমাইলেন।

এদিকে চীনের রাজা কন্যার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা ছাড়িয়া দিবারাত্রি কেবল "হা বেদ্রোলবদোর! হা বেদ্রোলবদোর!" বলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যেখানে আলাদিনের বাড়ী ছিল প্রতিদিন সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেন। যে রাত্রে আলাদিনের অট্টালিকা আবার আগের জায়গায় আসিয়া পড়িল তাহার পরদিন ভোরে রাজা জানালা দিয়া আলাদিনের প্রাসাদ যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া তাড়াতাড়ি ঐ বাড়ীর দিকে চলিলেন। আলাদিন আগেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সকালেই রাজার আগমন হইবে। তাই তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা আসিবামাত্র অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। রাজা আলাদিনকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "আলাদিন! তুমি আগে আমাকে বেদ্রোলবদোরের কাছে নিয়ে চল, তার পরে তোমাকে বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করব।" আলাদিন রাজাকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর ঘরে ঢুকিলেন। রাজা মেয়েকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুক্ষণ কেবল আনন্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাজকুমারীও পিতার শ্রীচরণ দর্শনে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন, "কন্যা! তুমি আমাকে দেখে এমনি খুসী হয়েছ যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন তোমার কোনো বিপদ ঘটেনি, কিন্তু তোমার কি হয়েছিল? আমাকে বল।" রাজকুমারী বলিলেন, "হে পিতা! যে দুরাত্মা আমায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সে আমার উপর কোনো অত্যাচার করেনি সত্য, কিন্তু পাছে আপনি রাগ করে আমার নির্দোষী প্রিয়তম স্বামীর প্রাণদণ্ড করেন, সেই আশঙ্কাতেই আমি অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম। কাল সকালে যখন আমি স্বামীকে দেখলাম, তখন যেন মৃতদেহে প্রাণ পেলাম। এই বলিয়া মায়াবী যেমন করিয়া তাঁহাকে ঠকাইয়া প্রদীপ লয়, যে-রকম ভাবে বাড়ী সুদ্ধ তাঁহাকে আফ্রিকাদেশে লইয়া যায় এবং যে উপায়ে ঐ জাদুকরকে হত্যা করা হয়, সেই-সমস্ত বিবরণ আগাগোড়া

বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এ ছাড়া আর যা যা ঘটেছিল, সে-সমস্ত আমার স্বামীর মুখ থেকেই শুনতে পাবেন।

আলাদিন বলিলেন, "মহারাজ! আমি এই অট্টালিকার এক নিরালা কোণে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে তার পর রাজকন্যার ঘরে গিয়ে দেখলাম, সেই মায়াবীর মৃতদেহ খাটের উপর পড়ে আছে। তখন রাজকুমারীকে আর সেখানে রাখা অনুচিত মনে করে যে-প্রদীপের জন্য আমাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতে হয়েছিল সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায্যেই এই অট্টালিকা এইখানে নিয়ে এসেছি। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখুন মায়াবীর কি দুর্দ্দশা ঘটেছে।" এই-কথা শুনিবামাত্র রাজা বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতারক মায়াবীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে এবং বিষে জর্জ্জরিত হওয়াতে তাহার মুখ নীল হইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া আলাদিনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হে বৎস! আমি কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহের বশে তোমার সঙ্গে যে-সমস্ত অসদ্ব্যবহার করেছি, সেইজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত না হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে আমায় ক্ষমা করতে হবে।" ইহা শুনিয়া আলাদিন বলিলেন, "মহারাজ! আপনার যা কর্ত্তব্য তাই করেছিলেন, এতে আপনি কোনোমতেই দোষী নন। পাপিষ্ঠ মায়াবীই আমার সমস্ত দুর্দ্দশার মূল। আমার উপর তার নিষ্ঠুর আচরণের বিবরণ আর-এক সময় বলব।" রাজা বলিলেন, "তাই হবে।" এই বলিয়া মায়াবীর মৃতদেহ শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর রাজার আজ্ঞা অনুসারে রাজকন্যা এবং আলাদিনের শুভ প্রত্যাগমন উপলক্ষে দশ দিন ধরিয়া সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব হইল।

এমনি করিয়া আলাদিন দুইবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও একেবারে নিরাপদ হইতে পারিলেন না. তাঁহাকে আবার মহা বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আফ্রিকা-দেশীয় মায়াবীর এক ছোট ভাই ছিল। সেও বড় ভাইএর মত মায়াবিদ্যা জানিত। তাহারা দুইভাই কখনই একত্র বাস করিত না। একজন এক দেশে, আর-একজন অন্য দেশে থাকিত। বৎসরান্তে কেবল একবার মায়াবিদ্যার সাহায্যে দুজনে দুজনের খবর লইত। ছোট মায়াবী এক বৎসর পর্য্যন্ত বড় ভাইয়ের কোনো খবর না পাওয়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এখন দাদা কেমন অবস্থায় আছেন, জানিবার জন্য গণনা করিতে আরম্ভ করিল। গণনা করিয়া জানিতে পারিল তাহার দাদা বাঁচিয়া নাই। চীনরাজ্যের একজন সামান্য ব্যক্তি বিষপান করাইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছে, এবং তাঁহারই পরিশ্রমের গুণে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছে। ছোট মায়াবী গণনা করিয়া এই-সমস্ত জানিয়া ভ্রাতৃ-শত্রুকে প্রতিফল দিবার জন্য চীনরাজ্যে যাত্রা করিল। পথে অনেক কষ্টভোগ করিয়া অবশেষে চীনরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কি উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সে প্রতিদিন শহরে বেড়াইতে বাহির হইতে লাগিল। একদিন বেড়াইতে

বেড়াইতে লোকমুখে ফতেমা নাম্নী এক ধার্ম্মিকা রমণীর সুখ্যাতি শুনিতে পাইল। তাই শুনিয়া এক ব্যক্তিকে ঐ নারীর বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "তুমি কি ফতেমাকে দেখনি? তিনি এই শহরের মধ্যে মহা পুণ্যবতী, কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় জীবন যাপন করেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে দুদিন নিজের ধ্যানকুটীর থেকে বাহির হয়ে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে লোকের মহা উপকার করে থাকেন। কেবল হাত দিয়ে ছুঁয়েই অসংখ্য লোকের মাথার অসুখ সারিয়েছেন।"

মায়াবী দিনের বেলা খোঁজ করিয়া ঐ পুণ্যবতীর বাসস্থান ঠিক করিয়া রাখিল। সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া শহরের এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে ফতেমার কুটীরে নিঃশব্দে ঢুকিয়া দেখিল ঐ ধার্ম্মিকা ঘুমাইতেছেন। মায়াবী একখানি খড়্গ হাতে করিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া বলিল, "তুমি চীৎকার করো না, তা হলে এখনি তোমার মাথা কেটে ফেলব। তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি আমার পরণের কাপড়খানা নিয়ে তোমার খানা আমাকে দাও, আর তোমার মুখে যে রঙ আছে, আমার মুখে ঐ রঙ এমনি ভাবে মাখিয়ে দাও, যেন আমাকে ঠিক তোমার মত দেখায়।"

মায়াবীর এই কথা শুনিয়া ফতেমা মহাভীতা হইয়া আপনার কাপড়-চোপড় দিয়া তাহাকে বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলেন। এমনি করিয়া মায়াবী অবিকল ফতেমার রূপ ধরিয়া যখন দেখিল যে, আপনার কার্য্যোদ্ধারের উপায় হইয়াছে, তখন গলা টিপিয়া ঐ বৃদ্ধা ধার্ম্মিকাকে মারিয়া ফেলিল, এবং ঐ কুটীরের পাশের এক পুকুরে তাঁহার মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া বাকি রাত্রি ঐখানেই কাটাইল। পরদিন সকালে ফতেমা কুটীর হইতে যেভাবে বাহিরে যাইতেন, সেও সেই ভাবে বাহির হইল। তাহাকে দেখিয়া কাহারও মনে কোনো সন্দেহ হইল না। সকলেই তাহাকে ফতেমা বলিয়া সমাদর করিতে লাগিল। মায়াবী আগেই আলাদিনের অট্টালিকা দেখিয়া রাখিয়াছিল। এখন ফতেমার বেশে সেইদিকে চলিল। আলাদিনের বাড়ীর কাছে আসিতেই সেখানে অনেক লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভিড়ের জন্য বেশ একটা মহা-কোলাহল উঠিল। রাজকুমারী বেদ্রোলবদোর ভিড়ের কারণ জানিবার জন্য একজন দাসীকে জানালায় মুখ দিয়া দেখিতে হুকুম করিলেন। দাসী দেখিবামাত্র বলিল, "ঠাকুরাণী! পুণ্যবতী ফতেমা এখানে এসেছেন, তাঁহার হাতের গুণে মাথার অসুখ সেরে যায়। এইজন্যে মাথার অসুখওয়ালা লোকেরা তাঁহার চারিদিকে জড়ো হয়েছে।"

রাজকন্যা অনেক দিন হইতে ঐ ধার্ম্মিকার গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কখনো তাঁহাকে চোখে দেখেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিবেন এই ইচ্ছায় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন নপুংসককে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র খোজা ঐ ছদ্মবেশী ফতেমাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে রাজকন্যার কাছে লইয়া আসিল। মায়াবী আসিয়াই রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং তাহার পরম প্রিয়পাত্র

হইবার ইচ্ছায় কাল্পনিক ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। রাজকন্যা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! আপনাকে আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে, আপনাকে কিছুদিন আমার কাছে থেকে আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হবে, তা হলে আমি আপনার দৃষ্টান্ত অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারব।" এই-কথা শুনিয়া মায়াবী অনেক তর্ক-বিতর্কের পর রাজকন্যার প্রার্থনায় রাজি হইল। কারণ সে মনে মনে ভাবিয়া দেখিল যে, ঐ বাড়ীতে থাকিতে পারিলেই অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে।

এদিকে রাজকন্যা তাহাকে একটি নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আপনি এইখানে বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করবেন।" রাজকন্যা তাহার সঙ্গে একত্রে খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মায়াবী ধরা পড়িবার ভয়ে অসম্মত হইয়া বলিল, "আমি শুদ্ধ প্রাণরক্ষার জন্য যথাসময়ে যৎসামান্য খাই, আমার রাজভোগে কিছুমাত্র দরকার নেই।" তখন দুজনে আলাদা জায়গাতেই খাইল। খাইবার পর দুজনে আবার দেখা হইলে রাজকন্যা ছদ্মবেশী ফতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! বল দেখি এই ঘরের কেমন শোভা হয়েছে?" এই-কথা শুনিয়া মায়াবী ঘরের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ ঘরের সাজ যে অতুলনীয়, তা পৃথিবীর সমস্ত লোকেই স্বীকার করবে। কিন্তু একটি জিনিষের অভাব আছে।" রাজকন্যা বলিলেন, "মা! সে জিনিষটি কি, আমায় বলুন।" মায়াবী বলিল, "এই গোল বৈঠকখানার ভিতরে ঠিক মাঝখানে যদি রক পাখীর একটি ডিম ঝোলান থাকিত, তা হলে এই অট্টালিকা যে সসাগরা বসুন্ধরার মধ্যে অদ্বিতীয় ও অত্যাশ্চর্য্য বলে পরিচিত হত, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" রাজকুমারী বলিলেন, "সে ডিম কোথায় পাওয়া যেতে পারে?" মায়াবী বলিল, "যে পাখীর ডিমের কথা বললাম, সে পাখী ককেসস পাহাড়ের উপরে থাকে। যে এই বাড়ী তৈরী করেছে সে অনায়াসেই এই ডিম এনে দিতে পারে।" এই বলিয়া ফতেমারূপী মায়াবী তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে আলাদিন মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াই রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন এবং তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী তাহার উত্তরে বলিলেন, 'হে নাথ! আমি এতকাল পর্য্যন্ত জানতাম যে, আমাদের এ বাড়ী পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এখানে একটি জিনিষের অভাব আছে। এই গোল ঘরের উপরে ঠিক মাঝখানে রক পাখীর একটি ডিম ঝুলানো থাকলে এর যে শোভা হত, তা বলা যায় না।" আলাদিন বলিলেন, "প্রেয়সী! তোমাকে সুখী করবার জন্যে আমি কি না করতে পারি? তুমি এখনি দেখতে পাবে তোমার সখের জিনিষটা আনা হয়েছে।" এই বলিয়া একটি নির্জ্জন ঘরে গিয়া নিজের বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে সেই প্রদীপটি বাহির করিয়া ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি সেই ভীষণ-মূর্ত্তি দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিন দৈত্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "দৈত্য! তোমাকে রক পাখীর ডিম এনে আমার এই গোল বৈঠকখানার ঠিক মাঝখানে ঝুলিয়ে

দিতে হবে।" আলাদিনের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্য এমনি ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ করিল যে, তাহাতে সমস্ত অট্টালিকা কাঁপিয়া উঠিল। তখন আলাদিন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোনো কথা কহিতে পারিলেন না।

দৈত্য গম্ভীরস্বরে বলিল, "রে পাপিষ্ঠ! আমি এবং আমার সঙ্গীরা তোর জন্যে কি না করেছি? কিন্তু তুই এমনি অকৃতজ্ঞ যে, আমার প্রভুকে এখানে এনে ঝুলিয়ে রাখতে বলিস্। তোর এই স্পর্দ্ধার জন্যে এই দণ্ডেই তোকে আর তোর স্ত্রীকে অট্টালিকাসমেত ভস্ম করে ফেলতাম, কিন্তু তুই নিজের বুদ্ধিতে এ প্রস্তাব করিস্‌নি, তাই তোকে এবার ক্ষমা করলাম। তুই তোর যে পরম শত্রু মায়াবীকে মেরে ফেলেছিস তার ছোটভাই পুণ্যবতী ফতেমার বেশ ধরে এই বাড়ীতে রয়েছে। সেই দুরাত্মাই তোকে মারবার ইচ্ছায় তোর স্ত্রীকে এই কুমন্ত্রণা দিয়েছে। তাই বলে রাখছি, তুই সাবধানে থাকবি।" এই বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

আলাদিন আগেই শুনিয়াছিলেন যে, ঐ ধার্ম্মিকা মাথার অসুখ সারাইতে পারেন। এখন দৈত্যের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজকন্যার ঘরে আসিলেন, এবং তাঁহাকে কোনো কথা না বলিয়া কেবল কাল্পনিক মাথা ধরার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা স্বামীর রোগ শান্তির জন্য ছদ্মবেশী ফতেমাকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিলেন।

মায়াবী আসিবামাত্র আলাদিন বলিলেন, "মা! আমি মাথার বেদনায় বড় কাতর হয়েছি। অতএব এ সময়ে যে আপনার দর্শন পেলাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই যন্ত্রণার উপশম করে দিন।" ইহা শুনিয়া মায়াবী খুসী হইয়া নিজের কাপড়ের ভিতরে লুকানো খড়্গ মুঠি করিয়া ধরিয়া আলাদিনের কাছে আসিবার উপক্রম করিল। এমন সময় আলাদিন তাহার হাত ধরিয়া নিজের ছোরা দিয়া তাহার বুকে এক ঘা দিতেই সে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

রাজকুমারী বলিলেন, "ওগো! তুমি কি করলে? পুণ্যবতীকে হত্যা করলে!" আলাদিন বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি ফতেমাকে হত্যা করিনি, দুরাত্মা মায়াবীকে মারলাম।" এই বলিয়া তাহার কাপড় তুলিয়া অস্ত্র দেখাইয়া আবার বলিলেন, "এই পাপিষ্ঠ সেই মায়াবীর ছোট ভাই, আমাকে মারবার চেষ্টায় ফতেমার বেশ ধরে এখানে এসেছিল।"

তাহার পর আলাদিন যেমন করিয়া এই-সমস্ত বিষয় জানিয়াছিলেন সব বলিয়া মায়াবীর মৃতদেহ বাহিরে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। এমনি করিয়া আলাদিন দুই মায়াবীর হাত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে সুখস্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিছুকালের পর চীনেশ্বরের মৃত্যু হইল। রাজার আর সন্তানসন্ততি না থাকাতে রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইলেন। পরে রাজনন্দিনী নিজের ক্ষমতা প্রিয় স্বামী আলাদিনের হাতে সঁপিয়া দিয়া দুজনে একসঙ্গে রাজকার্য্য করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। শেষে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই বংশাবলী চীনরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন

বাগদাদাধীশ্বর হারুন-অল-রশীদ ভূপতির
ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ

মানুষের মনে কখন কখন এমন বিমর্ষভাবের আবির্ভাব হয় যে, সে-বিষয়ে অন্যে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিতে পারা দূরে থাক্, নিজেই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না।

একদিন রাজা হারুন-অল-রশীদ ঐ-রকম বিষণ্ণ হইয়া ম্লানমুখে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী জাফর তাঁহার কাছে আসিলেন। কিন্তু রাজা তখন এমন বিমর্ষ-ভাবে ছিলেন যে, মন্ত্রীর দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই আবার আগের মত বসিয়া থাকিলেন, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহিলেন না। তাহা দেখিয়া মন্ত্রী বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আপনার এমন বিষণ্ণ মুখ কেন? আপনার ত এমন ভাব কখনো দেখিনি!" রাজা বলিলেন, মন্ত্রিবর! আমি বাস্তবিকই অন্যমনস্ক আছি বটে, কিন্তু কিজন্য যে অন্যমনস্ক আছি, তাহার কারণ কিছুই বলতে পারি না। এখন যাতে আমার মন প্রফুল্ল হয়, তার কোনো উপায় বলতে পার?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আপনার স্থাপিত নিয়মাবলী যে কিভাবে রাজ্যে মানা হচ্ছে, তা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে আপনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে যাবার জন্যে যে দিন স্থির করে রেখেছিলেন আজই সেই দিন, অতএব চলুন নগর ভ্রমণ করা যাক, তাতে আপনার এই বিমর্ষভাবেরও অনেক উপশম হবার সম্ভাবনা।" রাজা বলিলেন, "আমি একথা ভুলে গিয়াছিলাম, এখন মনে করিয়ে দিলে, ভালই হল। যাও শীঘ্র তোমার বেশ পরিবর্ত্তন করে এস, আমিও বণিকের পোষাক পরছি।"

তাহার পর রাজা এবং মন্ত্রী দুজনেই বিদেশী ব্যবসায়ীর বেশে গুপ্ত দরজা দিয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইলেন, এবং শহরের বাহিরটা প্রদক্ষিণ করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীর ধারে ধারে কিছুদূর গেলেন। কিন্তু কোনোখানেই অনিয়ম চোখে পড়িল না। তখন তাঁহারা একখানি নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়া শহর প্রদক্ষিণ করিয়া নদী পারাপারের জন্য যে সেতু ছিল, তাহার উপর দিয়া আবার নগরে ঢুকিতেছেন, এমন সময় ঐ সেতুর কাছে এক বুড়ো অন্ধ তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাওয়াতে, রাজা তাহার হাতে একটি মোহর দিলেন। অন্ধ মোহর পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজার হাত ধরিয়া বলিল, "হে দানশীল পুরুষ! তুমি যে হও না কেন, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমার কানের গোড়ায় একটি ঘুঁষি মারো।" এই বলিয়া রাজা তাহাকে মারিবেন মনে করিয়া তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু পাছে তিনি তাহার প্রার্থনা অনুসারে কাজ না করিয়া চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় শক্ত করিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া থাকিল। রাজা ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হে অন্ধ! আমি তোমার প্রার্থনা অনুসারে কাজ করতে পারি না, কারণ তা হলে আমার দানের কোনো ফল হবে না।" এই-কথা বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলে অন্ধ আরও

শক্ত করিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি মিনতি করছি, আমাকে খুসী করুন, না হলে আপনার দান ফিরিয়ে নিন। আমি পরমেশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করেছি, মার না খেয়ে কারুর দান গ্রহণ করব না।" তখন রাজা কি করেন, অগত্যা তাকে একটি সামান্ত ঘুষি মারিলেন। অন্ধও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাড়িয়া দিল।

রাজা কিছুদূর চলিয়া গিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন "মন্ত্রিবর! এই অন্ধ যে মার না খেয়ে দান গ্রহণ করে না, নিশ্চয় এর কোনো বিশেষ কারণ আছে। অতএব তুমি গিয়ে ওকে আমার পরিচয় দিয়ে বল, ও যেন কাল সন্ধ্যায় রাজসভায় আসে, আমি ওর বিশেষ বিবরণ শুনতে চাই।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী ঐ ভিক্ষুকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে কিছু টাকা দিয়া তাহার কানে এক ঘুষি মারিলেন এবং তাহাকে রাজার আজ্ঞা জানাইয়া রাজার কাছে চলিয়া গেলেন।

রাজা ও মন্ত্রী নগরে আবার ঢুকিয়া দেখিলেন, এক জায়গায় লোকারণ্য হইয়াছে এবং সেখানে একজন যুবা পুরুষ একটি ঘোটকীকে এমন নির্দ্দয়ভাবে মারিতেছে যে, তাহার শরীর

একজন যুবা পুরুষ একটি ঘোটকীকে নির্দ্দয়ভাবে মারিতেছে—

হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত বাহির হইতেছে। রাজা এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সকল লোককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ ঠিক করিতে পারিল না। "ঐ যুবা প্রতিদিন ঐখানে আসিয়া উহাকে নির্দ্দয়ভাবে মারে" সকলেই

কেবল এইমাত্র বলিল। রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! অন্ধকে কাল যে সময়ে রাজসভায় যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঐ যুবাকেও ঠিক সেই সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হতে বলে এস।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেই যুবার কাছে গিয়া রাজার আজ্ঞা জানাইলেন।

রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে যাইতে যাইতে রাস্তার ধারে নূতন একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি কি বলতে পার এ বাড়ী কার?" মন্ত্রীও আগে কখনও ঐ অট্টালিকা দেখেন নাই; সুতরাং রাজার কথার কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন রাজা সেই পাড়ার একটি লোককে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে বলিল, "মহাশয়! এই বাড়ীওয়ালার নাম খাজা হোসেন হোব্বাল। সে দড়ি তৈরী করত বলে তার হোব্বাল এই উপাধি হয়েছে। আগে খাজা হোসেন অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, আর দড়ি বেচে অতি কষ্টে খাওয়া-পরা চালাত। কিন্তু কি করে যে, হঠাৎ অতুল ধনের অধিকারী হয়ে এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা তৈরী করেছে, তা বলতে পারি না।" ইহা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! খাজা হোসেন হোব্বালকেও কাল সন্ধ্যার সময় রাজসভায় উপস্থিত হতে বলে এস।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশ পালন করিলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় রাজা বৈকালিক উপাসনাদি সমাপ্ত করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী সেই তিনটি লোককে রাজার কাছে হাজির করিলেন। লোক তিনটি রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, রাজা প্রথমে অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধ! তোমার নাম কি?" অন্ধ বলিল, "আমার নাম বাবা আবদুল্লা।" তখন রাজা বলিলেন, "বাবা আবদুল্লা! কাল তোমার ভিক্ষার নিয়ম দেখে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য লেগেছে। আমি তোমার কথা শুনে কখনই মারতাম না, কেবল তোমার ঐ-রকম প্রার্থনা করবার কোনো বিশেষ কারণ থাকতে পারে, এই মনে করে তাতে রাজি হয়েছিলাম। তুমি যে পথের মধ্যে ভদ্রলোকদের এইভাবে বিরক্ত কর, এ ত ভাল নয়। অতএব তোমাকে শাসন করা উচিত। কিন্তু কি-জন্যে তুমি এমন করে মার খেতে চাও, আগে তার কারণ জানাও উচিত। অতএব কোনো কথা গোপন না করে আমাকে সমস্ত বিবরণ বলো, দেখো, যেন সত্য বই মিথ্যা বলো না, তা হলে দণ্ডভোগ করতে হবে।"

বাবা আবদুল্লা রাজার কথায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "হে ধর্ম্মাবতার! আমি কাল আপনার প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি তাতে আমার অত্যন্ত অপরাধ হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কাজ দেখে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করে থাকেন, কিন্তু আমি যে-রকম দুষ্কর্ম্ম করেছি তাতে এই পৃথিবীর সমস্ত লোক আমাকে মারলেও আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মহাশয়! আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমার কুকর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করছি, তাতে আমার সেই কাজ সঙ্গত কি অসঙ্গত বিবেচনা করতে পারবেন।"

বাবা আবদুল্লার আত্মবিবরণ

বাবা আবদুল্লা বলিল, "মহারাজ! আমি বাগদাদনগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামাতা পরলোকে যাইবার সময় আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যান। যৌবন অবস্থায় হাতে টাকা হইলে, সচরাচর লোকে যে-রকম অপব্যয় করিয়া থাকে, আমি তাহা না করিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া ক্রমশঃ ঐ ধন বাড়াইয়া তাহা দিয়া আশীটি উট কিনিলাম, এবং বণিক্‌দের ঐ উট ভাড়া দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। এমনি করিয়া কিছুকাল কাটিবার পর, একদিন ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যদ্রব্যাদি বালশোরনগরে পঁহুছাইয়া দিয়া নিজের উটগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে এক ঘেসোমাঠে ঐ উটগুলিকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া এক গাছতলায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য আমার পাশে আসিয়া বসিল। পরস্পর আলাপ-পরিচয়াদি করিবার পর দুজনে নিজের নিজের খাবার বাহির করিয়া একত্রে খাইলাম। তাহার পর নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে সন্ন্যাসী বলিল, "ভাই! এইখান থেকে অল্প দূরে এক জায়গায় এত অর্থ আছে যে, তোমার আশিটা উট দিয়ে কেবল সোণা আর বহুমূল্য রত্নাদি বোঝাই করে আনলেও, তার কিছুমাত্র কমেছে মনে হবে না।" এই সংবাদ শুনিয়া আমি যেমন বিস্মিত হইলাম, ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া তেমনি মহানন্দ বোধ করিলাম এবং সন্ন্যাসীর কথায় অবিশ্বাস না করিয়া বলিলাম, "হে যোগিবর, তোমরা ত পার্থিব এই অর্থকে অতি সামান্য মনে করে থাকো। অতএব যদি আমাকে ঐ জায়গা দেখিয়ে দাও, তা হলে আমার সমস্ত উট রত্নে বোঝাই করে আনি এবং কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য তোমাকে তার ভিতর থেকে এক উট দিই।" মোট কথা তখন আমার মনের মধ্যে ধনলোভ এমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, উনআশি উট ধন পাইয়াও যে এক উট-অর্থ তাহাকে দিতে হইবে, সেজন্য আমার বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক সন্ন্যাসী আমার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া কেবল এইমাত্র বলিল, "ভাই! আমি তোমাকে এত অর্থ দেখিয়ে দেবো, আর তুমি আমাকে কেবল একটি উট-ধন দেবে, এটা কি সঙ্গত? আমি এ কথা কারও কাছে ব্যক্ত না করে সমস্ত ধন নিজেই নিতে পারতাম। কিন্তু তোমার উপকার করবার জন্যে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, তাই তোমাকে ধনের জায়গা দেখাতে রাজি আছি। এখন আমি যা বলি শোন। তোমার আশিটা উট আছে, চল দুজনে গিয়ে সমস্ত উট বোঝাই করি, তার পর এদের মধ্যে থেকে চল্লিশটা আমাকে দিও আর বাকি চল্লিশটা তোমার থাকবে, তা হলে কখনো অন্যায় হবে না। কারণ তোমাকে যেমন চল্লিশটা উট দিতে হচ্ছে তেমনি তার বদলে তুমি যে অর্থ লাভ করবে, তা দিয়ে হাজার হাজার উট কিনতে পারবে।"

আমি তখন ভাবিলাম, "সন্ন্যাসী যা বলেছে তা অসঙ্গত নয়। কিন্তু তাকে চল্লিশটা

উট দিতে স্বীকার করাও কঠিন। আবার উটের মায়া না ছাড়লেও অনেক ধনদৌলত বাদ পড়ে।" মনে মনে এই-সমস্ত আন্দোলন করিয়া অগত্যা যোগীর কথাতেই সম্মত হইলাম এবং উটগুলি লইয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চলিলাম। কিছুদূর যাইবার পর আমরা দুটি উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐখানের পথ এমনি সঙ্কীর্ণ যে, দুটি উট পাশাপাশি তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারিল না। সুতরাং একে একে উটগুলিকে তাহার মধ্যে ঢুকাইতে হইল। পাহাড় দুটির মাঝের চওড়া জায়গাটিতে উপস্থিত হইলে, সন্ন্যাসী বলিল, "এইখানে ধন আছে, উটগুলিকে এইখানেই বসাও, কেননা তা হলে বোঝাই করবার খুব সুবিধা হবে।" এই-কথা বলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো কাঠ জড়ো করিয়া চক্‌মকি হইতে আগুন বাহির করিয়া জ্বালিয়া দিল। তাহার পর সেই জ্বলন্ত আগুনে কতকগুলা ধূনা ফেলিয়া দিয়া কয়েকটা অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তখন ধোঁয়া উঠিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার খানিক পরেই দেখা গেল, যে. যেখানে আগে কিছুই ছিল না, সেইখানে কবাট-দেওয়া একটা দরজা রহিয়াছে। দরজা খুলিয়া তাহার ভিতর সোনা দিয়া গড়া ও নানা-রত্নে পরিপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখা গেল। আমি ঐ পুরীর সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য বা এই-সমস্ত ধন কোথা হইতে আসিল সে-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া লোভে পড়িয়া কেবল সোনার স্তূপ হইতে সোনা তুলিয়া নিজের থলিয়া পূর্ণ করিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসীও ঐরকম করিতে থাকিল, কিন্তু সে সোনা না লইয়া কেবল বহুমূল্য রত্নাদি লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমিও সোনা ফেলিয়া রত্নাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এমনি করিয়া আমাদের সমস্ত থলিয়া পরিপূর্ণ হইলে পর, আমি উটগুলি বোঝাই করিয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সন্ন্যাসী আবার ঐ রত্নাগারে ঢুকিয়া একটি খুব ভাল কাঠের তৈরী কৌটা আনিল, এবং তাহার ভিতর যে একরকম তেল ছিল, তাহা আমাকে দেখাইয়া ঐ কৌটাটি নিজের বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর যে উপায়ে ঐ রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলা হইয়াছিল, দরজা বন্ধ করিবার জন্য সেই-রকম মন্ত্র পড়াতে পাহাড়ের গায়ের দরজা আবার মিলাইয়া গেল, ধনস্থানের আর কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। তখন আমরা উটগুলি দুই ভাগ করিয়া নিজের নিজের উট লইয়া কিছুদূর একসঙ্গে আসিতে লাগিলাম। তাহার পর যেখান হইতে আমি বাগ্দাদে আসিব, এবং সন্ন্যাসী বালশোরায় যাত্রা করিবে, সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র আমি যোগীকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "ভাই! তোমার কৃপাতেই এই অতুল ঐশ্বর্য্য পেলাম। অতএব আমি যাবজ্জীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকলাম।" এমনি করিয়া তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত মনে সেখান হইতে বিদায় হইলাম।

কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই আমার মনের মধ্যে এমনই হিংসার উদয় হইল যে, চল্লিশ

উট-গুলি যোগীকে দিতে হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, "সন্ন্যাসী আমাকে যে ধনভাণ্ডার দেখিয়ে আনলে, সেটা ত ওর বললেই হয়, সে যখন খুসী মনে করলেই ঐ রত্নাগারের সমস্ত ধন আত্মসাৎ করতে পারে, তখন ওকে এত অর্থ নিয়ে যেতে দেওয়া ভাল হয়নি।" ইহা ভাবিয়া আমি নিজের উটগুলিকে থামাইয়া সন্ন্যাসীকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, "ওহে ভাই একবার দাঁড়াও, আমার কোনো বিশেষ কথা আছে।" সন্ন্যাসী আমার কথা শুনিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "ওহে ভাই! আমার একটা কথা মনে হল, তাই তোমাকে বলতে এলাম, তুমি উদাসীন, কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় জীবন-যাপন করাই তোমার প্রধান কাজ, তুমি এত অর্থ নিয়ে কি করবে? বিশেষতঃ এতগুলো উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। অতএব আমার পরামর্শ এই যে, দশটি উট আমাকে দিয়ে তুমি বাকি ত্রিশটি নিয়ে যাও।" ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া কহিল, "ভাল কথাই বলেছ, আমিও ঐ বিষয় মনে মনে ভাবছিলাম। তা তোমার যে দশটি নিতে ইচ্ছা হয় নেও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা।" এই কথায় আমি দশটি উট লইয়া নিজের উটের দলে মিলাইয়া দিয়া বাগদাদের পথে যাত্রা করিলাম।

সন্ন্যাসী যে আমাকে এত সহজে দশটি উট দিবে আমি তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু এখন তাহার উদারতা দেখিয়া আমার লোভ এমনি বাড়িয়া উঠিল যে, আবার তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "ভাই! তোমার উট চালানো কখনো অভ্যাস নেই, সে-জন্যে আমার ভাবনা হচ্ছে, তুমি কি করে ত্রিশটা উট নিয়ে যাবে। তাই কেবল তোমার কষ্ট নিবারণের জন্যেই বলছি, আমাকে আরও দশটা উট দাও।" যোগী তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনায় অম্লানবদনে রাজি হইয়া আমাকে আরো দশটি উট দিল। তাহাতে আমার ষাটটি হইল এবং তাহার কুড়িটি মাত্র রহিল। ঐ ষাটটি উটে এত ধন ছিল যে, রাজাধিরাজরাও তাহা কখন চোখে দেখেন নাই। কিন্তু তখন আমার ধনতৃষ্ণা বেজায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং আমি যতই ধন পাই না কেন, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না। আবার আমি আর দশটি উট পাইবার ইচ্ছায় সাধ্যানুসারে সন্ন্যাসীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। এবারেও সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনায় রাজি হইল। তখন যোগীর দশটা মাত্র উট বাকি রহিল। আমি ঐ দশটি উটও লইবার ইচ্ছায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নানারকম স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলাম যোগী আবার আমার প্রার্থনায় রাজি হইয়া বলিল, "ভাল ভাই! তুমি এগুলোও নিয়ে যাও। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন টাকা দেন তেমনি তিনি আবার তা নিতেও পারেন, সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রেখে সদ্ব্যবহার কোরো।"

সন্ন্যাসী এই-কথা বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমি এমনি পাপিষ্ঠ যে,

সন্ন্যাসীর এই-রকম সৎপরামর্শেও আমার চৈতন্যোদয় হইল না। আমি আশিটা উটের পিঠে বোঝাই-করা অজস্র ধনের অধিপতি হইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া সন্ন্যাসী আমাকে যে তৈলাক্ত জিনিষে পরিপূর্ণ কৌটাটি দেখাইয়া বহু যত্নে কাপড়ের মধ্যে রাখিয়াছিল, সেই কৌটাটিকে সকলের চেয়ে মূল্যবান মনে করিয়া তাহাও আত্মসাৎ করিবার মতলবে তাহার কাছে গিয়া বলিলাম, "ওহে যোগিবর! আমার মনে হল তুমি গহ্বর থেকে একটি ছোট কাঠের কৌটা এনেছিলে, তাতে এক-রকম তেলের মত জিনিষ আছে, বোধ হয় সেটা কোনো ওষুধ হবে। তুমি যখন পৃথিবীর সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করেছ, তখন তাতে আর তোমার দরকার কি? তাই বলছি, যদি ঐ কৌটাটি আমাকে দাও, তা হলে আমি তোমার কাছে চিরবাধিত হই।" সন্ন্যাসী যদিও প্রথমে ঐ কৌটাটি দিতে রাজী ছিল না, তবু আমার অত আগ্রহ দেখিয়া সে অগত্যা বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে কৌটাটি বাহির করিয়া আমাকে দিল। আমি ঐ কৌটা হাতে করিয়া আবার তাহাকে বিনীতভাবে বলিলাম, "হে যোগীন্দ্র! যদি আমার প্রতি এত অনুগ্রহই করলে, তবে এই তেলের কি গুণ তাও আমাকে বলে দাও।" সন্ন্যাসী বলিল, "এর গুণ অতি আশ্চর্য্য। যদি বাঁ চোখের চারিদিকে এটা লাগিয়ে দাও, তা হলে পৃথিবীর যেখানে যত ধন আছে সমস্ত ধন দেখতে পাবে, কিন্তু ডান চোখে দিলেই অন্ধ হবে।"

আমি ঐ জিনিষের আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সন্ন্যাসীকে বলিলাম, "ভাই! তুমি এই জিনিষ আমার বাঁ চোখে মাখিয়ে দাও, তা হলে এই পৃথিবীর সমস্ত ধন দেখতে পাওয়া যায় কি না দেখা যাবে।" এই বলিয়া আমি বাঁ চোখ বুজিতেই যোগী ঐ তেলতেলে জিনিস তাহার চারিদিকে মাখাইয়া দিল। তখন আমি ডান চোখ বুজিয়া বাঁ চোখ খুলিবামাত্র এই পৃথিবীর সমস্ত মণিমাণিক্য দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু অনবরত এক চোখ বন্ধ করিয়া রাখা বড় কষ্টকর মনে হওয়াতে আবার সন্ন্যাসীকে বলিলাম, "ভাই! তুমি ঐ জিনিষ আমার ডান চোখেও একটু মাখিয়ে দাও।" সন্ন্যাসী বলিল, "আমি তা দিতে রাজী আছি, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি তা হলে তুমি একবারে অন্ধ হয়ে যাবে।" আমি সন্ন্যাসীর কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া ভাবিলাম, ঐ জিনিসের বুঝি অন্য কোনো বিশেষ গুণ আছে, সন্ন্যাসী সেটা গোপন করিয়া রাখিবার জন্য এই-রকম কথা বলিতেছে। এই ভাবিয়া আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "ভাই! আমাকে কেন প্রতারণা কর? একই জিনিষের এমন বিপরীত গুণ কখনো থাকতে পারে না।" এই শুনিয়া যোগী বলিল, "আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বলছি, এর সত্যই এই-রকম গুণ, তুমি কখনও আমার কথায় অবিশ্বাস করো না।" কিন্তু তার কথায় আমার কোনোমতেই বিশ্বাস হইল না। কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন ঐ তেল বাঁ চোখে দেওয়াতে পৃথিবীর ধন দেখতে পেলাম, তখন ডান চোখে দিলে হয়ত ঐ-সমস্ত ধন আত্মসাৎ করবার

ক্ষমতা হবে।" এই ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে ঐ জিনিষ আমার ডান চোখে মাখাইয়া দিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলাম। সন্ন্যাসী বলিল, "ভাই! আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করেছি, এখন যদি এই কাজ করি, তা হলে আমার সকল কর্ম্ম বিফল হবে। কেননা তুমি

সন্ন্যাসীকে ঐ জিনিস আমার ডান চোখে মাখাইয়া দিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলাম

ভেবে দেখ, চক্ষুরত্নে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় কি আছে?" আমি বলিলাম, "ভাই, তোমার কাছে আমি যখন যা চেয়েছি, তুমি তখনি তাই দিয়েছ। এখন কেন আর সামান্য বিষয়ের জন্যে আমাকে অসন্তুষ্ট কর। এতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তার জন্যে তোমাকে দোষী হতে হবে না। আমি আপনার উপরেই সমস্ত দোষারোপ করব।" সন্ন্যাসী কি আর করে, অগত্যা আমার কথায় রাজী হইয়া ডান চোখে ঐ জিনিষ লাগাইয়া দিল। আমি চোখ মেলিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলাম না, কেবল চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "হে যোগিবর, তুমি যা বলেছিলে তাই ঠিক হল। রে ধনলোভ! রে দুরাশা! তোরাই আমাকে এমন দুঃখে ফেললি।"

এমনিভাবে অনেক বিলাপ করিয়া যোগীকে আবার সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "হে ভাই! তোমার অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণ আছে যদি তার মধ্যে এমন কোনো গুণ থাকে যা দিয়ে আমাকে আবার চক্ষুদান করতে পার, তবে তার প্রয়োগ কর।" তখন

সন্ন্যাসী বলিল, "ওরে হতভাগ্য পাপিষ্ঠ! তুই যদি আগে আমার পরামর্শ শুনতিস্ তা হলে তোর এ দুর্দশা ঘটবে কেন? তুই যেমন লোক, তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছিস্। এখন পরমেশ্বরকে স্মরণ কর; তিনি যদি চক্ষুদান করেন, তবেই চোখ পাবি, নইলে আমার কোনো সাধ্য নাই। তিনি তোকে যথেষ্ট ধন দিয়েছিলেন, কিন্তু তুই নিতান্ত অপাত্র, তাই তোর হাত থেকে আবার নিয়ে যারা তোর মত অকৃতজ্ঞ নয় তাদের দেবার জন্যে আমার হাতে সমর্পণ করলেন।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী আমার সেই আশিটি উট লইয়া বালশোরার পথে যাত্রা করিল। আমি শোকে অধীর হইয়া কাছের কোনো পান্থনিবাসে আমাকে পহুঁছিয়া দিবার জন্য তাহার নিকটে বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিলাম, কিন্তু সে তাহাতে কানও না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আমি এই-রকম করিয়া অন্ধ ও সর্বস্বান্ত হইয়া সেইখানে বসিয়া কাঁদিতেছি, এমন সময় বালশোরা হইতে একদল যাত্রী বাগদাদের দিকে আসিতেছিল, তাহারাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এইখানে রাখিয়া গেল। সেই হইতে আমি ভিক্ষার সাহায্যে প্রাণধারণ করি। কিন্তু আমার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি যে, মার না খাইয়া কাহারও দান গ্রহণ করিব না। এইজন্য কাল আপনার প্রতি যে অসঙ্গত আচরণ করিয়াছি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

অন্ধের কাহিনী শুনিয়া রাজা বলিলেন, "বাবা আবদুল্লা, তোমার পাপ অত্যন্ত গুরুতর বটে। কিন্তু তুমি যখন সেটা দুষ্কর্ম বলে স্বীকার করেছ, তখন জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন। অতএব তাঁর কাছে দিবানিশি ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাকে আর ভিক্ষা করে জীবন-ধারণ করতে হবে না। তুমি প্রতিদিন রাজসংসার থেকে চারিটি করে মোহর পাবে।" এই-কথা শুনিয়া বাবা আবদুল্লা রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

তাহার পর রাজা যে-যুবাকে ঘোড়ার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে কাছে ডাকাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আমার নাম সিদি নোমান।" তখন রাজা বলিলেন, "সিদি নোমান! তুমি কাল তোমার ঘোড়ার উপর যে-রকম নির্দয় ব্যবহার করেছিলে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমি লোকমুখে শুনেছি যে, তুমি ওর সঙ্গে ঐরকম দুর্ব্যবহার করে থাক। অতএব এর কারণ কি আমার কাছে খুলে বলো।" এই-কথা শুনিয়া সিদি নোমান রাজাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিল, "হে পুণ্যশ্লোক! আমি ঘোড়ার উপর ঐ-রকম নির্দয় ব্যবহার করাতে আপনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। কিন্তু এর কোনো বিশেষ কারণ আছে, তার কথা বলছি শুনুন।

সিদি নোমানের কথিত কাহিনী

মহারাজ! আমি যদিও কোনো বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই, তবু মা বাবার মৃত্যুর পর আমি যে ধনসম্পত্তি পাইয়াছিলাম, তাই দিয়াই এক-রকম ভদ্রলোকের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবার ইচ্ছায় দেশীয় রীতি অনুসারে আমিনা নামে এক সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম। বিবাহের পরদিন ভোজের আয়োজন হইলে নববধূর সঙ্গে একত্রে খাইতে বসিলাম। আমি রীতিমত পেট ভরিয়া খাইতে লাগিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী তাহা না করিয়া পকেট হইতে একটা কানখুস্কী বাহির করিয়া তাই দিয়া এক-একটি করিয়া ভাত মুখে তুলিতে আরম্ভ করিল। তাই দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমিনা! তুমি বাপের বাড়ীতেও কি এমনি করে খেতে, না আমার সংসার করবার ইচ্ছায় এত অল্প করে খাচ্ছ? আমার যথেষ্ট ধন আছে, অতএব এ-রকম করে আমার সংসারে প্রয়োজন নেই, আমি যেমন খাচ্ছি তুমিও তেমনি খাও।" সে আমার কথায় কোনো উত্তর দিল না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি যদিও তখন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, তবু সে লজ্জায় পড়িয়া ঐ-রকম ব্যবহার করিল ভাবিয়া আর কোনো কথা বলিলাম না, এবং অসন্তোষের কোনো চিহ্নও প্রকাশ করিলাম না।

সে রোজই ঐ-রকম কম খাইতে লাগিল। তাহাতে আমি মনে করিলাম, "অনাহারে জীবনধারণ করা কখনই সম্ভব নয়। অতএব ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম আছে।" এই ভাবিয়া মনের কথা গোপন রাখিয়া সর্ব্বদা ঐ খোঁজে থাকিতাম। একদিন রাত্রে দুজনে একত্রে শুইয়া আছি ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী আমাকে ঘুমন্ত মনে করিয়া নিঃশব্দে পা টিপিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল এবং তার পরেই উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লুকাইয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলাম। আমার বাড়ীর কাছেই একটি গোরস্থান ছিল। আমিনা তাহার ভিতর ঢুকিয়া পিশাচের সঙ্গে জুটিয়া কবর হইতে একটা মড়া বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। খাওয়ার পর যাহা বাকি ছিল, তাহা আবার মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিল। আমি দেওয়ালের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া চাঁদের আলোয় এই-সমস্ত দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া কাঁপিতে লাগিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া আগের মতন শুইয়া থাকিলাম। তাহার খানিক পরেই আমিনা আসিয়া কাপড় বদলাইয়া আবার আমার পাশে শুইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন ভোরে আমি বিছানা হইতে উঠিয়া সকালের উপাসনা প্রভৃতি শেষ করিয়া

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বাড়ীতে আসিয়া খাইতে বসিলাম। আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে খাইতে বসিয়া আগের মত খাইতে লাগিল। আমি খুব চটিয়া উঠিয়া বলিলাম, "দেখ আমিনা, বিবাহের পরদিন থেকে তোমার খাওয়ার রকম দেখে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি একদিনও ভাল করে মাংস খাওনি। এর জন্যে আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে কিছুই বলিনি। কিন্তু এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বল দেখি, মড়ার মাংসের চেয়ে কি এ সমস্ত মাংস ভাল নয়?" আমার মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র আমি যে রাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ফেলিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমিনা রাগিয়া আগুন হইয়া সামনের পাত্র হইতে খানিকটা জল তুলিয়া লইয়া বলিল, "ওরে হতভাগা, তুই কুকুর হয়ে গোপনে দেখার ফল ভোগ কর।" এই-কথা উচ্চারণ করিবামাত্র আমি কুকুর হইলাম। আমাকে এই ভয়ানক দণ্ড দিয়াও তাহার রাগের শান্তি হইল না। তাহার পরে প্রতিদিনই আমাকে এমনি সাংঘাতিকভাবে মারিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাতে কেন যে আমার মৃত্যু হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। আমাকে মারিয়া ফেলে, এই তাহার অভিসন্ধি ছিল, কিন্তু পরমায়ু থাকাতেই পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলাম।

অবশেষে আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজপথে বাহির হইবামাত্র কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া আমার পিছনে তাড়া করিল। আমি প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া এক মাংসওয়ালার দোকানে ঢুকিয়া তাহার এক কোণে লুকাইয়া থাকিলাম; মাংসওয়ালা আমাকে তাড়াইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারিল না। আমি সে রাত্রি অনাহারে সেইখানে পড়িয়া রহিলাম।

পরদিন সকালে মাংসওয়ালা দোকান খুলিলে আমি খাবারের খোঁজে বাহির হইলাম। মাংসওয়ালা আমাকে সামান্য কিছু খাইতে দিল। কিন্তু দোকানে আর ঢুকিতে দিল না। তখন আমি সেখান হইতে বিদায় হইয়া সামনের রুটিওয়ালার দোকানের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। রুটিওয়ালা তখন খাইতে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র একখণ্ড রুটি ফেলিয়া দিল। আমি ল্যাজ নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে সে আমার উপর অত্যন্ত খুসী হইয়া আমার থাকিবার জন্য একটা জায়গা ঠিক করিয়া দিয়া আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিল। আমিও তাহার খুব অনুগত হইলাম। কোনোখানে যাইতে হইলে সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

এমনি করিয়া ঐ রুটিওয়ালার সহবাসে কিছুদিন কাটিবার পর, এক দিবস একটি স্ত্রীলোক কয়েকখানি রুটি কিনিয়া আমার প্রভুকে একটা মেকি টাকা দিল। রুটিওয়ালা তাহা ফিরাইয়া দিয়া তাহার বদলে আর-একটি টাকা চাহিতেই মেয়েটি বলিল, "আমার টাকা মন্দ নয়।" ইহা শুনিয়া আমার প্রভু তাহাকে বলিল, "তোমার টাকা ভাল কি মন্দ, আমার কুকুর তা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দিতে পারবে।" এই বলিয়া আর কয়েকটি টাকার সঙ্গে ঐ টাকাটি মিশাইয়া সব কটা টাকা আমার সামনে ফেলিয়া দিল। আমি তাহার ভিতর হইতে

মেটি মেকি, তাহা বাছিয়া দিলাম। স্ত্রীলোকটি তখন আর কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া মেকি টাকাটির বদলে আর একটি ভাল টাকা দিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন আমার প্রভু প্রতিবেশীদের ডাকিয়া তাহাদের সাক্ষাতে আমার এই অদ্ভুত গুণের অনেক প্রশংসা করিলেন। কুকুর হইয়া আমি যে টাকা পরীক্ষা করিয়া দিতে পারি, আমার এই সুখ্যাতিবাদ ক্রমশঃ নগরের চারিদিকে প্রচার হইলে, অনেকেই মজা দেখিতে প্রতিদিন এক-একটি মেকি টাকা লইয়া আমার কাছে আসিতে লাগিল। কয়েকদিন পরে, একদিন একটি স্ত্রীলোক আমার প্রভুর দোকানে রুটি কিনিতে আসিয়া আমার এই অদ্ভুত গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি ভাল টাকার সঙ্গে একটি মেকি টাকা মিশাইয়া আমার সামনে ধরিল। আমি অনায়াসেই তাহার ভিতর হইতে সেই মেকি টাকাটি বাহির করিয়া দিলাম। তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকটি আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার সময় ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ডাকিয়া গেল।

আমার প্রভু তখন কোনো বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল। আমি এই সুযোগ পাইয়া তাহার পিছন পিছন চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে ঐ রমণী আমাকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে তাহার মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "বাছা! আমরা রুটিওয়ালার যে কুকুরের সুখ্যাতিবাদ শুনেছিলাম তাকে এনেছি, বোধ হয় এ কুকুর নয়, নিশ্চয়ই কোনো মানুষ।" কন্যা বলিল, "মা! আপনার কথাই ঠিক, আমি এখনি একে আগের রূপ ফিরিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ এক গণ্ডূষ জল আনিয়া কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ জল আমার গায়ে দিয়া বলিল, "যদি কোনো মায়াবিনী তোমার এমন দুর্দশা করে থাকে, তবে এই জলের গুণে এখনই আগের মতন হও।" তাহার মুখ হইতে এই-সমস্ত কথা বাহির হইতে-না-হইতেই আমি আগের মত মানুষ হইলাম, এবং আমার মুক্তিদায়িনীর পায়ে পড়িয়া বলিলাম, "ওগো দয়াময়ী! আমার উপর তোমার এ দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা কর।" এই বলিয়া আগাগোড়া ইতিহাস বলিলাম।

তখন সেই দয়াময়ী যুবতী বলিল, "তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আমি যে তোমার উপকার করতে পারলাম, এতেই যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার বিবাহের আগে থেকেই আমি সেই আমিনাকে বিলক্ষণ জানি। আমরা দুজনেই এক শিক্ষয়িত্রীর কাছে মায়াবিদ্যা শিখেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে মত না মেলাতে আমি তার সঙ্গে কথা বলাও ছেড়ে দিয়ে আলাদা বাস করছি। এখন যাতে তুমি আমিনার এই দুষ্ক্রিয়ার সমুচিত প্রতিফল দিতে পার তার উপায় বলে দিচ্ছি।" ইহা বলিয়া সেই মেয়েটি নিজের গুপ্তঘরে ঢুকিল।

এই সময় তাহার জননী আমার কাছে আসিয়া তাহার কন্যা যে কেবল পরোপকার করিবার জন্যই মায়াবিদ্যা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই বিষয়ের বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সেই গুণবতী মেয়েটি আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একপাত্র জল দিয়া বলিল, "তুমি বাড়ীতে গিয়ে দেখবে আমিনা এখন সেখানে নেই, বাইরে গিয়েছে। অতএব তার আসার অপেক্ষায় বসে থাকবে। সে বাড়ীতে আসবামাত্র তার গায়ে এই পাত্রের জল ছিটিয়ে দিয়ে এই কথা বলবে, 'ওরে পাপিয়সী! তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ডভোগ কর!' কিন্তু সে তোমাকে ভয় দেখালে বা অনুনয় করলে, তুমি নিজের কার্য্যসিদ্ধি না করে কোনোমতেই ছেড়ো না।"

সেই রমণীর মুখে এই-কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদে ঐ জলপাত্র হাতে করিয়া ঐ উপকারিণী রমণীদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। আমিনা কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে ঘরে আসিবামাত্র আমাকে দেখিয়া প্রথমে রাগ, পরে আমার হাতে সেই জলের পাত্র দেখিয়া বিস্তর অনুনয় করাতেও আমি তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া উপকারিণী মায়াবিনীর শিক্ষিত কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। অমনি সে ঘোড়ার রূপ ধরিল।

মহারাজ! ঘোড়া আমার দুষ্টা স্ত্রী। সেইজন্য আমি তাকে প্রতিদিনই মারি।

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর যেমন কর্ম্ম তেমনি প্রতিফল হয়েছে, সে জন্যে তোমার উপর কিছুমাত্র দোষারোপ করতে পারি না।"

তাহার পর রাজা খাজা হোসেনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খাজা হোসেন, কাল আমি তোমার বাড়ী দেখে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু তুমি যে যৎসামান্য ব্যবসায় কর, তাতে পেটের ভাতের জোগাড় হওয়াও কঠিন! তুমি কি করে এত টাকা পেলে, যাতে অনায়াসে ঐ অট্টালিকা তৈরী করতে পেরেছ?"

খাজা হোসেন তৎক্ষণাৎ রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার কাহিনী শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া আত্মবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

খাজা হোসেন হোব্বালের কথিত কাহিনী

মহারাজ! এই বাগদাদনগরে দুইজন বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহারাই আমার এই উপস্থিত সৌভাগ্যের মূল। ঐ দুই বন্ধুর পরস্পর অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাঁহাদের একজনের নাম সাদী, ও অপরের নাম সাদ। সাদী খুব বড়লোক ছিলেন, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অপর্য্যাপ্ত টাকা না হইলে এ পৃথিবীতে কেহই সুখী হইতে পারে না। সাদ বড়লোক ছিলেন না, এবং তাঁহার বিবেচনায় জীবনযাত্রার জন্য অর্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ও সদ্‌গুণ ছাড়া সুখী হইবার অন্য উপায় নাই।

একদিন তাঁহাদের এই বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে সাদী বলিলেন, "প্রথমতঃ, দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ, ধনবান্ হয়ে অপব্যয় করে অর্থনাশ, এই দুই কারণেই মানুষের দুঃখের উৎপত্তি হয়। কিন্তু গরীব লোকেরা যদি একবার কিছু ধন পায়, এবং তার অপব্যয় না করে, তা হলে তারা অনায়াসেই ক্রমশঃ মহা ধনী হতে পারে।" সাদ বলিলেন, "বন্ধু! সামান্য ধন পেয়ে দরিদ্র ঐশ্বর্য্যশালী হওয়ার যে প্রস্তাব করলেন, তা যদিও মিথ্যা নয়, তবু আমি এমন অনেক উদাহরণ দেখাতে পারি, যাতে বিনা ধনে দরিদ্র ধনবান্ হয়েছে। এমন কি বিপুল অর্থ দিয়ে রীতিমত ব্যবসায় করেও লোকে যা সংগ্রহ করতে পারেনি, তারা অতি দীন ব্যক্তি হয়েও অন্য উপায়ে তার হাজার গুণ টাকা জমিয়েছে।" এ-কথা শুনিয়া সাদী বলিলেন, "বন্ধু! আমি যা বলেছি তা বাদানুবাদে মীমাংসা করবার নয়, পরীক্ষা করে প্রমাণ করব। যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে অতি দরিদ্র এবং দৈনিক উপার্জ্জনেও যার দিনপাত হওয়া কঠিন, এমন একজন লোককে আমি অর্থদান করব: তাতে যদি আমার কথা সত্য প্রমাণিত না হয়, তবে তুমি যে উপায়ের কথা বলেছ, তারও পরীক্ষা করা যাবে।"

এই-রকম তর্কবিতর্কের কিছুদিন পরে এক দিন ঐ দুই বন্ধু আমার কার্য্যালয়ের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন আমাদের পুরুষানুক্রমে যে দড়ির ব্যবসায় ছিল, আমি তাহাই করিতাম। কিন্তু তাহাতে অতি কষ্টেও স্ত্রীপুত্র পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত না। সাদ আমার অতি দৈন্যদশা দেখিয়া সাদীকে তাঁহার আগের কথা মনে করাইয়া দিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তুমি সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলে, এই লোকটিকে দিয়েই তার পরীক্ষা হতে পারবে। আমি অনেক দিন থেকেই একে দড়ির ব্যবসায় করতে দেখে আসছি। কিন্তু এর যেমন দৈন্যদশা তেমনই আছে।" সাদী বলিলেন, "বন্ধু! আমি সেই দিন থেকেই কিছু টাকা সঙ্গে সঙ্গে রাখি, কিন্তু তুমি সঙ্গে না থাকায় কাকেও দিতে পারিনি। চল ওর কাছে গিয়ে ঐ লোকটি বাস্তবিকই দরিদ্র কি না তার খোঁজ করা যাক।"

এই বলিয়া ঐ দুই বন্ধু আমার কাছে আসিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাদের যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলাম. "আমার নাম হোসেন, আমি দড়ির ব্যবসায় করি বলে লোকে আমাকে হোসেন হোব্বাল এই উপাধি দিয়েছে।" সাদী বলিলেন, "হোসেন! বোধ হয় এই ব্যবসায়ে স্বচ্ছন্দে তোমার পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু তুমি এতকাল ব্যবসায় করেছ, এমন কিছু কি জমাতে পারনি, যা দিয়ে তোমার কাজ আরো ভাল করে চলতে পারে?" আমি উত্তর দিলাম, 'মহাশয়, আমি যে ব্যবসায় করি তাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে যা উপার্জ্জন করি, তাতে নিজের দিন চলাই দুষ্কর তাতে আবার আমার এক স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান। ছেলেগুলি এমনি অপোগণ্ড যে, তাদের মধ্যে একটিও আমার সাহায্য করতে পারে না। সুতরাং যেমন করেই হোক আমাকে তাদের সকলের ভরণপোষণ করতে হয়। অতএব কি করে আর সঞ্চয় করব? কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় যে ভিক্ষা করতে হয় না এই আমার পরম সৌভাগ্য।"

সাদী বলিলেন, "হোসেন! আমি যদি তোমাকে দুই শ' মোহর দি, তা হলে কি ভাল করে ব্যবসায় চালিয়ে খুব শীঘ্র তোমার সমব্যবসায়ীদের মত ধনী হতে পার না?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক, যা বল্‌লেন অবশ্যই সত্য হবে। কিন্তু আপনি যে টাকার কথা বল্‌লেন যদি তার খানিকটাও পাই তা হলেও যে কেবল সমব্যবসায়ীদের মত ধনী হব তা নয়, একদিন হয়ত এই বিস্তীর্ণ বাগদাদনগরের যে-সমস্ত মহাজন আছেন তাঁদের সকলের চেয়ে ধনবান্‌ও হতে পারি।" এই-কথা বলিবামাত্র সাদী পকেট হইতে দুই শত মোহরের একটা থলি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বর করুন এই দিয়ে তোমার ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নত হোক, এবং তুমি সৌভাগ্যশালী হয়ে পরমসুখে কালযাপন কর।"

মহারাজ! আমি ঐ অর্থ পাইয়া এতই আহ্লাদিত হইলাম যে, কথা বলিতে না পারিয়া দাতার পোষাকের তলা চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম। তার পর তিনি ও তাঁহার বন্ধু দুজনেই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা যাইবার পর, আমি ভাবিতে লাগিলাম মোহরগুলি কোথায় রাখি? বাড়ীতে সিন্দুক অথবা পেটরা কিছু নাই যে, তাহার মধ্যে রাখি, অথচ এ বিষয় কাহারও কাছে প্রকাশ করা চলিবে না। এই-রকম নানা-চিন্তা করিয়া কর্ম্মস্থান হইতে ঘরে আসিলাম এবং স্ত্রী ও পুত্রগণকে না জানাইয়া তখনকার খরচের জন্য থলি হইতে দশটি মোহর বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলি পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। পরদিন দশটি মোহর দিয়া কতকগুলা শণ কিনিয়া আনিলাম। তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মাংস খাওয়া হয় নাই বলিয়া রাত্রিতে খাইবার জন্য বাজারে গিয়া কিছু মাংস কিনিলাম। মাংস হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে একটা চিল ছোঁ মারিতে আসিল, আমি যেমন হাত সরাইয়া মাংস আগলাইতে গেলাম, অমনি ঝাঁকরানিতে আমার পাগড়ীটা মাটিতে পড়িয়া গেল। চিল তৎক্ষণাৎ ঐ পাগড়ী মুখে করিয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি এমনি চীৎকার করিয়া উঠিলাম যে, কাছাকাছি যত ছেলে বুড়ো ছিল সকলেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানা-রকম শব্দ করিয়া চিলটাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু চিল পাগড়ী লইয়া অনেক উঁচুতে উঠিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ মধ্যেই অদৃশ্য হইল। তখন আমি পাগড়ী ও মোহর ফিরিয়া পাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষণ্ণমনে বাড়ী আসিলাম, এবং শণ কিনিবার পর সেই দশ টাকার মধ্যে যাহা বাকি ছিল তাহাতে আবার শণ কিনিয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু ধনী হইবার যে আশা করিয়াছিলাম তাহা একেবারে নির্ম্মূল হইল। বরঞ্চ তখন এই ভাবনাই প্রবল হইল যে, যে-লোক আমাকে টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাকে এ কথা কি করিয়া বলিব এবং বলিলেই বা তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন? যাহা হউক, যৎসামান্য টাকা যাহা ছিল, তাহা দিয়াই দিন কতক কাজ চালাইয়া আবার আগের মত গরীব হইলাম। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া

"জগদীশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হয়েছে, তিনি আমায় পরীক্ষা করবার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, আবার ভালো বুঝেই কেড়ে নিলেন।" এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

এই দুর্ঘটনার ছয় মাস পরে সাদ ও সাদী দুই বন্ধু আবার আমার কার্য্যস্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। আমায় মনে পড়াতে আমার অবস্থার কি-রকম উন্নতি হইয়াছে জানিবার জন্য তাঁহারা আমার কার্য্যালয়ে আসিতে চাহিলেন। সাদ দূর হইতে আমাকে

মাংস হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে একটা চিল ছোঁ মারিতে আসিল

দেখিবামাত্র বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বন্ধু! হোসেনের আগের চেয়ে সুখের দশা ঘটেনি, কারণ ওর যে-রকম দরিদ্র-বেশ দেখে গিয়েছিলাম, এখনও সেই-রকমই দেখছি। আমার চোখের ভ্রম হলেও হতে পারে, অতএব তুমি নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখ।" এই-কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দুজনেই আমার দোকানের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাদী আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হোসেন! দুই শ' মোহর পাওয়ায় এখন তোমার ব্যবসার ভালরকম চলছে ত?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! ধন দিয়ে যে আশা করেছিলেন তা কপাল-দোষে নিষ্ফল হয়েছে। সেজন্যে আমি যে কি রকম মনস্তাপ পেয়েছি, তা বলা যায় না!" এই বলিয়া যেমন করিয়া আমার টাকা নষ্ট হইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিবরণ বলিলাম।

সাদী আমার কথায় কোনোমতেই বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, "হোসেন! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? চিলের ক্ষুধা পেলে কেবল খাবার খোঁজই করে থাকে। তাদের পাগড়ীতে কি প্রয়োজন? কতকগুলি লোক এমন আছে যে কোনো-রকমে কিছু টাকা পেলেই আর পরিশ্রম করতে চায় না, কেবল অনর্থক আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায়। সুতরাং কস্মিন্ কালেও তাদের সেই দৈন্যদশা আর দূর হয় না। তুমিও যে একজন ঐ শ্রেণীর লোক তাতে সন্দেহ নেই অতএব তোমার দৈন্যদশা কে নিবারণ করতে পারবে?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনি আমাকে যতই বকুন না কেন, আমি নিশ্চয় বলছি এতে আমার কিছুমাত্র দোষ নেই। আপনি প্রতিবেশীদের কাছে এ-বিষয়ের খোঁজ করলেই অনায়াসে জানতে পারবেন, আমি আপনাকে প্রতারণা করছি কি না।" সাদ আমার কথার অনেক সমর্থন করিয়া সাদীকে ঢের বুঝাইলেন। তখন সাদী আবার পকেট হইতে দুই শ' মোহর বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "হোসেন! এ টাকাগুলি অতি সাবধানে রেখো, দেখো যেন আবার এ টাকাও হারিয়ো না।"

আমি একবার দুইশত মোহর পাইয়া আশা করি নাই যে, তিনি আবার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ দেখাইবেন। তাই এই দুইশত মোহর পাইয়া তাঁহার প্রতি আরো বেশী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তখন তাঁহারা কথা বলিতে বলিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা যাইবার পর, আমি বাড়ী গিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী ও ছেলেরা অন্য কোথাও গিয়াছে, কেহই বাড়ীতে নাই। অতএব দশটি মোহর বাহিরে রাখিয়া, বাকিগুলি একখানা কাপড়ে জড়াইয়া ঘরে যে একটা ভূষিভরা বড় জালা ছিল তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তার খানিক পরেই আমার স্ত্রী বাড়ী আসিলে, তাহাকে এ-বিষয়ের কোনো কথা না জানাইয়া শণ কিনিতে বাজারে গেলাম।

আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলে একজন সাজিমাটিওয়ালা সাজিমাটি বিক্রয় করিতে করিতে আমাদের বাটীর সামনে দিয়া যাইতেছিল। আমার স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া পয়সার অভাবে সাজিমাটির বদলে ভূষি দিতে চাহিল। তাহাতে লোকটি রাজি হইলে আমার স্ত্রী সাজিমাটি লইয়া তাহাকে জালাসুদ্ধ ভূষি দিল। সাজিমাটিওয়ালা তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

তার পর আমি শণ কিনিয়া কতকগুলি নিজে এবং বাকিগুলি পাঁচজন বাহকের মাথায় দিয়া ঘরে আনিলাম। বাহকদের বিদায় করিয়া বিশ্রাম করিতে বসিতেই যেখানে জালা

ছিল সেখানে চোখ পড়িল। জালা দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূষির জালা কি হল?" সে বলিল, "আমি জালাসমেত ভূষির বদলে সাজিমাটি কিনেছি।" আমি বলিলাম, "ওরে হতভাগিনী! তুই কি করেছিস্! আজ সাদী আর তাঁর বন্ধু এসে আমাকে আবার দুই শ' মোহর দিয়েছিলেন, তার থেকে কেবল দশটি বাইরে রেখে বাকিগুলি জালার ভিতরে রেখেছিলাম। তুই সমস্ত মোহর সাজিমাটিওয়ালাকে দিয়ে সর্ব্বনাশ করেছিস!" আমার স্ত্রী এই-কথা শুনিবামাত্র পাগলের মত বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "হায় আমি কি হতভাগিনী! আমি সোনা দিয়ে মাটি নিলাম, আমার মরণই মঙ্গল। আমি যে সাজিমাটিওয়ালাকে চিনি না। এখন কোথায় আর তার খোঁজ করব?" তাহার পর আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তুমি কেন আমাকে এ-কথা বলনি? যদি তুমি একবার আমাকে জানিয়ে রাখতে, তা হলে কখনই এ দুর্ঘটনা ঘটত না।" এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

তখন আমি বলিলাম, "ওরে! এক্ষণে আর কান্নাকাটি করলে কি হবে? প্রতিবেশীরা আমাদের এই-কথা শুনলে আমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ না করে কেবল ঠাট্টাই করবে! সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনিই দিয়েছিলেন, তিনিই তা আবার গ্রহণ করলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তার মধ্যে থেকে দশটি মোহর বাইরে রেখেছিলাম, তাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হবে। অতএব তাঁকে ধন্যবাদ দাও।" এমনি করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া টাকার শোক ছাড়িয়া আগের মত প্রফুল্ল মনে নিজের ব্যবসায়ে লাগিলাম। কিন্তু এই একটি মহা দুর্ভাবনা রহিল যে, যখন সেই দুই বন্ধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে, তাঁহাদের দেওয়া টাকাতে আমার ব্যবসায়ের কি উন্নতি হইয়াছে, তখন তাঁহাদের কি উত্তর দিব।

সেবারে দুই বন্ধু আমার কাছে আসিতে আগের চেয়ে অনেক বেশী দেরি করিলেন। সাদ আসিবার কথা তুলিতেই সাদী বলিতেন, "দেরি করে গেলেই হোসেনকে একবারে খুব বড়লোক দেখব!" সাদ উত্তর দিতেন, "তুমি এমন মনে কোরো না যে, হোসেন তোমাকে সুসংবাদ দেবে।" সাদী বলিতেন, "এবার সে খুব সতর্ক থাকবে, রোজই কি পাগড়ী চিলে নিয়ে যায়?" সাদ বলিতেন, "ঐ-রকম না হোক অন্যরকম দুর্ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। অতএব হোসেনের সৌভাগ্য দেখবেই মনে করে আগে থাকতে এত বিশ্বাস রাখা কিছু নয়। তোমার ইচ্ছা যে পূর্ণ হবে আমার এমন মনে হচ্ছে না। কিন্তু টাকার চেয়ে অন্যান্য উপায়ে যে গরীব লোক খুব শীঘ্র বড়লোক হতে পারে, আমি অনায়াসেই তা প্রমাণ করে দেবো।" এই-রকম বাদানুবাদের পর একদিন ঐ দুই বন্ধু আমার কার্য্যালয়ের দিকে আসিতে লাগিলেন। আমি দূর হইতে তাঁহাদের দেখিয়া লজ্জায় লুকাইতে ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু কাজের জন্য তাহা করিতে না পারিয়া এমনিভাবে মাথা হেঁট করিয়া থাকিলাম, যেন তাঁহাদের দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা যখন কাছে আসিয়া আমাকে

সম্ভাষণ করিলেন। তখন আর কি করি, অগত্যা নমস্কার করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম। তাহার পর হেঁট মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলাম, "আপনারা বলতে পারেন, আমি ঐ টাকা ভূষির জালায় না রেখে অন্য জায়গায় কেন রাখিনি। জালাটা বহুদিন একই জায়গায় ছিল, কোনো দিনই সরানো হয়নি। অতএব আমি কি করে জানব যে, সেই দিনেই আমার স্ত্রী পয়সার অভাবে তার বদলে সাজিমাটি কিনবে? আপনারা এও বলতে পারেন, আমি স্ত্রীকে টাকার কথা কেন আগে বলিনি। আপনারা বিজ্ঞ হয়ে স্ত্রীলোককে যে এ-কথা বলতে পরামর্শ দেবেন এ কখনই সম্ভব নয়।" তাহার পর সাদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়! আপনার এত যত্নেও যখন আমি বড়লোক হতে পারলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হচ্ছে যে, আপনার ধনে আমার সুখী হওয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয়। সে যাহা হউক, আপনার দানের ফল কোথাও যাবে না। আমার অদৃষ্টে ধন নেই, আপনি কি করবেন?"

আমি এই-কথা বলিয়া নীরব হইলে সাদী বলিলেন, "হোসেন! তুমি যে-সকল কথা বললে, তা সত্যি না হলেও নিজের মতের পরীক্ষা করবার জন্যে তোমাকে ধনদান করে এ-রকম করে অর্থ ক্ষয় করা উচিত নয়। আমার চার শ' মোহর গিয়েছে, সেজন্যে কিছু মাত্র অনুতপ্ত নই, কারণ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করে কেবল পরমেশ্বরের প্রীতি এবং তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই দান করেছি। তবে কিনা অপাত্রে দান করা হয়েছে বলে এক-একবার দুঃখ জন্মাতে পারে।"

তাহার পর সাদী বন্ধু সাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন তুমি মনে কোরো না যে, আমি আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু টাকা না দিলেও যে দরিদ্রের ধন হতে পারে, এইবার তোমাকে তার প্রমাণ দেখাতে হবে। চার শ' মোহর পেয়েও যখন হোসেন যে-দরিদ্র সেই-দরিদ্রই থাকল, নিজের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করতে পারল না, তখন এই ব্যক্তিকে দিয়েই ঐ পরীক্ষা করলে ভাল হয়।"

এই কথায় সাদ সাদীকে একখানা সীসা দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে এই সীসাখান কুড়িয়ে পেতে দেখেছ। আমি এই সীসা হোসেনকে দিচ্ছি। তুমি দেখো, এর সাহায্যেই ওর অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হবে।" সাদী হাসিয়া বলিলেন, "এর দাম কিছুই নয়, বড় জোর দুই পয়সা মাত্র হবে। ভাল, এই দিয়ে হোসেন কি করতে পারে দেখা যাক।" তখন সাদ ঐ সীসাখান আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "হোসেন! সাদী হাসেন হাসুন তাতে ক্ষতি নেই, তুমি এটা অগ্রাহ্য কোরো না; সময়ে এর গুণেই তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হবে।"

আমি যদিও মনে করিলাম, সাদ পরিহাস করিতেছেন, তবু সীসাখান তাঁহার হাত হইতে লইয়া নিজের কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

দুই বন্ধু চলিয়া গেলে, আমি আবার নিজের কাজে লাগিলাম, সীসার কথা মনেও

রহিল না। কিন্তু রাত্রে শুইবার সময় সেটা কাপড়ের ভিতর হইতে বিছানার উপর পড়াতে তুলিয়া কাছেই এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিলাম।

দৈবাৎ সেই রাত্রেই এক প্রতিবেশী জেলে তাহার জালের সাজ করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহাতে একখান সীসা নাই, এবং তাহা না থাকিলে মাছ ধরা যাইবে না। তখন দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সীসা কিনিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই রাত্রে মাছ ধরা না হইলে, পর দিন সপরিবারে উপবাসী থাকিতে হইবে, এই ভাবিয়া জেলে তাহার স্ত্রীকে বলিল, "কোনো প্রতিবেশীর ঘরে একখানা সীসা পাওয়া যায় কি না দেখ।" জেলেনী তৎক্ষণাৎ একে একে সমস্ত প্রতিবেশীর কাছে সীসার খোঁজ করিল, কিন্তু কোথাও না পাইয়া শূন্য হাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন জেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হোসেন হোব্বালের বাড়ীতে যাওনি কেন?" জেলেনী বলিল, "সে অতি দরিদ্র, তার বাড়ীতে কিছুই থাকে না, তাই সেখানে যাইনি।" জেলে বলিল, "সে কথা কিছু নয়, তুমি একবার তার বাড়ীও যাও।" এই-কথায় জেলেনী আসিয়া আমার বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। আমার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চাও?" সে বলিল, "জাল মেরামত করবার জন্যে আমার স্বামীর একখান সীসার দরকার হয়েছে, যদি তোমার থাকে তবে আমাকে দাও।" আমি বলিলাম, "আমার একখান সীসা আছে, একটু দাঁড়ালে আমার স্ত্রী দিতে পারে।" আমার স্ত্রী তখন জাগিয়া ছিল। সে নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে সীসাখান বাহির করিয়া জেলেনীর হাতে দিল। জেলেনী সীসাখান পাইবামাত্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হে প্রতিবেশিনী! আমি অঙ্গীকার ক'রে যাচ্ছি, আমার স্বামী প্রথমবার জাল ফেলে যতগুলি মাছ ধরবেন সে সমস্তই তোমাদের দিয়ে যাব।" তাহার পরে স্বামীর কাছে গিয়া তাহাকে সীসা দিয়া নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বলিল। জেলে সীসা পাইয়া মহা খুসী হইয়া জাল তৈরী করিয়া রাখিল, এবং ভোর হইবার দুই ঘণ্টা আগেই নিজের নিয়ম অনুসারে মাছ ধরিতে গিয়া জাল ফেলিল। প্রথমবারেই এক হাত লম্বা একটি মাছ পড়িল। তাহার পর আরও অনেক মাছ ধরিল, কিন্তু ঐ মাছটাই সব-চেয়ে বড়। অতএব ঐটাই আমাকে দিবে ঠিক করিল।

মাছ ধরা শেষ হইলে, জেলে বাড়ী ফিরিয়াই আমাকে মাছ দিতে আসিল। আমি তখন কার্য্যালয়ে ছিলাম। জেলে আমার কাছে আসিয়া বলিল, "ওহে প্রতিবেশী! কাল রাত্রে আমার স্ত্রী যখন তোমার কাছ থেকে একখান সীসা নিয়ে যায়, তখন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, প্রথমবারে যে মাছ জালে পড়বে সেটা তোমার স্ত্রীকে দেবে। প্রথমবারেই এই মাছটা পেয়েছি, তুমি নাও।" আমি বলিলাম, "প্রতিবেশীদের পরস্পরের সাহায্য করাই উচিত। আমি তোমাকে কেবল একখান সীসা দিয়েছি মাত্র। তার জন্যে উল্টে কিছু নেওয়া উচিত নয়।' আমার এই-কথা শুনিয়া জেলে অনেক অনুরোধ করায় আমি অগত্যা তাহাকে খুসী করিবার জন্যই ঐ মাছটা গ্রহণ করিলাম।

সেই মাছ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলাম, "গত রাত্রে প্রতিবেশী জেলেকে যে সীসাখান দিয়েছিলে সেইজন্তে সে তোমাকে এই মাছটি দিয়েছে।" আমি আরো বলিলাম, "সাদ আমাকে ঐ সীসাখান দিয়ে বলেছিলেন, 'এতে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য হবে।' এই মাছ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বললেও বলা যায়।" আমার স্ত্রী তখন মাছ কুটিতে আরম্ভ করিল। কুটিতে কুটিতে মাছের পেটের ভিতর হইতে একটা মস্ত হীরা বাহির হইল। কিন্তু হীরা যে কি জিনিষ তা আমার গৃহিণী জানিত না, সুতরাং সে উহাকে কাচ মনে করিয়া খেলা করিবার জন্য সেটা আমার ছোট ছেলের হাতে দিল। তার পর আমার অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সেইটা লইয়া খেলা করিতে লাগিল। সকলেই তাহার জ্যোতি ও শোভা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। বিশেষতঃ রাত্রে তাহার জ্যোতি এমনি বাড়িয়া উঠিল যে, প্রদীপ না জালিয়া তাহার আলোকে রাত্রির সমস্ত কার্য্যই করিতে পারিলাম। তার পর ঐ হীরাখানা একটা উঁচু জায়গায় তুলিয়া রাখিলাম, সুতরাং বালকবালিকারা তাহা আর ছুঁইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি এবং আমার স্ত্রী বহু যত্নে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া ঘুম পাড়াইলাম।

আমাদের বাড়ীর পাশে একজন ধনী ইহুদী রত্নবণিক বাস করিতেন। পরদিন সকালে, আমি বিছানা হইতে উঠিয়া নিজের কাজে যাইলে, তাঁহার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে আমরা ঘুমতে পারিনি। ছেলেরা এত চীৎকার করেছিল কেন?" তাতে আমার স্ত্রী ইহুদীর স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া হীরকখান তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "এই পরকলাখানার জন্তে ছেলেরা অত চীৎকার করেছিল।"

বণিকগৃহিণী রত্ন চিনিতে পারিতেন, অতএব ঐ হীরকখানি হাতে পড়িবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, উহা খুব দামী পাথর। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া ঐ হীরকখান ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইহা খুব ভাল পরকলাই বটে। আমার বাড়ীতেও এই-রকম আর একখান আছে, তুমি যদি এটা বিক্রী কর, তাহা হলে আমি কিনতে রাজি আছি।" এই-কথা বলিয়া বণিকের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ আপন স্বামীর দোকানে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তাহাতে ইহুদী বণিক তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি এখনি গিয়ে সেখানা কেনো, কিন্তু একেবারে বেশী দাম দিতে স্বীকার কোরো না।" বণিকপত্নী আবার তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "আমি পরকলাখানার মূল্য কুড়ি মোহর দিতে পারি। এ খানা আমাকে বেচ।" আমার স্ত্রী যদিও একখান সামান্য কাচের দাম কুড়ি মোহর খুব বেশীই মনে করিল, তবুও তাহার কোনো উত্তর না দিয়া কেবল বলিল, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া এটা বেচতে পারব না।"

ইতিমধ্যে খাবার জন্য আমি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাছের পেটে যে পরকলাখান পাওয়া গিয়েছে, সে কি কুড়ি মোহরে বিক্রী করবে?"

সাদ বলিয়াছিলেন তাঁহার দেওয়া সীসাতেই আমার অতুল ধন হইবে, তাহা মনে হওয়াতে কিছুক্ষণ আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।

কুড়ি মোহর নেহাৎ কম মনে করিয়া আমি কোনো কথা বলিলাম না, ভাবিয়া বণিকপত্নী আবার বলিলেন, "হে প্রতিবেশী! আমি পঞ্চাশ মোহর দিতে রাজি আছি, তাতে বিক্রী করতে রাজি আছ কি না?" কুড়ির পর একেবারে পঞ্চাশ মোহর দিতে স্বীকার করাতে আমি মনে করিলাম, তবে এটা সামান্য কাচ নয়, নিশ্চয় কোনো দামী পাথর। তাই তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি যা দিতে চাও তা অতি সামান্য।" বণিকপত্নী বলিলেন, "তবে একশ মোহর দিচ্ছি। এতেও কি বিক্রী করবে না?" আমি বলিলাম, "এই পাথরের দাম লক্ষ মোহরেরও বেশী, কিন্তু তোমরা প্রতিবেশী বলে তোমাদের অনুরোধে লক্ষ মোহরে বিক্রী করতে রাজি আছি। তাতে যদি রাজি না হও, তা হলে আমি অন্য রত্নবণিকের কাছে নিয়ে গেলে বেশী দাম পাব।"

ইহুদী-পত্নী আমার কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ হাজার মোহর পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে রাজি হইলাম না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমার স্বামীর বিনা অনুমতিতে এর বেশী দিতে পারি না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তিনি দোকান থেকে বাড়ী আসেন, সে পর্য্যন্ত এই হীরকখান অন্য কোনো রত্নবণিককে দেখিও না।" আমি তাহাতে রাজি হইলাম। সন্ধ্যার পর রত্নবণিক বাড়ী আসিয়া তাঁহার স্ত্রীর মুখে সমস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমার বাড়ী আসিয়া বলিলেন, "ভাই হোসেন! তোমার হীরাখানা আমাকে একবার দেখাও দেখি।" আমি তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া হীরকখান দেখাইলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল, এবং ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই, সুতরাং হীরার জ্যোতি ভাল করিয়াই দেখা গেল।

তার পর ইহুদী ঐ উজ্জ্বল হীরাখানা আমার হাত হইতে লইয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার দিতে চাহিয়াছেন, আমি তাহার উপর কুড়ী হাজার দিচ্ছি, পাথরখান আমাকে দাও।" আমি বলিলাম, "বোধ হয় আপনার স্ত্রী বলে থাকবেন যে, আমি একলক্ষ মোহরের কমে হীরা বিক্রী করব না।" তিনি দাম কমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই দাম কম হইবে না, তখন একলক্ষ মোহর দিতে রাজী হইয়া দুইহাজার মোহর তখনই বায়না দিলেন। তাহার পরদিন বাকী টাকা আনিয়া উপস্থিত করিলে, আমি তাঁহাকে হীরকখান দিলাম।

আমি ঐ হীরা বিক্রয় করিয়া খুব বেশী ধন পাইয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম। পরে কি ভাবে ঐ টাকার সদ্ব্যবহার করিব, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার স্ত্রী নিজের এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য ভাল কাপড় গয়না ও সাজানো বাড়ী কিনিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে, আমি তাহাকে কহিলাম, "টাকা যদিও খরচের জন্যই হয়েছে, তবুও যতদিন পর্য্যন্ত না একটি স্থায়ী মূলধন জমানো যাচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ-রকম করে

টাকা খরচ করা উচিত নয়। কারণ মূলধন থেকে খরচ করলে, তা শীঘ্রই শেষ হয়ে যেতে পারে। অতএব আগে আয়ের একটা উপায় করা যাক, তার পর তোমার ইচ্ছা মত গয়না কাপড় সব কিনে দেবো।"

ইহুদী ঐ উজ্জ্বল হীরাখানা আমার হাত হইতে লইয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া নানা-রকম ভাল ভাল দড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য দড়ীর যে যে ব্যবসায়ী এবং কারিগর ছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু টাকা আগাম দিয়া আমার কাজে লাগাইলাম, এবং প্রতিদিন যে যেমন দড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিল, তাহাকে সেইরূপ টাকা দিয়া দড়ী কিনিতে লাগিলাম। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই শহরের সমস্ত কারিগর কেবল আমার কাজেই লাগিয়া রহিল। পরে তৈরী জিনিষপত্র

রাখিবার জন্য জায়গায় জায়গায় ঘর ভাড়া লইলাম, এবং প্রত্যেক ঘরে এক-একজন সরকার রাখিয়া তাহাদিগকে কেনাবেচার হিসাব রাখিতে আজ্ঞা দিলাম।

এইভাবে কিছুদিন বাণিজ্য-ব্যবসায় ভালভাবে চলিলে, আমার বেশ লাভ হইতে লাগিল, এবং স্ত্রীরও যে সাধ ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া দিলাম। তার পর সমস্ত বাণিজ্যের জিনিষ এক জায়গায় থাকিলে কাজের অনেক সুবিধা হয় ভাবিয়া সহরের মধ্যে একটি বড় পুরানো বাড়ী কিনিলাম, এবং বাড়ীখানা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিয়া কাল মহারাজ যে প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তৈয়ারী করাইয়াছি। ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমার সমস্ত জিনিষ রাখিবার এবং সপরিবারে থাকিবার বিলক্ষণ জায়গা আছে।

নূতন বাড়ীতে যাইবার কিছুদিন পরে সাদ ও সাদী দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে একদিন আমার আগেকার বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে যাইতে আমাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া সেই পাড়ার কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোসেন নামে যে একজন এইখানে ছিল, সে এখন বেঁচে আছে, না মারা গিয়েছে?" তাহাতে সে বলিল, "আপনারা যার কথা জিজ্ঞাসা করছেন, এখন তিনি এই শহরের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন, আগে তাঁর নাম কেবল হোসেন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি লোকে তাঁকে খাজা হোসেন হোব্বাল অর্থাৎ সওদাগর হোসেন দড়িওয়ালা বলে থাকে। তিনি এখন রাজবাড়ীর মত এক মস্ত বাড়ী করেছেন।" এই বলিয়া আমার বাড়ী দেখাইয়া দিল।

বন্ধু দুজন আমার বাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে পথে নানাপ্রকার তর্ক করিতে লাগিলেন। সাদ বলিলেন. "আমার দেওয়া সীসাতেই হোসেনের অত টাকা হয়েছে।" সাদী বলিলেন, "তা কখনই নয়। আমি যে চার শ' মোহর দিয়েছিলাম, তাতেই তার এ-রকম ধনসম্পত্তি হয়েছে, কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলে বড় অন্যায় কাজ করেছে।"

তাঁহারা এই-রকম নানাকথা বলিতে বলিতে আমার বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাঁহাদের কিছুতেই বিশ্বাস হইল না যে, ঐ বাড়ী আমার। তাহাতে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাজা হোসেন হোব্বালের কি এই বাড়ী?" সে বলিল, "হাঁ মহাশয়! এই বাড়ী তাঁর। তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আপনারা ভিতরে যান, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

তখন আমার একজন দাস তাঁহাদের আগমনের খবর দিতেই আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এমন কি তাঁহাদের পায়ে হাত দিতেও গেলাম, কিন্তু তাঁহারা পা ধরিতে না দিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদিগকে বৈঠকখানায় আনিয়া একখানি ভাল আসনে বসাইয়া বলিলাম, "আপনারা আমার পরম বন্ধু, শুদ্ধ আপনাদের কৃপাতেই আমার এই-সমস্ত ঐশ্বর্য্য হয়েছে।" তখন সাদী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খাজা হোসেন! আমি তোমাকে চার শ' মোহর দিয়ে তোমার যে-রকম ঐশ্বর্য্য কামনা করেছিলাম, এখন তাই হয়েছে দেখে আমি যে কি-রকম আনন্দিত হয়েছি,

তা বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ টাকা হারানোর উল্লেখ করে আমার কাছে কি জন্য যে দুবার মিথ্যা বলেছিলে, তার কারণ বুঝতে পারি না। যা হোক আমার মনস্কামনা যে পূর্ণ হয়েছে এই যথেষ্ট।”

এই-কথা শুনিয়া সাদ আমাকে কোনো কথা বলিতে না দিয়া নিজেই বলিলেন, “বন্ধু! আমি তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম। তুমি এখনও মনে করছ যে, খাজা হোসেন আমাদের কাছে মিথ্যা বলেছিল। আমি নিশ্চয় বলছি, ওর একটি কথাও মিথ্যা নয়, সত্য-সত্যই কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে ওর চার শ’ মোহর নষ্ট হয়ে গিয়েছে।” তার পরে আমি বলিলাম, “মহাশয়! আমার জন্য পাছে আপনাদের চিরকালের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, সেই ভয়ে এ পর্য্যন্ত কোনো কথা বলিনি। এখন তর্কবিতর্ক ছেড়ে কেমন করে আমার এত ঐশ্বর্য্য হয়েছে, তার কথা বলছি শুনুন।” এই বলিয়া মহারাজকে এইমাত্র যে-সমস্ত কথা বলিলাম, তাঁহাদের কাছে অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা করিলাম।

তাহার পর দুই বন্ধু উঠিয়া নিজের নিজের বাড়ী যাইবার উপক্রম করিলে, আমি সবিনয়ে বলিলাম, “অনুগ্রহ করে আপনাদের আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা আজ রাত্রিতে খেয়ে দেয়ে এখানে রাত্রি বাস করেন, এবং শহরের বাইরে আমি যে একখানি ছোট বাড়ী কিনেছি, কাল সকালে জাহাজে চড়ে আপনাদের সেইখানে নিয়ে যাই, দুপুরে সেখানে খাওয়া-দাওয়া হয়, এবং সন্ধ্যার পর ঘোড়ায় করে আপনাদের এখানে নিয়ে আসি।”

আমার প্রার্থনায় তাঁহারা রাজি হইলে, আমি একজন ক্রীতদাসকে ডাকিয়া আহারাদির জোগাড় করিতে হুকুম করিলাম। যখন খাওয়ার আয়োজন হইতে লাগিল, সেই সময়ে আমি আমার বন্ধুদের লইয়া আমার সমস্ত বাড়ী এবং তার ভিতরের কারখানা দেখাইতে লাগিলাম। এখন আমি দুজনকেই আমার মহা উপকারী বলিয়া মনে করি, কারণ সাদী না থাকিলে সাদ আমাকে সীসাখান দিতেন না, এবং সাদের সঙ্গে তর্ক না হইলেও সাদী আমাকে চারি শত মোহর দান করিতেন না। অতএব তাঁহাদের দুজনকেই আমার সমান উপকারী মনে করা উচিত। সে যাহা হউক, খাবার তৈয়ারী হইলে তাঁহাদের লইয়া খাইতে বসিলাম। খাইবার সময় তাঁহাদের আনন্দ দিবার জন্য নানারকম গান বাজনা হইতে লাগিল। এমনি করিয়া নানারকম আমোদ-প্রমোদে রাত্রি কাটাইলাম।

পরদিন ভোরে একখানি খুব ভাল জাহাজে চড়িয়া দুই বন্ধুকে আমার বাগান-বাড়ীতে লইয়া গেলাম। বাড়ীটি ঠিক নদীর ধারে, এবং তাহার চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাগান থাকাতে বাড়ীটির শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। দুই বন্ধু বাগানে ঢুকিয়া সেখানের গাছপালার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং নানা-জাতীয় সুকণ্ঠ পাখীর সুমধুর গান শুনিয়া মোহিত হইলেন। শেষে গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা হাওয়া খাইবার জন্য কুঞ্জবনে ঘেরা যে-ঘরখানি তৈয়ারী

করাইয়াছিলাম, তাঁহাদের তাহার ভিতর লইয়া গিয়া বহুমূল্য কাপড়ে ঢাকা একখানি পালঙ্কে বসাইয়া নানারকম কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা ঐখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইতিমধ্যে আমার দুই ছেলে হাওয়া খাইবার জন্য একজন চাকরের সঙ্গে বাগানে আসিয়া চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গাছের উপর একটি পাখীর বাসা দেখিয়া চাকরকে তাহা পাড়িয়া দিতে বলিল। চাকর গাছের ডালে উঠিয়া বাসার কাছে গিয়া দেখিল, পাখীটা একটা পাগড়ীর উপর বাসা তৈয়ারী করিয়াছে। তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পাগড়ী-সুদ্ধ বাসা নামাইয়া আমার বড় ছেলের হাতে দিয়া বলিল, "এটা নিয়ে তোমার বাবাকে দেখাও, তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে খুব খুসী হবেন।" চাকরের মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র আমার বড় ছেলে ঐ পাগড়ী-সুদ্ধ বাসা লইয়া তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা! দেখ দেখি আমরা কেমন পাগড়ী-সমেত পাখীর বাসা পেয়েছি।" তাই দেখিয়া আমিও যেমন আশ্চর্য্য হইলাম, আমার বন্ধুরাও তেমনি হইলেন। আমি পাগড়ী দেখিয়া ভাল করিয়াই চিনিতে পারিলাম, চিল আমার যে পাগড়ী লইয়া গিয়াছিল, উহা সেই পাগড়ী। তখন আমি বন্ধুদের সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "আপনাদের মনে থাকতে পারে আপনারা প্রথম যে দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন সে দিন আমার মাথায় এই পাগড়ী ছিল।" সাদ বলিলেন, "আমাদের তা বড় মনে নেই, কিন্তু ওতে যদি একশ নব্বই মোহর পাওয়া যায়, তবে আমি ও আমার বন্ধু তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি।" ইহা শুনিবামাত্র আমি পাগড়ী হইতে মোহরের থলিয়াটি বাহির করিয়া বলিলাম, "আপনারা থলের মোহর গুণে দেখুন, তা হলে বুঝতে পারবেন, আমি আপনাদের ঠকিয়েছিলাম কি না।"

আমার কথায় সাদ তখনি মোহরগুলি গণিয়া দেখিলেন, ঐ থলিয়ার মধ্যে একশত নব্বই মোহর আছে। তাহাতে সাদী বলিলেন, "খাজা হোসেন! এখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তুমি এই টাকা ব্যবহার করে ধনবান হও নাই। কিন্তু আর যে একশ নব্বই মোহর ভূষির জালায় রেখেছিলে তাই দিয়েই তোমার ধনবৃদ্ধি হয়েছে বোধ হয়।" আমি বলিলাম, "মহাশয়! আমি মিথ্যা বলিনি, বাস্তবিক যা ঘটেছে, তাই বলেছি।" সাদ বলিলেন, "খাজা হোসেন! সাদী যা বলেন বলুন, বড় জোর উনি মনে করতে পারেন যে, তোমার অর্দ্ধেক ঐশ্বর্য্য তাঁর দুইশ মোহর থেকে হয়েছে, কিন্তু তুমি যে মাছের পেটে হীরে পেয়েছ, সে জন্যে আমার সীসা থেকেই তোমার যে অর্দ্ধেক ধনোৎপত্তি হয়েছে তা ওঁকে স্বীকার করতেই হবে।" সাদী বলিলেন, "সাদ! আমি ওকথা স্বীকার করব, কিন্তু ধন ছাড়া যে ধনোৎপত্তি হয় না, এও তোমাকে মানতে হয়েছে।"

তাঁহারা তর্কবিতর্ক শেষ করিলে তাঁহাদের খাওয়া-দাওয়া করাইয়া রোদের সময় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিলাম। সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাদের আবার সঙ্গে লইয়া বাগানে কিছুক্ষণ বেড়াইলাম। তাহার পর অশ্বশালা হইতে তিনটি অশ্ব আনাইয়া সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিলে

আমরা তিনজনে তিন ঘোড়ায় চড়িয়া বাগ্দাদে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটনাক্রমে সেই দিন ঘোড়ার দানা ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং চাকরেরা দেখিয়া শুনিয়া আগে তাহা আনিয়া রাখে নাই। আমরা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন শস্যের গোলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং একজন চাকরকে শস্যের খোঁজে পাঠাইলাম। কিন্তু সে কোথাও শস্য না পাইয়া শেষে একজন প্রতিবেশীর দোকানে এক জালা ভুষি পাইল; তাহাই কিনিয়া, "কাল ঐ জালা ফেরত দেবো" বলিয়া ভুষি-সমেত জালাটি বাড়ীতে আনিল। জালা হইতে ভুষিগুলি বাহির করিবার সময় তাহার মধ্যে কাপড়ে বাঁধা মোহর দেখিতে পাইয়া চাকর তৎক্ষণাৎ আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া মোহরগুলি আমাকে দেখাইল। তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত খুসী হইয়া সাদীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "এখন পরমেশ্বর আমার মানরক্ষা করেছেন। আমাকে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে যে আমি একশ নব্বই মোহর জালার ভিতর রেখেছিলাম তা আবার ফিরে পেয়েছি।" এই বলিয়া ঐ মুদ্রাগুলি গণিয়া তাঁহাদের সামনে রাখিলাম। তখন সাদী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সাদকে বলিলেন, "আমি যে মনে করেছিলাম টাকা না হলে ধনোপার্জ্জন হয় না, এখন আমার সে ভ্রম দূর হল, এবং আমি নিশ্চয় বুঝতে পারলাম যে, কেবল ধনেই ধনোৎপত্তি হয় এমন নয়। অন্য উপায়েও হতে পারে।"

তখন আমি সাদীকে বলিলাম, "মহাশয়! আপনি আমাকে যে-টাকা দান করেছিলেন সেটা ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হয় না। কারণ আপনি ত ফিরে পাবার আশায় দান করেননি, এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমারও যথেষ্ট ধন হয়েছে। অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন তবে এই ধন দীনদুঃখীদের বিতরণ করি।" তাহার পর দুই বন্ধু সে রাত্রি আমার বাড়ীতে কাটাইয়া পরদিন সকালে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেদের বাড়ীর পথে যাত্রা করিলেন। আমিও তাঁহাদের সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, এবং এখন পর্য্যন্তও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া থাকি, এবং তাঁহারাও আমার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি দেখাইয়া থাকেন।

মহারাজা হারুন-অল-রশীদ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া এই কাহিনী শুনিয়া বলিলেন, "খাজা হোসেন! আমি অনেক কাল এমন আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিনি। পরমেশ্বর তোমাকে যে বিপুল অর্থ দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কিন্তু তুমি মাছের পেটে যে বহুমূল্য রত্ন পেয়েছিলে, এবং যার সাহায্যে তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়েছে, সেটা আমি কিনে আমার রত্নভাণ্ডারে রেখেছি!"

তাহার পর রাজা খাজা হোসেনের মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিলেন, সমস্ত লিখাইয়া ঐ মণির সঙ্গে রাখিয়া দিলেন।

আলীবাবা এবং এক ক্রীতদাসী কর্তৃক চল্লিশজন দস্যু বিনাশের বিবরণ

পারস্য দেশের এক শহরে দুই ভাই বাস করিতেন। বড়র নাম কাশিম আর ছোটর নাম আলীবাবা। তাঁহাদের পিতা পরলোকে যাইবার সময় যে কিঞ্চিৎ বিষয় রাখিয়া যান, তাহা তাঁহারা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়েন। তাহার পর কাশিম যে মেয়েকে বিবাহ করিলেন, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একটি মস্ত বড় ভূসম্পত্তি এবং বহুমূল্য জিনিষে পরিপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট দোকান ও একটি প্রকাণ্ড গোলাবাড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া শহরে একজন ধনবান্ বণিক্ বলিয়া পরিচিত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আলীবাবাও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় ভাইয়ের মত সৌভাগ্যবান হইতে পারেন নাই। তিনি একটি সামান্য বাড়ীতে বাস করিতেন, এবং প্রতিদিন কাছেরই এক জঙ্গলে গিয়া নিজের হাতে কাঠ কাটিয়া তিনটি গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া শহরে আনিয়া তাহাই বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তাহা দিয়া অতি কষ্টে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণ করিতেন।

এক দিন আলীবাবা বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া গাধার পিঠে বোঝাই করিতেছেন, এমন সময়ে সামনে দিয়া অনবরত ধূলি উড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া সেই দিকে মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করাতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একদল ঘোড়সওয়ার খুব জোরে সেই দিকে আসিতেছে। আলীবাবা ঐ ঘোড়সওয়ারদের দস্যু মনে করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায়, তিনটি গাধার যে কি হইবে সে-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া অবিলম্বে এক ঘন ডালপালায় ঘেরা গাছের ডালে চড়িয়া লুকাইয়া থাকিলেন। গাছটি মস্ত বড় এবং একটা উচ্চ পাহাড়ের উপরে জন্মিয়াছিল বলিয়া কেহই সহজে তাহাতে উঠিতে পারে না। আলীবাবা ঐ গাছের উপর থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

অস্ত্রধারী লোকগুলি পাহাড়ের তলায় আসিয়া একে একে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিতে লাগিল। আলিবাবা গণিয়া দেখিলেন, তাহারা সর্ব্বসুদ্ধ চল্লিশজন, এবং তাহাদের সাজ সজ্জা দেখিয়া পরিষ্কার বোধ হইল যে, তাহারা দস্যু না হইয়া যায় না। দস্যুরা প্রতিবেশীদের উপর কোনো অত্যাচার না করিয়া দূরের লোকের ধনসম্পত্তি লুট করিয়া ঐখানে জমা করিতে আসিত। আপন আপন ঘোড়া গাছতলায় বাঁধিয়া প্রত্যেকেই সোনা ও রূপায় পরিপূর্ণ এক একটি থলিয়া কাঁধে করিয়া লইল। তাহাদের মধ্যে এক জন প্রধান ছিল।

আলীবাবা যে গাছে চড়িয়াছিলেন, তাহার পাশ দিয়া সে নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, "সিসেম্, দরজা খোল।" আলীবাবা ঐ কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। দস্যুপতি ঐ কথা উচ্চারণ করিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। দস্যুরা একে একে তাহার মধ্যে ঢুকিবামাত্র দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে আলীবাবা গাছের উপরেই থাকিলেন, কোনোমতেই তাঁহার নামিতে সাহস হইল না। অনেকক্ষণের পর আবার ঐ গহ্বরের দরজা খুলিয়া গেল, এবং একে একে ডাকাতের দল তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলে, প্রধান দস্যু বলিল, "সিসেম্, দরজা বন্ধ কর।" এ-কথাও আলীবাবার কানে পৌঁছিল। তখন চল্লিশজন দস্যু নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল। দস্যুদল একবারে দৃষ্টির বাহির হইলে পর, আলীবাবা গাছের উপর হইতে নামিলেন, এবং দরজা খোলা ও বন্ধ করিবার কথাগুলি মনে করিয়া তাহার সাহায্যে নিজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ বনের মধ্যে ঢুকিলেন। তাহার পর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দস্যুর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। তখন আলীবাবা তাহার ভিতর একটি গহ্বর দেখিয়া মনে করিলেন, ঐ গহ্বরটি নিশ্চয় খুব অন্ধকার, কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে সেখান হইতে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত এমন একটি ফুকর খোঁড়া আছে, যাহাতে ভিতরে যথেষ্ট আলো আসিতেছে। তিনি আরো দেখিলেন ভিতরে রাশি রাশি সোনা রূপা সাজানো রহিয়াছে, এবং রূপা ও সোনার মোহরের তোড়া যে কত আছে, তাহা সংখ্যা শক্ত। আলীবাবা ইহা দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনটি গাধার পিঠে বোঝাই করার মত কেবল স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ কয়েকটী তোড়া ক্রমে ক্রমে বাহিরে আনিলেন, রূপার জিনিষে হাতও দিলেন না। ঐ-সমস্ত তোড়ায় আপন থলিয়া পূর্ণ করিয়া তিনটি গাধার পিঠে তুলিয়া দিলেন, এবং উহাতে কাহারও চোখ না পড়ে, এই মতলবে উপরে কাঠ দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তাহার পর দরজা বন্ধ করার মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া গহ্বরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনটি গাধা লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। আলীবাবা বাড়ী আসিয়াই ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন এবং থলিয়ার উপরের কাঠগুলা দূরে ফেলিয়া দিয়া যে-ঘরে তাঁহার স্ত্রী একখান খাটে বসিয়া ছিল, সেই ঘরে সমস্ত মোহরের তোড়া লইয়া তাহার সামনে সাজাইয়া রাখিলেন। তাঁহার স্ত্রী ঐ-সমস্ত সোনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার স্বামি যে, চুরি করিয়া উহা আনিয়াছেন, মনে মনে এই সন্দেহ করিয়া কহিল, "হে স্বামি! তোমার কি নীচ প্রবৃত্তি যে তুমি চুরি—" তাঁহার স্ত্রীর মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা বাহির হইতে-না-হইতেই আলীবাবা বলিলেন "প্রেয়সী! চুপ কর, ভয় পেয়ো না, আমি চোর নয়, কিন্তু চোরের ধন এনেছি বটে।" ইহা বলিয়া থলিয়া হইতে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত কথা জানাইলেন।

তাঁহার স্ত্রী রাশীকৃত মোহর দেখিয়া চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়া তাহা এক একটি করিয়া গণিতে লাগিল; তখন আলীবাবা কহিলেন; "এত মোহর গোণা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আমি একটি গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে এই-সমস্ত মোহর পুঁতে রাখি, আর দেরি করতে পারি না।" স্ত্রী উত্তর করিল, "হে নাথ! তুমি সদ্যুক্তি করেছ বটে, কিন্তু আমাদের কত টাকা রইল, তার একটা সংখ্যা করে রাখা উচিত। অতএব আমি কোনো প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা দাঁড়ি আনছি, মোহরগুলি তৌলে রাখতে হবে; ইতিমধ্যে তুমি গর্ত্ত খুঁড়ে রাখ।" আলীবাবা বলিলেন, "তা করতে চাও কর। কিন্তু সাবধান যেন একথা কারও কাছে প্রকাশ না হয়।"

এই-কথা শুনিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী ছুটিয়া কাশিমের বাড়ী গেল, এবং সেখান হইতে একগাছি দাঁড়ি আনিয়া সমস্ত মোহর ওজন করিয়া দিল। তখন আলীবাবা গর্ত্ত খুড়িয়া তাহার মধ্যে ঐ-সমস্ত টাকা পুঁতিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী দাঁড়ি লইয়া কাশিমের বাড়ীতে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। কিন্তু দাঁড়ির নীচে যে একটি মোহর লাগিয়া ছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। আলীবাবার স্ত্রী ফিরিয়া যাইবার পরেই কাশিমের স্ত্রী দেখিল যে, দাঁড়ির নীচে একটি মোহর লাগিয়া রহিয়াছে। তাই দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কি! আলীবাবার এত টাকা হয়েছে যে, সে গুণতে না পেরে দাঁড়িতে ওজন করে? সে এতটাকা কোথায় পেলে?" সন্ধ্যাবেলায় কাশিম বাড়ী আসিবামাত্র তাহার স্ত্রী খুব মুখ নাড়া দিয়া বলিল, "কিগো! তুমি যে নিজেকে বড় ধনী মনে কর, সে-সবই তোমার ভুল জানো? আলীবাবা এমন ধনী হয়েছে যে, সে তার টাকা গুণতে না পেরে দাঁড়িতে তৌলায়।" কাশিম এ-কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কেমন?" স্ত্রী তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া শেষে দাঁড়ির তলায় যে মোহর পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখাইল। কাশিমও তাহা দেখিয়া হিংসায় অস্থির হইয়া দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রির মধ্যে চোখ বুজিতে পারিলেন না। পরদিন সূর্য্য ওঠার আগেই কাশিম ভ্রাতার কাছে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলীবাবা! আজকাল তুমি এমন কি ধনী হয়েছ যে, টাকা গুণতে পার না? তবে কিজন্যে এমন কষ্টে দিন কাটাও?" আলীবাবা বলিলেন, "ভাই! তুমি যে কি বলছ তার কিছুই বুঝতে পারছি না।" তখন কাশিম আপন স্ত্রীর কাছে যে মোহরটি পাইয়াছিলেন, তাহা আলীবাবার হাতে দিয়া কহিলেন, "তুমি কাল আমার বাড়ী থেকে যে দাঁড়ি এনেছিলে, তার তলায় ঐ মুদ্রাটি লেগেছিল। অতএব সত্যি করে বল দেখি, এমন মোহর তোমার কতগুলি আছে?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা ভাবিলেন, তাঁহার স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই কাশিম ও তাহার স্ত্রী সমস্ত গুপ্ত ব্যাপার জানিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব আর গোপন না করিয়া যে উপায়ে অর্থলাভ করিয়াছেন, অগত্যা সে-সব কথা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাকে আমার অর্থের কিছু ভাগ দিচ্ছি, তুমি এ-কথা

কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।” তাই শুনিয়া কাশিম গর্বিতভাবে কহিলেন, “তুমি যেখান থেকে টাকাকড়ি এনেছ, তা আমাকে দেখাতে হবে। যদি তুমি না দেখাও তবে আমি এই খবর নগরের সব জায়গায় প্রচার করে দেবো। তা হলে, তোমার আবার ঐখান থেকে ধন আনা দূরে থাকুক, তোমার যা কিছু আছে তাতেও বঞ্চিত হয়ে তোমাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে হবে।”

দাঁড়ির তলায় যে মোহর পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখাইল

আলীবাবা লোক ভালই ছিলেন, তাই ভাইকে যে কেবল ধন-ভাণ্ডারের খোঁজ বলিয়া দিলেন তাহা নয়, যে মন্ত্র বলিয়া দরজা খোলা ও বন্ধ করা যায় তাহাও শিখাইয়া দিলেন। কাশিম আলীবাবার মুখে সমস্ত সংবাদ জানিয়া গহ্বরের সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছায় পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই দশটি অশ্বতরী ও কতকগুলি থলিয়া লইয়া একলা ঐ নির্দিষ্ট বনের দিকে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া খোঁজ করিয়া গহ্বরের দরজা দেখিবামাত্র কহিলেন, “সিসেম্ দরজা খোল।” অমনি দরজা খুলিয়া গেল। কাশিম গহ্বরমধ্যে ঢুকিবামাত্র আবার দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

কাশিম গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া সেখানকার অপর্য্যাপ্ত সোনা রূপা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। পরে দশটি অশ্বতরীর উপযুক্ত নানা-রকম বহুমূল্য জিনিষে থলিয়াগুলি পরিপূর্ণ করিয়া দরজা খুলিবার ইচ্ছায় তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু

মহানন্দে মাতিয়া দরজা খোলার মন্ত্রটি ভুলিয়া গেলেন। ঐ মন্ত্রের বদলে কতবার কত-রকম কথা উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই দরজা খুলিল না, তখন নিরুপায় হইয়া দরজার কাছে বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

দুপুর বেলা দস্যুদল ফিরিয়া আসিয়া গহ্বরের কিছুদূরে কাশিমের অশ্বতরীগুলাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, বুঝি কোন লোক তাহাদের ধন-দৌলত চুরি করিতে আসিয়াছে। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া গহ্বরের দরজা খুলিবামাত্র কাশিম ভিতর হইতে পলাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া তাহার পর গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, টাকায় ভরা অনেক থলিয়া দরজার কাছে রহিয়াছে। তাহাতে তাহারা মনে করিল, এ ব্যক্তি পাহাড়ের উপরের ফুকর দিয়া গহ্বরে নামিয়াছে। কিন্তু, দরজা বন্ধ থাকাতে উহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহা মনে করিয়া দস্যুরা ঐ মুদ্রাগুলি আগের মত সাজাইয়া রাখিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের টাকা চুরি করিতে যে আসিবে, তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য কাশিমের মৃতদেহ চারি টুকরা করিয়া দরজার দুই পাশে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর সকলেই গহ্বরের দরজা বন্ধ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে কাশিমের স্ত্রী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বামীর ফিরিবার আশায় প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল, তিনি আসিলেন না, তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আলীবাবার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! আজ খুব ভোরে আমার স্বামী বনে গিয়েছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফিরলেন না। অতএব তাঁর কি হয়েছে বলতে পার?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা আর কোন কথার উল্লেখ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "আমার ভাই অতি বিজ্ঞ, নির্ব্বোধ নন, বোধ হয় দিনে ধন আনলে কেউ দেখতে পাবে এই আশঙ্কায় তিনি রাত্রি বেলা আসবেন ঠিক করেছেন, সেইজন্য এত দেরি হচ্ছে।" কাশিমের স্ত্রী এই কথায় শান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়া স্বামীর আশায় বসিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যে তিনি আসিলেন না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পরদিন ভোরে আবার আলীবাবার বাড়ীতে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আলীবাবা তাঁহার ভ্রাতৃবধূ আসিবার আগেই তিনটি গাধা লইয়া ঐ বনের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু গহ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার বাহিরে জায়গায় জায়গায় রক্তের চিহ্ন দেখিয়া এবং পথে কোথাও কাশিম কিংবা তাঁহার অশ্বতরীর কোনো চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয় তাঁহার কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। তখন আগেকার মত মন্ত্র পড়িয়া শীঘ্র দরজা খুলিবার জন্য তাহার কাছে যাইয়া দুই পাশে নিজের ভাইয়ের শরীরের চারটুকরা ঝুলান রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আলীবাবা তখন আর কি করিবেন, ভাইকে কবর দিবার জন্য ঐ চারিখণ্ড দেহ একত্র করিয়া একটা গাধার পিঠে তুলিয়া দিয়া তাহার উপর কতকগুলা কাঠ চাপা দিলেন। পরে আর দুইটা

গাধায় মোহর বোঝাই করিয়া গহ্বরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনটা গাধা লইয়া সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিজের স্ত্রীকে মোহর তুলিয়া রাখিতে বলিয়া অন্য গাধাটি তাড়াইয়া লইয়া কাশিমের স্ত্রীর কাছে গেলেন।

আলীবাবা দরজায় ঘা দিবামাত্র মরজিয়ানা নামে কাশিমের এক বুদ্ধিমতী ক্রীতদাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে কাশিমের স্ত্রীর কাছে লইয়া গেল। কাশিমের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিল, "ভাই, আমার স্বামীর খবর কি বল? তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার বড় ভয় হচ্ছে।" আলীবাবা বলিলেন, "ভগিনী! আমি তোমার কাছে আগাগোড়া সবকথাই বলছি, কিন্তু সাবধান একথা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ করে ফেলো না।" কাশিমের স্ত্রী রাজি হইলে, আলীবাবা আগাগোড়া সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "হে ভগিনী! এই দুর্ঘটনায় তুমি যে বড়ই মনস্তাপ পেয়েছ, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করবে বল, এতে আর কোনো উপায় নাই। এখন তোমার সুবিধার জন্য আমি তোমাকে আমার ঘরে স্থান দিতে রাজি আছি। এতে তোমার মত কি?"

কাশিমের স্ত্রী চোখের জল মুছিয়া আলীবাবার প্রস্তাবে রাজী হইল। তখন আলীবাবা ক্রীতদাসী মরজিয়ানাকে কাশিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

চতুরা মরজিয়ানা কাছের একটি বৈদ্যের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া সাংঘাতিক পীড়া নিবারণের কিছু ঔষধ চাহিল। কবিরাজ মূল্যের উপযুক্ত ঔষধ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বাড়ীর কার অসুখ হয়েছে?" মরজিয়ানা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মহাশয়! আমার প্রভু কাশিমেরই পীড়া হয়েছে। তাঁর রোগ বড় সহজ নয়, তিনি দুই তিন দিন ধরে কিছুই আহার করতে পারেননি।" মরজিয়ানা এই-কথা বলিয়া তখনি ঔষধ লইয়া বাড়ীতে আসিল, এবং পরদিন ভোরে আবার ঐ বৈদ্যের নিকট হইতে আর একটা শক্ত ঔষধ আনিল.

এদিকে প্রতিবেশীরা আলীবাবা ও তাহার স্ত্রীকে অতি বিমর্ষভাবে সমস্ত দিন বারবার কাশিমের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু কিজন্য যে তাঁহারা অমন করিতেছিলেন তাহার কোনো কারণ বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন সন্ধ্যার সময় কাশিমের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কাশিমের স্ত্রী এবং মরজিয়ানা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন আর তাহাদের মনে অন্য কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিল না। সে যাহা হউক পরদিন ভোরে মরজিয়ানা বাবা মুস্তফা নামে এক বুড়ো মুচির দোকানে গিয়া তাহার হাতে একটি মোহর দিল। বাবা মুস্তফা মোহরটি লইয়া বলিল, "আমাকে কি করতে হবে বল।" মরজিয়ানা বলিল, "তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, সেখানে কোনো জিনিষ সেলাই করতে হবে, কিন্তু সেখানে যাবার আগে তোমার চোখ দুটি বেঁধে রাখব।" তাহাতে মুস্তফা

বলিল, "তুমি বুঝি আমাকে দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করিয়ে নেবে?" মরজিয়ানা তাহার হাতে আর একটি মোহর দিয়া বলিল, "তোমাকে অপমানজনক কোনো কাজ করতে হবে না। সে বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল। ইহা শুনিয়া মুস্তফা তাহার সহিত চলিল

ইহা শুনিয়া মুস্তফা মরজিয়ানার সহিত চলিল

মরজিয়ানা কিছুদুর গিয়া একখানা রুমালে মুস্তফার চোখ বাঁধিয়া কাশিমের বাড়ীর যে ঘরে মড়া ছিল, তাহাকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া চোখের কাপড় খুলিয়া দিয়া বলিল, "বাবা মুস্তফা, তুমি খুব তাড়াতাড়ি এই কাটা শরীরটা সেলাই কর, তা হলে তোমাকে আর একটি মোহর দেবো।" ইহা শুনিয়া মুচি সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। সেলাই শেষ হইলে পর মরজিয়ানা আবার তাহার চোখ বাঁধিয়া যেখানে আগে তাহার চোখে ঢাকা দিয়াছিল, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার চোখ খুলিয়া দিয়া তাহাকে আর-একটি মোহর দিয়া, সে যেন একথা কাহারো নিকট প্রকাশ না করে, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিল। তাহার পর আপনিও বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

মরজিয়ানা বাড়ী আসিয়াই গরম জল করিয়া তাহাতে কাশিমের মৃতদেহ স্নান করাইল। আলীবাবা নানা-রকম সুগন্ধি দ্রব্য আনিয়া দিতে মরজিয়ানা সেই-সমস্ত কাশিমের গায়ে মাখাইয়া দিল। তখন একটা সিন্দুক আনিয়া একখানি নূতন কাপড়ে কাশিমের মড়া ঢাকা দিয়া ঐ সিন্দুকের মধ্যে তাহা পূরিয়া ফেলিল। সব শেষে মসজিদে গিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। মস্‌জিদের অধ্যক্ষ এই সংবাদ পাইবামাত্র অন্যান্য কয়েকজন ধর্ম্মযাজককে সঙ্গে লইয়া কাশিমের বাড়ী আসিলেন। তাহার পর চারিজন প্রতিবেশী সিন্দুক সমেত কাশিমের মৃতদেহ কাঁধে লইয়া গোরস্থানের পথে যাইতে লাগিল, ধর্ম্মযাজকেরা ঈশ্বরোপাসনা করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, মরজিয়ানা কাঁদিতে কাঁদিতে পিছন পিছন যাইতে লাগিল। আলীবাবাও কতকগুলি প্রতিবেশীকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মযাজকদিগের সঙ্গে-সঙ্গে চলিলেন। কাশিমের স্ত্রী বাড়ীতে থাকিয়া প্রতিবেশিনী মেয়েদের সঙ্গে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমনি করিয়া কাশিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। কিন্তু আলীবাবা ও তাঁহার স্ত্রী এবং কাশিমের বিধবা স্ত্রী ও মরজিয়ানা এই চারিজন ছাড়া আর কেহই তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানিতে পারিল না।

আলীবাবার এক ছেলে ছিল সে অনেক দিন ধরিয়া একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের কাছে কাজ শিখিত। আলীবাবা ছেলের সুখ্যাতি শুনিয়া তাহার হাতেই কাশিমের দোকানের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন।

এদিকে দস্যুরা নিয়মিত সময়ে আপনাদের গহ্বরে ফিরিয়া আসিলে দস্যুপতি কাশিমের মৃতদেহ সেখানে নাই এবং তাহাদের জমানো টাকাকড়িও অনেক কমিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এখন সতর্ক না হলে আমাদের বহুদিনের জমানো সমস্ত অর্থ হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হতেই হবে। আমরা সে দিবস যে চোরকে মেরেছিলাম, তার মৃতদেহ কোথায় গেল? নিশ্চয় তার একজন সহযোগী আছে। আমাদের অনুপস্থিতির সময়ে সে এইখানে এসে ঐ মৃতদেহ এবং সেইসঙ্গে আমাদের ধন নিয়ে গিয়েছে। অতএব তার প্রাণসংহার না করলে আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই। হে দস্যুগণ! আমি এই পরামর্শ স্থির করেছি, আমাদের মধ্যে থেকে একজন খুব সাহসী ও চালাক লোক বিদেশী পথিকের বেশ ধরে নগরে যাও, এবং আমরা যাকে মেরেছি, নগরবাসীরা তার মৃত্যু-সম্বন্ধে কে কি বলছে, তাই শুনে আমাদের শত্রুর নাম ও ধাম নির্ণয় করে এস। কিন্তু তোমাদের উৎসাহ বাড়াবার জন্যে আমি একথাও বলে রাখছি যে, যে ব্যক্তি সাহস করে এই গুরুতর কাজের ভার গ্রহণ করবে, সে যদি কোনো সংবাদ না নিয়ে ফিরে আসে, তা হলে তার প্রাণবধ করা হবে।"

এই-কথা শুনিয়া একজন দস্যু সাহস করিয়া সেই রাত্রিতেই পথিকের বেশ ধরিয়া নগরের দিকে যাত্রা করিল এবং সূর্য্যোদয়ের কিছু আগে নগরে ঢুকিয়া দেখিল, কেবল একখানি মাত্র মুচির দোকান খোলা আছে। ঐ দোকান বাবা মুস্তফার। দস্যু বাবার কাছে গিয়া

কহিল, "ওহে বৃদ্ধ! এখনও অল্প অল্প অন্ধকার আছে, তুমি কি করে কাজ করবে? তুমি কি এখন দেখতে পাচ্ছ?" এই-কথা শুনিয়া বাবা মুস্তফা কহিল, "আমি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু আমার চোখের জুত এমন আছে যে, সেদিন এর চেয়ে অন্ধকার সময়েও অনায়াসে একটা মড়া সেলাই করে এলাম।" দস্যু এই-কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি মড়া সেলাই করেছ? সে কি রকম? বোধ হয় তুমি মৃতদেহের আচ্ছাদনবস্ত্র সেলাই করে থাকবে।" বাবা মুস্তফা বলিল, "সে বড় গোপনীয় কথা। সে-বিষয়ে আমি এর চেয়ে আর বেশী বলতে পারি না। যা হোক, আমি যা বললাম তা মিথ্যা নয়।"

দস্যু বাবা মুস্তফার সাহায্যে সমস্ত খোঁজ পাইবার আশায় তাহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, "আমি তোমার গুপ্তকথা শুনতে চাই না, কিন্তু তুমি যে বাড়ীতে শব সেলাই করে এসেছ, তা তোমাকে দেখাতে হবে।" বাবা মুস্তফা মোহর লইয়া বলিল, "তোমার সাধ পূর্ণ করি এই আমার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু কি করি, তা আমার সাধ্যাতীত।" এই বলিয়া তাহাকে কেমন করিয়া অনেক দূর হইতে দুই চোখ বাঁধিয়া শব সেলাই করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, আগাগোড়া সেই সমস্ত বর্ণনা করিল। দস্যু বলিল, "ওহে বৃদ্ধ! সেখানে যাবার সময় যেখানে তোমার চোখ বাঁধা হয়েছিল, এস, আমিও সেইখানেই তোমার চোখ দুটি বেঁধে দেবো, তা হলে বোধ হয় তুমি যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলে, অনুমান করি সেই পথ ধরে ঠিক বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারবে।" এই-কথা বলিয়া পোষাকের ভিতর হইতে আর-একটি মোহর বাহির করিয়া তাহাকে দিল

বাবা মুস্তফা দুইটি মোহর পাইয়া লোভে এমনি পাগল হইয়াছিল যে, দোকানের দরজা বন্ধ না করিয়াই তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঐ বাড়ীর উদ্দেশে চলিল।

কিছুদূর গিয়াই বলিল, "এইখান থেকেই আমার দুই চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল।" ইহা শুনিয়া দস্যু তৎক্ষণাৎ নিজের রুমাল দিয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিল। তখন বাবা মুস্তফা ধীরে ধীরে কিছুদূর গিয়া বলিল, "তোমাকে আর যেতে হবে না, বোধ হয় আমি এই পর্য্যন্তই এসেছিলাম।" এই বলিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। দস্যু তৎক্ষণাৎ তাহার চোখ খুলিয়া দিয়া তাহাকে সেখান হইতে বিদায় করিল। তার পর ঐখানের কাছেই একটি মস্ত বাড়ী দেখিয়া মনে মনে এইটিই মৃত ব্যক্তির বাড়ী হইবে, স্থির করিয়া পোষাকের ভিতর হইতে একখানি ফুলখড়ী বাহির করিয়া ঐ বাড়ীর দরজায় এক-রকম চিহ্ন দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন মরজিয়ানা কোনো কাজে বাহিরে গিয়াছিল। ফিরিবার সময় দরজায় চিহ্ন দেখিয়া মনে মনে ঠিক করিল, বুঝি কোনো দুষ্ট লোক আমার প্রভুর অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় দরজায় এ-রকম চিহ্ন দিয়া থাকিবে। অতএব তাহা দূর করিবার জন্য সেই পাড়ার সমস্ত বাড়ীর দরজায় ঐ-রকম খড়ির চিহ্ন দিয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে ডাকাতটা গহ্বরে ফিরিয়া আসিয়া সহচরদের কাছে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিল। তাই শুনিয়া দস্যুপতি তাহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাহার সঙ্গে ছদ্মবেশে

আলীবাবার বাড়ী দেখিতে গমন করিল। আলীবাবার বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইয়া সেই পাড়ার সকল বাড়ীর দরজাতেই একরকম খড়ির চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার যে কোন্ বাড়ী তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া বনমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দস্যুপতি নিজ সঙ্গীদের কাছে সমস্ত বিবরণ বলিয়া তাহাদের মত লইয়া তৎক্ষণাৎ মিথ্যাবাদীর মাথা কাটিতে অনুমতি দিল। তখন আরএকজন দস্যু ঐ-রকম খোঁজ করিয়া আলীবাবার বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইয়া, দরজার এমন জায়গায় একটা লাল চিহ্ন দিয়া আসিল যে, হঠাৎ কেহই তাহা দেখিতে না পায়। কিন্তু মরজিয়ানার কৌশলে সেও দস্যুপতিকে বাড়ী দেখাইতে পারিল না। ইহাতে দস্যুপতি অত্যন্ত রাগিয়া তাহারও প্রাণবধ করিল।

এইভাবে দুইজন দস্যুর মৃত্যু হইলে, সর্দার আর কাহাকেও না পাঠাইয়া আপনিই ছদ্মবেশ ধরিয়া শহরের দিকে যাত্রা করিল। সেখানে বাবা মুস্তফার কাছে আলীবাবার বাড়ীর সন্ধান লইয়া তাহার দরজায় আর কোনো চিহ্ন না দিয়া ঐ বাড়ী চিনিয়া রাখিবার জন্য তাহার সামনে দিয়া কয়েকবার যাওয়া আসা করিল। পরে বনে ফিরিয়া আসিয়া দস্যুদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে বন্ধুগণ! আমি নিজে অনেক অনুসন্ধান করে সেই পাপিষ্ঠের বাড়ী খোঁজ করে এসেছি। এখন তোমরা বিশেষ খোঁজ করে উনিশটি অশ্বতরী আর আটত্রিশটি কুপো কিনে আন, তার মধ্যে কেবল একটিতে মাত্র তেল এবং বাকি শূন্য থাকবে।" ইহা শুনিয়া দস্যুরা দুই তিন দিনের মধ্যে অশ্বতরী ও কুপো কিনিয়া আনিল। তখন দস্যুপতি সাঁইত্রিশটা কুপোর মধ্যে অস্ত্র-সহিত সাঁইত্রিশজন দস্যুকে ঢুকাইয়া কুপোর মুখ বন্ধ করিল, কেবল তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য কয়েক জায়গায় কয়েকটি ছিদ্র রাখিয়া দিল। তাহার পর প্রত্যেক কুপোর গায়ে এমনি ভাবে তেল মাখাইয়া দিল যে, লোক দেখিলেই মনে করিবে ঐ-সমস্ত কুপো তেলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

তখন প্রতি অশ্বতরীর পিঠে দুই দুইটা কুপো তুলিয়া দিয়া নিজে তৈলব্যবসায়ীর বেশ ধরিয়া ঐ উনিশটি অশ্বতরী লইয়া সন্ধ্যার সময় আলীবাবার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি অনেকদূর থেকে তেল বিক্রয় করতে এসেছি, কিন্তু কোথাও থাকবার জায়গা পেলাম না। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করে আজ রাত্রির জন্য আপনার বাড়ীতে স্থান দান করেন, তা হলে আমি উপকৃত হই।" ইহা শুনিয়া আলীবাবা একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই অশ্বতরীগুলাকে আস্তাবলে রেখে এস, এবং এই তৈল-ব্যবসায়ীকে আজ রাত্রির জন্য একটি ভাল যায়গায় থাকতে দাও। তার পর মরজিয়ানাকে ডেকে একজন বিদেশী ব্যবসায়ীর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করতে এবং খাবার পর এঁকে ভাল বিছানা দিতে বলে এস।"

আহারাদি প্রস্তুত হইলে আলীবাবা ছদ্মবেশী তৈল-ব্যবসায়ীকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে গল্প করিলেন। তাহার পর মরজিয়ানাকে ডাকিয়া ঐ

ব্যক্তির যখন যাহা আবশ্যক তাহা দিতে বলিয়া নিজে শুইতে গেলেন। দস্যুপতি আস্তাবলে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

আলীবাবার শুইবার কিছুক্ষণ পরেই দস্যুপতি অতি ধীরে ধীরে অশ্বশালা হইতে আসিয়া প্রত্যেক কুপোর কাছে গিয়া একে একে সকল দস্যুকে বলিল, "যখনি এখানে কয়েকটা পাথর ফেলব, তখনি তোমরা নিজের নিজের অস্ত্র নিয়ে কুপো থেকে বাহির হবে, এবং আমিও তৎক্ষণাৎ তোমাদের সঙ্গে এসে জুটব।" এই বলিয়া দস্যুপতি আবার আস্তাবলে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। মরজিয়ানা তখন রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে প্রদীপের তেল ফুরাইয়া যাওয়াতে সে আবদুল্লা নামক ক্রীতদাসকে ডাকিয়া বলিল, "এখন প্রদীপে একফোঁটাও তেল নেই। এর উপায় কি বল দেখি?" আবদুল্লা বলিল, "তেলের জন্য এত চিন্তা করছ কেন? তৈল-ব্যবসায়ীর এত কুপো রয়েছে। তুমি এখনি গিয়ে তার থেকে একটু তেল নিয়ে এস।" মরজিয়ানা আবদুল্লার এই-কথা শুনিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া একটা তেলের পাত্র হাতে লইয়া তৈলাগারে ঢুকিল।

সে প্রথম কুপোর কাছে যাইবামাত্র তাহার ভিতরকার দস্যু ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "সময় হয়েছে কি? মরজিয়ানা কুপোর মধ্যে মানুষের গলার স্বর শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কিন্তু তখন চীৎকার না করিয়া উত্তর করিল, "না এখন নয়, কিছুক্ষণ দেরি আছে।" এই-কথা বলিয়া সে একে একে প্রত্যেক কুপোর কাছে গেল। সকল কুপোর দস্যুরাই তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মরজিয়ানা তাহাদিগকে একই উত্তর দিল। শেষে যে কুপোতে তেল ছিল তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার ভিতর হইতে কিছু তেল লইয়া, "আমার প্রভু তৈল-ব্যবসায়ী মনে করিয়া দস্যুকে বাসা দিয়াছেন," মনে মনে এই চিন্তা করিতে করিতে রান্নাঘরে গিয়া প্রদীপ জ্বালিল। তাহার পর আর একটা প্রকাণ্ড পাত্র আনিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ কুপো হইতে সমস্ত তেল লইয়া গিয়া আগুনে খুব করিয়া গরম করিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি অনেকখানি করিয়া ঐ গরম তেল প্রত্যেক কুপোতে ঢালিয়া দিল, তাহাতে ভিতরের সব কটি দস্যুই একসঙ্গে মরিয়া গেল।

তখন মরজিয়ানা রান্নাঘরের সব কাজ শেষ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া শুইতে না গিয়া, ছদ্মবেশী দস্যুপতি আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্য রান্নাঘরে জানালায় মুখ দিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার একটু পরেই দস্যুপতি জাগিয়া জানালা খুলিয়া বার বার পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনো লোক বাহির হইল না দেখিয়া আস্তে আস্তে প্রত্যেক কুপোর কাছে গিয়া, "দস্যুরা বুঝি ঘুমাইয়াছে", মনে মনে এই ভাবিয়া অতি মৃদুস্বরে তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও যখন কোনো উত্তর পাইল না তখন নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাই দেখিয়া দস্যুপতি অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাগানের পাঁচিল ডিঙাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিল।

এমনি করিয়া দস্যুপতি পলাইবার পর মরজিয়ানা দস্যুর কবল হইতে প্রভুকে রক্ষা করিল ভাবিয়া আনন্দিত মনে বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া আপনার শুইবার ঘরে গেল। কিন্তু সে-রাত্রিতে আলীবাবাকে জাগাইয়া ঐ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই বলিল না।

গরম তেল প্রত্যেক কুপোতে ঢালিয়া দিল

পরদিন অতি ভোরে আলীবাবা বিছানা হইতে উঠিয়াই স্নান করিতে গেলেন, এবং স্নানের ঘর হইতে ফিরিবার সময় গতরাত্রিতে বণিক যে-সমস্ত তেলের কুপো এবং অশ্বতরী লইয়া আসিয়াছিল, সে-সমস্তই বাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মরজিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মরজিয়ানা এই-কথা শুনিয়া আলীবাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু! জগদীশ্বর যে কাল আপনাকে এবং আপনার পরিজনবর্গকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছেন সেজন্যে আগে তাঁকে ধন্যবাদ দিন, তার পরে আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সমস্ত ব্যাপার দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া মরজিয়ানা আলীবাবাকে সঙ্গে লইয়া একে একে কুপোর মধ্যের সমস্ত মৃতদেহ বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইল। তাই দেখিয়া আলীবাবা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন মনে করিয়া মরজিয়ানা আবার বলিল, "মহাশয়! গোল করবেন না, তা হলে, হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা।" তখন আলীবাবা আর কোনো কথা না কহিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "মরজিয়ানা!

তৈল-ব্যবসায়ীর কি হল ?" মরজিয়ানা বলিল. "মহাশয় ! তার যে কি হয়েছে এবং সে যে কে, তার বিবরণ আপনাকে বলছি, শুনুন।" এই বলিয়া মরজিয়ানা আলীবাবাকে আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল, "মহাশয় ! এই-রকম একটা দুর্ঘটনা যে উপস্থিত হবে, আমি তা আগেই জানতে পেরেছিলাম, কিন্তু তখন আপনাকে জানালে, কোনো ফল হবে না, মনে করে, আপনাকে সে-বিষয়ে আর কিছুই বলিনি। একদিন আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেখলাম, দরজার উপরে একটা ফুলখড়ির চিহ্ন রয়েছে। তাতে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রতিবেশীদের সমস্ত বাড়ীর দরজায় ঠিক সেইখানে ঐ রকম ফুলখড়ির চিহ্ন দিয়ে এলাম। তার পরদিন আবার বাড়ী থেকে বাইরে যাবার সময়ে দেখলাম যে, দরজার এক কোণে এক-রকম লাল-চিহ্ন রয়েছে, তাতে আমি সেদিনও প্রতিবেশীদের সমস্ত বাড়ীর দরজায় ঠিক সেইখানে ঐ রকম লাল-চিহ্ন দিয়ে এলাম। তাইতেই আপনার শত্রুদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হতে পারেনি। আপনি বন থেকে যে দস্যুদের টাকা নিয়ে এসেছেন, বোধ হয় তারাই আপনাকে মারবার চেষ্টায় নানা-রকম উপায় করেছে। অতএব আপনার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, কেননা, এখন পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেঁচে আছে।"

আলীবাবা মরজিয়ানার মুখে এই-সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "মরজিয়ানা ! তোমার কৌশলেই আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে। অতএব আমি কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য সম্প্রতি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। পরে অনেক টাকা পুরস্কার দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করব। এখন এই দস্যুদের মড়া লুকিয়ে পুঁতে ফেলা দরকার। কেননা, তা হলে কোনো লোকেই এই ব্যাপারটির কিছুমাত্র জানতে পারবে না।" এই বলিয়া আলীবাবা আবদুল্লা নামক ক্রীতদাসকে ডাকিয়া, তাহাকে দিয়া বাগানের ধারে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত খোঁড়াইয়া, তাহার মধ্যে দস্যুদের মড়াগুলি পুঁতিয়া ফেলিলেন ; তাহার পর দস্যুদের কুপো ও অস্ত্রাদি সমস্ত লুকাইয়া রাখিলেন, এবং সুবিধামত তাহাদের অশ্বতরীগুলি বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিলেন।

এদিকে দস্যুপতি বনে ফিরিয়া আসিয়া অনুচরদের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিল। তার পর একলাই আলীবাবার জীবন নষ্ট করিব, ইহা মনে করিয়া সঙ্গীদের শোক ভুলিয়া সে-রাত্রি কিছুক্ষণ ঘুমাইল। তাহার পরদিন খুব ভোরে বিছানা হইতে উঠিয়া নগরে ঢুকিয়া আলীবাবার বাড়ীর কাছে চটিতে গিয়া বাসা করিল। দস্যুপতি ভাবিয়াছিল যে, সঙ্গীদের মৃত্যু-সংবাদ সমস্ত নগরময় প্রচার হইয়াছে। অতএব বারবার সরাইওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি কি বলতে পার, কি-জন্যে আলীবাবার বাড়ীর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে ? কিন্তু সে তাহার এই কথার কোনো উত্তর না দিয়া অন্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল দেখিয়া, দস্যুপতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তার পরে নিজের মতলব সিদ্ধির চেষ্টায় বরাবর বনে গিয়া

ক্রমে ক্রমে সেখান হইতে কতকগুলা রেশমী ও পশমী কাপড়চোপড় আনিল। তার পরে ঐ সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য আলীবাবার ছেলের দোকানের ঠিক সামনে এক খানা দোকান ভাড়া লইয়া নিজের নাম খাজা হোসেন বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়া ঐ-সমস্ত কাপড়-চোপড় বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং কাছাকাছি দোকানী ও ক্রেতাদের সঙ্গে এমন ভদ্র ব্যবহার করিতে লাগিল যে, তাই দেখিয়া সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল। বিশেষতঃ আলীবাবার ছেলের সঙ্গে তাহার এমনি ভালবাসা জন্মিল যে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে উপহার দিতে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করিল।

আলীবাবার ছেলেও ঐ ছদ্মবেশী দস্যুপতির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পিতার কাছে সমস্ত কথা বলিলেন। তাহাতে আলীবাবা মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাছা! তার জন্য চিন্তা কি? তুমি আজই তাকে নিমন্ত্রণ করে এস। আমি মরজিয়ানাকে বলে খাবার প্রস্তুত করে রাখছি।" এই-কথা শুনিয়া আলীবাবার ছেলে সেই-দিনই সন্ধ্যায় খাজা হোসেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। আলীবাবা তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া পাশে বসাইয়া তাহার ছেলের উপর তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন। খাজা হোসেনও আলীবাবাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার ছেলের অনেক সুখ্যাতি করিল। এই-রকম কথাবার্ত্তার পর, আলীবাবা খাজা হোসেনকে খাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে খাজা হোসেন বলিল, "মহাশয়! আমি কোনো বিশেষ কারণে অন্যের বাড়ী আহার করি না। এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।" আলীবাবা এই-কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি বাধা আছে, আমার কাছে বলুন।" দস্যুপতি বলিল, মহাশয়! আমি নুন-দেওয়া কোনো ব্যঞ্জন খাই না।" ইহা শুনিয়া আলীবাবা বলিলেন, এই সামান্য কারণের জন্য আপনি খেতে চাইছেন না, অতএব যাতে কোনো ব্যঞ্জনে নুন দেওয়া না হয় তার উপায় করছি।"

এই বলিয়া আলীবাবা তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে গিয়া মরজিয়ানাকে ব্যঞ্জনে নুন দিতে বারণ করিলেন। মরজিয়ানা এই-কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "কার জন্যে ব্যঞ্জনে নুন না দিয়ে আপনার সমস্ত খাবার নষ্ট করব?" আলীবাবা বলিলেন, "মরজিয়ানা! যে ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি, তাঁর উপর বিরক্ত হয়ো না। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমি যা বলি তাই কর।" খাবার প্রস্তুত হইলে পর, মরজিয়ানা সেই সমস্ত লইয়া পরিবেষণ করিতে আসিল, এবং খাজা হোসেনের উপর চোখ পড়িবামাত্র তাহাকে সেই দস্যুপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। তার পর বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার কাপড়ের মধ্যে একখানা অস্ত্র রহিয়াছে। তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এই দুরাত্মা আমার প্রভুর পরম শত্রু, এর কাপড়ের মধ্যে একখান অস্ত্রও রয়েছে, এই পাপিষ্ঠ যে আজ তাঁর প্রাণ নিতে এসেছে তার আর সন্দেহ নেই। অতএব যাতে এ লোকটা নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারে, তার উপায় করতে হচ্ছে।" খাওয়া-দাওয়ার পর মরজিয়ানা সরবৎ ও

ফল আনিয়া দিল। আলীবাবা ও তাঁহার ছেলে ছদ্মবেশী দস্যুপতির সঙ্গে একত্রে সরবৎ পান করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাকাতটা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আলীবাবা ও তার ছেলেটা অন্যমনস্ক হলেই এদের মেরে ফেলে বাগানের দেয়াল টপকে পালাব।" কিন্তু মরজিয়ানা দস্যুপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ না হয় সেইজন্য নর্ত্তকীর বেশ ধরিয়া তাহাদের সামনে নাচিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ নাচিবার পর কাপড়ের ভিতর হইতে একখান তীক্ষ্ণধার তলোয়ার বাহির করিয়া ভাঁজিতে লাগিল এবং সেইসঙ্গে নাচিতেও লাগিল।

মরজিয়ানার এই-রকম নাচ দেখিয়া আলীবাবা ও খাজা হোসেন তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তার পরে আলীবাবা মরজিয়ানাকে একটি মোহর দিলেন। তাই দেখিয়া খাজা হোসেনও তাহাকে কিছু পুরস্কার দিবার ইচ্ছায় যেই বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে একটি মোহর বাহির করিবে, অমনি মরজিয়ানা তাহার বুকে এমন জোরে তরবারির আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রাণ বাহির হইল।

আলীবাবা ও তাহার পুত্র এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রাগিয়া বলিলেন, "ওরে পাপীয়সী! তুই কি করলি? আমাদের সর্ব্বনাশ করলি?" মরজিয়ানা বলিল, "আমি যা করলাম, তা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই জানবেন।" এই বলিয়া দস্যুপতির কাপড়ের ভিতর হইতে ছুরিকাখান বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলিল, "এই দুরাত্মা সেই দস্যুপতি! আপনারা একে চিনতে পারেননি, এই নরাধম আজ আপনাদের প্রাণে মারবার জন্যেই ছুরি নিয়ে এইখানে এসেছিল। এ ব্যক্তি নুন খেতে রাজি না হওয়াতেই আমার মনে সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল। এখন আমি আপনাদের শত্রু নিপাত করে পরম উপকারই করেছি। অতএব আমার প্রতি রুষ্ট হবার কারণ কি আছে?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া মরজিয়ানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মরজিয়ানা! আমি আগেই তোমার দাসীত্ব মোচন করেছি। এখন তোমাকে আমার পুত্রবধূ করব। এতে তোমার মত কি? এই-কথা বলিয়া আলীবাবা নিজের ছেলের কাছে আগাগোড়া বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তাঁহার ছেলে পিতার মুখে এই-সমস্ত কথা শুনিয়া মরজিয়ানার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। আলীবাবা দস্যুপতির মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে অনুমতি দিলেন এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের কাছে মরজিয়ানার যার পর নাই গুণকীর্ত্তন করিয়া মরজিয়ানার সঙ্গে নিজের ছেলের বিবাহ দিলেন। এই-ভাবে বিবাহ হইলে পর, আলীবাবা বনে গিয়া দস্যুদের গহ্বর হইতে ক্রমশঃ তাহাদের চিরসঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পুত্রপৌত্রাদি লইয়া পরমসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বাগদাদনিবাসী আলীখাজা বণিকের কথা

হারুন-অল-রশীদ নৃপতির রাজত্ব-সময়ে বাগদাদনগরে আলীখাজা নামে এক বণিক্ বাস করিত। লোকটি অবিবাহিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে বাণিজ্যাদি করিয়া জীবনযাপন করিত। আলীখাজা উপরি উপরি তিন রাত্রে এই-রকম স্বপ্ন দেখিল, যেন এক বুড়ো তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে নানা-রকম ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন, "তুমি কি মক্কা তীর্থে যাওনি?"

আলীখাজা যদিও মুসলমানদের পক্ষে মক্কা তীর্থ দর্শন করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিত, তবু নিজের বাণিজ্য ছাড়িয়া এতদিন সে অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই স্বপ্ন দর্শনাবধি তাহার মনে কেমন এক-রকম বৈরাগ্যের উদয় হইল যে, সে আপনার সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়া বসতবাড়ীটি পর্য্যন্ত ভাড়া দিল।

তার পর আলীখাজা জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া টাকাকড়ি যোগাড় করিল, তাহা হইতে পথ-খরচ ও তীর্থের খরচের মত কিছু টাকা এবং সেখানে বিক্রয় করিবার মত কতকগুলি জিনিষ কিনিয়া নিজের-সঙ্গে রাখিয়া বাকি যে এক হাজার মোহর থাকিল তাহা কলসের মধ্যে পূরিয়া তাহার উপর কতকগুলা জলপাই চাপা দিয়া ঐ কলসের মুখ বন্ধ করিয়া তাহা নিজের এক প্রিয় বন্ধু বণিকের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, "হে বন্ধু! আমি মক্কা তীর্থে যাত্রা করব। অতএব তোমার কাছে আমার এই জলপাইর কলসটি গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি। আমি সেখান হতে ফিরে এসে এটা আবার নিয়ে যাব।" ইহা শুনিয়া বণিক তাহার হাতেই ভাণ্ডারের চাবি দিয়া বলিল, "বন্ধু! তুমি নিজে ভাণ্ডারের দরজা খুলে তার মধ্যে এক জায়গা পছন্দ করে তোমার কলসটি রেখে যাও। তোমার অনুপস্থিতির সময়ে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।" আলীখাজা বন্ধুর মুখে এই-কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া নিজের হাতেই ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া কলসটি রাখিয়া আবার তালা বন্ধ করিয়া বণিকের হাতে ঐ চাবিটি ফিরাইয়া দিল।

তার পর আলীখাজা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া কয়েকজন মক্কা-যাত্রীর সঙ্গে জুটিয়া মক্কা যাত্রা করিল। কিছুদিনের পর সেখানে উপস্থিত হইয়া সব তীর্থ-দর্শন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিল। তার পর বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য কায়রো, ডামস্কস, জেরুজেলাম, আলিপো, মোসল প্রভৃতি নানা-নগরে গমন করিয়া নানা-জিনিষ বিক্রয় করিতে লাগিল। এই-রকম করিয়া সাত বৎসরকাল দেশভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিল।

আলীখাজা দেশে ফিরিয়াই বন্ধুর সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করিতেছে, ইতিমধ্যে একদিন বণিক্ স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসিয়া ভোজন করিতেছে, এমন সময় তাহার স্ত্রী খাইতে খাইতে কিছু জলপাই ভক্ষণ করিতে চাহিলে, বণিক বলিল, "প্রায় সাত বৎসর

হল, আলীখাজা আমার কাছে যে এক কলসী জলপাই রেখে মক্কা তীর্থে গিয়েছে, এ পর্য্যন্ত তার ত কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। বোধ হয় তার মৃত্যু হয়েছে, অতএব তার সেই কলস থেকেই তোমাকে কয়েকটি জলপাই এনে দেই।" বণিক্‌পত্নী স্বামীর মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "স্বামিন্! সে-ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করে আপনার কাছে জলপাই রেখে গিয়েছে তখন তাতে হস্তক্ষেপ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়! সে ব্যক্তি যখন এসে জলপাইয়ের কলসী চাইবে তখনি বা তাকে কি বলবেন? তা ছাড়া অনেক দিন হল ঐ জলপাই আপনার কাছে রয়েছে, বোধ হয় ওর সমস্তই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব ওতে হস্তক্ষেপও করবেন না, কলসটি যেমন আছে তেমনই থাকুক।" বণিক্ স্ত্রীর কথায় কান না দিয়া তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডার খুলিল, এবং তাহার মধ্যে ঢুকিয়া ঐ কলসের ঢাক্‌না খুলিয়া নীচে ভাল জলপাই আছে এই মনে করিয়া উপরের কতকগুলা জলপাই বাহির করিতে গিয়া দেখিল, তাহার নীচে কেবল মোহর রহিয়াছে। তাহাতে বণিক

জলপাই বাহির করিতে গিয়া দেখিল তাহার নীচে কেবল মোহর রহিয়াছে

ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মোহরগুলি বাহির করিয়া লইয়া, তাহার বদলে কতকগুলা নূতন জলপাই আনিয়া ঐ কলসটি পূর্ণ করিয়া রাখিল, কিন্তু এ-কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আলীখাজা ঐ বণিক্-বন্ধুর বাড়ী আসিল। বণিক্ তাহাকে

দেখিবামাত্র মহা সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'বন্ধু! তুমি ফিরে আসাতে যে আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হলাম তা বলা যায় না।"

তার পর আলীখাজা জলপাইয়ের কলসী চাহিবামাত্র বণিক্ বলিল, "ভাই! তোমার কলসী ভঁাড়ারে যেখানে রেখে গিয়েছ, সেইখানেই আছে. তুমি এখনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাও।" এই ব লয়া ভাণ্ডারের চাবিটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিল। আলীখাজা ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে জলপাইয়ের কলসটি লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া ঐ কলসের মধ্যে একটিও মোহর দেখিতে না পাইয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া মহা আক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং পরদিন খুব ভোরে অত্যন্ত বিমর্ষভাব ধরিয়া বণিকের কাছে গিয়া কহিল, "বন্ধু! আমার জলপাইয়ের কলসের মধ্যে যে এক হাজার মোহর ছিল, তা কোথায় গেল? বোধ হয় তোমার টাকার দরকার হয়েছিল সেইজন্য সেটা নিয়ে নিজের ব্যবসায়ে লাগিয়েছ। যদি তাই করে থাক তাতে ক্ষতি কি? এখন আমাকে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখে দাও। পরে তোমার সুবিধামত ক্রমশঃ আমাকে ঐ সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিও।

বণিক কহিল,"হে বন্ধু! তুমি কি আশ্চর্য্য কথা বলছ? তুমি নিজে ভাণ্ডারের দরজা খুলে কলসটি রেখে গিয়েছিলে এবং নিজেই সেটা নিয়ে গিয়েছ। আমি সেটা স্পর্শও করিনি। এবং যখন কলসটি রেখে যাও তখন বলেছিলে ওর মধ্যে জলপাই রইল। তার সঙ্গে মোহর থাকলে অবশ্যই সে-কথা উল্লেখ করে যেতে।" বন্ধুর মুখে এই-কথা শুনিয়া আলীখাজা সবিস্ময়ে বলিতে লাগিল, "ভাই! আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না। এ-বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলে লোকে তোমারই নিন্দা করবে। যদি মিষ্ট কথায় না হয় তবে অগত্যা আমাকে তোমার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করে এ-বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে। এখন যদি ভাল চাও, তবে মোহরগুলি দাও।" বণিক্ বলিল, "ওহে আলীখাজা, তুমি আমার কাছে যা রেখে গিয়েছিলে তাই নিয়ে গিয়েছ, তার সঙ্গে কি ছিল তা তুমি জান। তুমি যে জলপাই রেখে তার বদলে মাণিক মুক্তা না চেয়ে কেবল মোহর চাইছ, এই আমার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। যাও, এখান থেকে দূর হও, অনর্থক বাক্যব্যয় আর ভাল লাগে না।"

যখন আলীখাজার সঙ্গে বণিকের এই-রকম বিবাদ হয়, তখন সেখানে লোকারণ্য হইয়াছিল, কিন্তু কেহই এ বিষয়ের সত্যাসত্য ঠিক করিতে পারিল না। আলীখাজা আবার বলিল, "হে বণিক্! তুমি যেমন আমাকে প্রতারণা করছ, জগদীশ্বর তেমনি এর বিচার করবেন। এখন এস দুজনে কাজির কাছে যাই, দেখি তিনি এ-বিষয়ের কি মীমাংসা করে দেন।"

এই-কথা বলিয়া দুজনেই বিচারপতির কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। আলীখাজা বলিল, "হে ধর্ম্মাবতার! এ-ব্যক্তি প্রতারণা করে আমার জলপাইয়ের কলস হইতে একহাজার মোহর আত্মসাৎ করেছে।" তাহাতে কাজি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-বিষয়ে

তোমার কোনো সাক্ষী আছে?" আলীখাজা বলিল, "মহাশয়, আগে আমি একে পরমবন্ধু মনে করে কাকেও কোনো কথা না বলে মোহরের কলসটি এর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম।" বণিক্ শপথ করিয়া কহিল, "ওর কলসের মধ্যে যে কি ছিল, আমি সে-বিষয়ের কিছুই জানি না। যেমন কলসটি আমার কাছে রেখে গিয়েছিল, তেমনি সেটি নিয়ে গিয়েছে।" বিচারপতি এই-সমস্ত কথা শুনিয়া বণিক্কে নির্দ্দোষী ভাবিয়া অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। তখন আলীখাজা মহা দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমার উপর অবিচার হল, আমি মহারাজ হারুন-অল-রশীদের কাছে আবার অভিযোগ করব।" যা হোক তখন বণিক্ জয়লাভে মহা আনন্দিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এদিকে আলীখাজা বাড়ী আসিয়া একখান আবেদনপত্র লিখিয়া তাহা হাতে করিয়া রাজসভায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবেদনপত্র লইতে যে একজন দাস সর্ব্বদা রাজার কাছে উপস্থিত থাকিত সে আলীখাজার হাতের আবেদনপত্রখানি লইয়া রাজাকে দিল এবং কিছুক্ষণ পরে আবার রাজার নিকট হইতে আসিয়া তাহাকে কহিল, "মহারাজ কাল তোমার আবেদনপত্র শুনবেন, অতএব তুমি কাল রাজসভায় উপস্থিত থেকো।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে রাজা নিজের প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, পথে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছে। রাজা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক জায়গায় বসিলেন। তিনি দেখিলেন তাহাদের ভিতর হইতে একজন বালক তাহার সঙ্গীগণকে বলিল, "এস ভাই! আজ বিচারপতির কাজ করা যাক্। আমি কাজি হলাম, তোমরা যে বণিক্ আলীখাজার মোহর চুরি করেছ একজন বালককে সেই বণিক্ সাজিয়ে আমার কাছে আন। আমি তার বিচার করব।" এই-কথা শুনিবামাত্র আলীখাজার আবেদনপত্রের কথা রাজার মনে হইল। অতএব তিনি এই খেলা দেখিতে বিশেষ কৌতূহলী হইলেন।

যে-বালক বিচারপতি হইয়া বসিয়াছিল তাহার সম্মুখে এক বালক আলীখাজা এবং অপর আর-এক বালক বণিক্ হইয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুই বালক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, বিচারপতিবেশী বালক আলীখাজাবেশী বালককে কহিল, "বণিকের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে বল।" ইহা শুনিয়া আলীখাজাবেশী বালক কহিল, "আমি একটি কলসে এক হাজার মোহর রেখে তাহার উপর কতকগুলা জলপাই ঢাকা দিয়ে ঐ কলসটি এই বণিকের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। কিন্তু বণিক্ আমার মোহরগুলি চুরি করে' তার বদলে তার মধ্যে আর কতকগুলা জলপাই পূরে ঐ কলসটি আমাকে দিয়েছে। এখন সুবিচার করে যাতে আমি আমার টাকাগুলি পেতে পারি, তাই করুন!" বিচারপতির বেশধারী বালক এই-কথা শুনিয়া বণিক্-বেশধারী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আলীখাজা তোমার কাছে যে মোহরগুলি রেখেছিল তুমি কিজন্যে তা ফিরিয়ে দাওনি?" বণিক্রূপী

বালক শপথ করিয়া বলিল, "আমি মোহরের কিছুই জানি না। ও-ব্যক্তি আমার কাছে এক কলস জলপাই রেখেছিল, তা আমি ফেরত দিয়েছি।" তখন বিচারপতির বেশধারী বালক বলিল, "আমি জলপাইয়ের কলস দেখতে চাই, শীঘ্র আন।" এই-কথা শুনিবামাত্র যে-বালক আলীখাজার বেশ ধারণ করিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং একটা কলস আনিয়া বিচারপতিবেশী-বালকের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "হে ধর্মাবতার! আমি এই কলসের মধ্যে মোহর এবং জলপাই পুরে বণিকের কাছে রেখে গিয়েছিলাম।" তখন বিচারপতি-বালক বণিক্-বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন? আলীখাজা কি তোমার কাছে এই কলস রেখে গিয়েছিল?" তাহাতে বণিক্‌রূপী-বালক বলিল, "হাঁ ধর্মাবতার!" তখন বিচারপতির বেশধারী বালক কলসীর মধ্য হইতে একটি জলপাই লইয়া তাহার আস্বাদন গ্রহণ করিয়া বলিল, "সাত বৎসরের জলপাই কখনই এমন সুস্বাদু হতে পারে না। অতএব ব্যবসায়ীদের আনাইয়া এর পরীক্ষা করা কর্তব্য। এই-কথা শুনিবামাত্র আর দুইজন বালক তৎক্ষণাৎ জলপাই-ব্যবসায়ীর বেশ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচারপতি তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা সর্ব্বদাই জলপাই ক্রয়-বিক্রয় করে থাক, অতএব বল দেখি, এ জলপাইগুলি কত দিনের হতে পারে?" তখন ঐ বালক দুটি জলপাইয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া কহিল, "এ জলপাইগুলি যে এই বৎসরের তার আর কোনো সন্দেহ নেই।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি-বালক কহিল, "বণিক্ বড় প্রতারক, অতএব একে ফাঁসী দাও।" এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র আর আর সমস্ত বালক বণিক্‌বেশী-বালকের হাত ধরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেল।

রাজা বালকদের এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রীবর! তুমি এই বাড়ী চিনে রাখ, কাল এই বিচারপতি-বালকটিকে রাজসভায় নিয়ে যেতে হবে!" এই-কথা বলিয়া রাজা বাড়ী চলিয়া গেলেন।

পরদিন নিয়মিত সময়ে মন্ত্রী ঐ বালকটিকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ঐ বালকটিকে সিংহাসনের উপরে নিজের পাশে বসাইয়া আলীখাজা এবং বণিক্‌কে আনিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইলে রাজা কহিলেন, "এই বালকটি তোমাদের বিচার করবে; অতএব তোমাদের যা যা বলবার আছে, এর কাছে বল।" ইহা শুনিয়া আলীখাজা ও বণিক আপন আপন সমস্ত কথা জানাইয়া পরস্পর তর্ক করিতে লাগিলেন দেখিয়া ঐ বালক কহিল, "তোমাদের আর ঝগড়ার প্রয়োজন নেই। জলপাইয়ের কলসটি এখানে আন, তা হলে সকল বিষয়ের মীমাংসা হবে।" এই-কথা শুনিবামাত্র আলীখাজা তৎক্ষণাৎ সেই জলপাইয়ের কলসটি আনিয়া উপস্থিত করিল। বালক আগের মত কলস হইতে একটি জলপাই মুখে ফেলিয়া দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া জলপাই-ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিতে বলিল। তাহারাও রাজসভায় আসিয়া জলপাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল,

"এই জলপাই এই বৎসরের বটে।" তাহাতে বণিকের অপরাধ স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইল। তখন ঐ বালকটি রাজার দিকে চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! গতরাত্রে আমি যদিও খেলা করতে করতে অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করেছিলাম, তবু এখন দণ্ড দিতে পারি না, যেহেতু আপনিই দণ্ডবিধানের কর্ত্তা।" রাজা এইরূপে বণিকের অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া তখনি তাহাকে ফাঁসী দিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং আলীখাজাকে তাহার হাজার মোহর দেওয়াইলেন। তার পরে ঐ বালকের প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একশত মোহর দিয়া সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

পারস্যদেশীয় তিন ভগিনীর কথা

সেকালে পারস্যদেশে খস্রু শা নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অবধি প্রজারা তাঁহার রাজত্বে কে কিরূপ সুখস্বচ্ছন্দে আছে, তাহা জানিবার জন্য প্রতি-দিন সন্ধ্যার পর প্রধান-মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বাহির হইতেন। এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিন তিনি রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে নগরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজপথের কিছুদূরে একটি বাড়ীর ভিতর হইতে কয়েকটি মানুষের কথা শুনিতে পাইলেন। তাহারা যে এতরাত্রিতে কিসের কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহা জানিবার জন্য ঐ বাড়ীর একটি জানালার কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, একটি ঘরের মধ্যে মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং একখানি পালঙ্কের উপর তিনটি স্ত্রীলোক বসিয়া নিজের নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের আকার-প্রকার দেখিয়া রাজার বোধ হইল যে, তাহারা তিন বোন। বড়টি বলিল, "যদি আমি খস্রু শার মিঠাইওয়ালাকে বিবাহ করতে পারি, তা হলে যেসকল ভাল ভাল মিঠাই অতি ধনী লোকেও কখনও চক্ষে দেখেনি তা আমি অনায়াসেই পেট ভরে খেতে পাই।" মেজোটি বলিল, "যদি আমার সঙ্গে রাজার প্রধান পাচকের বিবাহ হয়, তা হলে আমি ভাল ভাল রাজভোগ খেয়ে আপনাকে পরিতৃপ্ত করি। তখন তাহাদের মধ্যে পরমাসুন্দরী এবং অসামান্যা বুদ্ধিমতী ছোট বোনটি বলিল, "দিদি! যদি মনের কথা জিজ্ঞাসা করলে তবে আমার ইচ্ছা এই যে, যদি রাজা অনুগ্রহ করে স্বয়ং আমাকে বিবাহ করেন, তা হলে আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী হয়ে এমন একটি ছেলের মা হই যে, তার মাথার একদিকের চুলগুলি সোনার এবং আর একদিকের চুলগুলি রূপার হয় এবং সে যখন কাঁদবে তখন তার চোখ থেকে অশ্রুধারা না পড়ে কেবল বহুমূল্য মুক্তা মাণিক ঝরবে, আর সে যখন হাসবে তখন তার ঠোঁট দুটি ঠিক সদ্যফোটা গোলাপফুলের মত অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করবে।"

তাহাদের তিনজনের, বিশেষতঃ ছোটটির, এই-রকম সাধের কথা শুনিয়া খসরু শা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের তিনজনেরই মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তখন প্রধান-মন্ত্রীর কাছে সে-বিষয়ে কোনো-কথা প্রকাশ না করিয়া কেবল তাঁহাকে ঐ বাড়ীটি চিনিয়া রাখিতে এবং পরদিন সকালে ঐ তিন ভগিনীকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিতে হুকুম করিলেন। সেই অনুসারে প্রধান মন্ত্রী পরদিন সকালে তাহাদের তিনজনকেই সঙ্গে লইয়া রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রিতে তোমরা তিনজনে একত্র বসে পরস্পর যে কথাবার্ত্তা বলছিলে আজ সে সমস্ত আমার কাছে প্রকাশ করে বল।" রাজার মুখে এই-রকম অচিন্তনীয় কথা শুনিয়া তাহারা তিনজনেই মহা ভীত হইয়া চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটিও কথা কহিতে পারিল না। তাই দেখিয়া খসরু শা তাহাদের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়া আপনিই বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমি স্বয়ং তোমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনে মহা সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের নিজের নিজের সাধ মিটাবার জন্য তোমাদের এখানে এনেছি।"

তখন মহীপাল মহাসমারোহ করিয়া তাহাদের মধ্যে ছোট ভগিনীটিকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন এবং অপর দুইজনের সহিত আপনার প্রধান পাচকের ও মিঠাইওয়ালার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাদের বিবাহ উপলক্ষ্যে ছোট বোনের মত মহোৎসবাদি কিছুই হইল না দেখিয়া তাহারা দুইজনেই ছোট বোনের হিংসা করিতে লাগিল। একদিন সাধারণ স্নানাগারে তাহাদের দুইজনের পরস্পর দেখা হইলে, বড় বোন মেজোকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বোন! আমাদের ছোটটার কেমন সৌভাগ্য দেখ, সে কেমন সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে।" মেজো বলিল, "দিদি! যদি মহারাজ ছোটটাকে বিবাহ না করে তোমার পাণিগ্রহণ করতেন তা হলে আমি পরম সুখী হতাম, কারণ তুমি রূপেগুণে কোনোক্রমেই তার চেয়ে খাটো নও।" বড় বোন মেজো বোনের মন রাখিয়া বলিল, "বোন! যদি রাজা ছুটকীর বদলে তোমাকে বিবাহ করিতেন তা হলে আমি একটুও দুঃখিত হতাম না। অতএব এস, যাতে তার গর্ব্ব খর্ব্ব হয় তার উপায় উদ্ভাবন করা যাক"

এই পরামর্শ স্থির হইলে, দুই ভগিনী নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই অবধি প্রতিদিন রাজবাড়ীতে গিয়া ছোট বোনের এই-রকম সুখসচ্ছন্দতা দেখিয়া এত কপট আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, যে, তাই দেখিয়া সে ভগিনীও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আগের চেয়ে বেশী ভক্তি করিতে লাগিল।

কয়েকমাস পরে তাহারা শুনিল তাহাদের ছোট বোনের ছেলে হইবে। তাহারা এই শুভ সংবাদ শুনিয়া আরও বেশী জলিয়া পুড়িয়া আস্তে আস্তে ভগিনীর নিকট গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছায় হাসিমুখে বলিতে লাগিল, "ভগিনী! তোমার খোকা হবে শুনে আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি, তা বলা যায় না। আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে, তোমার

ছেলে হওয়ার সময়ে আমরা আপনারাই ধাত্রীর কাজ করি, কারণ তা হলে তোমাকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করতে হবে না।" তাহাদের কথামত রাজরাণী সে-বিষয়ে রাজার সম্মতি লইয়া রাখিলেন; এবং পরে ঠিক্ সময় উপস্থিত হইলে বোন দুটিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা এই সুযোগে অনায়াসেই আপনাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিবে এই মনে করিয়া গোপনে একটা মরা কুকুরছানা সঙ্গে লইয়া অতি শীঘ্র আঁতুড় ঘরে গিয়া ঢুকিল। তাহার খানিক পরেই তাহাদের ছোট বোনের একটি পরম সুন্দর খোকা হইল। কিন্তু রাজকুমারের এত রূপলাবণ্য দেখিয়াও পাষাণহৃদয়া মাসিদের মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহারা অনায়াসেই সুন্দর বালকটিকে একখানি কাপড়ে জড়াইয়া একটি ঝুড়িতে রাখিয়া রাজবাড়ীর অতি নিকটেই যে একটি খাল ছিল তাহাতে তাহাকে ভাসাইয়া দিল এবং রাজার কাছে সেই মরা কুকুরছানাটা উপস্থিত করিয়া সকলের সামনে খুব চেঁচাইয়া বারবার কেবল এই-কথা বলিতে লাগিল, "মহারাজ! রাজরাণীর মানুষের মত ছেলের বদলে এই কুকুরছানাটি হয়েছে ; তার জন্যে আমাদের উপর কিছুমাত্র দোষারোপ করতে পারবেন না।" রাজা এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত রাগিয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহিষীর যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, "এ সমস্ত ঈশ্বরাধীন কার্য্য, এতে রাজ-মহিষীর কিছুমাত্র দোষ নাই," রাজাকে এই-রকমে নানামতে বুঝাইয়া সে-বিষয় হইতে ক্ষান্ত করিলেন।

এদিকে সেই নবজাত রাজকুমার রাজার বাগানের কাছ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে প্রধান মালী সেই ঝুড়িটি দেখিতে পাইয়া আর-একজন মালীকে দিয়া উহা বাগানের মধ্যে আনাইয়া খুলিয়া দেখিল যে, তাহার মধ্যে একটি সুন্দর ছেলে রহিয়াছে। তাই দেখিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কুমারকে নিজের স্ত্রীর কাছে লইয়া গেল এবং তাহার নিজের সন্তানাদি কিছুই নাই বলিয়া সে অতি যত্নে ঐ ছেলেটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরে রাজমহিষীর আগের মত আর-একটি সুন্দর খোকা হইল, কিন্তু তাঁহার বোনেরা সেবারেও শিশুটিকে আগের মত ঝুড়িতে করিয়া ভাসাইয়া দিয়া একটি মরা বিড়াল আনিয়া সকলের কাছে বলিল, "মহারাজ! এবারে রাজমহিষীর খোকা না হয়ে এই মরা বিড়ালছানাটি হয়েছে।" তাহাতে যদিও রাজার মনে রাজমহিষীর প্রতি আরও ক্রোধ জন্মিল, তবু প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে সেবারেও তিনি আপন স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না। এদিকে দ্বিতীয় রাজকুমারটিও আগের মত সেই মালীর হাতে পড়িয়া তাহার স্ত্রীর কাছে অতি যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

আবার প্রায় এক বৎসরের পর রাণীর একটি পরমাসুন্দরী কন্যা হইল এবং তাঁহার দুই ভগিনী সেবারেও মেয়েটিকে ঐ নদীতে ভাসাইয়া দিয়া একটি কাষ্ঠপুত্তলিকা হাতে লইয়া রাজার কাছে গিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "এই দেখুন, মহারাজ! এবারে রাজমহিষীর

ছেলের বদলে এই কাঠের পুতুলটি হয়েছে।" তাহাতে রাজা অত্যন্ত রাগিয়া "কি! মানুষ হইয়া যে এ-রকম অদ্ভুত জিনিষের মা হয়, এ ত আমি কখন কানেও শুনিনি। এ তবে

রাজরাণীর মানুষের মত ছেলের বদলে এই কুকুরছানাটি হয়েছে

নিশ্চয় ডাইনী রাক্ষসী।" তিনি কেবল বারবার এই-কথা বলিয়া, প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে ডাকাইয়া সেই দণ্ডে রাজমহিষীর মাথা কাটিয়া ফেলিতে অনুমতি দিলেন।

রাজার মুখে এই-রকম নিষ্ঠুর আদেশের কথা শুনিবামাত্র মন্ত্রীবর এবং অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বিশেষ দোষী ব্যক্তির প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়ে থাকে। মহিষীর

অপরাধ কি ? তিনি ত আর ইচ্ছা করে কিছুই করছেন না, এসমস্তই পরমেশ্বরের অধীন কাজ জানবেন। অতএব তাঁর প্রাণবধ না করে তাঁকে জন্মের মত ত্যাগ করুন। তা হলেই তাঁর প্রতি শাস্তি প্রদান করা হবে, অথচ আপনাকে পরমেশ্বরের কাছে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধের জন্য দোষী হতে হবে না।" মন্ত্রী প্রভৃতির মুখে এই রকম সদ্যুক্তি শুনিয়া রাজা তাহাতেই রাজি হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তোমাদের পরামর্শ অনুসারে তার প্রাণবধ বন্ধ করলাম, কিন্তু তোমরা খুব শীঘ্র একটি কাঠের খাঁচা প্রস্তুত করে তার মধ্যে রাজরাণীকে পূরে এই নগরের মধ্যে যে ভজনালয় আছে, তার ঠিক সামনে এমন একটি জায়গায় রাখিয়ে দাও, যেন সমস্ত লোকই ঐ ভজনালয়ে ঢুকবার সময়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। আর নগরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা প্রচার করিয়ে দাও যে, যে-কোনো মুসলমান ঐ খাঁচার মধ্যে রাজমহিষীকে দেখতে পাবে, সেই যেন অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার মুখে থুতু দেয়। যদি কেউ তা না করে তা হলে তার প্রতিও ঐ-রকম দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হবে।"

রাজা প্রধান মন্ত্রীর প্রতি এমনি গম্ভীরভাবে এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, মন্ত্রীবর সে-বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে অগত্যা রাজার আদেশে রাজমহিষীকে খাঁচায় বন্ধ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিতে হইল। রাজরাণীর এই-রকম দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হিংসুটে দুই বোনের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এদিকে মালী সেই দুই রাজকুমারের মধ্যে বড়টির নাম বাহমান, ছোটটির নাম পরভেজ এবং রাজকুমারীর নাম পরিজাদ রাখিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া অতি যত্নে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজকুমার দুইটি বড় হইলে, মালী তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ করিবার জন্য অতি বিচক্ষণ দেখিয়া কয়েকটি শিক্ষক নিযুক্ত করিল। রাজকুমারেরা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যায় এমনি পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনো বিষয়ে সদুপদেশ দিবার জন্য আর শিক্ষক রাখিতে হইল না। রাজকন্যাও অবসরমত ভাইদের সঙ্গে পশু শিকার, ঘোড়ায় চড়া, নানারকম যন্ত্র বাজান এবং গান করা প্রভৃতি অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। মালী এই-ভাবে পালিত পুত্র দুটি এবং কন্যাটিকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রকন্যাদের বাসের উপযোগী একটি সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করাইল। তার পর সে একদিন রাজসভায় গিয়া বৃদ্ধবয়সে আর কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে না বলিয়া রাজার কাছে বিদায় লইয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করিয়া ঐ নূতন বাড়ীতে চলিল। ইতিপূর্ব্বে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং বাড়ীতে যাইবার কয়েক মাস পরে মালীও মারা পড়িল, সুতরাং পুত্রকন্যাদের জন্মবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই জানাইতে পারিল না। দুই রাজপুত্র এবং রাজকন্যা মালীকেই তাঁহাদের পিতা বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে তাঁহারা তিনজনেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু মালীর বিপুল অর্থ

ছিল বলিয়া অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইলেন না, বরং পরম সুখস্বচ্ছন্দেই কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন যাইবার পর, একদিন রাজকুমার ভগিনীটিকে একাকিনী বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছেন, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহাদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো মা লক্ষ্মী! তোমাদের বাড়ীর মধ্যে আমি কি ঈশ্বরোপাসনা করবার জন্যে একটু জায়গা পাব না?" তাহাতে রাজকুমারী দুইজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা যে-ঘরে বসে পরমেশ্বরের উপাসনাদি করে থাকি, তোমরা একে সঙ্গে করে সেইখানে নিয়ে যাও এবং এর উপাসনা শেষ হলে পর আবার একে সঙ্গে করে এই বাড়ীর অন্যান্য ঘরগুলি ভাল করে দেখিয়ে আমার কাছে নিয়ে এস।"

রাজকুমারীর আজ্ঞানুসারে পরিচারিকারা ঐ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া পূজার ঘরে গেল। পরে ঐ অট্টালিকার যাবতীয় স্থান দেখাইয়া অবশেষে তাঁহার কাছে লইয়া আসিলে তিনি অতি সমাদর করিয়া ঐ ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো বৃদ্ধা! আপনি ত এই পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই যাওয়া-আসা করে থাকেন, কিন্তু এমন অট্টালিকা এবং বাগান কি কোথাও দেখেছেন?" বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, এই অট্টালিকা যে খুবই সুন্দর সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে এখনও তিনটি আশ্চর্য্য জিনিষের অভাব আছে, সেটা দূর হলেই যে অট্টালিকাটি পৃথিবীর অনেকানেক রাজঅট্টালিকার চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, তাতে আর অণুমাত্র সংশয় নেই।" রাজনন্দিনী ঐ বৃদ্ধার মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! সেই তিনটি জিনিষ কি কি? এবং কোন্‌খানে গেলে তা পাওয়া যেতে পারে?" রাজনন্দিনীর এই-রকম সুশীলতা দেখিয়া বৃদ্ধা অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "প্রথমটি বুল্‌বুল্ হাজার দোস্তান নামক একটি বাক্‌সিদ্ধ গায়কপক্ষী অর্থাৎ তার এমন গুণ আছে যে, সে যখন গান করতে আরম্ভ করে, তখন বন থেকে হাজার হাজার জীব তার কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং একমনে তার গান শুনতে থাকে। দ্বিতীয়টি সঙ্গীতকারী বৃক্ষ নামে একটি বৃক্ষ। ঐ গাছটির এমন এক আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি দুলতে আরম্ভ হলে এমন একটি সুস্বর ওঠে যে, দূর থেকে শুনলে মনে হয় যেন হাজার হাজার লোক একতান হয়ে অতি সুমধুর স্বরে গান করছে। তৃতীয়টি সোনার মত এক রকম হরিদ্রাবর্ণ জল। ঐ জলের কেমন এক আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, কোনো পাত্রে ঐ জলের এক ফোঁটা মাত্র ফেললে তখনি ঐ পাত্রটি সেই-রকম জলে পরিপূর্ণ হয়ে ফোয়ারার মত উপর দিকে ওঠে, কিন্তু তার এক ফোঁটা জলও অন্য জায়গায় না পড়ে কেবল ঐ পাত্রের মধ্যেই পড়তে থাকে, সুতরাং কস্মিন্‌কালেও ঐ জল শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতবর্ষের দিকে এই রাজ্যের যে প্রান্তভাগ আছে, সেই খানেই ঐ তিনটি জিনিষ পাওয়া যাবে। অতএব যে এইগুলি আনতে যাবে, সে যেন

তোমার বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যে পথ গিয়েছে ক্রমাগত তাই ধরেই কুড়ি দিন যায়, তার পর প্রথমেই যে-ব্যক্তিকে সাম্‌নে দেখতে পাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করবে, তা হলেই তিনি তার বিশেষ বিবরণ বলে দেবেন।" বৃদ্ধা এই কথাগুলি বলিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাজকুমারী ঐ আশ্চর্য্য জিনিষ তিনটির কথা শুনিয়া অবধি কি উপায়ে যে সেগুলি হস্তগত করিবেন, সারাক্ষণ কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তার পর রাজপুত্ররা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া রাজকন্যার এমন বিমর্ষভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোন! আজ যে তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি, এর কারণ কি?" তাতে রাজকন্যা উত্তর দিলেন, "ভাই! এতকাল আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের জন্য যে এই অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়েছেন, এতে কিছুরই অপ্রতুল নেই, কিন্তু আজ শুনে আশ্চর্য্য হলাম যে, এতে এখনও তিনটি অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রীর সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে, তাই আমি এত চিন্তিত হয়েছি।" এই বলিয়া রাজকন্যা সেই ধার্ম্মিকার নিকট যে যে তিনটি জিনিষের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং যে পথ দিয়া যেখানে গেলে ঐ তিনটি পাওয়া যাইতে পারে, আগাগোড়া সে-সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

রাজপুত্র বাহমান বোনের কাছে এই-রকম অত্যদ্ভুত জিনিষের কথা শুনিয়া তার পরদিন সকালে তাহার উদ্দেশে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ভাই-বোনের কাছে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজকন্যা পাছে পথে ভ্রাতার কোনো বিপদ ঘটে এই ভয়ে, তাঁহাকে সে-বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাজপুত্র বহমান তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিয়া রাজকুমারীর হাতে দিয়া বলিলেন, "বোন! তুমি মধ্যে মধ্যে এই ছুরিখানি বাহির করে দেখো। যতদিন পর্য্যন্ত এই ছুরিখানিকে পরিষ্কার দেখবে, ততদিন পর্য্যন্ত জেনো যে, আমি বেঁচেই আছি। কিন্তু যখন দেখবে যে, এই ছুরিখানির মধ্যে মধ্যে রক্তের মত লাল চিহ্ন হয়েছে, তখন বুঝবে যে আমার মৃত্যু হয়েছে।" এই-কথা বলিয়া বাহমান ভ্রাতা এবং ভগিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়িয়া ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমাগত উনিশ দিন যাইবার পর কুড়ি দিনের দিন সকালে দেখিলেন যে, পথের পাশে একখানি কুঁড়েঘর রহিয়াছে এবং তাহার কাছে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী গাছতলায় বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তাপস! আপনি কি বলতে পারেন, আমি কোন্ পথ দিয়ে গেলে বাকসিদ্ধ পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জল, এই তিনটি জিনিষ পাব?" সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তার পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার মত কত শত বীরপুরুষ ঐ তিনটি জিনিষ আনবার ইচ্ছায় আমার কাছ থেকে তার সবিশেষ বিবরণ জেনে তার উদ্দেশে গিয়েছেন, কিন্তু কেউ ত সফল হয়ে ঘরে ফিরে আস্‌তে পারেননি, সকলেই সেইখানে মৃত্যুর

কবলে পড়েছেন। অতএব আমি তোমাকে বারবার অনুরোধ করছি যে, তুমি এই-সকল জিনিষের দুরাশা পরিত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যাও।"

কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া তপস্বী আপন থলিয়ার মধ্য হইতে একটি গোলা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি নিজের ঘোড়ায় চড়ে এই গোলাটি তোমার সাম্‌নের দিকে ছুড়ে দিয়ে এর পিছন পিছন যাও। পরে যখন এই গোলাটি একটি পাহাড়ের তলায় গিয়ে ঠেকে থেমে যাবে, তখন তুমি তোমার ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে সেইখানে রেখে দিয়ে ঐ পর্ব্বতের উপরে উঠে যাবে। কিন্তু সাবধান, যেন উঠবার সময় তোমার দুই পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো পাথর দেখে বা চারিদিক থেকে অতি ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পিছন দিকে তাকিও না। তা হলে তুমি এবং তোমার ঘোড়াও তৎক্ষণাৎ ওদের মত কালো পাথর হয়ে যাবে। যদি তুমি এই-সমস্ত বিপদ্ হতে উত্তীর্ণ হয়ে সেই পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে পার, তা হলে তুমি একটি সুন্দর খাঁচার মধ্যে তোমার অভিলষিত সেই পক্ষীটিকে দেখতে পাবে, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সে তোমাকে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জলের সন্ধানও বলে দেবে।"

তখন বাহমান ঐ উদাসীনের পরামর্শ অনুসারে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রদত্ত গোলাটি নিজের সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলেন। গোলাটি অতি দ্রুতবেগে গড়াইয়া যাইতে লাগিল। রাজপুত্র তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। গোলাটি পর্ব্বতের নিকটে গিয়া নিশ্চল হইলে, বাহমান ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই পর্ব্বতের উপরে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ঐ পর্ব্বতের নীচ হইতে চারি পাঁচ পা মাত্র উপরে উঠিতে-না-উঠিতেই, "এ বোকাটা কে, কিজন্য এখানে এসেছে, ও কোথায় যায়? ওকে যেতে দিও না, খাঁচার পাখী বুঝি ওর জন্যই রাখা হয়েছে? ওকে মেরে ফেল।" তিনি পিছন দিক হইতে এই-সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন, অথচ একটিও মানুষ দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন বটে, কিন্তু গমনে ক্ষান্ত না দিয়া আরও কিছু পথ উঠিলেন। তখন তাঁহার পিছন ও সম্মুখ দিক হইতে অনবরত এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল যে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তাঁহার দুই পা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর একেবারে অবসন্নপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই বৃদ্ধের পরামর্শ ভুলিয়া গিয়া যেমন পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিলেন, অমনি তাঁহার শরীর একেবারে পাষাণময় হইয়া গেল, এবং তাঁহার ঘোড়াটিও তৎক্ষণাৎ প্রভুর মতই পাথর হইয়া পড়িল।

এ দিকে রাজকুমারী পরিজাদ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাড়ী হইতে বাহির হওয়া অবধি প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া তাহার-দেওয়া ছুরিখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং মেজো ভাইটির সঙ্গে সেই বিষয়ে নানারকম কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর যে দিন রাজপুত্র বাহমান পাহাড়ে পাষাণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দিন

রাজকুমারী আপনার মেজোভাই পরভেজের অনুরোধে ঘর হইতে ছুরিখানি আনিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্র তাহার গায়ে কয়েকটি লাল চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ছুরিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজকুমার পরভেজও দাদার জন্য যার পর নাই দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু সেজন্য আর বৃথা বিলাপে কোনো ফল হইবে না মনে করিয়া, নিজেই তৎক্ষণাৎ বেশভূষা করিয়া একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়িয়া ভগিনীর অভিলষিত জিনিষ তিনটি আনিবার জন্য তাঁহার কাছে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে এই চেষ্টা হইতে বিরত হইবার জন্য বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্রের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বোনের হাতে একছড়া মুক্তার মালা দিয়া বলিলেন, 'দেখ বোন। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি এই মুক্তাগুলি অনায়াসে সরিয়ে গুণতে পারবে ততদিন পর্য্যন্ত জেনো যে, আমার কোনো বিপদ ঘটেনি। কিন্তু যখন দেখবে মুক্তাগুলি আর কিছুতেই সরাতে পারা যায় না, তখন বুঝবে যে, আমার মৃত্যু হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং ক্রমাগত কুড়ি দিন চলিয়া সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যে পাহাড়ে বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী এবং সঙ্গীতকারী বৃক্ষ প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে তাহার খোঁজ পাইয়া সেই-সকল বস্তু পাইবার উপায়গুলি জানিয়া লইয়া পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় পা উঠিতে-না-উঠিতেই তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল যেন কে পিছন হইতে বলিতেছে, "দাঁড়ারে দুঃসাহসী যুবক, আমি এখনি তোর দুষ্টতার উচিত শাস্তি দিচ্ছি।" রাজপুত্র এই-কথা শুনিবামাত্র যেমন সাহস করিয়া তলোয়ার বাহির করিয়া পিছনের লোকটিকে কাটিবার জন্য সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি ঘোড়াসুদ্ধ একেবারে পাষাণ হইয়া গেলেন।

এদিকে রাজকুমারী পরিজাদ প্রতিদিন মেজো ভাইয়ের দেওয়া মালা ছড়াটির মুক্তাগুলি গুণিতে গুণিতে যে দিন দেখিলেন যে মুক্তাগুলি আর কোনো মতেই সরে না, সেই দিনই তাঁহার মেজো দাদার মৃত্যু হইয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো কথা কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরদিন সকালে আপনি একটি পুরুষের পোষাক পরিয়া "আমি কোনো বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কিছুদূরে যাচ্ছি, দুই তিন দিবসের মধ্যেই বাড়ী ফিরে আসব" চাকরদের কেবল এইমাত্র বলিয়া একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং কুড়ি দিনের দিন তিনিও সেই যোগিবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি বলতে পারেন, আমি কোন্ পথ দিয়ে কোন্ জায়গায় গেলে বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং সোনার মত হলদে জল, এই তিনটি পেতে পারব? তাপস উত্তর করিলেন, "ভদ্রে! যদিও তুমি পুরুষের পোষাক পরে আমার কাছে এসেছ তবু আমি তোমার গলার স্বর শুনেই ঠিক

বুঝতে পেরেছি যে, তুমি কখনই পুরুষ নও, অবশ্যই কোনো স্ত্রীলোক। অতএব আমি ঐ তিনটি জিনিষ যে কোন্ স্থানে পাওয়া যায় এবং কি প্রকারে সেগুলি সেখান থেকে আনতে হয় সে-বিষয়ে কোনো কথা তোমার কাছে বলতে চাই না, যেহেতু সেগুলি আনা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। অতএব আমার পরামর্শ এই যে, তুমি বৃথা অগ্রসর না হয়ে এইখান থেকেই বাড়ী ফিরে যাও।" কিন্তু রাজকুমারী যোগীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কি করিয়া যে ঐগুলি পাইতে পারিবেন তাহার উপায় জানিবার জন্য বারবার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে, যে পাহাড়ে উঠিয়া ঐ বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটিকে হস্তগত করিতে হইবে এবং যে-প্রকারে উহার মুখে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জলের বিষয় জানিয়া বহুকষ্টে তাহা আনিতে হইবে এবং ঐ পাহাড়ে উঠিবার সময় চারিদিক হইতে অতি ভয়ানক চীৎকার শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পিছন দিকে চাহিবামাত্র যে পাষাণ হইয়া যাইতে হয়, সন্ন্যাসী অগত্যা আগাগোড়া এই-সব কথা রাজবালার কাছে বর্ণনা করিয়া থলিয়ার মধ্য হইতে একটি গোলা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি ঘোড়ায় চড়ে এই ভাঁটাটি তোমার সাম্‌নের দিকে ফেলো। তা হলে এই গোলাটি খুব জোরে গড়াতে গড়াতে গিয়ে যে পর্ব্বতের নীচে থামবে, তুমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সেই পাহাড়ে চড়বে, তা হলেই ঐ তিনটি জিনিষ পেতে পারবে।"

রাজকুমারী সন্ন্যাসীবরকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঘোড়ায় চড়িলেন এবং তাঁহার দেওয়া গোলাটি নিজের সাম্‌নের দিকে ফেলিয়া দিয়া তাহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। গোলাটি অতি দ্রুতবেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়া যে পাহাড়ের নীচে গিয়া থামিল, রাজকুমারী তাড়াতাড়ি সেই পর্ব্বতের কাছে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া তূলা দিয়া কান বন্ধ করিয়া খুব সাহসের সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুদূর মাত্র উঠিতে-না-উঠিতেই চারিদিক হইতে অতি ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু রাজনন্দিনীর কান দুটি তূলা দিয়া খুব শক্ত করিয়া বন্ধ থাকায় তিনি তাহার কিছুমাত্র শুনিতে পাইলেন না। সুতরাং তিনি নির্ভয়ে ক্রমশঃ এত উঁচুতে উঠিয়া পড়িলেন যে, সেই খাঁচার পাখীটি তাঁহার চোখে পড়িল। কিন্তু পক্ষীটি রাজনন্দিনীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য চীৎকার করিয়া বারবার কেবল এই-কথা বলিতে লাগিল "ওরে নির্ব্বোধ! তুই আর উপরে উঠিস না, তুই ঐখান থেকে বাড়ী ফিরে যা।" রাজকুমারী একটুও ভয় না পাইয়া অতি কষ্টে ঐ পর্ব্বতে উঠিয়া পাখীর খাঁচাটি হাতে করিয়া বলিলেন, "পাখী! তুমি আর কোথায় যাবে? এক্ষণে তুমি আমার হস্তগত হলে।" ইহা শুনিয়া পাখীটি একটু লজ্জিতভাবে কহিল, "হে সাহসিনী! আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তোমাকে বিস্তর ভয় দেখিয়েছি বটে, কিন্তু সে জন্যে তুমি আমার উপর রাগ করো না। কারণ আজ থেকে আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস হয়ে থাকলাম এবং তুমি যে কে তাও আমি সময়বিশেষে তোমার কাছে প্রকাশ করে বলব। তাতে

তোমার বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা এখন আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করো।

রাজকন্যা পক্ষীর মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাখী! আমি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষের খোঁজ করতে এত কষ্ট

পর্ব্বতে উঠিয়া পাখীর খাঁচাটি হাতে করিয়া বলিলেন—

স্বীকার করে তোমার কাছে এসেছি। এইবার তুমি বল দেখি কাছাকাছির মধ্যেই যে অত্যাশ্চর্য্যগুণবিশিষ্ট সোনার মত রঙের জল আছে, তা আমি কোথায় গেলে পেতে পারব?" পাখী এই-সমস্ত কথা শুনিয়া যে স্থানে ঐ-প্রকার জল পাওয়া যাইতে পারে সেই স্থানটি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া বাড়ী হইতে যে রূপার পাত্রটি লইয়া আসিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সোনার-জলে পরিপূর্ণ করিয়া অতি শীঘ্র সেই পক্ষীটির

নিকট আসিয়া কহিলেন, "পক্ষীবর! এইবার আমায় বল দেখি এই পাহাড়ে যে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ আছে তা কোথায় পাওয়া যাবে?" বিহঙ্গম বলিল, "আপনার পিছনে যে বন দেখা যাচ্ছে সেখানে সন্ধান করলেই আপনি ঐ গাছ দেখতে পাবেন।" ইহা শুনিবামাত্র রাজকুমারী ঐ বনে ঢুকিয়া সেই বৃক্ষের সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া ঐ বৃক্ষটি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে অনায়াসেই চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু উহা খুব উঁচু এবং প্রকাণ্ড দেখিয়া তিনি সেই পাখীর কাছে আবার আসিয়া কহিলেন, "পাখী! আমি সেই সঙ্গীতকারী তরুটি দেখতে পেয়েছি বটে, কিন্তু সেটা এত বড় যে, তাকে শিকড়সুদ্ধ তোলা এবং এখান হতে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়, অতএব এর উপায় কি বল দেখি।" পাখী বলিল, "হে রাজকন্যে! ঐ গাছটি সমূলে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, ওর একটিমাত্র ডাল নিয়ে গিয়ে আপনার উদ্যানে লাগালেই অল্পক্ষণের মধ্যে সেটা খুব উঁচু আর বড় হয়ে এই বৃক্ষের মত সুমধুর স্বরে গান করতে আরম্ভ করবে।"

রাজকুমারী পাখীর মুখে এই-রকম কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষের একটি ডাল ভাঙিয়া আনিলেন।

তার পর সেই পাখীটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বিহঙ্গমবর! তোমার জন্যেই আমার দুই ভাই মরেছেন এবং আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁরাও এই-সমস্ত কালো পাথরের মধ্যে পাষাণ হয়ে আছেন। অতএব তাঁদের বাঁচাবার উপায় কি বল দেখি? তাঁদের আমি সঙ্গে না নিয়ে কিছুতেই বাড়ী ফিরব না।" যে উপায়ে পাষাণ দেহগুলিতে আবার প্রাণ দিতে পারা যায়, পক্ষীটির যদিও সেই-সমস্ত কথা বলিবার কোনোমতেই ইচ্ছা ছিল না, তবু রাজকুমারীর এই-রকম প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া তাহাকে অগত্যা সে-সমস্ত বলিতে হইল। সে কহিল, "রাজকন্যা! আপনার সামনে যে জলপাত্রটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি যখন এই পাহাড় থেকে নীচে নামবেন তখন ঐ পাত্র হতে একটু জল নিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রত্যেক পাথরের উপর ফেলবেন। তা হলেই আপনার ভাইদের আবার পাবেন।"

সেই অনুসারে রাজকুমারী যেমন সেই খাঁচার পাখী, সোনার জলে পূর্ণ রূপার পাত্র, সঙ্গীতকারী গাছের ডাল এবং সেই মৃতসঞ্জীবন বারিপূর্ণ জলপাত্রটি হাতে লইয়া পর্বতশিখর হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন, অমনি সেই পাত্র হইতে একটু একটু জল বাহির করিয়া প্রত্যেক পাথরের উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার দুই ভাই ও অন্যান্য রাজপুত্ররা অবিলম্বেই নিজ নিজ মনুষ্যমূর্ত্তি পাইল এবং তাঁহাদের ঘোড়াগুলিও আগেকার রূপ পাইল।

রাজকন্যা ভাইদের দেখিবামাত্র মহানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দাদা! আপনারা এতকাল এখানে কি করছিলেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।" রাজকন্যা বলিলেন, "হাঁ, এখানে আমি না এলে বোধ

হয় আপনারা অনন্তকালের জন্য নিদ্রিত থাকতেন। আপনাদের কি মনে নেই যে, আপনারা বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং সোনার রঙের জল আনতে এখানে এসেছিলেন? আপনারা কি এইখানটি কালো পাথরে পরিপূর্ণ দেখেন-নি? এখন দেখুন দেখি, সেই-সমস্ত পাথর কোথায়? আপনাদের সামনে এই যে অসংখ্য ভদ্রলোক দেখছেন, ওঁদের সঙ্গে আপনারাও এইখানে পাষাণ হয়েছিলেন।" এই বলিয়া কি করিয়া সেই মৃতসঞ্জীবন জল দিয়া তাঁহাদিগকে আবার মানুষের রূপ দিলেন এবং কি করিয়া সেই অদ্ভুত জিনিষগুলি হস্তগত করিলেন, আগাগোড়া সেই সব বর্ণনা করিলেন।

রাজকন্যার মুখে এই-সকল সমাচার শুনিয়া উপস্থিত রাজপুত্রগণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "হে বীরবালা! আপনি যখন আমাদের জীবন দান করলেন, তখন আমরা চিরকালের জন্য আপনার ক্রীতদাস হয়ে রইলাম।" রাজকন্যা রাজপুত্রগণের মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়গণ! আমি আমার ভাইদের বাঁচাতে গিয়ে আপনাদের যে জীবন রক্ষা করেছি, সেজন্য আমার কাছে আপনাদের কোনোমতেই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হবার কারণ নেই, কিন্তু আমার দ্বারা আপনাদের যে একটু উপকার হয়েছে, এই আমার পক্ষে মহানন্দের বিষয় বলতে হবে। যা হোক, এখন আর এখানে কালবিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। আসুন, আমরা সকলে নিজের নিজের বাড়ী যাই।"

এই বলিয়া তিনি বড় ভাইয়ের হাতে সঙ্গীতকারী বৃক্ষের ডাল এবং মেজ ভাইয়ের হাতে সোনালী জলের পাত্রটি দিয়া নিজে সেই পাখীটি লইয়া নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া সকলের আগে আগে চলিলেন এবং অন্যান্য সকলেই নিজের নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার পিছন পিছন যাইতে লাগিলেন। তার পর পথিমধ্যে সেই সন্ন্যাসীবরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সেখানে আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সকলেই নিজের নিজের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদিন তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে লাগিল; কারণ যিনি যে দেশ হইতে যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি সেই পথের কাছাকাছি হইবামাত্র রাজকুমারীর এবং তাঁহার ভাইদের কাছে বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজকন্যাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই ভাইকে সঙ্গে করিয়া অপূর্ব্ব জিনিষগুলি লইয়া বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারী বাড়ী পঁহুছিবামাত্র খাঁচাসুদ্ধ সেই পক্ষীটাকে বাগানে রাখিয়া দিলেন। পক্ষীটি এমন সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল যে, পাড়ার যত-রকমের পাখী আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল। তার পরে সেই সঙ্গীতকারী গাছের ডালটি বাগানে লাগানো হইল। তাহা কিছুক্ষণের মধ্যেই ডালপালা মেলিয়া অতি সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সেই বাগানে একটি প্রকাণ্ড শ্বেত পাথরের জলাশয়

করিয়া তাহার মধ্যে কয়েক ফোঁটা সেই সোনালী জল ফেলিতেই তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ঐ পাত্রটি পরিপূর্ণ করিল এবং একটু পরেই তাহার ভিতর হইতে এমন একটি ফোয়ারা উঠিল যে, ঐ জল আপনা-আপনি সাত হাত উপরে উঠিয়া আবার সেই আধারেই পড়িতে লাগিল।

এই অদ্ভুত জিনিষগুলির কথা চারিদিকে প্রচারিত হইলে, তাহা দেখিতে অনেক লোক প্রতিদিন বাগানে আসিতে লাগিল। এদিকে একদিন রাজপুত্র বাহমান এবং পরভেজ, তাঁহাদের বাড়ী হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে মৃগয়া করিতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে পারস্যের রাজাও মৃগয়া করিবার জন্য ঐ নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজরা অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়া রাজা আসিয়াছেন অনুমান করিয়া যে পথে গেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই সেই পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবঘটনায় তাঁহাদের একটি সঙ্কীর্ণ পথে রাজার সাম্‌নে পড়িতে হইল। তখন তাঁহারা আর অন্য পথে যাইতে না পারিয়া আপন আপন ঘোড়া হইতে নামিয়া সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে প্রণিপাত করিলেন।

পারস্যাধিপতি তাঁহাদের বেশভূষা ও রূপলাবণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজবংশের সন্তান বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে এবং কোথায় থাক?" বড় যুবরাজ কহিলেন, "মহারাজ! আমরা মহাশয়ের পরলোকগত মালীর পুত্র। তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমাদের জন্য যে নূতন বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন, আমরা এখন সেই বাড়ীতে বাস করি।" রাজা আবার বলিলেন, "তোমাদের আকারপ্রকার দেখে আমার বোধ যে, তোমরা পশু শিকার করতে খুব ভালবাস। অতএব তোমরা মৃগয়াকৌশল দেখিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট কর।" রাজার মুখে এই-কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্রেরা তৎক্ষণাৎ অসমসাহস প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শর দ্বারা দুইটি সিংহ ও দুইটি ভল্লুক শিকার করিলেন। পারস্যাধিপতি তাঁহাদের এই-রকম বীরত্বে মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা আজ থেকে আমার অতি প্রিয়পাত্র হলে এবং কোনো-না-কোনো সময়ে তোমাদের দ্বারা আমার মহা উপকার হবার সম্ভাবনা।" অল্পক্ষণেই রাজা তাঁহাদের এত স্নেহ করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে নির্জ্জনে কোনো কথাবার্ত্তা কহিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বাহমান কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাদের যে এতখানি গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, আমরা তার উপযুক্ত পাত্র নই। অতএব আমাদের ক্ষমা করবেন।" রাজা এই উত্তরে একটু ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাহমান আবার উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমাদের একটি ছোট বোন আছে, আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো কাজই করি না।" রাজা বলিলেন, "ভাল, আজ তোমরা বাড়ী যাও, বোনের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ স্থির করে এখানে এসে আমাকে উত্তর দিও।" সেই অনুসারে যুবরাজেরা বাড়ী গেলেন, কিন্তু ভগিনীকে সে-বিষয়ে কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিতে মনে হইল না। সুতরাং পরদিন মৃগয়ায় আসিয়া রাজার সঙ্গে

দেখা হইবামাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন, "ভাল, এবারে যেন মনে থাকে।" কিন্তু রাজপুত্রেরা সেবারেও আগের মত সমস্ত কথা ভুলিয়া যাওয়ায় রাজা সেজন্য একটুও না রাগিয়া যাহাতে তাঁহাদের ঐ সমস্ত কথা মনে হয় সেই চেষ্টায় দুইটি ছোট ছোট সোনার গোলা তাঁহাদের হাতে দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন; "তোমরা এই সোনার গোলা দুটি কাপড়ের মধ্যে রেখে দাও, তা হলে কাপড় ছাড়বার সময় আমার কথাগুলি তোমাদের মনে উদয় হবে।"

রাজকুমারেরা বাড়ী গিয়া পোষাক ছাড়িবার সময় ঐ গোলা দুইটি তাঁহাদের কাপড়ের ভিতর হইতে মাটিতে পড়িল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বোনের কাছে গিয়া তাহাকে আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। রাজকুমারী দাদাদের মুখে এই-রকম আশ্চর্য কথা শুনিয়া তিনি যে সে-বিষয়ে কি সৎপরামর্শ দিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ভাইদের সঙ্গে লইয়া সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটির কাছে গিয়া সে বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাখী আগাগোড়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, "রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু রাজবাড়ী থেকে ফিরবার সময় তাঁরাও যেন আপনাদের বাড়ী দেখতে রাজাকে নিমন্ত্রণ করে আসেন।"

রাজকুমারেরা পরদিন সকালে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজার কাছে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, রাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিজের পাশে বসাইয়া রাজবাড়ীর দিকে চলিলেন। পারস্যাধিপতি রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র যুবরাজদের দেখিবার জন্য রাজপথে লোকারণ্য হইল। কয়েকবার তাহার মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! রাজমহিষী যে গর্ভধারণ করেছিলেন, তিনি বিড়াল কুকুর প্রভৃতি প্রসব না করে যদি প্রত্যেকবারে এক একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিতেন, তা হলে মহারাজের পুত্রগণও যে এঁদের সমবয়স্ক হতেন তার আর সন্দেহ নেই।"

রাজা যুবরাজদের সমারোহ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া একখানি অপূর্ব্ব সিংহাসনে বসাইলেন।

রাজা রাজকুমারদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইবার সময়ে তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও মিষ্টালাপে মহা সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আহা! এদের যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এরা যদি আমার সন্তান হত, তা হলে যে আমি এদের কতদূর সুশিক্ষিত করতাম তা বলে শেষ করতে পারি না।" তার পর তিনি তাহাদের বিশ্রামমন্দিরে লইয়া গিয়া গায়িকা রমণীদের নাচগান করতে অনুমতি করলেন। আজ্ঞামাত্র রমণীরা এমন সুমধুর স্বরে গান-বাজনা করিতে আরম্ভ করিল যে, রাজপুত্রদের মন একেবারে মুগ্ধ হইল।

এই-রকম আমোদ-আহ্লাদে সমস্ত দিন কাটাইবার পর, সন্ধ্যার সময় বাহমান এবং পরভেজ রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি বাষ্পগদ্গদস্বরে বলিলেন, "আমি আজ তোমাদের যেতে অনুমতি দিলাম, কিন্তু তোমরা মধ্যে

মধ্যে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। কারণ আমি তোমাদের দেখলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।"

রাজকুমারেরা সেখান হইতে বাহির হইবার আগে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমাদের বলতে সাহস হয় না। আপনার স্নেহ দেখে অভয় পেয়েই বলছি আপনি এবার যখন আমাদের পাড়ার ভিতর দিয়ে মৃগয়া করতে যাবেন, তখন যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে একবার পদার্পণ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন, তা হলে আমাদের প্রতি, বিশেষতঃ আমাদের বোনটির প্রতি, বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়।" ইহা শুনিয়া পারস্যাধীশ্বর কহিলেন, "হে বৎস! আমি খুসী হয়েই তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং কল্যই গিয়ে তোমাদের বাড়ী এবং সেই সর্ব্বগুণান্বিতা বোনটিকে দেখে আসব। অতএব মৃগয়ায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যেখানে প্রথমে দেখা হয়, কল্য সকালে তোমরা সেখানে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি তোমাদের সঙ্গে তোমাদের বাড়ী যাব।"

দুই রাজকুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বোনকে এই-সমস্ত কথা জানাইলেন। রাজকন্যা পরিজাদ, রাজার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, প্রথমে মহা আনন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু কি-রকম অভ্যর্থনা করিয়া যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনে সেই পাখীর কাছে যাইয়া তাহাকে সে-বিষয়ে সদ্‌যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। পাখী বলিল, "হে ঠাকরুণ! আপনি কয়েকজন ভাল ভাল রসুইকর দিয়ে অনেক-রকম মাংস ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধিয়ে রাখুন এবং তার মধ্যে কতকগুলি মুক্তা দিয়ে যেন একটা শশার তরকারীও তৈরী করা হয়। রাজা যখন আহারে বসিবেন তখন ঐ শশার তরকারীটাই তাঁকে সবার আগে দেবেন। তা হলেই তিনি মহা সন্তুষ্ট হবেন।" ইহা শুনিয়া রাজকুমারী অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "পাখী! তুমি যে কি বলছ আমি তার ভাব কিছুই বুঝতে পারছি না। তরকারীর মধ্যে এই-রকম মুক্তা দেখে রাজা আমাদের মহাঐশ্বর্য্যশালী মনে করতে পারেন বটে, কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে তো তাঁকে এখানে ডাকা হয়নি, তাঁকে ভাল করে আহার করানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষতঃ, তুমি যে রকম ব্যঞ্জনের কথা বলছ তা প্রস্তুত করতে গেলে অসংখ্য মুক্তার প্রয়োজন, তাই বা আমি কোথায় পাব?" পক্ষী বলিল, "ঠাকুরাণি! আমি যা বলছি আপনি তাই করুন। তার জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আপনার দক্ষিণ পাশে ঐ যে গাছ দেখতে পাচ্ছেন, কাল সকালে ওরই গোড়া খুঁড়লে যথেষ্ট মুক্তা পাবেন।"

রাজকুমারী সেই পাখীটির পরামর্শ অনুসারে পরদিন খুব ভোরে একজন চাকরকে দিয়ে ঐ গাছের গোড়া খোঁড়াইতেই একটি সোনার বাক্স পাইলেন এবং সেটা খুলিয়া দেখিলেন বাক্সটি অসংখ্য ছোট ছোট মহামূল্য মুক্তায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া ঐ বাক্সটি হাতে লইয়া গৃহে ফিরিয়া ভাইদের তাহার ভিতরের মুক্তাগুলি

দেখাইয়া তিনি যে কি উপায়ে তাহা পাইলেন এবং তাহা দিয়া যে কি কি করিতে হইবে সবই তাঁহাদিগকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া যুবরাজেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; তবু ভগিনী যাহা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলিয়া কেবল সেই পক্ষীরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা প্রধান পাচককে ডাকিয়া যাহা যাহা রাঁধিতে হইবে সব বলিয়া দিলেন। তারপরে রাজকুমারেরা মৃগয়ায় গেলেন এবং পারস্যাধিপতি সেখানে আসিবামাত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরিজাদ রাজাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগে হইতেই দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে ঘোড়া হইতে নামিতে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই রাজকুমারেরা রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! ইনিই আমাদের বোন।" রাজা এই-কথা শুনিবামাত্র নিজের হাতে তাহার হাত ধরিয়া মাটি হইতে তুলিয়া রাজকুমারীকে কহিলেন, "বৎসে! আমি তোমার আকার-প্রকার দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি যে, তুমি অতি বুদ্ধিমতী। অতএব তোমার ভাইরা যে তোমার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে চায় না, তা আশ্চর্য্য নয়। যা হোক, আগে আমাকে তোমাদের বাড়ী দেখাও, পরে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে।" ইহা শুনিয়া রাজকন্যা কহিলেন, "হে রাজন্! আমরা অতি সামান্য লোক এবং নগরের এক কোণে বাস করি। আমাদের এই সামান্য বাড়ী আপনি আর কি দেখবেন?" কিন্তু রাজা সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজেই ঐ বাড়ীর সমস্ত ঘর দ্বার দেখিয়া মহা আনন্দিত হইয়া রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুন্দরি! এইবার তুমি আমাকে তোমাদের বাগান দেখাও, বোধ হয় সেটাও এই বাড়ীরই উপযুক্ত।" রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া রাজাকে তাহার মধ্যে লইয়া গেলেন। রাজা বাগানে ঢুকিবামাত্র প্রথমেই সেই সোনালী ফোয়ারাটি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! এমন অপরূপ জল তো কখন দেখিনি! আমার মনে হয় এর তুল্য জিনিষ ভূমণ্ডলে আর নেই।" এই কয়েকটি কথা বলিয়া রাজা যেমন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমনি সঙ্গীতকারী বৃক্ষটির সুমধুর গীত শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সুন্দরি! গান শুনা যাচ্ছে, কিন্তু গায়কদের দেখা যাচ্ছে না, এরই বা কারণ কি? তারা কোথায়? তারা কি পাতালে না শূন্যে অদৃশ্য হয়ে আছে?" রাজকুমারী রাজার মুখে এই-রকম কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এসব মানুষে গান করছে না। আপনার সামনের দিকে ঐ যে বৃক্ষটি দেখতে পাচ্ছেন, ঐ গাছটিই এই-রকম সুমধুর স্বরে গান করছে, আপনি ওর কাছে গেলেই আরও স্পষ্ট গান শুনতে পাবেন।" পারস্যাধিপতি কহিলেন, "হে রূপবতী! তুমি এমন অদ্ভুত গাছ কোথায় পেলে! এটা কি অকস্মাৎ এখানে উৎপন্ন হয়েছে? না, কোনো ব্যক্তি তোমাকে উপহার দিয়েছে? এবং এই বৃক্ষটির

নামই বা কি ?" রাজকুমারী বলিলেন, "মহারাজ! একে আমরা সঙ্গীতকারী বৃক্ষই বলে থাকি এবং একে যে উপায়ে এখানে আনা হয়েছে, তার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায় না। অতএব আপনার কাছে সোনালী জল, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী এই অদ্ভুত জিনিষ তিনটি যে-সকল কষ্ট স্বীকার করে এখানে এনেছি তার বিবরণ আমি সময়ান্তরে ব্যক্ত করব। এখন আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।"

'একে আমরা সঙ্গীতকারী বৃক্ষই বলে থাকি'

রাজা বলিলেন, "আমি যে অত্যদ্ভুত জিনিষগুলি দেখলাম এতেই আমার সকল শ্রম দূর হয়েছে। এখন আমাকে বাক্‌সিদ্ধ পাখীটির কাছে নিয়ে চল।"

রাজকন্যা রাজাকে সঙ্গে লইয়া একটি সুন্দর ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন এবং নানাজাতীয় গায়কপক্ষীর মাঝে উপবিষ্ট সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটির কাছে গিয়া কহিলেন, "ওরে পাখী!

আজ পারস্তাধিপতি এসেছেন। তাঁকে প্রণাম কর।" ইহা শুনিয়া পক্ষী কহিল, "মহারাজের জয় হোক। পরমেশ্বর মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন।"

পক্ষীটি যে-ঘরে ছিল সেই গৃহেই ভোজনের আয়োজন হইলে রাজা আহার করিতে বসিয়া শশার ব্যঞ্জনটি কাছে থাকাতে সবার আগে তাহারই খানিকটা মুখে ফেলিয়া দিলেন। তার পরে চিবাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার মধ্যে কতকগুলি মুক্তা রহিয়াছে। তাহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, "এ কি! কি অভিপ্রায়ে শশার সঙ্গে মুক্তা-মিশ্রিত করে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়েছে, মুক্তা কি কখন খাওয়া যায়?" এই-কথা বলিয়াই তিনি যেমন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রাজকন্যা ও রাজপুত্রদের দিকে তাকাইলেন; অমনি সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটি বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আপনি যখন বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন যে, আপনার রাজমহিষী মানুষ হয়ে একটি কুকুরছানা, একটি বিড়াল, আর একটি কাঠের পুতুলের মা হয়েছেন, তখন আপন চক্ষে শশাতে মুক্তা দেখে কিজন্য এ-রকম আশ্চর্য্য বোধ করছেন?" পাখীর মুখে এই কয়েকটি কথা শুনিবামাত্র রাজা কহিলেন, "সে-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নেই। আমি ধাত্রীদের কথাতেই তা বিশ্বাস করেছি।"

তখন পাখী বলিল, 'মহারাজ! ধাত্রীরা যে কে, আপনি তা জানেন কি? তারা রাণীর দুই সহোদরা। তারা ছোট বোনের এই-রকম সৌভাগ্য দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে আপনাকে প্রতারণা করেছে। তাদের একটু জোর-জবরদস্তি করলেই তারা দোষ স্বীকার করবে। আপনার কাছে এই যে দুই রাজপুত্র ও রাজকন্যাটিকে দেখছেন, এঁরাই আপনার সন্তান। হিংসুটে ধাত্রীরা এঁদের মেরে ফেলবার জন্যে নদীতে ফেলে দিলে পর এঁরা যখন আপনার বাগানের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন সেই-সময়ে আপনার মালী এদের নদী থেকে তুলে আপন সন্তানের মত লালন-পালন করেছিল।"

পক্ষী এই-রকম আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিয়া রাজার ভ্রম দূর করিলে, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বিহগশ্রেষ্ঠ! তোমার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে-বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নেই। যেহেতু ওদের দেখে অবধি আমার অন্তঃকরণে যে অপত্যস্নেহের উদয় হয়েছে তাতেই আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে যে এরাই আমার সন্তান।" রাজা এই কয়েকটি কথা বলিয়াই উঠিয়া সন্তানদের আলিঙ্গন করিলেন এবং অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দুই ভাই এবং ভগিনীটিও পিতৃদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া একেবারে আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তার পর রাজা, রাজকুমার এবং রাজকুমারীর সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিলেন। পরে যাইবার সময় তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন, "বাছা! আজ তোমরা তোমাদের পিতাকে দর্শন করলে, কাল আমি তোমাদের জননী রাজমহিষীকে এইখানে এনে দেখাব। অতএব তোমরা তাঁকে বিশেষ অভ্যর্থনা করবার আয়োজন কর।"

এই বলিয়া পারস্যাধীশ্বর নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া খুব তাড়াতাড়ি রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে পৌছিয়াই সবার আগে রাণীর সেই হিংসুটে বোনদের রাজসভায় আনাইলেন এবং বিচারে তাহাদের দোষ প্রমাণ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মাথা কাটিয়া ফেলিতে অনুমতি দিলেন। তার পরে যেখানে রাজমহিষী বন্দী থাকিয়া মহাকষ্টে জীবনযাপন করিতেছিলেন, পারস্যাধিপতি সভাসদগণকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্‌গদস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রেয়সি! আমি বিচার না করে তোমার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমি তোমার কাছে এসেছি এবং যাদের জন্যে তোমাকে এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, তাদেরও প্রাণদণ্ড করতে অনুমতি দিয়েছি। কুকুর-বিড়ালের বদলে তুমি যে দুটি বহুগুণশালী কুমার এবং কাঠের পুতুলের বদলে যে একটি পরমাসুন্দরী কুমারীর মা হয়েছিলে, আমি তাদের যখন তোমাকে দেখাব তখন তুমি আগেকার দুঃখ একেবারে ভুলে যাবে। সম্প্রতি তুমি বাড়ী চল।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে মহাসমারোহ করিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন।

পরদিন সকালে রাজা এবং রাণী সুন্দর বসনভূষণে সাজিয়া পারিষদদের সঙ্গে করিয়া মৃত মালীর বাড়ী যাত্রা করিলেন এবং রাজা সেখানে উপস্থিত হইয়াই রাজকুমার বাহমান ও পরভেজ এবং রাজকন্যা পরিজাদকে রাণীর কোলে দিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! এরাই তোমার সন্তান। এখন এদের কোলে নিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন করে জগদীশ্বরের নিকট এদের দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা কর।"

রাজমহিষী যে পুত্রকন্যার অভাবে এতকাল নানা-রকম কষ্ট এবং অপমান সহ্য করিতেছিলেন, এখন তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের কোলে করিয়া আনন্দে অবিরত চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন

ইতিপূর্ব্বে রাজপুত্রেরা মা-বাবার খাবারের জন্য যে-সমস্ত ভাল ভাল খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন এখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া সেই-সমস্ত খাইলেন।

তার পরদিন পারস্যাধিপতি মহিষীকে সেই সোনালী জল, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটিকে দেখাইয়া আনিলেন। তার পরে তিনি নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রদের দক্ষিণ পাশে এবং পরিজাদ ও মহিষীকে বাম পাশে আলাদা আলাদা ঘোড়ায় চড়াইয়া মহাসমারোহ করিয়া রাজবাড়ীর পথে যাত্রা করিলেন।

আবু আয়ুবের পুত্র গানেমের কাহিনী

সে অনেককালের কথা। ডামস্কস্ নগরে এক সওদাগর ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল আবু আয়েব, ধনদৌলত ছিল অগাধ। এত ধন ভোগ করিবার যে তাঁহার লোক ছিল না তা' নয়। গানেম নামে তাঁহার যে পুত্র ছিল তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রভা দেশময় আলোর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; কন্যা আল্‌কলবার নয়নভুলানো রূপে দিক্ আলো হইয়া উঠিত। কিন্তু এত সুখ আবু আয়েবের সহিল না; আলোকরা ঘর অন্ধকার করিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন।

গানেমের বয়স তখন অল্প; কিন্তু হইলে কি হয়? পিতার মৃত্যুতে তাঁহাকেই সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে হইল। একদিন গানেম আর তাঁহার মা গল্প করিতে করিতে দেখিলেন, ঘরের মধ্যে কতকগুলি কাপড়ের গাঁটের উপর বড় বড় অক্ষরে "বোগদাদের জন্য" লেখা রহিয়াছে। গানেম ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "বাছা, তোমার বাবা বোগদাদে গিয়ে ওই সব জিনিষ বিক্রী কর্‌বেন মনে করেছিলেন, তাই ওতে ওরকম লেখা। ভগবান তাঁর সে সাধ ত পূর্ণ কর্‌লেন না।"

গানেম মায়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মা, বাবার সাধটা আমি থাকতে অপূর্ণ থাকবে কেন? যে জিনিষ তিনি বোগদাদে বিক্রী কর্‌বেন মনে করেছিলেন, তা আমি নিজে গিয়ে সেখানে বিক্রী করে আস্‌ব।"

ছেলের কথায় মা ত ভয়ে আকুল। এতটুকু ছেলে বলে কি? মা বলিলেন, "বাছা, তোর এই বয়সে অমন কাজ সাজে না। বিদেশ যে কি জিনিষ আর বাণিজ্য যে কি ব্যাপার তার তুমি জান কি? এখন ওসব ইচ্ছা ছাড়। আর দেখ বাছা, তুমি যদি আমার এই অবস্থায় ফেলে চলে যাও তবে আমি কার মুখ চেয়ে বাঁচ্‌ব?"

গানেমের মন তখন কল্পনায় বিদেশের কত রঙীন ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। সুদূরের পথ কত অজানা রূপ-রসের লোভে তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। মায়ের চোখের জল অনুনয় কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। বিদেশ-যাত্রার আয়োজন সুরু হইয়া গেল; লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ দেখিয়া জনকয়েক দাস কেনা হইল, আর ভাল দেখিয়া একশ উট ভাড়া করা হইল। একশ উটের পিঠ কাপড়ে বোঝাই করিয়া নূতন বণিক আর-একদল বণিকের সঙ্গে বোগদাদের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। মা আর মেয়ে বাড়ীতে বসিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। ছেলে বোগদাদে পৌঁছিয়া সুন্দর ঘরবাড়ী ভাড়া করিয়া জম্‌কাইয়া বসিলেন।

তার পর একদিন খুব সাজ-পোষাকের ঘটা করিয়া গানেম বাজারে চলিলেন। সেখানে তাঁহার আদর দেখে কে? দেখিতে দেখিতে সব জিনিষপত্র বিক্রী হইয়া গেল, বাকি রহিল কেবল একটি গাঁট। মাত্র একটি, এ আর বেশি কি? গানেম ভাবিলেন পরদিন আসিলেই ওটিও উঠিয়া যাইবে। কিন্তু পরদিন বাজারে আসিয়া দেখেন সব দোকান-পাট বন্ধ। একটি লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সব বন্ধ কেন?" সে বলিল, "একজন প্রধান বণিকের মৃত্যু হয়েছে। তাই আজ সকলে মিলে তাঁর গোরস্থানে গিয়েছেন।"

সেখানে কি হয় দেখিবার জন্য গানেমের মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তিনিও আর-সকলের মত গোরস্থানে চলিলেন। গিয়া দেখেন মৃত বণিকের জন্য উপাসনা হইতেছে। তার পর খুব দামী কাপড়ে মৃতদেহ ঢাকা দিয়া পাথরের গোরের মধ্যে রাখা হইল। গোর দেওয়া শেষ হইয়া গেলে পরলোকগত বণিককে সম্মান দেখাইবার জন্য সকলে খাইতে বসিলেন। এই-রকম নানা ব্যাপারে দিন শেষ হইয়া গেল। সূর্য্য ডুবিয়া গেল, রাত্রি অন্ধকার করিয়া আসিল, গানেমের বড় ভয় হইল—বাড়ীতে জিনিষপত্র ফেলিয়া আসিয়াছেন, যদি চোরে সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া যায়। ভয়ে বেচারার ভাল করিয়া খাওয়া হইল না। খাওয়া শেষ হইলে শুনিলেন আজ আর কেউ বাড়ী ফিরিবেন না। গানেম কিন্তু আর-সকলের মত এইখানেই রাত কাটাইতে পারিলেন না। সকলকে লুকাইয়া তিনি একলাই বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

রাত্রি তখন অনেক। নগরের দরজা বন্ধ। গানেমের বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছেই আর-একটা গোরস্থানের ঘাসের উপর শুইয়া ঘুমাইবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দূর হইতে একটা আলো সেইদিকে আসিতেছে। শ্মশানের মাঝখানে না-জানি কিসের আলো ভাবিয়া ভয়ে গানেম তাড়াতাড়ি একটা গাছে চড়িয়া বসিলেন। আলোটা ক্রমে কাছে আসিয়া পৌঁছিলে দেখিলেন, ক্রীতদাসের মত পোষাক-পরা তিনজন লোক একটা সিন্দুক ঘাড়ে করিয়া আনিয়া নামাইল। তার পর তাড়াতাড়ি করিয়া একটা গোর খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে সিন্দুকটা পুঁতিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

এতরাত্রে এমন চুপিচুপি আসিয়া লোকগুলি কি রাখিয়া গেল জানিতে গানেমের মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তিনি আস্তে আস্তে গাছের নীচে নামিয়া গোর খুঁড়িয়া সিন্দুকটি বাহির করিলেন। তাড়াতাড়ি ডালা খুলিতে গিয়া দেখিলেন সিন্দুকে তালাবন্ধ। নিরাশ হইয়া গানেম দুঃখিতমনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর একটা পাথর দিয়া ঠুকিয়া তালা ভাঙিয়া ফেলিয়া যাহা দেখিলেন, কোনোকালে স্বপ্নেও তা' তিনি মনে করেন নাই। দেখিলেন, সিন্দুকের মধ্যে পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে শুইয়া আছেন। তাঁহার মুখে চোখে মৃত্যুর কোনো ছাপ নাই, সোনার মত রং একটুও ম্লান হয় নাই, যৌবনের লাবণ্যে মুখখানি পদ্মের মত ঢলঢল করিতেছে, নিশ্বাসও একটু একটু বহিতেছে। সবই আছে, কিন্তু জ্ঞান নাই।

খুব সাবধানে অনেক যত্নে গানেম মেয়েটিকে সিন্দুকের বাহিরে আনিয়া ঘাসের উপর শোয়াইয়া দিলেন। তখন ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠাণ্ডা হাল্কা হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। সেই স্নিগ্ধ হাওয়া মুখে চোখে লাগিতেই মেয়েটির জ্ঞান একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। খানিক পরে চোখ মেলিয়া তিনি গানেমের দিকে না তাকাইয়াই কতকগুলি মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মেয়েগুলি বোধ হয় তাঁহার সখী। কিন্তু সেখানে ত আর তাহারা ছিল না, উত্তর দিবে কে? কোনো উত্তর না পাইয়া মেয়েটি চোখ মেলিয়া দেখিলেন যে, ঘর-দ্বার কোথাও কিছু নাই, শ্মশানে ঘাসের উপর তিনি শুইয়া আছেন। ভয়ে তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। গানেম মেয়েটির ভয় দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া আগাগোড়া সমস্ত কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। নিজের জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনার কথা পরের মুখে শুনিয়া মেয়েটির ভুল ভাঙিল। তিনি তাঁহার জীবনদাতা গানেমকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এই দুঃখিনীর উপর কৃপা করে যখন আপনি এতটাই করেছেন, তখন আর-একটু করুন। ওই সিন্দুকটার মধ্যে আমাকে আবার পূরে ঘোড়ার পিঠে তুলে বাড়ী নিয়ে চলুন। সেখানে গিয়ে আমার সব-কথা আপনাকে বল্‌ব।"

মেয়েটির কথা-মত সমস্ত করা হইল। বাড়ী পৌঁছিয়া নিজের হাতে সিন্দুক খুলিয়া গানেম মেয়েটিকে বাহির করিয়া আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন; নিজের হাতে খাবার আনিয়া খাইতে দিলেন। মেয়েটি গানেমকেও সেইসঙ্গে খাইতে অনুরোধ করিলেন। দুইজনে খাইতে বসিলেন। মুসলমানবংশের মেয়েরা মুখের ঘোম্‌টা প্রায় কোনো পুরুষের কাছেই খোলে না, কিন্তু গানেম যাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া তাঁহার সাম্‌নে ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া থাকেন? তাই মেয়েটি মুখ খুলিয়াই বসিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে গানেম দেখিলেন মেয়েটির ওড়্‌নায় সোনার অক্ষরে কি যেন লেখা রহিয়াছে। লেখাটা কি জানিবার জন্য গানেমের ভারি কৌতূহল হইল। তিনি ওড়্‌নার অক্ষরগুলি পড়িতে চাহিলেন। পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "হে ভবিষ্যৎবক্তার পিতৃবংশীয়, তুমি আমার এবং আমি তোমার।" গানেম বুঝিলেন মেয়েটি সম্রাটের প্রিয়পাত্রী। কারণ তখনকার সম্রাট্‌ মহম্মদের কাকা আব্বাসের বংশধর। মেয়েটির পরিচয়ের একটুখানি আভাস পাইয়া বাকিটা জানিবার জন্য গানেমের মন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সম্রাটের প্রিয়পাত্রী কি করিয়া এমন অবস্থায় পড়িলেন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গানেম তাঁহাকে তাঁহার আগেকার কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমার নাম ফেৎনাব (হৃদয়বেদনাদায়িনী)। আমার খুব অল্পবয়সে এক দৈবজ্ঞ বলেছিলেন, যে, এই মেয়েটিকে দেখ্‌বে একদিন-না-একদিন তার একটা মস্ত অমঙ্গল হবে। তাই আমার এমন নাম রাখা হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি মহারাজের অন্তঃপুরে মানুষ হয়েছিলাম, তাঁরি কৃপা আর যত্নে নানারকম শিল্প শিখি আর

অনেক শাস্ত্র পড়্তে পাই। লেখাপড়া আর কাজকর্ম্ম শেখার উপর আমার এত টান দেখে মহারাজ আমার উপর খুব খুসী হয়েছিলেন। তিনি আমায় খুব স্নেহ কর্‌তেন, আদর করে' কত সময় কত দামী জিনিষ উপহার দিতেন। রাজমহিষী জোবেদী কিন্তু আমার উপর মহারাজের এত টান পছন্দ কর্‌তেন না। আমায় ঐজন্তেই তিনি দেখ্‌তে পার্‌তেন না,

গানেম যুবতীর ওড়্‌নায় লেখা পড়িতেছেন

হিংসা করে' আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। এতদিন আমি খুব সাবধানে চলে তাঁর সমস্ত কুমৎলব নিষ্ফল করে এসেছি বটে, কিন্তু শেষকালে আর তাঁর সঙ্গে পেরে উঠ্‌লাম না। দিনকয়েক আগে মহারাজ কতকগুলি বিদ্রোহী সামন্তকে শাস্তি দেবার জন্তে বাড়ী ছেড়ে চলে' যান। রাণী সেই অবসরে আমার এক ঝিকে ঘুস দিয়ে বশ করে' তাকে দিয়ে আমার সর্‌বতে বিষ মিশিয়ে দেন। সেই বিষ খাওয়ার ফলে আমি প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। তার পর আমার দশা যে কি হয়েছিল তা বোধ হয় আর বল্‌তে হবে না। সেটা আপনি আমার চেয়ে ভালোই জানেন। এখন আপনার হাতেই আমার জীবন-মরণ, কারণ, মহারাজ না-আসা পর্য্যন্ত রাণীর হাত এড়ানো শক্ত। তিনি আমার খোঁজ পেলেই মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন। আর যদি জানতে পারেন যে, আপনি আমার সাহায্য করেছেন, তা হলে আপনাকেও নিস্তার দেবেন না।"

ফেৎনাবের কাহিনী শুনিয়া গানেম সসম্মানে বলিলেন, "ভদ্রে, আমার হাতে আপনার কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। আপনি যে এখানে আছেন, একথা আমি পারতপক্ষে প্রকাশ হতে দেব না। আপনার সেবা করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।" গানেম ফেৎনাবের জন্য দুইটি দাসী রাখিয়া দিলেন, নিজেও তাঁহাকে খুসী রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জোবেদীর ত আহার নিদ্রা বন্ধ। সিন্দুকে পুরিয়া ফেৎনাব আপদকে ত বিদায় করা হইল, কিন্তু মহারাজের কাছে ব্যাপারটা লুকানো থাকে কি করিয়া? জোবেদী ভাবিয়া ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা না পাইয়া যে বুড়ী ঝি তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল তাহার শরণ লইলেন। বুড়ী বলিল, "রাণীমা, এক কাজ করুন। একটা কাঠের পুতুলকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে বাক্সের মধ্যে পুরে চারিদিকে রটিয়ে দিন যে, ফেৎনাব হঠাৎ মারা গেছে। তার পর বাক্সটা গোর দিয়ে তার উপর একটা মস্‌জিদ তৈরী করান্ আর দাসদাসী সবাইকে শোকের পোষাক পরতে বলুন। নিজেও সেইসঙ্গে পর্‌বেন। তার পর মহারাজ বাড়ী ফিরে এসে সবাইকার এ-রকম পোষাক দেখে নিজেই নিশ্চয় কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। তখন আপনি বল্‌বেন যে, ফেৎনাব হঠাৎ মারা পড়েছে। কথাটা হয়ত তাঁর বিশ্বাস হবে না, হয়ত মনে করবেন আপনিই হিংসা করে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছেন। তখন আপনি গোর খুঁড়িয়ে কাপড়-ঢাকা পুতুলটা দেখাতে পার্‌বেন। তাতেও যদি তাঁর বিশ্বাস না হয়, যদি তিনি মুখের কাপড় তুলে ফেৎনাবের মুখ দেখ্‌তে চান, তাহলে আপনি বল্‌বেন, ''শাস্ত্রে মানা আছে। কাজেই মহারাজকে ক্ষান্ত হতে হবে। ভগবান যদি আপনার উপর সদয় থাকেন, তা হলে এতেই আপনার কার্য উদ্ধার হয়ে যাবে।"

বুড়ীর কথায় জোবেদী ত মহাখুসী। আনন্দে তাহাকে একটা মহামূল্য হীরাই দিয়া ফেলিলেন। তার পর তাহার কথামত সব কাজ সুরু করিলেন। শহরে ফেৎনাবের মৃত্যুর কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। কথাটা ক্রমে ক্রমে গানেমের কানেও উঠিল। তিনি ফেৎনাবকেও খবরটা দিয়া আসিলেন।

বিদ্রোহী রাজাদের হার মানাইয়া মাস-তিনেক পরে সম্রাট্ খুব জাঁকজমক করিয়া রাজধানীতে আসিলেন। এমন সুখের খবরটা প্রথমেই ফেৎনাবকে দিবেন মনে করিয়া মহারাজ বাড়ী আসিয়াই অন্দরে ঢুকিতে গিয়া দেখেন, দাসদাসী যে যেখানে আছে সকলেরই গায়ে শোকের পোষাক। মহারাজ ত দেখিয়া অবাক্। তার পর জোবেদীর মহলে গিয়া তাঁহাকেও ঐ-রকম পোষাকে দেখিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ক্রীতদাসী ফেৎনাবের অকালে মৃত্যু হওয়াতে সকলে এই-রকম পোষাক পরেছে।" এমন দুঃসংবাদ শুনিয়াই মহারাজ চীৎকার করিয়া মন্ত্রী জাফরের কোলের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙিতেই মহারাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ফেৎনাবের সমাধি কোথায় আমায় দেখাও।" রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আমি তাকে বড় ভালবাস্‌তাম, তাই রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তার সমাধি-মন্দির তৈরী করিয়েছি।" রাণীর কথা শুনিয়াই মহারাজ সেখানে যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জোবেদী পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিলেন। সমাধি-মন্দিরে পৌছিয়া রাজার মনে নানারকম সন্দেহ উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমি একবার শবাধারটা দেখ্‌তে চাই।" রাজার ইচ্ছার কথা মুখ দিয়া বাহির হইতে-না-হইতে ক্রীতদাসেরা সমাধি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। গোর খুঁড়িয়া সেই ঢাকা-দেওয়া কাঠের পুতুলটা বাহির করা হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া নিজেই চাদরখানা তুলিয়া ফেৎনাবের মুখ দেখিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভয়ে জোবেদীর প্রাণ উড়িয়া গেল। কোনো-রকমে সাম্‌লাইয়া লইয়া জোবেদী বলিলেন, "মৃতদেহের উপরের চাদর তুল্‌বেন না, শাস্ত্রে বারণ আছে।" মহারাজ শাস্ত্রে বিশ্বাসী, ঈশ্বরপরায়ণ মানুষ, শাস্ত্রের নিষেধ আছে শুনিয়া ভয় পাইয়া হাত সরাইয়া লইলেন, ফেৎনাবের মুখ দেখা আর হইল না। কাঠের পুতুলটাকে আবার গোর দেওয়া হইল। এ-যাত্রা জোবেদী মানে মানে বাঁচিয়া গেলেন। মহারাজ ফেৎনাবের আত্মার মঙ্গলের জন্য সাম্রাজ্যের যত বড় বড় পুরোহিতকে সেই সমাধি-মন্দিরে প্রতিদিন তিনবার করিয়া কোরান পাঠ আর উপাসনা করিতে আদেশ দিয়া শোকে দুঃখে ম্লানমুখে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। একদিন মহারাজ নিজের ঘরে পালঙ্কে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন; তাঁহার বিছানার দুইপাশে দুটি দাসী বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে রাজা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া দুই সখীতে গল্প আরম্ভ করিল। একজন বলিল, "একটা সুখবর শুন্‌বি বোন? ফেৎনাব নাকি এখনও বেঁচেই আছেন।" এমন কথা শুনিয়া সখী আনন্দে দিশাহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, সে কি গো! সত্যি নাকি!" দাসীর চীৎকারে মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গেল, তিনি একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, "অমন চেঁচামেচি করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেন?" দাসী ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল, "মহারাজ, ফেৎনাব বেঁচে আছেন, শুনে আমি আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, দয়া করে' দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।" দাসীর উত্তর শুনিয়া মহারাজের চোখের ঘুম কোথায় উড়িয়া গেল, তিনি বিছানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কোথায় তুমি এমন খবর পেলে?" যে দাসী খবর দিয়াছিল সে বলিল, "মহারাজ, আজ একজন অচেনা লোক আমার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে বল্‌লে, চিঠিখানা মহারাজকে দিও। চিঠিতে কোনো নাম স্বাক্ষর নেই বটে, কিন্তু ফেৎনাবের হাতের লেখা দেখেই আমি চিনেছি। মহারাজের ঘুম ভাঙ্‌লে চিঠি দেব মনে করেছিলাম।"

চিঠিখানা পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ফেৎনাব

নিজের বিপদ আর দুর্ভাগ্যের কথা সমস্ত লিখিয়া শেষে গানেমের কথা লিখিয়াছেন। গানেম যে তাঁহাকে কত আদর যত্নে রাখিয়াছেন মহারাজকে সে-কথা না জানাইয়া ফেৎনাব পারেন নাই। কিন্তু ফেৎনাব যে আশায় গানেমের গুণগান করিয়াছেন তাহা ফলিল না; ফল হইল উল্টা। এই ব্যাপারে গানেমেরই কোনো চক্রান্ত আছে মনে করিয়া মহারাজ গানেমের উপর চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই মন্ত্রী জাফরকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, গানেমের ঘরবাড়ী যেন এখনি ভাঙিয়া ধূলিসাৎ করা হয়, আর ফেৎনাব ও গানেমকে বন্দী করিয়া তাঁহার কাছে ধরিয়া আনা হয়।

রাজার হুকুম পাইবামাত্র জাফর সৈন্য-সামন্ত লইয়া গানেমের বাড়ী আক্রমণ করিতে চলিলেন। রাজার কাছে চিঠি পাঠাইয়া কি ফল হয় জানিবার জন্য ফেৎনাব ঘরের জানালায় বসিয়া পথ-পানে তাকাইয়া ছিলেন। হঠাৎ জাফরকে সদলবলে যুদ্ধ-সাজে সাজিয়া আসিতে দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশায় ছাই পড়িয়াছে। যে গানেম তাঁহাকে যমের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার এই বিপদে কোনো-রকমে সাহায্য করিবার জন্য ফেৎনাব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া গানেমকে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাজ আমাদের মেরে ফেল্‌বার জন্যে সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন। এখনও একটু সময় আছে, তুমি এই বেলা চাকরের পোষাক পরে বেরিয়ে পালাও, নইলে আর রক্ষা নেই। আমার জন্যে ভেবো না। মহারাজের সঙ্গে কোনো-রকমে যদি একবার দেখা হয়, তাহলে এ যাত্রা প্রাণে মর্‌ব না।" গানেমের মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। তিনি কিছুক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ফেৎনাবের উপরোধ-অনুরোধে বাধ্য হইয়া চাকরের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে একটা চাকর মনে করিয়া সৈন্যদল তাঁহাকে কিছু-মাত্র সন্দেহ করিল না। গানেম অনায়াসে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইলেন।

মন্ত্রী-মহাশয় বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া চারিধার খুঁজিতে খুঁজিতে ফেৎনাবের ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। মন্ত্রীকে দেখিয়াই ফেৎনাব তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "মন্ত্রীমশায়, মহারাজ আমায় কি শাস্তি দিয়েছেন বলুন। আমি এখনি তা মাথা পেতে নেব।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ তোমার একগাছি চুলও ছুঁতে বারণ করে দিয়েছেন। তোমার কোনো ভয় নেই। তিনি তোমাকে আর তোমার জীবনরক্ষক বণিককুমার গানেমকে তাঁর কাছে নিয়ে হাজির কর্‌তে মাত্র বলেছেন।" ফেৎনাব বলিলেন, "আমি ত এখনি যেতে রাজি আছি। কিন্তু সওদাগরমশায় ত আজ একমাস হ'ল কি-সব কাজের জন্য ডামস্কস গেছেন। তাঁর ঘরবাড়ী জিনিষপত্র সব দেখবার ভার আমার উপর দিয়ে গিয়েছেন। আমি চলে গেলে যাতে তাঁর ধনসম্পত্তি কিছু নষ্ট না হয় আপনি অনুগ্রহ করে তার ব্যবস্থা কর্‌বেন।" "আচ্ছা তাই করা যাবে," বলিয়া মন্ত্রী ফেৎনাবকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সঙ্গের রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়া গেলেন, "বাড়ীর মধ্যে ভালো করে গানেমের খোঁজ করে বাড়ীটা ভেঙে চুরমার করে ফেলো।" সৈন্যদল খানাতল্লাস করিয়া কোথাও

গানেমকে না পাইয়া বাড়ীঘর ভাঙিয়া একাকার করিয়া চলিয়া গেল। রাজসভায় পৌঁছিয়া সেই কর্ম্মচারী মন্ত্রীকে খবর দিল যে, গানেমকে কোথাও পাওয়া গেল না

মন্ত্রী-মহাশয় ফিরিয়াছেন দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, আমার হুকুম-মত সব করেছ ত?" মন্ত্রী বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ফেৎনাব আপনার হুকুমের অপেক্ষাতেই

চাকরের সাজে গানেমের পলায়ন

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু গানেমের ত কোনো খোঁজ পেলাম না। ফেৎনাব বললেন, "তিনি আজ মাসখানেক হল ডামস্কস গেছেন।" মহারাজ ত খবর শুনিয়া রাগিয়া আগুন। তাঁহার যত রাগের জ্বালা গিয়া পড়িল ফেৎনাবের উপর। নিশ্চয় সে-ই সব চক্রান্তের মূল। মহারাজ হুকুম দিলেন, "রাখো ওকে অন্ধ কূপে বন্ধ করে।" যাহার উপর হুকুম হইল

তাঁহার এমন কাজে কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না; কিন্তু কি আর করে? সম্রাটের আদেশ! কাজেই সে দুঃখিনী ফেৎনাবকে পাতালপুরীর মত গাঢ় অন্ধকার একটা খোঁপে কয়েদ করিয়া রাখিল।

সীরিয়া রাজ্যের রাজধানীতে তখন মহম্মদ জেনেবি রাজত্ব করিতেন, আত্মীয় বলিয়া সম্রাট্ হারুন-অল্-রশীদ তাঁহাকে এই রাজ্যটি দান করিয়াছিলেন। ফেৎনাবকে অন্ধকূপে বন্ধ করিয়া সম্রাট্ সেই মহম্মদ জেনেবিকে চিঠি লিখিতে বসিলেন:—

"প্রিয় ভ্রাতঃ,

গানেম নামের ডামস্কসের এক সওদাগর আমার ক্রীতদাসী ফেৎনাবকে চুরি করিয়াছিল। সে এখন তোমার রাজ্যে পলাইয়া গিয়াছে। আমার আদেশ, তুমি তাহাকে ধরিয়া হাতে-পায়ে শিকল বাঁধিয়া উপরি-উপরি তিন দিন তাহাকে পঞ্চাশ ঘা করিয়া বেত মারিবে। তার পর তাহাকে সমস্ত শহর ঘুরাইয়া শহরে প্রচার করিয়া দিও যে, সম্রাটের ক্রীতদাসী চুরি করিলে এই-রকম শাস্তি হয়। শহর ঘোরানো হইয়া গেলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। তার পর তাহার ঘর-বাড়ী ভূমিসাৎ করিয়া ধন-সম্পত্তি লুট করিয়া তাহার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে তিন দিন ধরিয়া শহরময় ঘুরাইয়া প্রচার করিয়া দিও যে, যদি কোনো প্রজা তাহাদের সাহায্য করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

মহম্মদ জেনেবি মানুষটি খুব দয়ালু; চিঠি পড়িয়া গানেমের দুঃখে তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সম্রাটের হুকুম অমান্য করেন এমন সাধ্য তাঁহার ছিল না। কাজেই তিনি লোকজন সৈন্যসামন্ত লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া গানেমের বাড়ী চলিলেন।

অনেককাল ছেলের কোনো খোঁজখবর না পাইয়া গানেমের মা মনে করিলেন, ছেলে বুঝি আর বাঁচিয়া নাই। গানেমের নামে বাড়ীর ভিতরেই একটি সমাধি-মন্দির তৈরী করা হইল, তাহাতে গানেমের একটি মূর্ত্তি রাখিয়া মা-মেয়ে দুজনে শোকের পোষাক পরিয়া দিনরাতই কান্নাকাটি করিতেন। দিন এমনি করিয়া যায়, এমন সময় একদিন মহম্মদ জেনেবি আসিয়া হাজির। গানেমের খোঁজেই তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া গানেমের মায়ের চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। কাঁদিতে-কাঁদিতেই তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের চেহারা আর বেশভূষা দেখেই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছেন যে, বাছা আমার আর নেই। আমার এমন সৌভাগ্য কি হবে যে, তার সেই চাঁদমুখখানি আবার দেখতে পাব? ওরে আমার বাছারে!" কাঁদিতে কাঁদিতে বিধবার গলা বন্ধ হইয়া আসিল। এমন দৃশ্য দেখিয়া মহম্মদ জেনেবি আর কি করিয়া বিধবার কথা অবিশ্বাস করেন? কিন্তু এই শোকের উপরেও দুঃখিনীদের দুঃখের বোঝা তাঁহাকে বাড়াইতে হইবে। সম্রাটের আদেশ এমন নিষ্ঠুর যে, সে নিষ্ঠুর আদেশের কথা দয়ালু জেনেবির মুখ দিয়া বাহির হইল না। তিনি বলিলেন, "এখানটা আপনাদের থাক্‌বার উপযুক্ত জায়গা নয়; আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" দুজনে বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে আসিতেই রাজা প্রজাদের সেই বাড়ী লুট করিতে হুকুম দিলেন। লুটপাট

করিয়া বাড়ী-ঘর ভাঙিয়া ফেলিতে বলিয়া তিনি আল্‌কলব্ আর তাহার মাকে সঙ্গে করিয়া নিজের রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। সম্রাটের নিষ্ঠুর আদেশের কথা আর কতক্ষণ না বলিয়া পারা যায়? জেনেবি বাড়ী আসিয়া দুঃখিনীদের নূতন দুর্ভাগ্যের কথা কোনো-রকমে

গানেমের মা ও ভগিনীর অপমান

তাঁহাদের বলিলেন। ঘোড়ার লোমের পোষাক পরাইয়া মা ও মেয়েকে পথে পথে ঘুরাইয়া আনা হইল। অপমানের ব্যথায় তাঁহাদের চোখের জল এক মুহূর্তের জন্যও শুকাইতে পাইল না। পথে-ঘাটে তাঁহাদের এমন অপমান যে দেখিল তাহারই চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। পথে পথে সারাদিন এমনি করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। শোকে দুঃখে আর অপমানের ব্যথায় তাঁহারা

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাণী আর তাঁহার সখীরা মিলিয়া অনেক কষ্টে আর যত্নে হতভাগিনীদের মূর্চ্ছা ভাঙাইলেন। চোখ মেলিয়া চাহিয়াই গানেমের মা একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, বলতে পার কোন্ অপরাধে আমাদের এমন গুরুদণ্ড?" দাসী বলিল, "শুন্‌লাম আপনার ছেলে মহারাজ হারুন-অল্-রশীদের এক ক্রীতদাসীকে চুরি করেছে। তাই ছেলের পাপে মায়ের এমন শাস্তি।" ছেলে যে এখনও বাঁচিয়া আছে এই-কথা শুনিয়া এত দুঃখেও তাঁহার মায়ের প্রাণ সমস্ত ব্যথা ভুলিয়া সুখী হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া তিন দিন পথে পথে ঘুরাইয়া চার দিনের দিন চারিদিকে প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, যদি কোনো প্রজা গানেমের আত্মীয়-স্বজনকে কিছুমাত্র সাহায্য করে তবে তাহাকে রাজার হুকুমে প্রাণটি হারাইতে হইবে, এমন কি মরিবার পর কুকুর দিয়া তাহাকে খাওয়ানো হইবে। গানেমের মা আর বোনকে ইহার পর শহর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রাণের ভয়ে কেউ তাঁহাদের এক ফোঁটা জলও দিল না। দুঃখিনীরা সারাদিন উপবাসের উপর পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া একটি ছোট গ্রামে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বুকভাঙা দুঃখের কথায় গ্রামের লোকের মন গলিয়া গেল, তাহারা দয়া করিয়া মা ও মেয়েকে কিছু খাবার আর দুই-একখান কাপড় দিল। রাত্রে শুইবার একটু ঠাঁইও সেইখানেই মিলিল। ভোরে উঠিয়া দুজনে আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, পথই এখন তাঁহাদের ঘর। কতদিন পথ হাঁটিয়া আলিপ্পো নগর ছাড়াইয়া ইউফ্রেটিস নদী পার হইয়া তাঁহারা বোগ্দাদে আসিয়া উঠিলেন। কিন্তু এততেও দুঃখের অবসান হইল না। সম্রাটের ভয়ে গানেম রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার দেখা মিলবে কি করিয়া?

মহারাজ হারুন-অল্-রশীদ মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে পথে বেড়াইতে বাহির হইতেন। রাত্রে এইভাবে পথেঘাটে ঘুরিয়া তিনি প্রজাদের মনের কথার খোঁজ করিতেন। অনেককাল পরে একদিন এমনি বেশে ফেৎনাবের অন্ধকূপের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলেন, সে আপন মনে গানেমের জন্য কাঁদিতেছে, "হায়রে হতভাগ্য গানেম, না জানি আজ তোমার কি দুর্দশা ঘটেছে! অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়েই ত তোমার এত লাঞ্ছনা। মহারাজকে সম্মান দেখাতে গিয়ে নিষ্ঠুর মহারাজের হাতে তোমার কি অপমানই না হ'ল? ভগবান খলিফাকে এই পাপের শাস্তি নিশ্চয় একদিন দেবেন।"

ফেৎনাবের বিলাপ শুনিয়া সম্রাটের ভুল ভাঙিল। তাহার কোনো দোষ নাই জানিয়া প্রাসাদে ফিরিয়াই তিনি ফেৎনাবকে তাঁহার কাছে হাজির করিতে বলিলেন। রাজার মুখের কথা পড়িতে-না-পড়িতে ফেৎনাবকে আনিয়া হাজির করা হইল। রাজা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ফেৎনাব কার উপর আমি এমন অবিচার করেছি, আমায় নির্ভয়ে সব খুলে বল, আমি এখনি তার সুবিচার করব।" রাজার কথায় সাহস পাইয়া ফেৎনাব তাহার এতকালের দুঃখের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল।

আজ মহারাজ বড়ই উদার। ফেৎনাবের কোনো কথায় কিছুমাত্র রাগ না করিয়া বরং তাহার উপর খুসীই হইয়া উঠিলেন। তার পর মন্ত্রী জাফরকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজধানীতে প্রচার করিয়া দাও যে, গানেমের সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। সে স্বচ্ছন্দে এখানে ফিরে আস্তে পারে; এলে পরে তার সঙ্গে আমি ফেৎনাবের বিবাহ দেওয়াব।" কিন্তু রাজার আদেশ প্রচারের কোনোই ফল ফলিল না, গানেমের খোঁজ মিলিল না।

হতাশ হইয়া ফেৎনাব নিজেই গানেমকে খুঁজিতে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাজার মত পাইয়া এক হাজার মোহর সঙ্গে করিয়া ফেৎনাব ঘোড়ায় চড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। নগরে যত মন্দির ছিল, সব-তাতে কিছু কিছু টাকা দিয়া পুরোহিতদের তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন সকাল হইতেই আবার একহাজার মোহর লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বাজারে রত্নবণিক-দের দোকানে গিয়া সেখানকার উপরওয়ালাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন্‌লাম আপনি নাকি নিজের আয়ের অধিকাংশ দীনদুঃখীদের দান করেন। আমিও সামান্য কিছু দিয়ে দুঃখীদের সাহায্য কর্‌তে চাই। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি দয়া করে এই সামান্য কটা মোহর যোগ্যপাত্রে দান করে দেবেন।" বণিক ফেৎনাবের সাজ-পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীর মহিলা মনে করিয়া বলিলেন, "মা, আমি খুসী হয়েই আপনার আদেশ পালন করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনি যদি নিজে হাতে দান কর্‌তে চান তবে অনুগ্রহ করে আমার বাড়ী আসুন। কাল দুটি দুঃখিনী মেয়েকে এই নগরে আসতে দেখে আমি তাদের আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাদের দেখ্‌লে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। তাই আমার স্ত্রী তাদের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন।"

কথাটা শুনিয়া ফেৎনাবের কৌতূহল হইল, তিনি ভদ্রলোকটির বাড়ী চলিলেন। তাঁহার স্ত্রী খুব আদর অভ্যর্থনা করিলেন। ফেৎনাব বলিলেন, "আপনার স্বামীর কাছে শুন্‌লাম কাল দুটি ভদ্রঘরের দুঃখী মেয়ে আপনার কাছে এসেছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

গৃহিণী ফেৎনাবকে তাঁহাদের কাছে লইয়া গেলেন। ফেৎনাব বলিলেন, "শুন্‌লাম আপনারা বড় দুঃখে কষ্টে পড়েছেন, তাই আমি এলাম যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগ্‌তে পারি। এ নগরে আমার একটু-আধটু প্রতিপত্তি আছে।"

ফেৎনাবের কথায় মেয়ে দুটির চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অল্পবয়সী মেয়েটি নীরবে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন, প্রবীণা কাঁদিয়া বলিলেন, "আজও তবে ভগবান আমাদের একেবারে ভুলে যাননি।" তাঁহার কথায় ফেৎনাবেরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

ফেৎনাব তাঁহার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "শুনেছি ফেৎনাব বলে মহারাজের এক প্রিয়পাত্রী আছে, সেই আমাদের সকল দুঃখের মূল।" এই-কথা শুনিয়াই ফেৎনাবের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, কিন্তু তিনি কোনো-রকমে মনের কথা

চাপা দিয়া সব-কথা ভাল করিয়া শুনিতে চাহিলেন। দুঃখিনী বলিলেন, "মহারাজের অন্তঃপুরে ফেৎনাব বলে একটি মেয়ে থাকৃত। সেই মেয়েটিকে চুরি করার অপরাধে আমার ছেলে গানেমের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। আর সেই পাপেই আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে' সীরিয়াদেশ থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই এতদিন ধরে পথে পথে ঘুরে এই পোড়া দেশে এসে উঠেছি।"

ফেৎনাব গানেমের মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, আমিই সেই অভাগিনী ফেৎনাব। আমার জন্তেই আজ গানেমের আর আপনাদের এত দুঃখভোগ। কিন্তু মা আমার বা গানেমের কোনো দোষ নেই। আমাদের অদৃষ্টের দোষেই এত দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমাদের দুঃখের রাত বোধহয় এইবার পোহাল। মহারাজের কাছে আমি গানেমের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পেরেছি। তিনি তাঁকে ক্ষমা করে আমার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে রাজি হয়েছেন। এখন ভগবানের দয়ায় গানেমের দেখা পেলেই আমাদের দুঃখের অবসান হয়।"

রাজা গানেমকে ক্ষমা করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মা আর বোনের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না।

ইতিমধ্যে বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, "মা, আজ বোগদাদের হাঁসপাতালে একটি পীড়িত যুবক উটের পিঠে চড়ে এসেছিল। তার মুখ দেখে আমার কেমন চেনা-চেনা লাগ্ছিল, কিন্তু ঠিক চিনতে পার্লাম না। তাই তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটি কিন্তু কোনো উত্তর দিল না, কেবল অঝোরে চোখের জল ফেলতে লাগ্ল। দেখে আমার মনটা কেমন হয়ে গেল, তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলাম। সাধারণ হাঁসপাতালে চিকিৎসাও তেমন ভাল হয় না, পথ্যও বিশেষ সুবিধার মেলে না, সেখানে পড়ে থাক্লে হয়ত ছেলেটি মারাই পড়্ত।"

হয়ত বা এতদিনে বিধাতা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছেন মনে করিয়া ফেৎনাব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলিলেন, "আমায় একবার সেই পীড়িত লোকটির কাছে নিয়ে চলুন। তাকে দেখবার জন্তে আমার মন ছটফট্ কর্ছে।"

রোগীর ঘরে ঢুকিয়া ফেৎনাব দেখিলেন, পালঙ্কের উপর একটি জীর্ণশীর্ণ লোক চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। শরীরে কেবল হাড়ের উপর একটি চাম্ড়া ছাড়া আর কিছু নাই। লোকটিকে দেখিয়াই ফেৎনাব বুঝিলেন, এ গানেম ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু নিজের এত সৌভাগ্যে তাঁহার বিশ্বাস হইতেছিল না, মনে হইল বুঝি বা চোখে ভুল দেখিতেছেন, তাই একবার ডাকিলেন, "গানেম!" চোখের জলে ফেৎনাবের গলা ধরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই চিরপরিচিত মধুর স্বর চিনিতে গানেমের দেরি হইল না। চোখ মেলিয়া চাহিয়াই ফেৎনাবকে দেখিয়া "ভগবানের কি আশ্চর্য্য লীলা!" বলিয়া গানেম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর কর্ত্তা আর ফেৎনাব অনেক যত্নে আবার তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

এদিকে অন্যঘরে বসিয়াই গানেমের গলার স্বর চিনিতে পারিয়া তাঁহার মা ও বোন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গানেমের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফেৎনাব তাঁহাদের এই-রকম অবস্থা দেখিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে বসিলেন। অনেক চেষ্টায় জ্ঞান হইতেই মা ছেলেকে দেখিবার্ জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, "গানেমের এমন অবস্থায় আপনাদের দেখ্‌লে মন চঞ্চল হয়ে অনিষ্ট হতে পারে, আপনি যাবেন না।" ছেলের অনিষ্টের ভয়ে মা অগত্যা জেদ ছাড়িলেন। ফেৎনাব নিজের এমন সৌভাগ্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া সম্রাটকে এই সুখবর দিবার জন্য সেদিনকার মত বিদায় লইলেন।

রাজপ্রাসাদে গিয়া মহারাজকে প্রণিপাত করিয়া ফেৎনাব সমস্ত খবর দিলেন। মহারাজ শুনিয়া খুসী হইয়া বলিলেন, "গানেম সেরে উঠ্‌লে তার মা বোন আর তাকে নিয়ে আমার কাছে এসো।"

সেবায় যত্নে গানেম দিন দিন সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ফেৎনাব প্রায়ই তাঁহার কাছে যাইতেন। একদিন নানা গল্পের মধ্যে কি করিয়া ফেৎনাব গানেমের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার ফলে মহারাজ কেমন করিয়া তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জন করিয়াছেন, এই-সব সুখের কথার গল্প করিলেন। শুনিয়া গানেমের আনন্দ উছলিয়া উঠিল, তাঁহার সকল ভয়ভাবনা কাটিয়া গেল। তার পর ফেৎনাবের মুখে মা ও বোনের সমস্ত দুঃখ আর অপমানের কথা শুনিয়া তাঁহার মুখের হাসি চোখের জলে মুছিয়া গেল। তাঁহাদের দেখিবার জন্য গানেমের মন কাঁদিয়া উঠিল। ফেৎনাব তাঁহাদের মিলন ঘটাইয়া দিলেন। ছেলেকে পাইয়া মায়ের বুক জুড়াইয়া গেল।

ফেৎনাব তখন গানেমের এতদিনের সব-কথা শুনিতে চাহিলেন। গানেম বলিলেন, "বোগ্দাদ ছেড়ে ত পালালাম। তার পর অনেক পথ ঘুরে, অনেক দুঃখ-কষ্ট সয়ে একটি ছোট্ট গ্রামে গিয়ে উঠ্‌লাম। কপাল এমনি খারাপ যে, সেখানে গিয়েই রোগে পড়্‌লাম। সেখানকার কয়েকটি চাষা ছিল খুব দয়ালু, তারা আমার অনেক সেবা-শুশ্রূষা করে যখন কিছুতেই রোগের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ল না, তখন চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে উটের পিঠে বোগ্দাদে পাঠিয়ে দিল।"

যাহার যত সুখদুঃখের কথা ছিল, সব বলা হইল। ফেৎনাব নিজের কথাও বলিলেন। গানেম সারিয়া উঠিলে সকলের রাজবাড়ীতে যাইবার কথা। কিন্তু এমনি ভিখারীর বেশে ত যাওয়া যায় না। এক হাজার মোহর দিয়া ফেৎনাব সকলের জন্য সুন্দর সুন্দর পোষাক কিনিতে দিলেন। পোষাক আসিলে একদিন রাজমন্ত্রী আসিয়া রাজার আদেশ বলিয়া গেলেন। খুব সাজানো ঘোড়ায় চড়িয়া গানেম মন্ত্রী জাফরের সঙ্গে রাজসভায় চলিলেন। মেয়েরাও ফেৎনাবের সঙ্গে অন্য দরজা দিয়া অন্তঃপুরে ঢুকিলেন।

রাজসভায় ঢুকিয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া গানেম কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া মহারাজের বন্দনা করিলেন। শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তার পর মহারাজ গানেমকে বলিলেন, "যে দিন প্রথম তোমার সঙ্গে ফেৎনাবের দেখা হয় সেদিন থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সব খুলে বল।"

একটি কথাও ঢাকা না দিয়া গানেম সরলভাবে সব-কথা বলিয়া গেলেন। মহারাজ বুঝিলেন ইহার মধ্যে কোথাও একটুও মিথ্যা নাই, খুসী হইয়া তিনি গানেমকে একটি মহামূল্য পোষাক উপহার দিলেন আর বলিলেন, "আজ হতে চিরকাল তুমি আমার সভার শোভা হয়ে থাক।" গানেম মহারাজের আদেশ মাথায় পাতিয়া লইলেন, মহারাজ তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি ঠিক করিয়া দিলেন। তার পর মন্ত্রীও গানেমকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন। সেখানে গিয়া আল্‌কলুবার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, না জেনে তোমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই তোমায় আমার রাণী করে। জোবেদীর পাপের শাস্তিও এতেই হবে।"

তার পর একদিন মহা ধূমধাম করিয়া ফেৎনাবের সঙ্গে গানেমের আর আল্‌কলুবার সঙ্গে সম্রাটের বিবাহ হইয়া গেল।

খোদাদাদ ও তাঁহার উনপঞ্চাশ ভাই

অনেক কাল আগে হরন্ নগরে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুখের কোনো আয়োজনেরই তাঁহার অভাব ছিল না। ধন ছিল দৌলত ছিল, আর সুখী প্রজা ছিল। রাজাকে প্রজারা যেমন ভয় তেমনি ভক্তি করিত। এত সুখেও রাজার মন ছিল অসুখী, কারণ তাঁহার পঞ্চাশটি রাণীর কোল ছিল শূন্য। রাজপ্রাসাদে একটি শিশুর হাসিও কোনো দিন ফুটে নাই। মনের দুঃখে রাজা দিনরাত্রিই ভগবানের কাছে কাতর হইয়া পুত্র ভিক্ষা করিতেন।

একদিন রাত্রে রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার মাথার কাছে এক অতি বৃদ্ধ ঋষি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মাথার চুল দুধের মত শুভ্র; ঋষি বলিলেন, "তোমার প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিয়াছে। কাল ভোরবেলা তোমার বাগানের একটি ডালিম আনিয়া, যতগুলি পুত্র চাও, ততগুলি বীজ খাইও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।" পরদিন ভোর না হইতেই ডালিম আনিয়া রাজা পঞ্চাশ রাণীর জন্য, পঞ্চাশটি কুমার কামনা করিয়া পঞ্চাশটি বীচি খাওয়াইলেন। কিছুদিন পরে একে একে উনপঞ্চাশ রাণীর কোল আলো করিয়া উনপঞ্চাশটি শিশু-কুমার উদয় হইল, কিন্তু রাণী পিরোজার কোল তখনও শূন্য পড়িয়া রহিল। পিরোজার এই অপরাধে ক্রুদ্ধ রাজা তাঁহাকে যমলোকে পাঠাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি রাগের মাথায় অমন কাজ করবেন না,

হয় ত কিছুদিন পরে পিরোজারও সন্তান হবে। তবে আপনি যদি নিতান্ত তাকে দেখতে না পারেন ত এখনি প্রাণে না মেরে তাকে আপনার ভাই সমরিয়ার রাজার কাছে পাঠিয়ে দিন।”

রাগটা সাম্‌লাইয়া রাজা তাহাই করিলেন। মন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণীও ফলিয়া গেল। সমরিয়ার রাজধানীতে পৌছিবার অল্পদিন পরেই ফুলের চেয়েও সুন্দর একটি শিশু আসিয়া পিরোজার কোল জুড়িয়া বসিল। সমরিয়ার রাজা পিরোজার স্বামীকে সুখবর পাঠাইয়া দিলেন। খবর শুনিয়া সুখী হইয়া তিনি ছেলের নাম রাখিতে বলিলেন খোদাদাদ। ছেলের শিক্ষাদীক্ষার যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় একথাও বলিয়া দিলেন। খোদাদাদ কাকার রাজধানীতেই দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিও বাড়িয়া চলিল। অল্পদিনেই কুমার সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন, যুদ্ধে ত তাঁহার দোসর দেশে আর-একটিও মিলিত না।

বাকি উনপঞ্চাশ রাণীর উনপঞ্চাশ কুমারও বড় হইয়া উঠিল। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা কি বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় তাহারা দিতে পারিল না। এদিকে সেই সময় বিদেশী শত্রুরা আসিয়া হরন্ রাজ্য আক্রমণ করিল। পিতার বিপদে সমরিয়ায় বসিয়াই খোদাদাদের মন কাতর হইয়া উঠিল। তিনি মাকে গিয়া বলিলেন, “শত্রুরা বাবার রাজ্য আক্রমণ করেছে, এমন সময় দূরে বসে সুখে কাল কাটানো কি আমার উচিত, মা? আমি চাই তাঁর বিপদে সাহায্য করতে। তিনি আমাকে ডাকেননি, কিন্তু আমি নিজের পরিচয় না দিয়ে যে কোনো সৈনিকের মত তাঁর অধীনে কাজ নিয়ে শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে প্রশংসা পেতে চাই।” মা শুনিয়া খুসী হইয়া মত দিলেন।

খোদাদাদ যাত্রার আয়োজন সুরু করিলেন। কাকা পাছে বাধা দেন এই ভয়ে মৃগয়ার নাম করিয়া যোদ্ধার বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। হরন্ নগরে পৌছিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিলেন। তরুণ সৈনিকের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। খোদাদাদ বলিলেন, “আমি কায়রোর এক আমীরের পুত্র। দেশভ্রমণে এখানে এসেছি। শুন্‌লাম আপনার প্রতিবেশী রাজারা আপনাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আপনার যথাসাধ্য সাহায্য করতে পেলে আমি সুখী হব।” এই-কথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়া রাজা তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

অল্পদিনেই খোদাদাদের যশ আলোর মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে এতই ভালবাসিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহারই হাতে উনপঞ্চাশ কুমারের দেখাশুনার ভার সঁপিয়া দিলেন। কুমারেরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র খুসী হইয়া উঠিলেন না। রাজ্যে আসিয়া পা দিতে-না-দিতে এত প্রতিপত্তি লাভ করাতে গোড়াতেই তাঁহারা খোদাদাদের উপর চটিয়া ছিলেন, এখন আবার তাহাকেই নিজেদের হর্ত্তাকর্ত্তা হইতে দেখিয়া রাগে হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। কি করিয়া খোদাদাদের সর্ব্বনাশ করা যায়

এই ভাবনায় তাঁহাদের চোখের ঘুমসুদ্ধ লোপ পাইল। অনেক ভাবিয়া ঠিক করিলেন, একদিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া মৃগয়ায় যাইবার জন্য খোদাদাদের অনুমতি চাহিবেন, কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া আর ফিরিবেন না। ছেলেদের হারাইয়া রাজা নিশ্চয় খোদাদাদের উপরেই চটিয়া উঠিবেন, হয়ত তাহাকে রাগের মাথায় প্রাণেই মারিয়া ফেলিবেন। খোদাদাদ মরিলে তাঁহারা নিষ্কণ্টক হইয়া মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন।

রাজকুমারেরা শিকারে যাইবার জন্য খোদাদাদের অনুমতি চাহিতেছেন

রাজকুমারদের ফন্দি সফল হইল। অনেককাল ছেলেদের দেখা না পাইয়া মহা চটিয়া রাজা খোদাদাদকে বলিলেন, "যদি তুমি অমুক দিনের মধ্যে তাদের খোঁজ করে দিতে না পার তাহলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" খোদাদাদ রাজার মুখে এমন কথা শুনিবার আশা কোনো দিন করেন নাই। এমন নিষ্ঠুর কথায় মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া তিনি সেইদিনই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজকুমারদের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। কত দেশ-দেশান্তর খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের দেখা মিলিল না। হতাশ হইয়া খোদাদাদ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। মাঠের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড

কালো-পাথরের বাড়ী ; বাড়ীটার কাছে গিয়া দেখিলেন জানালায় একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে বসিয়া আছে, তাহার মাথার এলো চুল রুক্ষ, গায়ের কাপড়-চোপড় শতছিন্ন। মেয়েটি খোদাদাদকে দেখিয়াই উপর হইতে ডাকিয়া বলিল, "পালাও, পালাও ; এ বড় ভীষণ জায়গা। এখানে এক রাক্ষস থাকে, সে মানুষ দেখ্‌লেই খাবার জন্যে তাকে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখে।" খোদাদাদ একটুও ভয় না পাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি কে? কি করে এমন জায়গায় এলে?"

জানালায় পরমাসুন্দরী মেয়ে—

সুন্দরী বলিল, "আমি কায়রো-দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের কন্যা। কাল যখন আমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন এই রাক্ষসটার হাতে পড়ি। নিষ্ঠুর রাক্ষস আমার সঙ্গীসাথী সকলকে মেরে ফেলে আমায় আটক করে রেখেছে। আজ না জানি আমার কি দশা হবে!"

মেয়েটির মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে রাক্ষসটা একটা প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে আসিয়া হাজির হইল। চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতে খোদাদাদ খোলা তলোয়ার তুলিয়া ধরিলেন। রাক্ষসটা গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বিনাযুদ্ধে হার মানিতে বলিল। খোদাদাদ কিন্তু সে-কথা কানে না তুলিয়া রাক্ষসের উরুতে প্রচণ্ড এক কোপ বসাইয়া দিলেন। রাগে অন্ধ হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া রাক্ষসও তলোয়ার খুলিয়া তাঁহাকে মারিতে আসিল। খোদাদাদ সামান্য মানুষ হইলেও যুদ্ধ-বিদ্যায় অদ্বিতীয় ; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতিতে নানা কৌশলে ঘোড়া চালাইয়া তিনি রাক্ষসের খাঁড়ার ঘা এড়াইলেন ; রাক্ষসটা আবার হাত তুলিতে-না-তুলিতেই খোদাদাদের তলোয়ারের ঘায়ে তাহার মাথা উড়িয়া গেল।

সুন্দরী মেয়েটির ধড়ে যেন এতক্ষণে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ এই ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল ততক্ষণ সে যেন তাহারি মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। রাক্ষসটা মরিয়া যাইতেই মেয়েটি হাসিমুখে খোদাদাদকে ডাকিয়া উপর হইতে একটা চাবি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই চাবিটা দিয়ে দরজা খুলে আমায় উদ্ধার কর।" বন্ধ বাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই মেয়েটি বাহিরে আসিয়া খোদাদাদের সাহসের শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিক

হইতে কান্নার সুর আসিয়া মেয়েটির কথা ডুবাইয়া দিতে লাগিল। খোদাদাদ ভাবিয়া পাইলেন না কে এমন কাতরভাবে কাঁদিতেছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আজ কতদিন ধরে কত দুর্ভাগাকে এইখানে ঘরে-ঘরে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। এসব তাদেরি কান্নার সুর।" বন্দীদের দুঃখে দুঃখী হইয়া খোদাদাদ সেই মেয়েটির সাহায্যে একে একে সমস্ত অন্ধকার ঘরের কোণ হইতে হতভাগ্যদের উদ্ধার করিয়া আনিলেন। বন্দীরা অন্ধকার ঘর হইতে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইতেই খোদাদাদ দেখিলেন এতদিন যাহাদের খোঁজে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছেন ইহাদের মধ্যে তাঁহার সেইসব হারানো ভাইগুলি রহিয়াছে। ভাইদের দেখিয়া আনন্দে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহাদের সাদর-সম্ভাষণ করিয়া অন্যসব বন্দীদের বিদায় দিয়া এইবার যাত্রার আয়োজন সুরু হইল। কিন্তু মেয়েটিকে ত একলা ফেলিয়া রাখা যায় না। খোদাদাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যেতে চাও বল। এখানে তোমায় একলা ফেলে যাওয়া আমাদের উচিত হবে না।" মেয়েটি বলিল, "আগে আমার সত্য পরিচয় শুনুন, তার পর অন্যকথা। আমি প্রথমে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম, আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনার কাছে আর মিথ্যা বলা চলে না। আমি আসলে এক রাজার মেয়ে। শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলে রাজ্য দখল করে নিয়েছে, তাই আমি পালিয়ে এসেছি।" খোদাদাদ বলিলেন, "ওইটুকু বলে কি লাভ? আগাগোড়া সব ভাল করে বল।" তখন মেয়েটি তাহার ইতিহাস বলিতে বসিল।

দরিয়াবাদের রাজকন্যার কথা

"চারিদিক সমুদ্রে ঘেরা এক দ্বীপের মধ্যে দরিয়াবাদ নগর। দরিয়াবাদের রাজার ধন-মানের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু খ্যাতিতে মানুষের মনের সুখ হয় না। রাজার ছেলেমেয়ে কিছু ছিল না, তাই মনে সুখও ছিল না। একটি পুত্রের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করতেন। কিছুদিন পরে রাজার ঘরে একটি শিশুর আবির্ভাব হল, সেটি কিন্তু একটি মেয়ে। কি আর হবে? দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে রাজা তাইতেই খুসী হলেন।

"এই অভাগিনীই সেই রাজকন্যা। রাজা মেয়েকে নানা বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। রাণী হবার উপযুক্ত সব শিক্ষাই আমার হতে লাগল, কারণ পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর স্বর্গ-প্রাপ্তির পর আমিই সিংহাসনে বসি।

"মৃগয়ায় গিয়ে পিতা একদিন একটা বুনো গাধার পিছনে তাড়া করতে করতে দলছাড়া হয়ে পড়েন। তখন ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কাজেই রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। কিছু দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল, রাজা মনে করলেন হয়ত কাছেই কোনো গ্রাম আছে। খুসী হয়েই তিনি সেইদিকে এগিয়ে চললেন। কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন একটা

প্রকাণ্ড কালো দৈত্য আগুনে মাংস পোড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে মদ খাচ্ছে। তার সাম্‌নে একটি সুন্দরী মেয়ে হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে, পাশে একটি ছোট ছেলে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌ছে। বাবা মনে মনে ভাব্‌লেন কোনোরকমে সুবিধা পেলেই দৈত্যটিকে পিছন থেকে মেরে মেয়েটিকে উদ্ধার কর্‌বেন। তিনি বসে বসে সুযোগ খুঁজ্‌ছিলেন। এদিকে দৈত্যটা ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে মাতাল হয়ে উঠে খাঁড়া তুলে মেয়েটিকে মার্‌তে ছুট্‌ল। সুযোগ বুঝে বাবা সেই-সময় দৈত্যটাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়্‌লেন। বুকে তীর বিঁধে প্রকাণ্ড কালো দৈত্যটা বিকট একটা চীৎকার করে পড়ে মরে গেল। বাবা তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত-পা

কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য এবং মাতা ও শিশু

খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি করে আপনি এই অসুরটার হাতে পড়লেন?" তিনি বল্‌লেন, 'সারাসেন বংশের এক রাজা আমার স্বামী। সমুদ্রতীরে তাঁর বাস। এই অসুরটা আমার স্বামীর অধীনে কর্ম্মচারী ছিল। আমার স্বামীর উপর চটে দৈত্যটা আমায় চুরি কর্‌বার মতলবে ছিল। একদিন আমার ছেলেকে আর আমাকে নির্জ্জনে পেয়ে জোর করে আমাদের এখানে ধরে এনেছে। সেই থেকে আমরা এইখানেই দিন কাটাচ্ছি।"

"রাতটা দৈত্যের কুঁড়েতেই কাটিয়ে বাবা পরদিন তাদের নিয়ে রাজধানীর পথে যাত্রা কর্‌লেন। পথে দলের সব লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। সবাই মিলে দরিয়াবাদে ফিরে

এলেন। সেই ছেলেটির শিক্ষার জন্যে বাবা শিক্ষক রেখেছিলেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেও নানা বিদ্যার পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ল। বড় হয়ে সে একদিন বাবার কাছে আমাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা জানাল। বাবা কিন্তু মত দিলেন না। তাতে সে ভয়ানক চটে গিয়ে শোধ নেবার জন্যে বাবার যত শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একদিন তাঁকে মেরে ফেলে সিংহাসন দখল করে বস্‌ল। তার পরেই এসে আমার মহল আক্রমণ কর্‌ল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যেই বাবার এক বিশ্বাসী মন্ত্রীর সাহায্যে একটা নিরাপদ জায়গায় পালিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম সেখান থেকে জাহাজে চড়ে কোনো একটা দূরদেশে চলে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন আমায় চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। যে জাহাজে রওনা হলাম সেটা গেল ডুবে। কোনো-রকমে প্রাণে বাঁচ্‌লাম। কিন্তু যার কেউ কোথাও নেই তার প্রাণ নিয়ে কি লাভ? তাই সমুদ্রেই আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দেব মনে করে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে পিছনে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলাম। পিছনে ফিরে দেখি জনকয়েক ঘোড়-সওয়ার সেইদিকে আস্‌ছে। তাদের সেনাপতি আমার দুর্দ্দশা দেখে দয়া করে আমায় সঙ্গে নিতে চাইলেন। তিনি বল্‌লেন, 'আপনি আমার মায়ের কাছে থাক্‌বেন। আমার সঙ্গে রাজধানীতে চলুন।' শতমুখে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলাম, পথে আমার দুঃখের কথা সব তাঁকে শোনালাম। শুন্‌লাম তিনি এক রাজা। বাড়ী পৌঁছে তিনি আমায় রাণী কর্‌তে চাইলেন। তাঁকে কোনো-দিন চিন্‌তাম না, ভালও বাস্‌তাম না, কিন্তু যিনি আমার অমন উপকারী তাঁর কথা কি ফেলা যায়? আমি রাণী হতে রাজি হলাম।

"দুঃখ আমার এইখানেই শেষ হল না। বিবাহের কিছুদিন পরে আমার স্বামীর প্রবল শত্রু জাগুইবারের রাজা একদিন অন্ধকার রাত্রে এসে আমাদের রাজ্য আক্রমণ করলেন। আমার স্বামী যুদ্ধের জন্য কোনো আয়োজনই করে রাখেননি, কাজেই সহজেই হেরে গেলেন। শত্রুর হাতে প্রাণ দেবার ভয়ে তখন আমরা পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লাম। আমাকে নিয়ে অনেক কষ্টে স্বামী একটা জেলেদের নৌকায় উঠে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। তিনদিন ধরে বিশাল সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়ে একটা জাহাজ দেখ্‌তে পেয়ে খুসী হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হায়রে কপাল! জাহাজটা ছিল ডাকাতদের। তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমাদের নৌকায় উঠে আমার স্বামীকে বেঁধে ফেল্‌ল। তার পর আমাকে নিয়ে ঝগ্‌ড়া বাধ্‌ল। কে আমাকে নেবে এই নিয়ে সবাই মারামারি কাটাকাটি সুরু কর্‌ল। যুদ্ধে সব কটা ডাকাত মরে গেল, কেবল একজন বেঁচে রইল। সে বল্‌লে, 'কায়রোয় আমার এক বন্ধু আছে, তাকে তোমায় উপহার দেব।' এই বলে নিষ্ঠুর দস্যুটা আমার স্বামীকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে কায়রোর দিকে যাত্রা কর্‌ল। কাল সবে আমরা এখানে এসেছি। ডাকাতটা আর তার সব লোকজন দৈত্যের হাতে মারা পড়েছে, আমিই শুধু বাকি ছিলাম।"

দরিয়াবাদের রাজকন্যার গল্প শুনিয়া খোদাদাদ বলিলেন, "তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার প্রভুর গৃহে আপনি যাতে সম্মানের সঙ্গে থাক্‌তে পারেন, আমি তার সুবিধা

করে দেব। আর আপনি যদি রাজি থাকেন, তবে আমি আপনাকে বিবাহ করতে রাজি আছি।" রাজকন্যা রাজি হইলেন, সেই প্রাসাদেই তাঁহাদের শুভ-বিবাহ হইয়া গেল। তার পর নববধূ ও ভাইদের সঙ্গে করিয়া খোদাদাদ হরন্ রাজ্যের পথে চলিলেন। যাইতে যাইতে ভাইদের কাছে তিনি নিজের সত্য পরিচয় দিলেন। অকৃতজ্ঞ ভাইরা তাহাতে খুসী না হইয়া হিংসায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া উঠিল। কি করিয়া তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইবে এই ভাবনায় তাহাদের রাত্রে ঘুম হইল না। খোদাদাদের কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া হিংসুক ভাইগুলি তলোয়ারের ঘায়ে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পিতার রাজ্যে পলায়ন করিল। রাজা ছেলেদের পাইয়া মহা খুসী হইয়া উঠিলেন, তার পর তাহাদের এতদিন দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মিথ্যাবাদী রাজপুত্রেরা দৈত্য কিংবা খোদাদাদের কোনো-কথা না বলিয়া বলিল, নূতন নূতন নানা দেশ দেখিতে এতদিন দেরি হইল

এদিকে খোদাদাদের নববধূ সেই দিগন্তজোড়া নির্জ্জন মাঠের মধ্যে খোদাদাদকে কোলে করিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর বিধাতা যে তাঁহার অদৃষ্টে একদিনেরও সুখ লেখেন নাই এই বেদনায় ভগবানের চরণে অনেক কাঁদিলেন; যে অকৃতজ্ঞ রাজকুমারেরা প্রাণদাতা ভ্রাতার উপর এমন অত্যাচার করিতে পারে তাহাদের কু-প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিলেন; কিন্তু রাজকুমারীর করুণ বিলাপ মাঠে মাঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহারই কানে ফিরিয়া আসিল, অন্যে কিছু শুনিল না। শোক একটু কমিয়া আসিলে রাজকুমারী দেখিলেন খোদাদাদের দেহে তখনও প্রাণ আছে, তাই তিনি বৃথা ক্রন্দন ছাড়িয়া চিকিৎসকের খোঁজে বাহির হইয়া একটি ছোট গ্রামে গিয়া পড়িলেন। গ্রামে একজন চিকিৎসক মিলিল বটে, কিন্তু মাঠে ফিরিয়া আসিয়া খোদাদাদকে আর মিলিল না। মাঠে যে ছাউনি ফেলা হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া রাজকুমারী মনে করিলেন, তবে নিশ্চয় বাঘ-ভাল্লুকে খোদাদাদকে খাইয়া ফেলিয়াছে। স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার আশায় যে চোখের জল এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে একেবারে হারাইয়া তাহা দ্বিগুণ হইয়া ঝরিতে লাগিল। রাজকুমারী চোখের জলে চিকিৎসকের কোমল মন গলিয়া গেল। তিনি দয়া করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে খোদাদাদের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া দুষ্ট রাজকুমারদের উচিত শাস্তি দিবার ইচ্ছায় তেজস্বী বৃদ্ধ রাজকুমারীকে লইয়া হরন্ নগরে চলিলেন।

তাঁহারা হরন্ নগরে পৌঁছিয়া শুনিলেন মহিষী পিরোজার পুত্র খোদাদাদ অনেকদিন ছদ্মবেশে পিতার রাজ্যে কাটাইয়া এখন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আর পাওয়া যাইতেছে না। পিরোজা স্বামীর রাজ্যে ছেলের খোঁজ করিতে আসাতেই মহারাজ সব খবর জানিতে পারিয়াছেন। কত বিদেশে তাঁহার খোঁজে লোক ছুটিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো সন্ধান কেহ দিতে পারে নাই। খবর শুনিয়া চিকিৎসক ভাবিলেন, তবু মন্দের ভাল। তিনি খুসী হইয়া মহিষী পিরোজার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

দীনদুঃখীদের ধন দান করিবার জন্য একদিন রাণী এক মন্দিরে গিয়াছিলেন ; সেখানে অনেক লোকের সঙ্গে সেই বৃদ্ধ চিকিৎসকও গিয়া ঢুকিয়াছিলেন। রাণীর এক ক্রীতদাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "ভাই, রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার ?" দাস বলিল, "যদি তুমি যুবরাজ খোদাদাদের কোনো খবর দিতে পার তবে

রাণীমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার

চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।" চিকিৎসক বলিলেন, "হাঁ, সেই-রকম খবরই দিতে পারি বটে।" দাস বলিল, "তবে তুমি আমাদের সঙ্গে রাজবাড়ীতে চল, সেখানে দেখা হবে।"

প্রাসাদে পৌছিয়া দাস রাণীকে বলিল, "একজন বুড়ো এসেছে যুবরাজের খবর নিয়ে, সে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।" রাণী শুনিবামাত্র বৃদ্ধকে আনিবার জন্য দাসকে দৌড় করাইলেন। বৃদ্ধ আসিয়া যাহা কিছু জানেন সমস্তই রাণীকে শুনাইলেন। একমাত্র সন্তানের এমন পরিণাম শুনিয়া রাণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে তিনি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহারাজও সেই মহলে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই খোদাদাদের মৃত্যু আর রাজপুত্রদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনিয়া

নববধূ খোদাদাদের মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করিলেন

রাগে অন্ধ হইয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া সেই মুহূর্ত্তেই রাজপুত্রদের কারাগারে বন্ধ করিতে হুকুম করিলেন। তার পর খোদাদাদের মৃত্যু স্মরণ করিয়া একমাসের জন্য রাজকার্য্যে যোগ দিবেন না এই-কথা নগরে প্রচার করিয়া দিতে বলিলেন। মন্ত্রী "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ পালন করিলেন। তখন মহারাজ পুত্রবধূকে প্রাসাদে আনিতে হুকুম দিলেন। হুকুম পাইবামাত্র প্রধান উজীর মহাসমারোহ করিয়া রাজবধূকে রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। নববধূ আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের কাছে খোদাদাদের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আবার বর্ণনা করিলেন।

তার পর মহারাজের আদেশে এক সুন্দর সমাধি-মন্দির গড়িয়া উঠিল। খোদাদাদের একটি প্রতিমূর্ত্তি সেই মন্দিরে রাখিয়া মহারাজ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার জন্য শোক করিতে লাগিলেন, আর নগরের প্রতি দেবালয়ে খোদাদাদের কল্যাণের জন্য আটদিন ধরিয়া উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন। আটদিন কাটিয়া গেলে নবম দিনে খোদাদাদকে হত্যাকরার অপরাধে রাজপুত্রদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

দেখিতে দেখিতে আটদিন কাটিয়া গেল। নবম দিনে রাজপুত্রদের প্রাণদণ্ডের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় খবর আসিল খোদাদাদ আর হরন্ রাজ্য রক্ষা করিতে কোনোদিন আসিবেন না জানিয়া শত্রু-রাজার দল রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাদের অসংখ্য সৈন্যদল প্রায় নগরের দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া রাজা মহা বিপদে পড়িয়া রাজপুত্রদের শাস্তি বন্ধ রাখিয়া শত্রুদের ঠেকাইবার জন্য সৈন্যসামন্ত সাজাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা ত প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সময় পান নাই, কাজেই অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমুল যুদ্ধের পর তাঁহারই সৈন্যদল হঠিতে লাগিল। শত্রুরা মহা উৎসাহে হরনের রাজাকে বন্দী করিতে আসিতেছিল, এমন সময় যুদ্ধ-ক্ষেত্রের কোনো এক কোণ হইতে দলে দলে ঘোড়সওয়ার আসিয়া নিমেষের মধ্যে অধিকাংশ শত্রুকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল, বাকি যাহারা ছিল তাহারা প্রাণের ভয়ে দৌড় দিল। শেষ মুহূর্ত্তে এমন করিয়া যাহারা শত্রুদের শেষ করিয়া দিল তাহাদের উপর রাজা যে কত খুসী হইলেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আনন্দে অধীর হইয়া তিনি এই নূতন সৈন্যদলের সেনাপতির অদ্ভুত রণকৌশলের প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া শত শত ধন্যবাদ দিতে ছুটিয়া চলিলেন। সেনাপতি কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আমি আজও বেঁচে আছি দেখে আপনি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। আপনার অসময়ে কাজে লাগাবার জন্যেই ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।" রাজা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন খোদাদাদ। এক মুহূর্ত্ত আগে রাজা পুত্রশোকে অধীর হইয়া শত্রুর হাতে বন্দী হইতে যাইতেছিলেন, আর চোখের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মৃত পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার মনে যেন আনন্দের বান বহিয়া গেল। রাজা খোদাদাদকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া মহা আনন্দে মহিষী পিরোজার কাছে লইয়া চলিলেন। সেখানে মাকে ও অকালে-হারানো স্ত্রীকে পাইয়া খোদাদাদেরও সুখের সীমা রহিল না। সকলের দেখা-সাক্ষাৎ হইবার পর খোদাদাদ কি করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন জানিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

খোদাদাদ বলিলেন, "আমি যেখানে পড়েছিলাম সেইখান দিয়ে এক চাষা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। আমায় পড়ে থাক্‌তে দেখে সে আমাকে তুলে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ী গিয়ে কি একরকমের ঘাস চিবিয়ে আমার সমস্ত গায়ের ঘায়ে লাগিয়ে দিল। তাইতেই সেগুলো তাড়াতাড়ি সেরে গেল। সেরে উঠেই এই-পথে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লাম যে,

শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ করেছে। তাই কোনো-রকমে তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঘোড়সওয়ার জুটিয়ে নিয়ে ছুটে এসেছি।”

রাজা সব-কথা শুনিয়া ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু উনপঞ্চাশ রাজপুত্রের উপর তাঁহার রাগ যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আজই সেই বিশ্বাস-ঘাতক-গুলোর প্রাণদণ্ড দিতে হবে।” খোদাদাদের মন করুণায় পূর্ণ। তিনি রাজার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, “বাবা, যদিও তারা বড় নিষ্ঠুর কাজ করেছে, তবু তারা ত আপনার সন্তান? আমি ভাইদের সব অপরাধ ক্ষমা করলাম। আপনিও তাদের ক্ষমা করুন এই চাই।” ছেলের মুখে এমন করুণামাখা কথা শুনিয়া রাজার চোখে জল আসিল। তিনি সকলের কাছে জানাইয়া দিলেন যে, খোদাদাদের কথায় অন্য রাজপুত্রদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু খোদাদাদই তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। তার পর কয়েদী রাজপুত্রদের রাজার কাছে আনিতে বলা হইল। লোহার শিকল পরিয়া সকলে আসিলে খোদাদাদ একে একে সকলের বাঁধন খুলিয়া দিলেন এবং সস্নেহে তাহাদের আলিঙ্গন করিলেন। খোদাদাদের মহত্ত্বের এই আশ্চর্য্য পরিচয় পাইয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

মায়াময় অশ্ব

কত যুগ ধরিয়া জানি না পারস্যদেশে নববর্ষ আরম্ভের দিনে খুব ঘটা করিয়া বসন্ত-উৎসব করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। দুঃখী, কাঙাল, রাজা, প্রজা সকলেই এই উৎসবের আনন্দস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। এই উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ীর সাম্‌নে মস্ত বড় এক মেলা হয়। সেই মেলাতে দেশ-বিদেশের লোক নিজেদের শিল্পচাতুর্য্য আর নানা গুণপনা দেখাইয়া রাজ-সরকার হইতে প্রচুর পুরস্কার পায়।

একবার বসন্তোৎসবের মেলায় নানা শিল্পীকে তাহাদের গুণানুসারে নানারকম পুরস্কার দিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময় একজন ভারতবাসী একটি সুন্দর কাঠের ঘোড়াকে চমৎকার সাজ পরাইয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা রাজাকে প্রাসাদে ফিরিবার কল্পনা ছাড়িয়া দিতে হইল। কাঠের ঘোড়াটি এমন নিপুণ হাতের শিল্প যে, দেখিলে প্রকৃতির হাতের গড়া জীবন্ত ঘোড়া বলিয়াই মনে হয়। ভারতবাসী রাজাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, “মহারাজ আমি সকলের শেষে এসেছি বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিষ আমি এনেছি যা আপনি আর কখনও কোথায় দেখেননি!”

রাজা বলিলেন, “তোমার ঘোড়ার এমন কোনো আশ্চর্য্য গুণ ত দেখ্‌ছি না যাতে মুগ্ধ

হয়ে যেতে হয়। শিল্পী প্রকৃতির অনুকরণ-কার্য্যে অনেকটা সফল হয়েছেন বটে, কিন্তু আর কোনো শিল্পী যে চেষ্টা করলে এ-কার্য্যে সফল হতেন না এমন ত মনে হচ্ছে না।"

ভারতবাসী বলিল,"মহারাজ আমি আপনাকে ঘোড়ার চেহারাটা দেখ্‌তে অনুরোধ করছি না। এই ঘোড়ার এমন আশ্চর্য্য গুণ যে, এ পুষ্পক রথের মত বিদ্যুদ্বেগে আকাশে উঠে

রাজা ভারতবাসীকে তালপাতা আনিতে বলিতেছেন

যেতে পারে। একে চালাবার একটি বিশেষ কৌশল আছে। সেই কৌশলটি যদি কেউ আমার কাছে শিখে নেয়, তবে এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।"

রাজা ঘোড়ার গুণের কথা শুনিয়া সুখী হইলেন, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিলেন। রাজার মুখের কথা খসিতে-না-খসিতে ভারতবাসী ঘোড়ার পিঠে এক লাফে চড়িয়া বসিয়া বলিল, "কোথায় যেতে হবে, হুকুম করুন।"

রাজা বলিলেন, "সিরাজ নগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, ওই পাহাড়ের কাছে গিয়ে তার কোণের কাছের তালগাছটি থেকে একটি পাতা কেটে আন।"

রাজার আদেশ তখনও শেষ হয় নাই ভারতবাসী তাড়াতাড়ি ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে একটা পেরেক ঘুরাইল। দেখিতে দেখিতে ঘোড়া তীরের মত ছুটিয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িল,

চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতে কোথায় যে মিলাইয়া গেল, বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ যাদের চোখ তাহারাও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। রাজা ও মন্ত্রীরা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন, মেলার যত লোক আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল একটা তালপাতা হাতে করিয়া ভারতবাসী আকাশপথে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিবা মাত্র মেলা সুদ্ধ লোক আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মাটিতে নামিয়া ভারতবাসী রাজার পায়ে তালপাতাটি উপহার দিয়া প্রণাম করিল।

ঘোড়ার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া রাজা খুসী ত হইলেনই, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজস্ব সম্পত্তি করিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কাজেই ঘোড়ার দামের কথা উঠিল। ভারতবাসী বলিল, "মহারাজ ঘোড়ার গুণ দেখে আপনি যেমন খুসী হয়েছেন, দাম শুনলে সে-রকম খুসী হবেন বলে আমার বিশ্বাস নয়। যে লোকটি ঘোড়াটা তৈরী করেছিল তার কাছ থেকে আমি দাম দিয়ে এটা কিনিনি। এই ঘোড়াটার বদলে আমার একমাত্র কন্যাটিকে দান করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি মূল্য নিয়ে কখনও একে কারুর কাছে বিক্রী করব না। তবে ঘোড়ার বদলে আর কিছু নিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার আছে।"

এই-কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, "আমার এই বিশাল রাজ্যে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর আছে ; তুমি তার মধ্যে যেটি চাও সেটিই পাবে, ঘোড়াটি আমায় দাও।"

ভারতবাসী বলিল, "মহারাজ, রাজ্য আমি চাই না। যদি আপনি রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দেন তবেই আমি ঘোড়াটি দিতে পারি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি রাজকন্যাকে না পেলে ঘোড়া দেব না।"

ভারতবাসীর কথা শুনিয়া যে যেখানে ছিল সবাই ত হাসিয়াই খুন। আর যুবরাজ ফিরোজশাহ ত লোকটার এমন স্পর্দ্ধা দেখিয়া চটিয়া আগুন। কিন্তু রাজা ঘোড়ার লোভে এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কন্যাদানেই রাজি। কিন্তু হঠাৎ মুখে মতটা জানাইয়া ফেলা ঠিক হইবে কি না ভাবিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

রাজাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যুবরাজ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, আপনি এই পাগলের কথা নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? এক-কথায় 'না' বলে দিলেই ত হয়। এই রকম একটা যে-সে লোকের সঙ্গে রাজবংশের কন্যার বিবাহ হলে আমাদেরই যে কলঙ্ক হবে তা কি আপনি জানেন না ?"

রাজা বলিলেন, "বৎস, তুমি যা বলছ সে সকলই বুঝি ; তবে এমন আশ্চর্য্য ঘোড়া ত যেখানে-সেখানে মেলে না, তাই ভাবছি। আমি যদি ঘোড়াটি না নি তবে অন্য কোনো রাজা হয়ত কন্যার বদলে ঘোড়া নিতে পারে ; কিন্তু অন্য কোনো লোকের হাতে ঘোড়াটি গেলে আমার বড় কষ্ট হবে। তবে যে-সে লোকের হাতে মেয়ে দিতেও আমি পারব না। অন্য কোনো উপায়ে যদি পারি তাই চেষ্টা দেখছি। এখন তুমি আগে ঘোড়াটি পরীক্ষা করে দেখ তার পর পরের কথা পরে হবে।"

সে যেখানে ছিল সবাই ত হাসিয়াই খুন

ভারতবাসী রাজার কথার ভাবে বুঝিলেন যে, তিনি ঘোড়ার বদলে কন্যা দিতে একরকম রাজীই আছেন। তবে যুবরাজ এখন বড়ই আপত্তি করিতেছেন, তাঁহার মতটা কোনো রকমে ফিরাইতে পারিলেই হয়। রাজকন্যা-লাভের আশায় ভারতবাসী যুবরাজকে খুসী করিবার জন্য তাঁহাকে চড়াইতে তাড়াতাড়ি ঘোড়াটা কাছে আনিয়া ধরিল; যুবরাজ কিন্তু তাহার কোনো সাহায্য না লইয়াই এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিলেন এবং যে পেরেকটা ঘুরাইয়া সে ঘোড়া চালাইয়াছিল উঠিয়াই সেইটা ঘুরাইয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়াটা আকাশে উঠিয়া দেখিতে দেখিতে চোখের আড়াল হইয়া গেল। তখন ভারতবাসী রাজার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "মহারাজ, এতে আমার কোনো অপরাধ নেই দেখ্‌তেই পাচ্ছেন। কি করে ঘোড়াটাকে শূন্যে তুল্‌তে হয় তা যুবরাজ দেখেছিলেন, কিন্তু কি করে নামাতে হয় সে-বিষয়ে আমার কোনো উপদেশের অপেক্ষা না রেখেই তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। কাজেই তাঁর নানারকম বিপদের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তার জন্যে আমি দায়ী নই। যে-রকম বিদ্যুতের মত জোরে ঘোড়াটা শূন্যে উঠে গেল তাতে উপদেশ দেবার এতটুকু সময়ও পাওয়া গেল না।"

ভারতবাসীর কথা শুনিয়া পারস্যের রাজা যুবরাজের বিপদের কারণ ভাল করিয়াই বুঝিলেন এবং ভারতবাসী তাড়াতাড়ি করিয়া নামিবার উপায় বলিয়া দেয় নাই বলিয়া তাহাকে বকিতে লাগিলেন। ভারতবাসী বলিল, "মহারাজ, আপনি ত স্বচক্ষেই দেখেছেন যে, যুবরাজ যে-রকম তীর-বেগে চলে গেলেন তাতে আমি একটি কথাও বল্‌বার সময় পেলাম না। কাজেই আমার অপরাধ নেবেন না। তাছাড়া রাজপুত্র হয়ত নিজেই বুদ্ধি করে ঘোড়ার অন্য কানটা ঘুরিয়ে দেখ্‌তে পারেন, তাহলেই নেমে পড়্‌বেন। কাজেই আপনার অতটা কাতর হবার কারণ নেই।"

রাজা বলিলেন, "এখন তোমার কোনো কথাতেই আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না। তুমি তিনদিন অপেক্ষা কর, তার মধ্যে যদি যুবরাজ ফিরে না আসেন, কিংবা তাঁর বেঁচে থাকার কোনো প্রমাণ পর্য্যন্ত না পাওয়া যায়, তাহলে সেই তিন দিন পরে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। এ-বিষয়ে আমার কথার আর কোনো নড়্‌চড় নেই।"

রাজার কথা শুনিয়া ভারতবাসী ত ভয়ে অস্থির। রাজা তাঁহার সিপাই-শান্ত্রীদের হুকুম দিয়া দিলেন, লোকটিকে যেন এই মুহূর্তেই গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করা হয়। রাজার আদেশ কে আর অমান্য করিবে? ভারতবাসীর কয়েদ হইল। রাজা যুবরাজের বিপদ আশঙ্কায় ম্লানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের সন্ধানে দেশবিদেশে লোক ছুটিল, কিন্তু কেহই কোনো সুসংবাদ আনিতে পারিল না। রাজার হৃদয় আরো কাতর হইয়া পড়িল। মনের জ্বালা মিটাইবার আর কোনো উপায় ছিল না, কাজেই ভারতবাসীকে ধরিয়া সে দিনও যথাসম্ভব বকুনি দিলেন।

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকুমার এত উপরে উঠিয়া গেলেন যে, পৃথিবীর আর

কোনো কিছু চোখে দেখাও অসম্ভব হইল। তখন তিনি মনে করিলেন, আর বেশী উপরে উঠিয়া কাজ নাই, এইবার নামিয়া পড়াই ভাল। নামিবার মতলবে ঘোড়ার কানটি খুব জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন, কিন্তু নামা ত দূরে থাকুক, ঘোড়াটা আরো উপরের দিকেই উৎসাহের সঙ্গে উঠিতে লাগিল। যুবরাজ বুঝিলেন, এ উপায়ে নামা যাইবে না, যে উপায়ে যায় সেটা না শিখিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ হয় নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কারও অনেক দিলেন, কিন্তু ভয় পাইলেন না। নামিবার উপায় একটা আছেই, সেইটা খুঁজিয়া বাহির করার কেবল অপেক্ষা, এই ভাবিয়া চারিদিকে ভাল করিয়া নজর দিয়া দেখিলেন ঘোড়ার আর একটা কানও আছে। সেই কানটা আস্তে আস্তে ঘুরাইতেই ঘোড়াটা নামিতে সুরু করিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ও পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে, যুবরাজ কোন্ রাজ্যের কোন্ কিনারায় যে নামিতেছেন কিছুই জানিতে পারিলেন না। রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন মনে হইল যেন প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর ছাদে আসিয়া নামিয়াছেন। চারিদিকে চাহিয়া বোধ হইল বাড়ীটা কোনো রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের চারিধার অসংখ্য আলোকমালায় ঝল্‌মল করিতেছে, কিন্তু কোনোদিকে জনপ্রাণী দেখা যায় না, সামান্য একটু গলার স্বর কি চলাফেরার কোনো আওয়াজও মেলে না। যুবরাজের কেমন যেন আশ্চর্য্য বোধ হইল, ভয়ও একটু একটু করিতেছিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিলেন, বিদেশী মানুষ দৈবের অধীন হইয়া এমনভাবে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, এসব কথা শুনিলে বোধ হয় কেহ তাঁহার উপর অত্যাচার করিবে না।

ছাদের উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা সিঁড়ি পাইয়া যুবরাজ নামিতে লাগিলেন। একটা ঘরের কাছে আসিয়া দেখিলেন খোলা তলোয়ার হাতে অমাবস্যার মত ঘোর কালো জনকয়েক হাবসী ঘুমাইতেছে। যুবরাজ বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহারা রাজঅন্তঃপুরের প্রহরী। সেই ঘর দিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি বড় বড় পালঙ্ক পাতা, একটি সকলের চেয়ে উঁচু। উঁচুটিতে রাণী কি রাজকন্যা এবং নীচুগুলিতে যে তাঁহার দাসীরা ঘুমাইতেছে এটুকু বুঝিয়া লইতে যুবরাজের বেশী দেরি হইল না। তিনি নিঃশব্দে উঁচু পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিলেন, সুন্দর শয্যার উপরে একটি ভুবনমোহিনী সুন্দরী ঘুমাইয়া আছেন। কালো মেঘের মত তাঁহার খোলা এলোচুল বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া কখনো চাঁদের মত মুখখানি আড়াল করিয়া ফেলিতেছে, কখনও বা সরিয়া গিয়া জ্যোৎস্নাময়ীর রূপের আলোয় ঘর আলো করিয়া তুলিতেছে। এমন অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিয়া যুবরাজেরতেজস্বী বলিষ্ঠ মনও কোমল হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "বিধাতা জগতের সকল সৌন্দর্য্য দিয়ে কি এমন ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি গড়েছ?"

মুগ্ধ হইয়া যুবরাজ সেইখানে জানু পাতিয়া বসিয়া রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে চোখ মেলিয়া চাহিয়া সুন্দরী দেখিলেন, মাটিতে হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া কে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। এমন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া

যুবরাজ জানু পাতিয়া বসিয়া রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন

রাজকুমারী বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু ভয়ের কি রাগের কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না। যুবরাজ সাহস পাইয়া বলিলেন, "রাজকুমারী, কোনো অদ্ভুত কারণে দৈবদুর্বিপাকে পড়ে পারস্যের যুবরাজ আজ তোমার চরণে অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে বসে আছে। কাল যে বসন্তোৎসবের পুরস্কার বিতরণে রাজার দক্ষিণ হস্ত ছিল, আজ তার জীবন পর্য্যন্ত তোমার হাতে। তুমি না সাহায্য করলে সে প্রাণটুকুও হারাবে। কিন্তু তার ভরসা আছে যে, এমন কুসুম-কোমল দেহে কখন নির্দ্দয় হৃদয়ের স্থান থাকতে পারে না।"

যুবরাজ ফিরোজ শাহ যাঁহার কাছে আশ্রয় ও জীবন ভিক্ষা করিতেছিলেন তিনি বঙ্গ-দেশের রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা। কন্যা রাজধানীর কোলাহল হইতে দূরে পল্লীজননীর নিভৃত কোলে আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়া বঙ্গরাজ তাঁহার জন্য এই প্রাসাদটি করিয়া দিয়াছিলেন। যুবরাজের কথা শুনিয়া রাজকুমারী মধুর সুরে বলিলেন, "রাজপুত্র, ভয় নেই, তুমি অসভ্যদের কবলে পড়নি। পারস্যদেশের মত বঙ্গদেশেও মানুষের হৃদয়ে মায়া মমতা ভদ্রতা আতিথেয়তা প্রভৃতি সভ্যসমাজের উপযুক্ত গুণগুলি আছে। শুধু আমার বাড়ীতে নয়, বঙ্গদেশের যার ঘরে তুমি অতিথি হয়ে যেতে, আদর করে সেই তোমায় ঘরে তুলে নিত।" যুবরাজ রাজকন্যার উত্তরে আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু রাজকন্যা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আগে বল, কোন্ যাদুবলে তুমি একদিনে এত পথ এলে, কোন্ মন্ত্রের গুণেই বা এত প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলে, এই-সব কথা শুনতে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে।" যুবরাজ উত্তর দিতে যাইতেছেন দেখিয়া রাজকুমারী আবার বাধা দিয়া বলিলেন, "না এখন থাক্। তোমার ম্লান মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সারাদিন তোমার মুখে অন্নজল ওঠেনি। আগে তার ব্যবস্থা করি, পরে সব-কথা শোনা যাবে এখন।"

এই-সব কথাবার্ত্তার শব্দেই বোধ হয় দাসীদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাজকন্যার আদেশে তাহারা যুবরাজকে আর-একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে লইয়া গিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে যুবরাজকে সযত্নে আহার করাইয়া সেই ঘরে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহারা রাজকুমারীর ঘরে ফিরিয়া আসিল।

রাজকুমারীর চোখের ঘুম কিন্তু যুবরাজের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়িয়া গেল। দাসীরা যতক্ষণ অতিথির আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা করিতেছিল তিনি ততক্ষণ মনে মনে অতিথির মনোমোহন রূপ ও প্রাণ-জুড়ান কথাগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিলেন। জগতে আর-কোনো মানুষের যে এমন দেবতার মত রূপগুণ থাকিতে পারে রাজকুমারী তাহা ভাবিতেও পারিতেছিলেন না। এই অনুপম পুরুষকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রাজকুমারী সকল ভুলিয়া যখন যুবরাজের কথা ধ্যান করিতেছিলেন তখন দাসীরা কাজ শেষ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কুমারী দাসীদেরও যুবরাজের কথাই শুনাইলেন। তাঁহার চোখে যাহাকে এত ভাল লাগিয়াছে ইহারা তাহাকে কেমন দেখিয়াছে

জানিতে ব্যস্ত হইয়া তিনি নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দাসীরা বলিল, "রাজকুমারি আপনার মত কি জানি না, কিন্তু আমাদের মনে হয় মহারাজ যদি এই যুবকের হাতে আপনাকে সঁপে দেন, তবে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কারুর কখন হবে না।"

কথাটা শুনিয়া রাজকুমারী মনে মনে খুবই খুসী হইলেন, কিন্তু হাজার হউক দাসীর কথা বই ত নয়। কাজেই মুখে একটু রাগ দেখাইয়া বলিলেন, "দূর পাগ্‌লী! কি সব মাথামুণ্ড যে বক্‌ছে তার ঠিক নেই। যাও এখন শোও গিয়ে, আমাকে একটু শুতে দাও।"

সকাল হইতেই রাজকুমারী বেশভূষা সুরু করিলেন। সাতবার মুখ ধুইলেন, পাঁচবার খুলিয়া ছয়বারে মনের মত করিয়া চুল বাঁধিলেন, ঘুরিতে ফিরিতে হাঁটিতে চলিতে একশত বার আয়নায় মুখখানির ছায়া দেখিলেন। তার পর মনের মত সাজসজ্জা হইলে যুবরাজের এখন অবসর আছে কি না জানিবার জন্য একজন দাসীকে তাঁহার ঘরে পাঠাইলেন। দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "যুবরাজ নিজেই আপনার কাছে আস্‌ছিলেন, কিন্তু আপনার আদেশ ত অমান্য করা চলে না, তাই তিনি আর এলেন না, আপনার দর্শনের আশাতেই বসে আছেন।"

রাজকন্যা মণিমুক্তা আর রূপের আলোয় দশদিক উজ্জল করিয়া যুবরাজের দর্শনে চলিলেন। সেখানে গিয়া কিছুক্ষণ গল্প করার পর হাসিয়া বলিলেন, "যুবরাজ, কি যাদুমন্ত্রবলে তোমার দর্শন-সুখ পেয়েছি, তা ত এখনও শোনা হয়নি; সে-কাহিনী শোনালে বাধিত হব।

যুবরাজ বসন্তোৎসবের মেলার গল্প হইতে সুরু করিয়া তাঁহার আকাশপথে যাত্রার সমস্ত ঘটনা কুমারীকে শুনাইলেন। তার পর বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার প্রাসাদে যে আমায় আশ্রয় দিয়েছ সে ঋণ শোধ দেবার মত আমার কিছু নেই; তাই নিজেকেই তোমার পায়ে অর্পণ কর্‌তে হয়েছে, আজ হতে আমিও তোমার দাসদের একজন।"

এই-কথায় একটুও বিরক্ত না হইয়া কুমারী বলিলেন, "যুবরাজ, আমার আশ্রয়ে এসে যদি তুমি নিজেকে দাস মনে কর্‌তে তাহলে আমি অত্যন্তই দুঃখিত হতাম; কিন্তু তুমি তা মনে কর না জানি, কেবল ভদ্রতার জন্যে অমন কথা বল্‌ছ। তোমার পিতার রাজ্যে তুমি যেমন স্বাধীন ছিলে এখানেও তেমনি স্বাধীন আছ জেনো।"

এমন সময় দাসী আসিয়া জানাইল অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে। দুজনে উঠিয়া আর-একটি সুসজ্জিত ঘরে গেলেন। কত বিচিত্র পাত্রে বিচিত্র রকম খাদ্য সাজানো। গায়িকারা কুমারী ও তাঁহার অতিথিকে আনন্দ দিবার জন্য মধুর সঙ্গীতে ঘরটি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। রসনার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু-কর্ণও সুধাপান করিয়া ধন্য হইল।

সেখান হইতে রাজকুমারী যুবরাজকে আর-একটি ঘরে লইয়া গেলেন। জানালা দিয়া রাজকন্যার ফুলের বাগানের চোখ-জুড়ানো রূপ দেখিয়া যুবরাজের মুখে প্রশংসা ধরিতেছিল না। কুমারী বলিলেন, "এই বাগানের তুমি এত প্রশংসা কর্‌ছ, আমার পিতার রাজ-উদ্যান

দেখ্‌লে না জানি কি বল্‌তে। আমার চোখে তার চেয়ে সুন্দর বাগান আর কখনও পড়েনি। তোমাকে সে বাগান দেখাব। যখন দৈবের কৃপায় এদেশে এসেই পড়েছ তখন আমার পিতার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবে।"

রাজকুমারীর ধারণা ছিল কোনো-রকমে যুবরাজকে পিতার চোখের সাম্‌নে দাঁড় করাইতে পারিলে হয়ত তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। এত যার রূপগুণ, কে না তাহাকে কন্যাদান করিতে চায়? যুবরাজ কিন্তু রাজকুমারীকে নিরাশ করিয়া বলিলেন, "কুমারী, এমন অবস্থায় তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার উচিত নয়। আমার পদ-মর্য্যাদার উপযুক্ত লোকজন না নিয়ে রাজদর্শনে যেতে আমার আপত্তি আছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তোমার উপযুক্ত অনুচরবর্গ সংগ্রহ করতে যত অর্থ লাগে আমি দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি কেবল অনুমতি দাও।"

যুবরাজ কুমারীর মনের কথা বুঝিয়া খুসী হইলেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসাও তাঁর বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু তবু নিজের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য এ-প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না। রাজকুমারীর মনে ঘা না লাগে এই ভাবিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার প্রস্তাবে অত্যন্ত বাধিত হলাম। কিন্তু আমি আর বেশী দিন এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার পিতা আমার অদর্শনে না-জানি কত কাতর হয়ে পড়েছেন। বেশী দিন দেরি করলে হয়ত স্নেহশীল পিতা পুত্রশোকে প্রাণই বিসর্জ্জন করবেন। আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। তুমি অনুমতি দাও আমি একবার পিতাকে দর্শন দিয়ে আসি। তার পর রাজপুত্রের উপযুক্তভাবে তোমার পিতার রাজ্যে ফিরে এসে তাঁর কাছে তোমাকে বধূরূপে প্রার্থনা করব। আশা করি, তিনি আমার প্রার্থনায় কোনো আপত্তি করবেন না।"

রাজকুমারী যুবরাজের ন্যায়সঙ্গত কথার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এত শীঘ্র বিদায় লইলে পাছে তিনি রাজকুমারীকে ভুলিয়া যান এই ভয়ে তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবরাজ আর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। রাজকন্যা যে তাঁহার অশেষ উপকার করিয়াছেন। যুবরাজকে থাকিতে রাজি করিয়াই কুমারী সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাঁহাকে দেশের কথা ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য কত না আনন্দ-উৎসবের আয়োজন হইল, গীতবাদ্যের আর বিরাম রহিল না। দুজনে মিলিয়া মৃগয়ায় ফিরিতেন, দেশবিদেশের হাজার রকম গল্প করিতেন। একদিন এমনি সব গল্পের মাঝখানে রাজকন্যা এমন একটা কথা বলিলেন তাহাতে বোঝা গেল যে, যুবরাজের সঙ্গে পারস্য দেশে যাইতে তাঁহার আপত্তি নাই। কথাটা যুবরাজ মনে করিয়া রাখিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া তখনই কুমারীকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন আরও কিছুদিন দুজনে একসঙ্গে এমনি আনন্দে কাটাইলে রাজকন্যার ভালবাসা এত গভীর হইয়া উঠিবে যে, তখন যুবরাজ তাঁহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলে তিনি একটুও আপত্তি করিতে পারিবেন না। সত্যই তাই হইল; মাস দুই পরে যুবরাজ

যখন রাজকন্যার কাছে ওই প্রস্তাব করিলেন, তখন রাজকন্যা সলজ্জ মুখখানি নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলিলেন না। যুবরাজ জানিতেন মত না থাকিলে কেহ কখনো চুপ করিয়া থাকে না। কাজেই ভোর না হইতেই রাজকন্যাকে নিজের পাশে মায়াময় অশ্বের পিঠে বসাইয়া আকাশ-পথে পারস্যে যাত্রা করিলেন। যুবরাজ ঘোড়া চালাইতে

যুবরাজ রাজকন্যাকে নিজের পাশে মায়াময় অশ্বের পিঠে বসাইয়া আকাশপথে যাত্রা করিলেন

এমনই সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে, আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই বঙ্গদেশ দূরে ফেলিয়া পারস্যের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

দেশে ত ফিরিলেন, কিন্তু এখানে ত বঙ্গদেশের রাজকন্যাকে কেহই চেনে না। কাজেই হঠাৎ একটি অচেনা অজানা সুন্দরীকে রাজপ্রাসাদে হাজির করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে না ভাবিয়া রাজধানীর কাছেই রাজার একটা বাগানবাড়ীতে নামিলেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া বাড়ীর বুড়ো প্রহরীর হাতে রাজকন্যার ভার দিয়া কুমার পিতৃদর্শনে চলিলেন। পথে যে তাঁহাকে দেখিল সেই আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। রাজধানীর পথেঘাটে অভ্যর্থনা পাইয়া তিনি যখন রাজসভায় গিয়া পৌঁছিলেন তখন সেখানে দরবার বসিয়াছে। সভার সকলের পোষাক ঘোর কালো, যুবরাজের অদর্শনে রাজা সেইদিন হইতে সভাসদদের শোকসজ্জা করাইয়াছেন। যাঁহার শোকে সকলের এমন বেশভূষা, এতদিন পরে হঠাৎ তাঁহাকে পাইয়া রাজার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া

যুবরাজকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তার পর শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ঘোড়াটা কই?"

ঘোড়ার কথা যখন উঠিলই তখন যুবরাজ নিজের সমস্ত ইতিহাসটাই বলিয়া ফেলিলেন। রাজকন্যাকে যে রাজধানীর বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছেন একথাও বলিতে ভুলিলেন না। তার পর সেই পরম উপকারিণীকে যে তিনি বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং এবিষয়ে পিতার আশীর্ব্বাদ পাইবার আশা করেন সে-কথাও বলিলেন।

রাজা বলিলেন, "বৎস, তোমার এ বিবাহে মত ত আমি দেবই। তা ছাড়া আমার ভাবী বধূমাতাকে আমি নিজে গিয়ে রাজপ্রাসাদে এনে আজই তোমাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন করব।"

শোকের ছায়াও দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদের চারিপাশ হইতে সরিয়া গেল। রাজধানীতে আনন্দ-কোলাহলে কান পাতা দায় হইয়া উঠিল। ভারতবাসীও মুক্তি পাইল। রাজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও তোমার ঘোড়া আর প্রাণ যে হারাওনি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।"

ভারতবাসী রাজার কাছে বিদায় লইয়া প্রহরীদের কাছে খবর পাইল যে, যুবরাজ ফিরোজশাহ একটি পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন; রাজকন্যা এখনও সেই বাগানবাড়ীতে আছেন, রাজা নিজেই তাঁহাকে আনিতে যাইবেন। খবরটি জোগাড় করিয়াই লোকটা সকলের আগে সেই বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। প্রহরীকে বলিল, "মহারাজের আদেশে আমি এই ঘোড়ায় করে রাজকন্যাকে নিতে এসেছি। মহারাজ সভাসুদ্ধ আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন।"

প্রহরী ভারতবাসীকে চিনিত এবং তাহার কয়েদের কথাও শুনিয়াছিল। এখন সে মুক্তি পাইয়াছে দেখিয়া প্রহরী তাহার কথায় অবিশ্বাস করিল না। সে তাহাকে রাজকন্যার কাছে লইয়া গেল। যুবরাজ তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছেন মনে করিয়া রাজকন্যা এতই আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সামান্য কোনো সন্দেহের কথাও তাঁহার মনে আসিল না। ভারতবাসী দেখিল তাহার মতলব সিদ্ধ হইল বলিয়া। সেও মহাখুসী হইয়া আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া রাজকন্যাকে ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া আকাশে উঠিয়া পড়িল।

এদিকে মহারাজাও ঠিক সেই সময় পাত্রমিত্র সভাসদ আর যুবরাজ ফিরোজশাহকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। আগে আগে আসিতেছিলেন যুবরাজ, পিছনে সদলবলে মহারাজ। তাঁহাদের দেখিয়া ভারতবাসী সেইখানেই আকাশ পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহারাজ যে তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিলেন, আজ সে ঠিক করিয়াছিল এমনি করিয়াই তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবে। রাজা ব্যাপার দেখিয়া রাগে অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বলাই শুধু সার, শোধ লইবার ত উপায় নাই। আর যুবরাজের মনের অবস্থা যে কি-রকম হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা শক্ত। তিনি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে প্রিয়তমা

রাজকন্যাকে হারাইয়া কখনও নিজের উপরই আগুন হইয়া উঠিতেছিলেন, কখনও বা রাজকুমারীর অসহায় কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার দুঃখে চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আবার কখনও শত্রুর নিষ্ঠুর হাসি দেখিয়া মনে মনে তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করিতেছিলেন। কাজেই কিন্তু কিছু উপায় ভাবিয়া উঠিবার আগেই ভারতবাসী রাজকন্যাকে লইয়া শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। মহারাজা এ অসহ্য অপমান সহিতে না পারিয়া ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। যুবরাজ পাগলের মত দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গ্রামের ধারের বাগান-বাড়ীতে গিয়া ঢুকিলেন।

বাগানের প্রহরী কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। যুবরাজ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমার আর কি দোষ? আমারই বুদ্ধির দোষে এমন অঘটন ঘটেছে। তা যাক্, যা হয়েছে তা ফিরবে না, এখন আমাকে একটা ফকিরের পোষাক এনে দাও।"

সেই গ্রামে কতকগুলি ফকিরের আখড়া ছিল। প্রহরী এক ফকির-বন্ধুর কাছে গিয়া বলিল, "ভাই, একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ রাজার কুনজরে পড়েছেন, তিনি ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে পালাতে চান। তুমি যদি তোমার একটা পোষাক দাও, তাহলে একজন ভদ্রলোকের প্রাণটা বাঁচে।

দয়াধর্ম্মই ফকিরের স্বভাব। সে একথা শুনিয়াই প্রহরীর হাতে একপ্রস্থ পোষাক আনিয়া দিল। যুবরাজ ফকিরের সেই পোষাক প্রহরীর কাছে পাইয়া ফকির সাজিয়া পথ খরচার জন্য কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া রাজকন্যার খোঁজে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কোন্ পথে কোথায় তাঁহার সন্ধান পাইবেন কিছুই জানিতেন না, তবু এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই বাহির হইলেন যে, সেই সুন্দরীর দর্শন না পাইলে এ পথে আর ফিরিবেন না।

এদিকে ভারতবাসী নক্ষত্রের মত বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া কাশ্মীরে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে এক গহন বনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা হ্রদের ধারে ঘোড়াটা আসিয়া নামিল। পথের কষ্টে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুজনেই তখন অবসন্ন। ভারতবাসী কাজেই সেইখানে রাজকন্যাকে রাখিয়া ফলমূলের খোঁজ করিতে গেল। লোকটা তাঁহাকে একলা রাখিয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজকন্যা ভাবিলেন, এই বেলা কোথাও গিয়া লুকাইয়া থাকিলে হয়। কিন্তু উঠিয়া হাঁটিতে গিয়া দেখিলেন দুর্ব্বল শরীর এক পাও নড়িতে পারে না। পলায়নের চেষ্টা বৃথা দেখিয়া ঠিক করিলেন সাহস আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভারতবাসীকে হার মানাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে ভারতবাসী কিছু ফলমূল জোগাড় করিয়া ফিরিয়া আসিল। কিছু খাইয়া গায়ে জোর পাইয়া রাজকন্যা ভারতবাসীকে অনেক উপদেশ দিলেন। অনেক তিরস্কারও করিলেন। কিন্তু কথায় বশ হইবার পাত্র সে নয়। রাজকন্যা তখন কোনো উপায় না দেখিয়া চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন।

সেদিন কাশ্মীরের রাজা পাত্রমিত্র সঙ্গে করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। বনপথে

যাইতে যাইতে কান্নার শব্দ শুনিয়া তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেইখানে আসিয়া পৌছিলেন। রাজা ভারতবাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? এ মেয়েটিই বা কাঁদ্‌ছে কেন?"

ভারতবাসী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "মেয়েটি আমার স্ত্রী; স্বামীই স্ত্রীর প্রভু, অন্যের তার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন কর্‌বার অধিকার নেই।"

রাজকন্যা তাহার মিথ্যা উত্তরে ভয় পাইয়া হাতজোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিলেন, "মহাশয় আপনি যেই হোন, অসহায় রাজকন্যার উপর কৃপা করে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। ভগবান বোধ হয় আপনাকে আমার সাহায্যের জন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। এ পাপিষ্ঠ আমার কেউ নয়। পারস্যের যুবরাজ আমার ভাবী স্বামী, এই মায়াবী তাঁর বাড়ী থেকে আমাকে জোর করে কেড়ে নিয়ে মায়া-ঘোড়ায় চড়িয়ে পালিয়ে এসেছে।"

চোখের জলে রাজকন্যার সুন্দর মুখখানি করুণ হইয়া উঠিয়াছিল। অমন মুখের কথা তরুণ কাশ্মীররাজ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভারতবাসীর একটা কথাও কানে না তুলিয়া অনুচরদের তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। ভারতবাসী সবে মুক্তিলাভ করিয়াছে, অস্ত্রশস্ত্র তাহার কিছুই নাই। কাজেই নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করিতে রাজভৃত্যদের বেশী চেষ্টা করিতে হইল না।

কাশ্মীররাজ তখন রাজকন্যাকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুরে তাঁহার জন্য একটি মহল সাজাইয়া অনেক দাসদাসী রাখিয়া দেওয়া হইল। রাজার আদরযত্নে কুমারী খুসী হইয়া মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু এত আদর যত্ন যে কিসের জন্য সরলা বালিকা তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কাশ্মীররাজ বঙ্গরাজকন্যার জ্যোৎস্নার মত রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন ঠিক করিলেন। পরদিনই বিবাহ হইবে, কাজেই উৎসবের আয়োজন লাগিয়া গেল। পথে পথে প্রজাদের কাছে বিবাহের খবর প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রি শেষ না হইতেই বাদ্যভাণ্ডের হট্টগোলে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাজা নিজে আসিয়া আনন্দ-উৎসবের কারণ বলিতে বসিলেন। কাশ্মীররাজ্যের আনন্দে রাজকন্যার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। বিবাহের কথা শুনিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক যত্ন চেষ্টার পর জ্ঞান হইলে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রাণ থাকিতে এ বিবাহে মত দিবেন না। কিন্তু নিস্তারই বা কি করিয়া পাওয়া যায়? মনে হইল পাগল সাজিলে ত চলে। রাজা মনে করিবেন মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। এই ভাবিয়া তখন হইতে তিনি আবোল-তাবোল বকিতে লাগিলেন, রাজাকে দেখিয়াই ছুটিয়া কামড়াইতে গেলেন। রাজা মনের মতন বধূ পাইবার আনন্দে মাতিয়াছিলেন, হঠাৎ এমন ভাবে সে-সাধে বাধা পড়াতে দুঃখে কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈবের হাত কে এড়াইতে পারে? দাস-

দাসীর হাতে রাজকন্যার ভার দিয়া কাশ্মীররাজ অন্তঃপুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে খোঁজ লইতে আসিয়া শুনিতেন রোগ কমা দূরের কথা, আরো বাড়িয়া চলিতেছে।

পরদিন রাজা ভয় পাইয়া রাজবাড়ীর যত চিকিৎসককে ডাকিয়া রাজকন্যার অসুখের খবর দিলেন। চিকিৎসকরা সব শুনিয়া বলিলেন, "বায়ুরোগ অনেক রকম; কোনোটা সারে, কোনোটা একেবারেই সারে না। রোগী না দেখে কিছু বলা শক্ত।" রাজা হুকুম দিলেন চিকিৎসকদের অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হউক।

রাজকন্যা দেখিলেন, এবার বিপদ গুরুতর। নাড়ী দেখিলেই ত মিথ্যা ফাঁকি সব ধরা পড়িয়া যাইবে। এখন উপায়? বৈদ্যরা নাড়ী দেখিবার জন্য কাছে আসিতেই তিনি এমন বিকট চীৎকার করিয়া ছুটিয়া তাঁহাদের কামড়াইতে গেলেন যে, ভয়ে আর কেহ এক পা অগ্রসর হইলেন না। দু একজন দক্ষ চিকিৎসক নাড়ী না দেখিয়াই ঔষধ দিলেন। রাজকন্যার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাণ-করা রোগ হাজার চিকিৎসায়ও সারে না। রোগ যেমন তেমনই রহিল।

রাজ-বৈদ্যের দল হার মানিল, দেশের আর যত বৈদ্য ও ওঝা সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল, কাজেই রাজা দেশবিদেশে প্রচার করিয়া দিলেন যে, কেহ বঙ্গরাজকন্যার রোগ সারাইয়া দিতে পারিবে রাজভাণ্ডার হইতে তাহার দুই হাত ধনে দৌলতে পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। অনেক বৈদ্য অনেক হাকিম আসিল, কিন্তু রোগ সারানো ত দূরের কথা রাজকন্যার কাছে কেহ পৌঁছাইতেই পারিল না।

এদিকে ফকির-যুবরাজ দেশদেশান্তর ঘুরিয়া ভারতবর্ষে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে একদিন শুনিলেন বঙ্গরাজদুহিতা কাশ্মীররাজের সঙ্গে বিবাহের দিনে পাগল হইয়া গিয়াছেন। রাজকন্যার নাম শুনিতেই ঘোর নিরাশায় যুবরাজ যেন আশার আলো দেখিতে পাইলেন। তিনি ওই নামের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সেই-দিনই কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া লোকমুখে ভারতবাসীর মুণ্ডপাত ও রাজকন্যার মুক্তির কথা সব শুনিলেন। এত দুঃখ-কষ্টের পর প্রিয়ার সন্ধান পাইয়া যুবরাজের সকল ব্যথা জুড়াইয়া গেল। আনন্দে তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এখনও কাশ্মীর-রাজের হাত হইতে উদ্ধার বাকি। যুবরাজ বৈদ্য সাজিয়া রাজসভায় দর্শন দিলেন। কাশ্মীররাজ বৈদ্যকে দেখিয়া বলিলেন, "বৈদ্যের দর্শনমাত্র রাজকুমারী এমন ভীষণ মূর্তি ধারণ করেন যে, কেউ তাঁর কাছে যেতে পারে না।"

বৈদ্য যুবরাজ বলিলেন, "তাঁকে না জানিয়ে আমি লুকিয়ে দেখ্‌তে চাই।" মতলবটা এই যে, রোগটা ফাঁকি কি না দেখেন। ভৃত্যেরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া দেয়ালের ফুটা দিয়া রাজকন্যাকে দেখাইল। যুবরাজ দেখিলেন মেয়েটি পালঙ্কে বসিয়া নিজের দুঃখের গান গাহিতেছেন। দেখিয়া যুবরাজের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি লোক-জনদের বিদায় দিয়া একলাই রাজকন্যার ঘরে ঢুকিলেন। সাধারণ আর একজন চিকিৎসক

আসিয়াছে মনে করিয়া রাজকন্তা বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসিলেন। যুবরাজ তাহাতে একটুও না হটিয়া রাজকুমারীর কাছে আসিয়া পড়িতেই আস্তে আস্তে বলিলেন, "রাজকুমারী, আমি হাকিমবৈদ্য নই, আমি তোমার প্রিয়বন্ধু ফিরোজশাহ, বৈদ্য সেজে তোমায় উদ্ধার করতে এসেছি।"

এই-কথা শুনিয়াই রাজকন্তা ফিরোজশাহের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তখন কোথায় গেল তাঁহার সে ভীষণ মূর্ত্তি, আর কোথায়ই বা সে পাগলামি। রাজকন্তার আনন্দ আর ধরে না। তার পর দুজনে বসিয়া বসিয়া দুজনের দুঃখের ইতিহাস শুনিলেন। সুখদুঃখের গল্প শেষ হইলে যুবরাজ কাজের কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ঘোড়াটি কোথায় জান?"

রাজকুমারী বলিলেন,—"ঠিক কোথায় আছে জানি না বটে; তবে আমার কাছে তার অমন গুণের কথা শুনে কাশ্মীররাজ নিশ্চয় তাকে নিজের ভাণ্ডারে স্থান দিয়েছেন।"

যুবরাজ বলিলেন, "সেই ঘোড়াটা পেলে তাতে করেই আমি তোমায় নিয়ে যেতে চাই।"

কি উপায়ে কাজটা সহজে উদ্ধার করা যায়, দুজনে সেই বিষয়ে খানিকক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কাল যখন বৈদ্যবেশী যুবরাজের সঙ্গে কাশ্মীররাজ রাজকন্তার ঘরে আসিবেন, তখন রাজকন্যা সুন্দর বেশভূষা করিয়া শান্তভাবে সসম্মানে রাজাকে অভ্যর্থনা করিবেন, কিন্তু কথা বলিবেন না।

পরদিন রাজকুমারীর অমন শোভন ব্যবহারে আর সুন্দর সাজসজ্জা দেখিয়া কাশ্মীররাজ ত অবাক্! একদিনে যে বৈদ্য এতখানি রোগ সারাইতে পারে তাহার না-জানি কত গুণ! রাজকন্যাকে দেখিয়া ফিরিবার সময় রাজা বৈদ্যরাজের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য গুণপনায় আনন্দ দেখাইতে লাগিলেন। বৈদ্যরাজ বলিলেন, "একটা বিষয় আমার বড় খট্‌কা লাগ্‌ছে। রাজকন্যা এত দূরদেশ থেকে একলাটি কি করে কাশ্মীরে এলেন?"

মায়া-অশ্বের খোঁজ করিবার জন্যই যে তাঁহার এবিষয়ে এত আগ্রহ কাশ্মীররাজ তাহা জানিতেন না, কাজেই তিনি যুবরাজের মতলব না বুঝিয়া রাজকন্যালাভের সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "সেই যে অদ্ভুত ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যা এদেশে এসেছিলেন, সেটিকে আমি অতি যত্নে ভাণ্ডারে তুলে রেখেছি।"

যুবরাজ অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, "আপনার গল্প শুনে বোধ হচ্ছে আর-একটা নূতন উপায়ে চিকিৎসা না কর্‌লে রাজকুমারীর রোগ নির্ম্মূল হবে না। আপনি যে ঘোড়াটার কথা বল্‌লেন, সেটা কিনা মায়ার তৈরী, তাই তার পিঠে চড়াতে রাজকন্যার শরীরেও [illegible]জাল ঢুকেছে। আমি এক-রকম সুগন্ধি জিনিষের কথা জানি, যার ধোঁয়া লাগলে ভোজবাজির সব দোষ কেটে যায়। আপনার যদি এরকম চিকিৎসা দেখ্‌তে কৌতূহল হয়, তাহলে কাল সকালে আপনার আঙিনায় সব প্রজাদের জড় করে আর সেই ঘোড়াটা বার করে রাখ্‌বেন। আমি সকলের সাম্‌নে রাজকন্যার রোগ সারিয়ে দেব।"

রাজা বৈদ্যরাজের উপর মহা প্রসন্ন, কাজেই তাহার সব কথাতেই রাজি। পরদিন প্রাসাদের আঙিনা লোকে লোকারণ্য। ঘোড়াটিকেও মাঝখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। তার পর যখন স্বয়ং রাজাও আসিয়া উপস্থিত, তখন ফিরোজশাহ ঘোড়ার পিঠে রাজকন্যাকে বসাইয়া দুইপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাঁড়ে আগুন দিয়া সাজাইয়া রাখিলেন।

ফিরোজশাহ ঘোড়ার পিঠে রাজকন্যাকে বসাইয়া দুই পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাঁড়ে আগুন দিয়া সাজাইয়া রাখিলেন

আগুনের মধ্যে এক-রকম সুগন্ধি ধূপ ফেলিয়া দিতেই ধোঁয়ায় ঘোড়াটাকে ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পিঠে কে আছে না আছে কিছুই আর দেখা যায় না। এই অবসরে ফিরোজশাহ রাজকন্যার পাশে উঠিয়া বসিয়া ঘোড়ার কান ঘুরাইয়া সাঁ সাঁ করিয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িলেন; তার পর সোজা পারস্য যাত্রা। যাইবার সময় কাশ্মীররাজকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন,

"কাশ্মীরপতি, যদি কখনও কোনো শরণাগত রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাও, তবে আগে তার মতটা নিও "

পারস্যরাজ এই বিবাহে বঙ্গরাজের শুভ ইচ্ছা ভিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে দূত পাঠাইয়া দিলেন

সেই দিনই যুবরাজ বাগ্দত্তা বধূকে লইয়া পিতার প্রাসাদের মাঝখানে ঘোড়া হইতে নামিলেন। পারস্যরাজ দুইবার পুত্র হারাইয়া জীবনের সমস্ত আনন্দ বিসর্জন দিয়াছিলেন। আজ হারাধন ফিরিয়া পাইয়া মহাধুমধাম বাধাইয়া যুবরাজের বিবাহের আয়োজন সুরু করিয়া দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে আনন্দ-উৎসবের ঘটার মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। তার পর পারস্যরাজ এই বিবাহে বঙ্গরাজের শুভ ইচ্ছা ভিক্ষা করিয়া বঙ্গদেশে দূত পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্গরাজ সকল কথা শুনিয়া সরল হৃদয়ে কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুমার আমেদ ও দৈত্যকন্যা পরীবানুর কথা

ভারতবর্ষে সেকালে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপের আর সীমা ছিল না। সেই রাজার তিনটি ছেলে ছিল আর একটি ভাই-ঝি ছিল। রাজকুমারদের গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। বড় রাজকুমার হোসেন, মেজ আলি, আর ছোট আমেদ। রাজার ভাই-ঝির মত সুন্দরী দেশে আর ছিল না। তাঁহার নাম নুরুন্নিহার।

নুরুন্নিহার রাজার ছোট ভাইয়ের কন্যা। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতা কচি মেয়েটিকে ফেলিয়া পরলোক যাত্রা করেন। রাজা ভাইকে বড়ই ভালবাসিতেন, কাজেই ছোট মেয়েটির ভার তিনিই লইলেন। রাজার যত্নে কচি মেয়েটি দিনে দিনে সুন্দরী তরুণী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দিক্-আলো-করা রূপ আর মনভুলানো গুণের কথা দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িল।

রাজা মনে করিয়াছিলেন, নুরুন্নিহারের বিবাহের বয়স হইলে প্রতিবেশী কোনো যোগ্য রাজকুমারের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শুনিলেন তাঁহার তিন পুত্রই নুরুন্নিহারকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহারা তিনজনেই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। মুসলমানসমাজে এ-রকম বিবাহ হয়। কিন্তু তিনজনই যখন একজনকে চায় তখন ভাইদের মধ্যে ঝগড়া না হইয়া যায় না। কাজেই রাজা খবর শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি একে একে তিন ভাইকে ডাকিয়া এ দুরাশা ছাড়িতে অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু সকলেই নাছোড়বান্দা, উপদেশে কিছু ফল হইল না। তখন তিনি তিনজনকে এক সঙ্গে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের আলাদা আলাদা ডেকে এ-বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছি। তোমরা কেউ আমার উপদেশ শুন্‌লে না। এখন আমি যাকে ইচ্ছা তার হাতেই নুরুন্নিহারকে দিতে পারি বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে বলেই অন্যায় করে আমি সে ক্ষমতা খাটাতে চাই না। যাতে কোনো অবিচার না হয় এই ভেবে আমি ঠিক করেছি যে, তোমরা তিনভাই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাবে। সেখানে গিয়ে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রেখে শুধু নিজ নিজ চেষ্টা, ক্ষমতা আর দৈবের উপর নির্ভর করে জগতের নানা দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। যে সকলের চেয়ে দুর্লভ আর অদ্ভুত বস্তু সংগ্রহ করে আন্‌তে পার্‌বে, নুরুন্নিহার তারই বধূ হবে। তোমাদের পথখরচা আর জিনিষপত্র কেনার জন্যে তিনজনকেই কিছু কিছু টাকা দেব।"

রাজার কথায় খুসী হইয়া সেই দিনই তিন রাজকুমার টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সরাইখানার কাছে গিয়া দেখেন রাজপথ সেইখানে তিন ভাগ হইয়া তিন মুখে চলিয়া গিয়াছে। তিনজনে পরামর্শ করিলেন যে, পরদিন সকালে উঠিয়া তিন ভাই তিন পথে ভ্রমণে বাহির হইবেন। সরাইখানাতে রাত কাটিল। সকালে যাত্রার আয়োজন সুরু হইল।

কথা রহিল এক বৎসর পরে তিন ভাই আবার এই সরাইখানাতেই আসিয়া জুটিবেন। যদি সকলে একসঙ্গে আসিয়া না পৌঁছিতে পারেন তবে যিনি আগে আসিবেন তিনি আর দুই ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তিনজন একসঙ্গে পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া যাইবেন। সব পরামর্শ শেষ করিয়া পরস্পরের কাছে বিদায় লইয়া তিন রাজকুমার তিন পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমার হোসেন অনেকদিন হইতেই বিশনগর রাজ্যের নামডাক শুনিয়া আসিতেছেন। ভারতসমুদ্রের পথে সেই রাজ্য। হোসেন বিশনগরে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় সেই পথেই চলিলেন। তিন মাস ধরিয়া পথে পথে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে বিশনগরে পৌঁছিলেন। রাজধানীরও নাম বিশনগর। নগরটি দেখিলেই চোখ জুড়াইয়া যায়। দারিদ্র্যের কোনো চিহ্ন নাই। দোকান বাজার চমৎকার শৃঙ্খলার সহিত সাজানো। চারিভাগে ভাগ করা সহরের মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। প্রজাদের ধনদৌলত অজস্র। কি পুরুষ, কি রমণী সকলেরই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, তাহাদের কালো অঙ্গে সোনার গহনার আভা পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছে। সে দেশের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, ছোট বড় ভদ্র ইতর সকলেই গোলাপ-ফুল ভালবাসে। পথে ঘাটে যাহাকে দেখিবে তাহারই হাতে হয় একটি গোলাপ-ফুলের তোড়া নয় গলায় গোলাপের মালা।

সারাদিন রাজধানী দেখিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া হোসেন সন্ধ্যার সময় এক বণিকের আশ্রয় লইলেন। বণিক খুব আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে দোকানেই বসাইল। কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখেন পথ দিয়া গালিচা হাতে এক ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া চলিয়াছে, "ত্রিশ হাজার টাকার চমৎকার গালিচা।" রাজকুমার গালিচার এত দাম শুনিয়া কি মনে করিয়া জানি না হঠাৎ ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া গালিচা দেখিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গালিচাটা এমন ত কিছু বেশী সুন্দর নয় যে, ত্রিশ হাজার টাকা দাম হাঁকছ।"

ফেরিওয়ালা হোসেনকে বণিক মনে করিয়া বলিল, "মশায় এই দামটাই অসম্ভব বোধ হচ্ছে ? তাহলে একথা শুনলে না-জানি কি বলবেন যে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা হাতে না পেয়ে গালিচা ছাড়া বারণ !"

হোসেন বলিলেন, "তবে নিশ্চয় এর কোনো গুপ্ত গুণ আছে।"

ফেরিওয়ালা বলিল, "আপনি ঠিক ধরেছেন ত ! এ গালিচায় বসে যে যেখানে যেতে চায় তখনি সেখানে যেতে পারে।"

এমনই একটা কিছু অত্যাশ্চর্য্য জিনিষের খোঁজে রাজকুমার ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এত অল্পদিনে আর এমন অনায়াসে এই-রকম জিনিষটা হাতের কাছে পাইয়া তিনি মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "সত্যিই যদি এর এমন গুণ থাকে তাহলে আমি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গালিচা নিতে এখনি রাজি আছি। তাছাড়া তোমাকেও কিছু পুরস্কার দিতে পারি।"

ফেরিওয়ালা বলিল, "দোকানের পিছনে চলুন, আমি আপনাকে এখনি এর গুণের চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দিতে পারি। আপনার কাছে বোধ হয় দামের টাকাটা নেই, চলুন এই গালিচায় বসেই আপনার বাসায় গিয়ে টাকা নিয়ে আসি। গালিচাখানা মাটিতে পেতে দুজনে বসে একমনে আপনার বাসায় পৌঁছবার কামনা করব, তাতে যদি এক নিমেষের মধ্যে সেখানে গিয়ে না হাজির হই, তাহলে আপনাকে গালিচা কেনাবার আমার কোনো অধিকার থাকবে না।"

হোসেন তখনই দোকানের মালিকের অনুমতি লইয়া দোকানের পিছনে ফেরিওয়ালাকে আনিয়া হাজির করিলেন। সে সেইখানে মাটিতে গালিচাখানা পাতিল, তার পর দুইজনে তাহার উপর বসিয়া যেই বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন অমনি এক মুহূর্তে গালিচাসুদ্ধ সেখানে আসিয়া হাজির। গালিচার এমন গুণ দেখিয়া হোসেন ত বিস্ময়ে আনন্দে অধীর। তখনই ফেরিওয়ালাকে ত্রিশ হাজার টাকা দাম আর যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া গালিচা লইয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কার্য্য ত সিদ্ধ হইল, কিন্তু রাজকুমার যাত্রার কোনো উদ্যোগ করিলেন না, কারণ এক বৎসর পূর্ণ না হইলে আর দুই ভাই ফিরিবেন না, বৃথা ততদিন সেই সরাইখানায় একলা বসিয়া থাকিতে হইবে। কাজেই হোসেন ঠিক করিলেন, এখন বাকি কয়মাস বিশনগরেই কাটানো ভাল। সকাল সন্ধ্যায় শহরের পথে পথে ঘুরিয়া সে-দেশের লোকের আচার ব্যবহার রীতি-নীতি শেখাই ছিল তাঁহার রোজকার কাজ। লোকে তাঁহাকে বিদেশী সওদাগর বলিত। যখনই আর কোনো বিদেশী সওদাগর রাজধানীতে আসিত, তখনই রাজার কথাবার্তার সুবিধার জন্য রাজসভায় তাঁহার ডাক পড়িত। হোসেন রাজাকে তাহাদের কথা বুঝাইয়া দিতেন, রাজার কথা তাহাদের বুঝাইতেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি সে দেশের শাসন-প্রণালীও অনেক শিখিয়া ফেলিলেন। এমনি করিয়া এক বৎসর কাটাইয়া একদিন বিশনগরের পালা সাজ করিয়া অনুচর সমেত গালিচায় বসিয়া সেই সরাইখানায় গিয়া নামিলেন। তখনও আর দুই ভাই আসিয়া পড়েন নাই। কাজেই তাহাদের অপেক্ষায় কিছুদিন বসিয়া থাকিতে হইল

রাজকুমার আলির ইচ্ছা ছিল পারস্যে যাইবার। তিনি পথে একদল পারস্য-যাত্রী সওদাগর দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ লইলেন। চার মাস পথ চলিয়া সিরাজ নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সিরাজ তখন পারস্যের রাজধানী। সেইখানে রত্নবণিক সাজিয়া সওদাগরদের সঙ্গেই বাসা বাঁধিলেন। তার পর একদিন শহরের রত্নবণিকদের দোকান দেখিতে গিয়া দেখেন দোকানের বাহিরেই রাশি রাশি রত্ন স্তূপ করিয়া ঢালা। যে দোকানের বাহিরেই এত রত্ন তাহার ভিতর না-জানি কত আছে, কুমার আলি ভাবিয়াই পাইলেন না। এই-রকম দোকান দেখিয়া তিনি আরও কুতূহলী হইয়া একটা নিলাম দেখিতে গেলেন।

নিলামে অনেক দামী জিনিষের মধ্যে ছোট একটি হাতীর দাঁতের নল রহিয়াছে, নিলামের অধ্যক্ষ তাহার ত্রিশ হাজার টাকা দর দিয়াছে। এতটুকু একটা নলের এত দাম শুনিয়া আলি কাছের একজন সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, লোকটা কি পাগল? ওই নলের ত্রিশ হাজার টাকা দাম?"

রাজকুমার অনুচর সহিত গালিচায় চড়িয়া শূন্যপথে উড়িয়া যাইতেছেন

সওদাগর বলিলেন, "অমন জিনিষের অত দাম চাইলে পাগল ছাড়া আর কি বলি? তবে লোকটা খুব চালাক চতুর বিচক্ষণ ব্যক্তি। ও যখন চাইছে তখন তার বিশেষ কিছু কারণ থাকা সম্ভব।" এই বলিয়া লোকটিকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, ওই নলটার অমন অসম্ভব দাম চাইছেন কেন?"

লোকটি বলিল, "বিনা কারণে চাচ্ছি না, নলের গুণ আছে। এর দুই মুখে দুটি আশ্চর্য্য কাচ আছে, তার একটির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর যা-কিছু জিনিষ ইচ্ছা করলেই দেখা যায়।"

নলের এমন অলৌকিক গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কুমার আলি চোখে নলটা লাগাইয়া পিতাকে দেখিতে চাহিলেন। অমনি দেখিলেন তিনি বেশ সুস্থ শরীরে পাত্র-মিত্র লইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। তার পর প্রিয়তমা নুরুন্নিহারকে দেখিবার ইচ্ছা হইতেই দেখিলেন রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে আনন্দে বেশভূষা করিতেছেন।

আর বেশী পরীক্ষার কোনো দরকার নাই মনে করিয়া রাজকুমার তখনই ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া নলটি কিনিয়া মহা আনন্দে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন অপূর্ব্ব জিনিষ এত অল্প চেষ্টায় পাইয়া আলিরও আর ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকার ছিল না। কিন্তু এত শীঘ্র ফিরিয়া যাওয়াও বৃথা, কাজেই তিনিও কিছুদিন সিরাজ নগরে থাকিয়া রাজসভায় যাওয়া-আসা করিয়া সেখানকার রাজনীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে হোসেনের মত সেই সরাইখানায় গিয়া দেখিলেন ছোট ভাই আমেদ তখনও আসে নাই। দুই ভাই আমেদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

ছোট রাজকুমার গেলেন সমরকন্দে। সেখানে একদিন এক সওদাগরের দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় শুনিলেন একটি লোক একটা আপেলের দাম ত্রিশ হাজার টাকা চাহিতেছে। আমেদ বিস্মিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু হে, তোমার আপেলের এমন কি গুণ যে, কম করে ত্রিশ হাজার টাকা দাম হেঁকেছ?" লোকটি বলিল, "মশায়, গুণ না থাকলে কি আর অমনি খয়রাত চাচ্ছি! আমার এমনই কি বুকের পাটা! আপনি যদি এ আপেলের গুণের কথা একবার শোনেন ত অবাক হয়ে থাকবেন। এ যে অমূল্যনিধি তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। পৃথিবীতে যতরকম রোগ আছে, সব রোগই এই আপেলের গন্ধে মানুষকে ছেড়ে পলায়। এমন কি যার প্রাণের আশা জগতে কেউ করে না, সেই মুমূর্ষ রোগীকেও এই আপেলের গুণে বাঁচিয়ে তোলা যায়। এরই গুণে সে তার সুস্থ সবল শরীর আবার ফিরে পায়।"

কুমার আমেদ বলিলেন, "তুমি যা বলছ সে-কথা যদি সত্য হয় তাহলে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্য ত এমন অমূল্যনিধির পক্ষে অতি তুচ্ছ। কিন্তু তোমার কথা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ কি?"

লোকটি বলিল, "আপনি এখানকার যত সওদাগর বণিক দেখছেন সবাইকে জিজ্ঞাসা করে জানুন কথাটা সত্য কি না। এর বিষয় সকলেই অল্পবিস্তর জানে। এই আপেল সৃষ্টির কথা শুনলে হয়ত আপনার বিশ্বাস একটু বাড়তে পারে। এখানকার একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনেক রকম বুনো গাছগাছড়া থেকে ঔষধ সংগ্রহ করে অনেক যত্ন চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলে এই আপেলটি গড়ে তুলেছিলেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন

ততদিন কত যে দুরারোগ্য রোগ এই আপেলের গুণে সারিয়েছেন তার ঠিক নেই। সম্প্রতি তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে, তাঁর বিধবা স্ত্রী নাবালক ছেলেদের ভরণ-পোষণের জন্য জিনিষটি বিক্রি করতে পাঠিয়েছেন।"

দুজনে যখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহাদের কথায় যোগ দিতে একে একে অনেক লোক আসিয়া জুটিল। ভিড়ের ভিতর ফলের গুণের যথেষ্ট সাক্ষী মিলিল। একজন বলিল, "মশায়, আপেলের গুণ যদি নিজের চোখে দেখে বিচার করে নিতে চান, তবে আমার সঙ্গে আসুন। আমার এক বন্ধু মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে দিয়েই খাঁটি পরীক্ষা হবে।"

কুমার আমেদ ফলওয়ালাকে বলিলেন, "যদি তোমার কথা এই পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণ হয়, তবে ত্রিশের জায়গায় চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি তোমার ফল কিনতে রাজি আছি। চল, এখন এই লোকটির বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পরীক্ষা করে আসি।"

আপেল-ওয়ালা কোনো আপত্তি না করিয়া আমেদ ও সেই মুমূর্ষুর বন্ধুর সহিত চলিল। লোকটি বিছানায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল, কিন্তু আপেলের একটু গন্ধ নাকে যাইতেই উঠিয়া বসিল। এক ঘণ্টার মধ্যে দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত রোগ সারিয়া গেল, সে আবার বেশ সুস্থ সবল হাসিখুসী নীরোগ মানুষটি হইয়া উঠিল। কুমার আমেদ আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া ত্রিশ হাজার টাকা ফেলিয়া দিয়া ফলটি কিনিয়া লইলেন। অমন জিনিষ পাইয়া তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না। তার পর কিছু দিন সমরকন্দে সুখে কাটাইয়া সায়দার পাহাড়-পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া ঠিক এক বৎসর পরে সেই সরাই-খানায় গিয়া বড় দুই ভাইয়ের দেখা পাইলেন।

তিন দেশে তিন ভাই যখন তিনটি অদ্ভুত জিনিষ পাইলেন, তখন প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন জগতে এমন জিনিষ আর কাহাকেও পাইতে হইবে না; এমন জিনিষ যাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে, নুরুন্নিহার তাহার না হইয়া যান না। তাই তিন ভাই এক জায়গায় জুটিয়া মহা উৎসাহে কে কি আনিয়াছে, কাহার জিনিষের কি গুণ, কাহার ভাগ্যে নুরুন্নিহার লাভ আছে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সকলের আগে বড় ভাই হোসেন বলিলেন, "ভাই, আমি বিশনগর থেকে এই গালিচাখানা এনেছি। ওটা বাইরে থেকে দেখতে একখানা সামান্য গালিচা বই কিছু নয় বটে, কিন্তু ওর গুণের সীমা নেই। এই গালিচায় বসে মানুষ যখন যেখানে যেতে চায়, তখনই সেইখানে যেতে পারে। আমি আর আমার চাকর ত এই আসনখানায় বসেই তিনমাসের পথ একদণ্ডেই চলে এসেছি তোমরা যখনই এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে চাও, তখনই দেখতে পাবে। এখন তোমরা কি এনেছ বল।"

বড় ভাই হাসিয়া চুপ করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, "এর কাছে লাগতে পারে এমন আর কিছু আনতে হয় না।"

আর দুই ভাই অবশ্য হোসেনের গালিচার বর্ণনা শুনিবার আশা করেন নাই, তবু দমিলেন না। আলি বলিলেন, "ভাই, তোমার গালিচার যেমন গুণ বর্ণনা শুন্‌লাম তেমন গুণ থাক্‌লে জগতে সেটাকে একটা দুর্লভ জিনিষ বলে স্বীকার কর্‌তেই হবে। কিন্তু আমি যা এনেছি তার কথা শুন্‌লে তোমার গালিচার একটি দোসর আছে বলে স্বীকার করতে হবে। এই যে হাতীর দাঁতের ছোট নলটি দেখ্‌ছ, এর গুণ বলে শেষ করা যায় না। এর একপাশ দিয়ে দেখলে জগতের যেখানে যা-কিছু দেখতে চাও তখনি তা দেখতে পাবে। শুধু আমার মুখের কথায় তোমাদের বিশ্বাস কর্‌তে বল্‌ছি না, তোমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখ।" এই বলিয়া কুমার আলি দাদার হাতে নলটি দিলেন।

যুবরাজ হোসেন আলির কথামত নলটি একদিকে চোখ লাগাইয়া নুরুন্নিহারকে দেখিতে চাহিলেন। আর দুই ভাই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ হোসেনের মুখের ভাব যেন কেমন বদ্‌লাইয়া গেল। ব্যাপার কি, না বুঝিয়া ভাইরাও বিস্মিত হইয়া গেলেন। হোসেনের মুখে বিস্ময়ের ভাব ছিল বটে, কিন্তু বেদনায় তাঁহার মুখের আর-সব ভাব ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। ভয় পাইয়া দুইভাই একসঙ্গেই কারণ জানিতে চাহিলেন। হোসেন বলিলেন, "ভাই, আমাদের এত দিনের সব পরিশ্রম বৃথা। নুরুন্নিহারের দিন ফুরিয়েছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রাণ দেহ ছেড়ে অনন্তে উড়ে চলে যাবে। আমি দেখলাম তাঁর সখী দাসী প্রহরী সকলে তাঁর মৃত্যুশয্যার চারিপাশে ঘিরে বসে চোখের জলে ভাস্‌ছে। তোমরা যদি শেষ দেখা দেখতে চাও ত দেখে নাও।" যুবরাজ নলটি আর দুই ভাইকে দিলেন। দুজনেই একে একে প্রিয়তমার শেষ শয্যা দেখিলেন।

হঠাৎ কুমার আমেদ বুকের ভিতর হইতে সেই আপেলটি বাহির করিয়া বলিলেন, "যা দেখ্‌লাম তাতে মনে হচ্ছে রাজকুমারীর আসন্নকাল উপস্থিত। কিন্তু এখনও যদি কোনো রকমে তাঁর কাছে গিয়ে পড়া যায় তাহলে আমি নিশ্চয় তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারি। এই যে আপেলটি আমি এনেছি এর গন্ধ নাকে গেলেই যে-কোনো রোগ সেরে যায়; এমন কি, যার মৃত্যুযন্ত্রণা সুরু হয়েছে সেও এর গন্ধে আবার সুস্থ হয়ে উঠে বসে।"

আমেদের কথা শুনিয়া হোসেন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে আর বৃথা সময় নষ্ট করে কি লাভ? চল, এই আসনে তিনজনে বসে সোজা নুরুন্নিহারের ঘরে হাজির হই।" এই বলিয়া গালিচা পাতিয়া তিনভাই তাহাতে বসিয়া মনে মনে রাজকুমারীর ঘরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে গালিচাখানা তাঁহাদের লইয়া শূন্যে উঠিয়া হু হু করিয়া এক নিমেষে রাজকুমারীর ঘরের মধ্যে নামাইয়া দিল। হঠাৎ আকাশ হইতে তিনটি মানুষ ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল দেখিয়া ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অজানা অচেনা লোক কাহারো অনুমতি না লইয়া অন্তঃপুরে আসিয়া ঢুকিয়াছে মনে করিয়া খোজারা খাপ হইতে তলোয়ার খুলিয়া রাজকুমারদের চিনিবামাত্র মাথা হেঁট করিয়া জোড়হাতে ক্ষমা চাহিল।

ঘরে ঢুকিয়াই কুমার আলি আসন হইতে উঠিয়া ফলটি মুরুন্নিহারের নাকের কাছে আনিয়া ধরিলেন। রাজকুমারীর চোখের দৃষ্টি ম্লান হইয়া চোখ বুজিয়া আসিয়াছিল ; ফলের গন্ধ পাইতে-না-পাইতে চোখের জ্যোতি ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়া মাথা নাড়িয়া তিনি চারিধারে তাকাইয়া দেখিলেন। তার পর আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া দাসীদের ডাকিয়া সকালে পরিবার পোষাক-পরিচ্ছদ আনিতে বলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল তিনি মৃত্যুর ছায়াকে ঘুম বলিয়া ভুল করিয়াছেন। সকলে তাঁহার ভুল ভাঙাইয়া বুঝিয়া দিল, এ একরাত্রির সুখনিদ্রার পর জাগিয়া উঠা নয়, চিররাত্রির মহানিদ্রার কবল হইতে মুক্তি। রাজ-কুমারদের গুণে ও ভালবাসায় হারানো প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছেন শুনিয়া মুরুন্নিহার তাঁহাদের শত-মুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং বিশেষ করিয়া আমেদের কাছে কৃতজ্ঞতা দেখাইলেন। তিন রাজকুমার প্রিয়তমাকে যমের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আনন্দিত মনে পিতার চরণ দর্শন করিতে চলিলেন।

রাজা ইতিমধ্যেই খোজার মুখে কুমারদের আগমন ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা শুনিয়াছিলেন ; ছেলেরা কাছে আসিতেই সস্নেহে তাঁহাদের আলিঙ্গন করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া তিন রাজপুত্র তাঁহাদের তিনজনের অদ্ভুত সংগ্রহের কথা বলিলেন। কোন্ জিনিষটির কি গুণ সব বুঝাইয়া বলিয়া পিতার হাতে সেগুলি সঁপিয়া দিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রাজপুত্রেরা আশা-নিরাশায় দোল খাইতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়া ভারতরাজ বলিলেন, "বৎসগণ, যদি আজ আমি বিচারের ফলে তোমাদের একজনকে আর দুজনের চেয়ে যোগ্য মনে কর্‌তে পার্‌তাম, তা হলে খুব আনন্দের সঙ্গেই তার হাতে নুরুন্নিহারকে দিতাম। কিন্তু আমি তোমাদের জিনিষগুলির গুণ আর রাজ-কুমারীর রোগশান্তির কথা ভেবে দেখ্‌লাম এরকম ভাবে কাজ করা যায় না। যে জিনিষ তোমরা এনেছ সেগুলি সবই জগতে দুর্লভ, কিন্তু রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার পক্ষে তিনটির গুণের কোনো ইতর বিশেষ বোঝা যায় না। আমেদের আপেলের গন্ধে মুরুন্নিহার প্রাণ পেয়েছেন বটে, কিন্তু আলির নল না থাক্‌লে রোগের কথা তোমরা কিছুতেই জান্‌তে পার্‌তে না, আর হোসেনের গালিচা না থাক্‌লে তোমরা আপেল নিয়ে এখানে পৌঁছবার অনেক আগেই রাজকন্যা ইহলোক ছেড়ে যেতেন। কাজেই এসব দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে এর উপর নির্ভর করে বর নির্ব্বাচন কর্‌লে একজন-না-একজনের উপর অন্যায় করা হবে। তাই ভাব্‌ছি আর একটা নূতন উপায় দেখ্‌লে ভাল হয়। কাল সকালে যদি তোমরা তিন ভাই তীর আর ধনুক নিয়ে নগর-প্রাচীরের বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে তীর ছোড়ো তাহলে যার তীর সকলের চেয়ে দূরে যাবে তারি সঙ্গে আমি মুরুন্নিহারের বিবাহ দেব।" রাজকুমারেরা এ প্রস্তাবে আপত্তি করিবার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না।

পরদিন তিন ভাই তীরন্দাজের সাজে সাজিয়া যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট মাঠে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আসিয়া সকলের আগে জ্যেষ্ঠপুত্র হোসেনকে তীর ছুড়িতে বলিলেন। হোসেনের পরে আলির পালা। আলির তীর বড় ভাইয়ের চেয়ে খানিকটা দূরে পড়িল। তার পর ছুড়িলেন আমেদ। কিন্তু আমেদের তীর এতদূরে গিয়া পড়িল যে, কেহ তাহা খুঁজিয়াই বাহির করিতে পারিল না। ভৃত্যেরা যতদূর পারিল খুঁজিল, শেষে আমেদ নিজেও খুঁজিতে বাহির হইলেন, কিন্তু তীর কোথাও মিলিল না। আমেদের তীরই যে সকলে চেয়ে দূরে পড়িয়াছে তাহা সকলেই বুঝিল, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও যখন তীরটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন রাজা আলিকেই রাজকুমারীর বর ঠিক করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই মহা ধুমধাম করিয়া বিবাহ হইয়া গেল।

যুবরাজ হোসেন নুরুন্নিহারকে বড়ই ভাল বাসিতেন। এতদিন তাহাকে আপনার করিয়া পাইবার আশায় কত পরীক্ষা কত সংগ্রামের ভিতর দিয়া হাসিমুখে পার হইয়াছেন, এখন সব আশা বৃথা হইল দেখিয়া দুঃখে নিরাশায় তাঁহার মন ভাঙিয়া পড়িল। যাহাকে সকলের চেয়ে ভাল বাসিতেন তাহাকেই পাইলেন না দেখিয়া হোসেনের সংসারের আর কিছুই ভাল লাগিল না; তিনি সংসার ছাড়িয়া ফকির হইয়া এক বিখ্যাত ফকিরের শিষ্যরূপে দেশের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

আলির বিবাহে কুমার আমেদের যোগ দিতে মন উঠিল না। মনের দুঃখে তিনি তাঁহার হারানো তীরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। যেখান হইতে তীর ছুড়িয়াছিলেন সেইখান হইতে তীরের গতির পথে সোজা চলিলেন, মাঝে মাঝে আশেপাশেও চাহিয়া দেখিতেন। ক্রমে চারিক্রোশ পথ ছাড়াইয়া এক পাহাড়ের কাছে আসিয়া পড়িলেন, আর পথ নাই। কুমার পাহাড়ের তলায় আসিয়া দেখেন। পাহাড়েরই গায়ে তাঁহার তীরটি বিঁধিয়া রহিয়াছে। তীর যে এতদূর কি করিয়া আসিল কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না; তবু মনে হইল, "হয়ত অদৃষ্ট আবার প্রসন্ন হয়েছে। যাতে চিরসুখী হব মনে করেছিলাম, তার চেয়েও বেশী সুখ হয়ত ভাগ্যে আছে। দেখা যাক এই পথে সেই সুখ মেলে কি না। ভগবানই হয়ত এমনি করে ইঙ্গিত করেছেন।"

কুমার আমেদ দেখিলেন তীরটি একটি গুহার মুখে গিয়া বিঁধিয়াছে। এই পথেই ভাগ্য পরীক্ষার উপায় আছে ভাবিয়া তিনি গুহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। গুহার ভিতরে একটি লোহার দরজা। কুমার মনে করিয়াছিলেন, যতই ভিতরে যাইবেন ততই ঘন অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু লোহার দরজা পার হইয়া দেখেন, অন্ধকারের লেশও কোথাও দেখা যায় না। চারিদিক আলোয় উজ্জ্বল, সেই আলোর বুক আলো করিয়া দেব-নিকেতনের মত সুন্দর একটি অট্টালিকা পথের ধারেই দাঁড়াইয়া আছে। কুমার সুন্দর বাড়ীটি দেখিয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন এমন সময় একদল তরুণী সখীর সঙ্গে একটি পরমা সুন্দরী কুমারী মণিমুক্তার আলোয় চোখ ঝল্সাইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমেদ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে নমস্কার করিতে যাইতেই সুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন, "কুমার আমেদ আসতে আজ্ঞা হোক।"

এমন অজানা দেশের অচেনা মেয়েটি যে কি করিয়া তাঁহার নাম জানিয়া ফেলিল, আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কুমার তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। কারণটা জানিবার আশায় সুন্দরীকে প্রণাম করিয়া আমেদ বলিলেন, "ভদ্রে, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু কি করে আপনি আমার নাম জান্‌লেন শুন্‌তে আমার দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছে, তাই না জিজ্ঞাসা করে পার্‌ছি না।"

সুন্দরী বলিলেন, "আগে আমার সঙ্গে আসুন, তার পর সব কথা বলা যাবে এখন।"

কুমার সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একটি প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকিলেন। ঘরখানির যেখানে যাহা দিলে সাজে, তেমনি করিয়া সাজানো। মাঝে মাঝে রেশম, কিংখাপে ঢাকা দামী কাঠের আসন। তাহারই একটিতে নিজে বসিয়া কুমারী আমেদকে আর একটিতে বসিতে বলিলেন। দুইজনেই বসিবার পর সুন্দরী বলিলেন, "কুমার অচেনা মানুষ হয়েও আমি কি করে তোমার নাম জেনেছি ভেবে তুমি ব্যাকুল হচ্ছ। আমি তোমার ভাবনা দূর করছি। তুমি বোধ হয় জান যে পৃথিবীতে অনেক দৈত্যের বাস। তারা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, যা দেখতে চায় তাই দেখতে পায়। আমি এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যের কন্যা। আমার নাম পরীবানু। তোমাদের তিন ভাইয়ের ইতিহাস, নুরুন্নিহারের প্রতি তোমাদের ভালবাসা, এ-সব কথাই আমি জানিতাম। কিসের জন্যে যে তোমরা তিন ভাই এক বৎসর বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছ, তাও আমার অজানা নাই। আমি সেই সর্ব্ব রোগহর আপেল, সর্ব্বদর্শী নল আর ইচ্ছা-বিহারী আসন তোমাদের কাছে বিক্রীর জন্য পাঠিয়েছিলাম। তার পর তোমাদের ভাগ্যে আর যা-কিছু ঘটেছে সবই আমি জেনেছি। এমন কি যেদিন তোমরা নুরুন্নিহারকে পাবার জন্য তীর ছোড়ার পরীক্ষা দিচ্ছিলে সেদিন আমি অদৃশ্য হয়ে তোমাদেরই কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি দেখ্‌লাম তোমার তীরটা আর দুজনের তীরই ছাড়িয়ে চলেছে; তখন আমি নিজের হাতে তোমার তীরটা ধরে এমন জোরে একটা টান দিলাম যে, সেটা এসে একেবারে এই পাহাড়ের গায়ে বিঁধ্‌ল। নুরুন্নিহার তোমার বধূ হবার উপযুক্ত নয় মনে করেই আমি অমন কাজ করেছিলাম। তার চেয়ে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী তোমার পাওয়া উচিত। তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই নিজের ভাগ্যফল ভোগ কর্‌তে পার, না হয় ফেলে চলে যেতে পার। এই যে অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার চারধারে দেখ্‌ছ, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে সে-সমস্তই তোমার হবে। আমার পিতামাতা আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাকে বিবাহ কর্‌তে চাইছি। আমাদের বিবাহে মানুষের মত মন্ত্র-তন্ত্রের দর্‌কার নেই, মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তু এ বিবাহের বন্ধন আরো অনেক দৃঢ়, অনেক গভীর।"

কুমার আমেদ খুসী হইয়াই পরীবানুকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর একসঙ্গে বসিয়া বরকন্যা বিবাহ-ভোজ খাইলেন। তার পর আমেদ তাঁহার নূতন গৃহ দেখিতে বাহির হইলেন। দৈত্যপুরীর যেমন অপূর্ব্ব শোভা তেমনি ঐশ্বর্য্য। পথেঘাটে হীরা মণি মুক্তার ছড়াছড়ি। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসিয়া দিনের পর দিন কত নিত্য-নূতন উৎসব

চলিতে লাগিল। পরীরাজ্যের অপূর্ব্ব নাচগান, মনোহর সঙ্গীত, আরও কত হাজার-রকমের মন-ভুলানো আয়োজনে কুমারের দিনগুলি সুখে কাটিতে লাগিল।

মাস ছয় এমনি করিয়া কাটিয়া যাইবার পর কুমার আমেদ পিতাকে একবার দেখিবার জন্য পরীবানুর কাছে দেশে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পরীবানু মনে করিলেন, আমেদ বুঝি এইবার ছল করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন। দুঃখে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। জলভরা চোখে কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "কুমার, দাসী কি অপরাধ করেছে যে তাকে ছেড়ে যেতে চাও?"

কুমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "অনেকদিন পিতাকে দেখিনি, তাই তাঁকে বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শুধু সেই জন্যেই দেশে যাবার অনুমতি চেয়েছিলাম। নাহলে তোমাকে ছেড়ে যাব এও কি কখনও সম্ভব? যাক্, তুমি যখন এতে কষ্ট পাচ্ছ তখন তোমার মনে ব্যথা দেবার জন্য আর ওকথা তুল্‌ব না।"

পরী স্বামীর কথায় খুসী হইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

এদিকে দুই ছেলেকে হারাইয়া আলির বিবাহে রাজা একটুও সুখ পাইলেন না। হোসেনকে সংসারে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার তরুণ মন তখন উৎসাহের সঙ্গে যে দিকে ঝুঁকিয়াছে সে দিক হইতে ফিরাইতে বৃদ্ধ রাজার ক্ষমতায় কুলাইল না। আমেদের খোঁজে দেশ বিদেশে কত দূত ছুটিল, কিন্তু কোথাও তাহার খোঁজ মিলিল না। আমেদ সকলের ছোট ছেলে বলিয়া রাজার বড় আদরের, তাহাকে হারাইয়া তাঁহার দুঃখের পার রহিল না। কি উপায়ে ছেলের খোঁজ পাওয়া যায় এই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা, মন্ত্রীর সঙ্গে কেবল সেই পরামর্শই চলিত। একদিন মন্ত্রী বলিলেন, "সিরাজ নগরে এক বিখ্যাত মায়াবিনী বুড়ী আছে। তার কাছে খোঁজ কর্‌লে, সে হয়ত তুক্‌তাক্ করে কোনোরকমে কুমারের সন্ধান বলে দিতে পারে।"

রাজা বুড়ীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গুণে আমার ছেলের খোঁজ করে দাও; যদি ঠিক বল্‌তে পার ত অনেক টাকা পুরস্কার পাবে।"

সেদিনকার মত বুড়ী চলিয়া গেল। পরদিন আসিয়া বলিল, "মহারাজ, অনেক গুণে, অনেক খড়ি পেতে কিছুতেই আপনার ছেলের খোঁজ কর্‌তে পার্‌লাম না। কেবল বুঝ্‌লাম যে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।"

রাজা অতটুকু জানিয়াও কিছু নিশ্চিন্ত হইলেন।

কুমার আমেদ অনেকদিন দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, পিতাকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইত। কিন্তু এবার সোজা দেশে যাইবার প্রস্তাব না করিয়া তিনি অন্য পথ ধরিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় যখন-তখন তিনি পিতার কথা তুলিতেন, তাঁহার নানাগুণের প্রশংসা করিতেন। পরীবানু দেখিলেন তাঁহার স্বামী দেশের কথা, পিতার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না, কেবল তাহার মনে ব্যথা দিবার ভয়েই সেখানে যাইবার কথা

আর তুলেন না। স্বামী যখন তাঁহাকে এতই ভালবাসেন তখন দেশে যাইবার ছলে স্ত্রীকে ফেলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবিয়া পরীবানু আমেদকে দেশে যাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ কিংবা দৈত্যপুরীর কোনো কথা বলিতে বারণ করিয়া দিলেন।

একদিন কুড়িজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে করিয়া সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমেদ পিতৃ-দর্শনে চলিলেন। পথে তাঁহার পিতার প্রজারা যেই তাঁহাকে দেখিল অমনি মহা আনন্দে দলে দলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত প্রজারা সঙ্গে সঙ্গে আসিল। এতদিন পরে ছোট ছেলেটিকে ফিরিয়া পাইয়া রাজার আর আনন্দ ধরে না। আমেদকে বুকের কাছে টানিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রাজা বলিলেন, "বৎস, কতদিন তোমার সন্ধান পর্য্যন্ত পাইনি, এ চোখে যে তোমার চাঁদমুখ আর কোনোদিন দেখ্‌তে পাব এমন আশা আর ছিল না।"

আমেদ বলিলেন, "বাবা, আমি রাজধানী ছেড়ে আমার তীরটার খোঁজে বেরিয়েছিলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়েও যখন তীরটা পেলাম না, তখন একবার মনে হয়েছিল ফিরে আসি। কিন্তু কি একটা শক্তি যেন আমায় সাম্‌নের দিকেই টেনে নিয়ে চল্‌ল। ক্রোশ চার গিয়ে একটা পাহাড়ের গায়ে তীরটা বিঁধে আছে দেখ্‌লাম। তার পর আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে সে-সব কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না। তবে আমি যে খুব সুখেই আছি এটুকু বলে রাখ্‌ছি। অনুগ্রহ করে আমার গুপ্তকথার বিষয় কোনো প্রশ্ন কর্‌বেন না। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনার চরণ দর্শন করে যাব।"

রাজা আমেদকে ফিরিয়া পাইয়া এত সুখী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুপ্তকথার প্রতি এতটুকু কৌতূহলও দেখাইলেন না, শুধু বলিলেন, "বৎস, তুমি যেখানেই থাক না কেন, সুখে থাক্‌লেই আমার সুখ। কিন্তু মনে রেখো যে তোমার বৃদ্ধ পিতা তোমারই পথ চেয়ে দিন কাটান, মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা দিতে ভুলো না।"

তিনদিন আদরে যত্নে রাজপ্রাসাদে কাটাইয়া আমেদ দৈত্যপুরীতে ফিরিয়া গেলেন। তিনি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন দেখিয়া পরীবানুর আনন্দ উথলিয়া উঠিল, সকল ভয় ও সন্দেহ দূর হইয়া গেল। তিনি ভাল করিয়া বুঝিলেন যে, আমেদের ভালবাসা একেবারে খাঁটি।

দেখিতে দেখিতে আবার একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু আমেদ আর দেশে যাইবার নাম করেন না দেখিয়া পরীবানু একদিন কারণ জানিতে চাহিলেন। আমেদ বলিলেন, "কারণ আর কি? পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়, তাই ও-কথা আর তুলি না। তুমি নিজে যখন যেতে বল্‌বে তখনি আমি যাব।"

পরীবানু বলিলেন, "তুমি আমায় পর ভাবো দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি দেশে যাবে তোমার পিতাকে দেখ্‌তে তার জন্যে অত কথা কেন? তোমার ইচ্ছা হলেই তুমি যেও, আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই।"

পরদিন আবার কুড়িজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে করিয়া আরো বেশী ঘটা করিয়া যুবরাজ দেশে চলিলেন। এবারেও সুল্‌তান খুব আদর যত্ন করিয়া কুমারকে ঘরে তুলিলেন। প্রতিমাসেই আমেদ এমনি করিয়া পিতাকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার জাঁকজমক একটু একটু বাড়িত আর সাজ-পোষাক অগের চেয়ে আরও সুন্দর হইয়া উঠিত।

কুমারের এত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জনকয়েক মন্ত্রীর হিংসা হইতে লাগিল। তাঁহারা রাজার কাছে আমেদের নামে নানারকম অকথা কুকথা বলিতে সুরু করিল। একজন গম্ভীর হইয়া বলিল, "কুমার কোথায় থাকেন, কি করেন খোঁজ করা উচিত। তিনি যে-রকম ঘন-ঘন যাওয়া-আসা কর্‌ছেন আর প্রতিবারেই যেমন নূতন নূতন ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে যাচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি শীঘ্রই রাজ্যে বিদ্রোহ বাধিয়ে দিয়ে আপনার সিংহাসন দখল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন।"

রাজা ছেলেকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি সহজে এমন কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীরা বলিল, "মহারাজ, নুরুন্নিহারকে কুমার আলির সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় কুমার আমেদ তখন থেকেই মনে মনে আপনার উপর চটা; কাজেই তিনি যে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্‌বেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

কথাটা শুনিয়া রাজার মনে একটু ভয় হইল। কিন্তু তিনি ভয়টা মন্ত্রীদের কাছে দেখাইলেন না। লুকাইয়া সেই বুড়ী মায়াবিনীকে ডাকিয়া আবার কুমার আমেদের ঘরবাড়ীর খোঁজ করিতে বলিলেন।

বুড়ী লোকের কাছে শুনিয়াছিল যে, পাহাড়ের গায়ে রাজকুমারের তীর পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তীর পাইবার পর যে তিনি কোথায় গিয়াছিলেন সে-কথা কেউ জানে না। এইখানেই সে গুপ্তদেশের খোঁজ মিলিবে মনে করিয়া বুড়ী রাজার হুকুম পাইবামাত্র সেই পাহাড়ের একটা গুহায় লুকাইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে দেখিল কুমার আমেদ লোকজন লইয়া পাহাড়ের দিকেই আসিতেছেন। পাহাড়ের গায়ের কাছে আসিয়া অত ঘোড়া ঘোড়সওয়ার সবসুদ্ধ কুমার যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন বুড়ী কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

সেই পাহাড়টায় পথ বলিয়া কোনো জিনিষ ছিল না; কোনো মানুষ কখনও সে-পাহাড়ে চড়ে নাই। কাজেই রাজকুমার যে বুড়ীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া পাহাড়ে উঠিয়া পার হইয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা সম্ভব নহে। বুড়ী বুঝিল হয় তিনি কোনো গুহার মধ্যে লুকাইয়া আছেন, নয়ত পাতালের কোনো দৈত্যপুরীতে নামিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া বুড়ী তন্ন তন্ন করিয়া অনেক খুঁজিল, কিন্তু তাঁহাদের এতটুকু চিহ্নও কোথাও পাইল না। যে-লোহার দরজা পার হইয়া আমেদ দৈত্যপুরীতে ঢুকিতেন, পরীবানুর মায়ায় তাহা আর কোনো মানুষে দেখিতে পাইত না। কাজেই বুড়ী বৃথাই ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া রাজাকে গিয়া সব-কথা বলিল। কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়া

না দিয়া বলিল, "আমাকে আর কিছুদিন সময় দিলে, আমি ঠিক খবর এনে দিতে পারি, কিন্তু কি উপায়ে যে আমি সব খবর সংগ্রহ কর্‌ব, সেটা আমি কাউকে জান্‌তে দিতে চাই না।" রাজা সেই কথাতেই রাজি হইয়া বুড়ীকে উৎসাহ দিবার জন্য একটি মহামূল্য হীরার আংটি উপহার দিলেন।

কুমার আমেদ যে প্রতি মাসে একবার করিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, এ-কথা জানিতেও বুড়ার বাকি ছিল না। পরের মাসে কুমার আসিবার আগের দিনই বুড়ী গিয়া পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় শুইয়া পড়িয়া রহিল। পরদিন নূতন-রকম সাজ-সজ্জা করিয়া দলবল লইয়া কুমার লোহার দরজা পার হইয়া পাহাড়ের সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিলেন। কোন্ পথে যে আসিলেন বুড়ী এবারেও টের পাইল না। কিন্তু রাজকুমার পাহাড়ের গায়ে বুড়ীকে অমন করিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেন না। কি হইয়াছে দেখিবার জন্য বুড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কাছে আসিয়া দেখিয়া মনে হইল বেচারা বড়ই কষ্ট পাইতেছে। কুমার আমেদের বড় দয়া হইল; তিনি বুড়ীকে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুড়ী বলিল, "কাল এই পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বিষম জ্বরে ধরেছে; যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাই এখানে পড়ে আছি। আমার বাড়ীও এখান থেকে অনেক দূর, আর এখানেও ত চিকিৎসার কোনো উপায় দেখ্‌ছি না।"

আমেদ আসল কথা না বুঝিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ী যেতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে ত আমি লোক দিয়ে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারি। বাড়ী আমার কাছেই আর সেখানে তোমার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

বুড়ীর মনোবাঞ্ছা এতক্ষণে পূর্ণ হইল। সে কোনো-রকমে একবার কুমারের বাড়ীটা দেখিতে পাইলে বাঁচে। এমন সুবিধা পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ রাজি।

কুমারের হুকুমে দুইজন সওয়ার ঘোড়া হইতে নামিয়া আসিয়া বুড়ীকে ধরিয়া দৈত্যকন্যার বাড়ীতে লইয়া চলিল। কুমার আমেদও পিছন পিছন চলিলেন। বাড়ী পৌঁছিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাঁহাকে বুড়ীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। পরীবানু বুড়ীর কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখ চোখ দেখিয়া দুইজন দাসীকে বলিলেন, "বুড়ীকে নিয়ে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা কর।" দাসীরা বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল। পরীবানু তখন স্বামীকে ডাকিয়া কানে কানে বলিলেন, "দেখ, বুড়ীকে দেখে ত মনে হচ্ছে ওর রোগ-বালাই কিছুই নয়, ওসব ছল। নিশ্চয় কোনো লোক তোমার অনিষ্ট কর্‌বার জন্যে ওকে এখানে পাঠিয়েছে। কিন্তু তুমি তার জন্যে কিছু ভেব না। ভগবানের ইচ্ছায় আমি সকলের কুমতলব ফাঁস করে দেব। শত্রু তোমার একগাছা চুলও ছুঁতে পারবে না।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন, "জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত আমি কখনও কারুর অনিষ্ট চেষ্টা করিনি,

কোনোদিন কর্‌বার ইচ্ছাও নেই, কাজেই আমার বিশ্বাস অন্যেও আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করবে না।" এই বলিয়া কুমার আমেদ স্ত্রীর কাছে বিদায় লইয়া আবার ফিরিয়া পিতার রাজ্যে চলিলেন।

এদিকে দাসীরা মায়াবিনী বুড়ীকে সুন্দর একটি ঘরে উঁচু নরম বিছানায় যত্ন করিয়া শোয়াইল। একজন দাসী স্বচ্ছ সুন্দর কাচের পেয়ালায় করিয়া খানিকটা জল আনিয়া বলিল, "এই জলটুকু খাও। এই সিংহোৎসের জল খেলে সব জ্বর জ্বালা এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে যায়।"

বুড়ীর মতলব ত অনেকক্ষণই সিদ্ধ হইয়াছিল, এখন কি করিয়া ফিরিয়া পালান যায় সেই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু সিংহোৎসের জলে এক ঘণ্টার আগে উপকার হয় না শুনিয়া অগত্যা এক ঘণ্টা তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইল। দাসীরা ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। একঘণ্টা পরে বুড়ী কেমন আছে দেখিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে সে যাইবার জন্য খাট ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছে। দাসীদের দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "ধন্য ওষুধ তোমাদের! খেতে-না-খেতে অত যে জ্বর তা কোথায় মিলিয়ে গেল! সেরে ত উঠেছি। এখন তোমাদের রাণীর কাছে একবার নিয়ে চল, তাঁকে প্রণাম করে এইবার বিদায় হই।"

সোনার সিংহাসন রূপে আলো করিয়া পরীবানু যেখানে বসিয়াছিলেন, দাসীরা বুড়ীকে সেইখানে লইয়া গেল। তিনি বুড়ীর কুমতলব সবই বুঝিলেন। তবু যেন কিছুই জানেন না এমন ভাবে বলিলেন, "বাছা, তুমি এত শীঘ্র সেরে উঠেছ দেখে খুবই খুসী হলাম। বৃথা আর তোমায় এখানে ধরে রাখ্‌তে চাই না। তবে দৈবাৎ যখন একবার এসেই পড়েছ, তখন আমার বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখে যাও।"

দাসীরা বুড়ীকে দৈত্যপুরীর আগাগোড়া ঘুরাইয়া আনিল। মণিমাণিক্যের ছটায় প্রাসাদ ঝলমল করিতেছিল। ঘরে ঘরে কত যে মহামূল্য আসবাব তৈজসপত্র তাহার আর ঠিকানা নাই। দেখিয়া দেখিয়া বুড়ীর চোখ ধাঁধিয়া গেল। দেখা শোনা সাঙ্গ করিয়া দাসীদের ধন্যবাদ দিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথেই বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়া ফিরিয়া দেখিল সে লোহার দরজাও নাই, সে পথও নাই, এমন কি এতটুকু ফাটলও আর দেখা যায় না। সেখানে আর অকারণে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লাভ নাই, বুঝিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে গিয়া উঠিল। রাজার দেখা পাইবামাত্র তাঁহাকে সব খবর দিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি হয়ত ছেলের এত ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে খুব খুসী হয়েছেন, কিন্তু আমার ভয় হয় কুমার পাছে লোভী দৈত্যকন্যার কুমন্ত্রণায় ভুলে আপনার সিংহাসন দখল করে বসেন। আমার ত মনে হয়, রাজকুমার কিছু কর্‌বার আগেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত।"

মন্ত্রীদের মন্ত্রণা শুনিয়া-শুনিয়াই রাজার প্রাণে ভয় ঢুকিয়া গিয়াছিল, এখন আবার মায়াবিনী বুড়ীর কথায় ভয়টা আরও বাড়িয়া গেল। কি করা উচিত ভাবিয়া ঠিক করিতে

না পারিয়া রাজা মন্ত্রীদের ডাকিয়া সব-কথা বলিলেন, আর সকল দিক যাহাতে রক্ষা হয় এমন কিছু পরামর্শ চাহিলেন। একজন বলিলেন, "রাজকুমার ত এখন রাজসভাতেই রয়েছেন। এই সময় তাঁকে জোর করে ধরে কয়েদ করে ফেল্‌লেই ত হয়। পরে না হয় প্রাণদণ্ড না করে যাবজ্জীবন কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখা যাবে; তাহলেই ত সব আপদের শান্তি।"

বুড়ীর কিন্তু এরকম পরামর্শ পছন্দ হইল না। রাজার অনুমতি লইয়া বলিল, "প্রস্তাব করা হল, কাজে কর্‌তে গেলে ফল তাতে উল্টো হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে। কুমারকে না-হয় আপনারা ইচ্ছা করলেই বন্দী কর্‌তে পারেন। কিন্তু তাঁর কুড়িজন যে সঙ্গী আছে তাদের কি কর্‌বেন? তারা ত আর মানুষ নয়, দৈত্য। তাদের আক্রমণ কর্‌তে গেলেই তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে আর দৈত্যকন্যার কাছে গিয়ে তাঁর স্বামীর বিপদের কথা সব বলে দেবে। দৈত্যের মেয়ে যে সহজে আপনাদের ছেড়ে দেবে না তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন। রাজ্যসুদ্ধ দৈত্যদানব জোগাড় করে এনে সে আপনার রাজধানী ছারখার করে তবে ছাড়্‌বে। তাই আমার মনে হয় যে, এমন কোনো একটা উপায় আবিষ্কার করা উচিত যাতে আমেদ কিংবা পরীবানু বুঝ্‌তে না পারে যে, আমরা তাদের কুমতলব বিফল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, অথচ যাতে করে আমাদের কার্য্যসিদ্ধিটাও ভাল করেই হয়। আমি একটা উপায় আপনাদের বল্‌তে পারি। মহারাজ যদি কুমারের কাছে কোনো একটা অদ্ভুত জিনিষের নাম করে বলেন, 'বৎস, শুনেছি দৈত্যেরা অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমার অমুক জিনিষটার বড় দর্‌কার, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে বলে আমাকে সেটা আনিয়ে দিতে পার, তাহলে আমার বড় উপকার হয়।' তবে এই উপায়ে কাজ সহজে হাসিল হবে। কারণ কুমার কিছুতেই তাঁর বাবার অনুরোধ ঠেলতে পার্‌বেন না। কিন্তু যে জিনিষটা চাইতে হবে সেটা এমন কিছু হওয়া চাই যা দৈত্যদের পক্ষেও জুটিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেটা এনে দিতে না পার্‌লে কুমার আর লজ্জায় মহারাজের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বেন না, পাতালপুরীতে দৈত্যকন্যার কাছেই তাঁকে চিরটা কাল কাটাতে হবে; আমাদেরও আর কোনো ভয়ভাবনা থাক্‌বে না। একটা জিনিষের নামও আমি বলে দিতে পারি। ধরুন, এমন একটা তাঁবু চাওয়া যাক্ যেটা দরকার হলে হাতের মুঠোয় পুরে রাখা যায়, আবার দর্‌কার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে খাটিয়ে তার মধ্যে মহারাজের সমস্ত সৈন্যসামন্তকে থাক্‌তে দেওয়া যায়।" বুড়ীর কথায় কোনো মন্ত্রী কিংবা স্বয়ং মহারাজেরও আপত্তি দেখা গেল না।

পরদিন কুমার রাজসভায় আসিতেই রাজা খুব হাসিমুখে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "বৎস, শুনে খুব খুসী হলাম যে, তুমি এক দৈত্যকন্যাকে বিবাহ করে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেছ। আমি তোমার পিতা, আমার কাছে এমন সুসংবাদটা লুকিয়ে রাখা কি ভাল? যাক্, যা করেছ তা করেছ। এখন তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যদি আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়। জানই ত যুদ্ধের সময় তাঁবু নিয়ে যেতে

আস্‌তে কি রকম অসুবিধা আর টাকার শ্রাদ্ধ হয়। শুনেছি দৈত্যদের আশ্চর্য্য রকম জিনিষ তৈরী করবার ক্ষমতা আছে। তুমি যখন দৈত্যকুলে বিবাহ করেছ, তখন অনায়াসেই আমাকে এমন একটি তাঁবু করিয়ে দিতে পার যেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়ানো চলে, কিন্তু যুদ্ধের সময় যাতে সব সৈন্যসামন্তের থাক্‌বার জায়গা হয়।"

মহারাজ যে তাঁহার কাছে এমন একটা অসম্ভব প্রার্থনা করিয়া বসিবেন, কুমার আমেদ তা' স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীর কাছে পিতার জন্য ভিক্ষা করিতেও তাঁহার লজ্জা হইতেছিল। কাজেই তিনি প্রথমে এমন কাজের ভার লইতে আপত্তি করিলেন। রাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা। কুমারকে শেষে রাজি হইতেই হইল।

কুমার আমেদ বিষণ্ণ মুখে আবার দৈত্যপুরীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়াই পরীবানু বুঝিতে পারিলেন কুমারের মন ভাল নাই। তিনি স্বামীকে এমন বিমর্ষ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমারের ইচ্ছা ছিল না যে, কথাটা বলেন। প্রথমে তিনি অনেক রকমে কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবানু বার বার করিয়া এক-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজের প্রার্থনার কথাটি বাহির করিয়া লইলেন। এই-কথার জন্য আমেদের এত ভাবনা-চিন্তা দেখিয়া পরীবানু হাসিয়া বলিলেন, "এমন একটা সামান্য জিনিষ আমার কাছে চাইতে এত ইতস্ততঃ করছ কেন ?" এমন জিনিষও সামান্য শুনিয়া আমেদ অবাক হইয়া গেলেন। পরীবানু তখনই ভাণ্ডারের দাসী নুরজাহানকে ডাকিয়া ঐরকম একটি তাঁবু আনিতে বলিলেন। নুরজাহান বুড়ো আঙুলের মত ছোট একটি তাঁবু আনিয়া হাজির। আমেদ ত দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির। তিনি ভাবিলেন পরীবানু তাঁহার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছেন। পরীবানু বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ঠাট্টা মনে করে হাস্‌ছ ? ঠাট্টা নয়, সত্যই এই সেই তাঁবু। নুরজাহান, উঠানে তাঁবুটা খাটিয়ে দেখিয়ে দাও ত।" নুরজাহান অমনই আঙুলের মত তাঁবুটি লইয়া উঠানে খাটাইতে আরম্ভ করিল। অতটুকু তাঁবুর মাথা দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের ছাদে গিয়া ঠেকিল, সমস্ত উঠান তাঁবুর মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গেল। আমেদ ত দেখিয়া অবাক্! নুরজাহান আবার সেই তাঁবুই গুটাইয়া বুড়ো আঙুলের মত করিয়া আমেদের হাতে দিয়া বলিল, "তাঁবুর গুণ শুধু এইটুকুই নয়। একে ইচ্ছামত যত খুসী বড় কি ছোটও করা চলে।"

কুমার আমেদ এতই খুসী হইয়াছিলেন যে, তাঁবু সঙ্গে করিয়া সেই দিনই পিতার রাজ্যে যাত্রা করিলেন। মহারাজ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এমন অসম্ভব জিনিষ কুমার আনিতে পারিবেন। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় কি ? কাজেই তিনি মুখে খুব আনন্দ দেখাইলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। পরীর ক্ষমতা এত আশ্চর্য্য দেখিয়া ভয়টাও আরো বাড়িয়া গেল। দুঃখে ভয়ে অস্থির হইয়া আর একটা নূতন উপায়ের সন্ধানে তিনি আবার সেই মায়াবিনী বুড়ীর শরণ লইলেন।

বুড়ী আর-এক নূতন পরামর্শ দিল। তাহার পরামর্শ-মত রাজা পরদিন কুমারকে আর-এক অনুরোধ করিয়া বসিলেন। কুমার সভায় আসিতেই রাজা বলিলেন, "বৎস, তোমার কাছে এই তাঁবুটি পেয়ে যে কত খুসী হয়েছি তা মুখে জানাবার সাধ্য নাই। কিন্তু আবার আর একটি জিনিষের জন্যে তোমারই কাছে হাত পাত্‌ছি। শুনেছি সিংহোৎসের জলে সব-রকম জরজ্বালা জুড়িয়ে যায়; আমাকে সেই জল কিছু যদি এনে দাও ত বড় ভাল হয়।" একটা জিনিষ পাইতে-না-পাইতে আবার আর একটার জন্য পরীর কাছে ভিক্ষা করিতে হইবে মনে করিয়া কুমারের মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না।

দৈত্যপুরীর অন্দরমহলে সোনার সিংহাসনে বসিয়া পরীবানু সেলাই করিতেছিলেন, এমন সময় কুমার ফিরিয়া আসিলেন। চাহিতে ত হইবেই, কাজেই এবার আর কুমার কোনো কথা লুকাইলেন না। সব-কথা শুনিয়া পরীবানু বলিলেন, "বুঝেছি, তোমাকে মার্‌বার জন্যে সুল্‌তান সেই ডাইনী বুড়ীর পরামর্শে এই-সব চাইছেন। সিংহোৎস সহজ জায়গা নয়, সে এক ভীষণ দুর্গের মধ্যে; চার-চারটা ভয়ঙ্কর সিংহ সারাক্ষণ সেই দুর্গের দরজা পাহারা দেয়। পালা করে দুটো সিংহ ঘুমায় আর দুটো জেগে বসে থাকে। কিন্তু যাক্‌, তার জন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি এমন উপায় করে দেব যে তুমি বেশ নিরাপদে জল নিয়ে চলে আসবে।"

সেলাইয়ের সূতার একটা গুলি তুলিয়া কুমারের হাতে দিয়া পরীবানু বলিলেন, "চাকরদের বলে রাখ, কাল সকালে যেন দুটো ঘোড়া সাজিয়ে রাখে। একটা ঘোড়ায় তুমি যাবে আর একটায় টাট্‌কা চার টুক্‌রো ভেড়ার মাংস আর একটা জলের পাত্র নিয়ে যেও। কাল সকালে এই দুটো ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়। তার পর লোহার দরজা পার হয়ে হাতের এই সূতোর গুলিটা ছুড়ে দিও। সেটা গড়াতে গড়াতে তোমার ঠিকপথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌বে মস্ত এক দরজায় একজোড়া সিংহ পাহারা দিচ্ছে। তোমায় দেখেই তারা বিকট একটা ডাক দিয়ে আর দুটো সিংহকে জাগিয়ে তুল্‌বে। কিন্তু তাতে তুমি ভয় পেয়ো না। চারটে সিংহের মুখের কাছে চার টুক্‌রো মাংস ফেলে দিলেই তারা মাংস খেতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌বে যে, সেই সুযোগে তুমি অনায়াসে দুর্গের মধ্যে ঢুকে জল নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে। যাওয়া-আসায় অকারণ একটুও সময় নষ্ট না কর্‌লে সিংহগুলো তোমার কোনো অনিষ্ট কর্‌বে না।"

ঘোড়া সাজানো আর অন্যান্য সব আয়োজনই যথাসময়ে হইল। পরদিন কুমার পরীবানুর কথামত একটা ঘোড়ায় চড়িয়া আর অন্যটার পিঠে মাংস প্রভৃতি চাপাইয়া সিংহোৎসের জল আনিতে চলিলেন। লোহার দরজা পার হইয়া সূতার গুলি ফেলিয়া দুর্গের দরজায় আসিয়া পড়িতেই সিংহ-দুইটা বিকট গর্জ্জন করিয়া আর-দুইটাকে জাগাইয়া তুলিল তাহাতে একটুও ভয় না পাইয়া যুবক চারটা সিংহের মুখে তাড়াতাড়ি চার টুক্‌রা

মাংস ফেলিয়া দিলেন। সিংহগুলা খাইতে ব্যস্ত হইতেই তিনি দৌড়িয়া দুর্গে ঢুকিয়া সিংহোৎস হইতে একপাত্র জল ভরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। কিছুদূর আসিয়া দেখেন এক জোড়া সিংহ তাঁহার পিছন পিছন আসিতেছে। কুমার খাপ হইতে তলোয়ার খুলিয়া তাহাদের মারিবার জন্য পিছন ফিরিলেন। কিন্তু সিংহদুটা সে দিকে নজর না দিয়া লেজ মাথা নাড়িয়া এমন ভাব দেখাইল যেন তাহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত। কুমার তলোয়ারটা আবার খাপে পুরিয়া ফেলিলেন। তখন একটা সিংহ আগে আর-একটা পিছনে রক্ষীর মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত চলিল। রাজধানীর পথে পথে লোকেরা কেহ সিংহ দেখিয়া ভয়ে পলাইল, কেহ বা দেখিতে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তাহাদের দিকে একবারও না তাকাইয়া সিংহদুটা কুমারকে রাজপ্রাসাদের সিংহদরজায় রাখিয়া আবার ফিরিয়া দুর্গে চলিয়া গেল।

পিতার পায়ের কাছে সিংহোৎসের জল রাখিয়া কুমার প্রণাম করিলেন। মায়াবিনীর মুখে রাজা শুনিয়াছিলেন সিংহোৎস অতি ভয়ানক স্থান—সে দ্বিতীয় যমপুরীতে যে একবার যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। এমন ভীষণ বিপদ এড়াইয়া কুমার বাঁচিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া রাজার ভয় আরও বাড়িয়া গেল। তিনি ছেলেকে আদর করিতে ভুলিয়া গিয়া কি করিয়া সে এমন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে নখের আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগাইয়া বাঁচিয়া ফিরিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন। কুমার খুটিনাটি সব-কথাই খুলিয়া বলিলেন।

এততেও ছেলে মরে না দেখিয়া রাজা বার বার তিনবার বুড়ীর শরণ লইলেন। বুড়ী বলিল, "এবার যে উপায় বলে দিচ্ছি, তার আর মার নেই।" বুড়ী আর-এক নূতন পরামর্শ দিল।

এবার রাজা রাজকুমারকে দেখিয়াই বলিলেন, "বৎস, তোমার কাছে যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। আমার শেষ আর-একটি প্রার্থনা আছে, সেটিও তোমাকে পূর্ণ করতে হবে। যে একহাত লম্বা মানুষের কুড়িহাত লম্বা দাড়ি আর যে ছ'মণ ওজনের লোহার মুগুর নিয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়, সেই অদ্ভুত মানুষটিকে আমার সভায় একবার নিয়ে আসতে হবে।" পিতার এরকম অন্যায় প্রার্থনা শুনিয়া আমেদ খুবই বিরক্ত হইলেন, তিনি কিছুতেই রাজি হইতেছিলেন না, কিন্তু মহারাজ এই তাঁহার শেষ প্রার্থনা বলিয়া অনেকবার অনেক করিয়া অনুরোধ করাতে মনের রাগ মনে চাপিয়াও কুমারকে রাজি হইতে হইল।

দৈত্যপুরে ফিরিয়া গিয়া আমেদ পরীবানুকে রাজার তৃতীয় প্রার্থনার কথা বলিলেন। সে-কথা শুনিয়া পরী বলিলেন, "কুমার, সকলের চেয়ে যা কঠিন কাজ, সেই সিংহোৎসের জল আনাই যখন হয়েছে, তখন আর ভাবনা কিসের? রাজা যাঁকে দেখতে চেয়েছেন, তিনি আমারই বড় ভাই। তাঁর নাম স্কৈবার। জগতে তাঁর মত দুর্জ্জয় রাগ আর কোনো লোকের নেই। একটু সামান্য কারণেই তিনি আগুনের মত জলে ওঠেন। কিন্তু

জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালবাসেন তিনি আমাকে। আমি যদি তাঁকে অনুরোধ করি তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার খাতিরে সুলতানকে একবার দেখা দিয়ে আসবেন। আমি এখনি তাঁকে ডাকবার আয়োজন করছি। তুমি আগে থেকেই প্রস্তুত হও, দেখো যেন তাঁর ভীষণ মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ো না।"

ভীষণমূর্ত্তি এক-হাত লম্বা দৈত্য কুড়ি-হাত দাড়ি উড়াইয়া হাজির

পরীবানু দাসীকে ডাকিয়া সোনার পাত্রে আগুন আনিতে বলিলেন। দাসী আগুন আনিতেই তিনি একটা সোনার কৌটা খুলিয়া খানিকটা সুগন্ধি গুঁড়ো আগুনে ছড়াইয়া দিলেন। আগুনের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর অন্ধকার হইয়া গেল; তার পর সেই ধোঁয়ার রাশির ভিতর হইতে প্রকাণ্ড লোহার মুগুর কাঁধে করিয়া মস্ত-কুঁজওয়ালা এক ভীষণমূর্ত্তি

একহাত লম্বা দৈত্য কুড়িহাত দাড়ি উড়াইয়া আসিয়া আমেদের সম্মুখে হাজির। কুমার তাঁহাকে সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। স্কৈবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া পরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে?"

পরীবানু বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, ভারতবর্ষের রাজপুত্র আমার শ্বশুর আপনাকে একবার দেখ্‌তে চান বলে আমি আপনাকে স্মরণ করেছি "

স্কৈবার লোহার মুগুরের বাড়ি রাজার মাথাটাই গুঁড়াইয়া দিলেন

স্কৈবার ভগিনীপতির দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার অনুরোধ আমি খুসী হয়েই পালন করব। কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি এখনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

পরীবানু বলিলেন, "আজ বড় বেলা হয়েছে, কাল ভোরবেলা গেলেই বোধ হয় চল্‌বে। ইতিমধ্যে ভারতরাজ ছেলের সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করছেন সেইসব কথা আপনাকে একটু খুলে বলি।"

পরদিন স্কৈবার কুমারের সঙ্গে রাজসভায় চলিলেন। তাঁহার বিকট মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড মুগুর আর দাড়ির ঝড় দেখিয়া দোকানীরা ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করিয়া ফেলিল, ঘরে ঘরে লোকে দরজায় খিল দিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। এমনি করিয়া স্কৈবার রাজসভায় গিয়া উঠিতেই সভাসুদ্ধ সব ছুটিয়া পলাইয়া গেল, রাজা একলা

পড়িয়া রহিলেন। স্কেবার রাজার কাছে গিয়া এক হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমায় কেন ডেকেছিলেন?" রাজার মুখে কথা ফুটিল না, তিনি ভয়ে দুইহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিলেন। রাজার এরকম অভদ্রতা দেখিয়া স্কেবার ত চটিয়াই আগুন। রাগে অন্ধ হইয়া তিনি লোহার মুগুরের বাড়ি রাজার মাথাটাই গুঁড়াইয়া দিলেন। তার পর সেইসব

স্কেবার আমেদকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন

দুষ্ট মন্ত্রীর দল আর মায়াবিনী বুড়ীকেও যমালয়ে পাঠাইয়া স্কেবার আমেদকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। স্কেবারের স্নেহের পাত্রী পরীবান্থ হইলেন রাজরাণী। কুমার আলি ও তাঁহার স্ত্রী নুরুন্নিহার আমেদের সঙ্গে কোনো মন্দ ব্যবহার করেন নাই বলিয়া কুমার তাঁহাদের হাতে একটা প্রদেশের শাসনের ভার দিলেন। বড় ভাই হোসেন আগের মত ফকিরই রহিয়া গেলেন, তিনি আর সংসারে ঢুকিলেন না।

———

কামারলজমান ও বেদৌরার কথা

পারস্তদেশের কাছে সমুদ্রতীরের উপকূল-বিভাগে খালেদান নামে কতকগুলি ছোট ছোট উপদ্বীপ আছে। সেখানের এক রাজার নাম ছিল শাহজমান। রাজার প্রবল পরাক্রম; দয়ার আর ন্যায়বিচারে তাঁহার তুলনা মিলিত না। দেশে দেশে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক কাল ধরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে তিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন। কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এততেও রাজার মনে একটি গোপন দুঃখ সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিত। রাজার পুত্র ছিল না। সেই দুঃখে সকল সুখই তাঁহার কাছে তুচ্ছ ছিল। শেষে রাজা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে পুত্রলাভের জন্য দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ সুরু করিয়া দিলেন। ফকির সন্ন্যাসী যাজক সকলে রাজার কৃপায় কত যে সেবা-যত্ন পাইল তাহার ঠিক নাই, রাজ্যের যত দেবালয় ধনরত্নে ভরিয়া উঠিল।

এক বৎসর ধরিয়া দানধ্যান স্বস্ত্যয়নের পর পূর্ণচন্দ্রের মত রূপবান একটি শিশু রাজমহিষীর কোল আলো করিল। শিশুর এমন চাঁদের মত রূপ দেখিয়া রাজা তাঁহার নাম রাখিলেন কামারলজমান (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র)।

শুক্লপক্ষের চাঁদ যেমন দিন দিন বাড়িতে থাকে তেমনি করিয়া রূপেগুণে বাড়িতে বাড়িতে শিশু রাজকুমার সাত বৎসরে পা দিলেন। মহারাজ দেশবিদেশ হইতে যত বিদ্বান পণ্ডিত আনিয়া কুমারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই কুমার নানাবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কুমারের যত রূপ তত গুণ, দেশে দেশে তাঁহার নামডাক পড়িয়া গেল। কুমারের গৌরবে রাজাপ্রজার বুক আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

কুমারের বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন রাজার সখ হইল এইবার তাঁহার হৃদয়ের ধন একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মনে মনে শত শত আনন্দের কল্পনা করিয়া মহারাজ কুমারকে ডাকিয়া হাসিয়া মনের কথা বলিলেন।

কুমার সে-কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "বাবা, আপনার অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লাম না বলে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, বিবাহ কর্‌তে আমার একটুও ইচ্ছা নেই।"

কুমারের কথা শুনিয়া মহারাজ বড় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু মুখে আর বৃথা তর্কবিতর্ক না করিয়া তখনকার মত কুমারকে বিদায় দিলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজার মনের ইচ্ছা তখনও ঘোচে নাই। তিনি আবার আর-একদিন কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, গত বৎসর তোমাকে বিবাহের কথা বলেছিলাম, এতদিন ভেবেচিন্তে তুমি সে-বিষয়ে কি ঠিক কর্‌লে ?"

কুমার বলিলেন, "বাবা, আমি এ-বিষয়ে অনেক ভেবে দেখ্‌লাম যে, বিবাহ করা উচিত নয়। কাজেই অনুগ্রহ করে একথা আর তুল্‌বেন না, আপনার আদেশ রাখ্‌তে পার্‌লাম না বলে ক্ষমা কর্‌বেন।" এই বলিয়া কুমার মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুমারের এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া শাহজমানের মনটা খারাপ হইয়া গেল। তিনি কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রী ও রাণীকে সব-কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা দুজনে কুমারকে অনেকদিন ধরিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু কুমার কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না।

আর-একটা বৎসরও কাটিয়া গেল। রাজা আর-একবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া একদিন পাত্রমিত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলকে ডাকিয়া মহাসভা করিয়া কুমারকে বলিলেন, "বৎস, তোমার বিবাহ দিতে আমার বড় সাধ। আমি কতদিন ধরে তোমায় বার বার অনুরোধ কর্‌ছি, কিন্তু তুমি আমার কথা রাখনি। আজ আমি সভাস্থ সকলের সঙ্গে তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তোমাকে বিবাহ কর্‌তে হবে; তুমি আর কথার অবাধ্য হয়ো না।"

রাজকুমার বলিলেন, "কেন আমায় বিবাহের জন্যে বৃথা বারবার অনুরোধ কর্‌ছেন? আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিবাহ কর্‌ব না।"

মহারাজ শাহজমান সভাসুদ্ধ লোকের মাঝখানে কুমারের মুখে এমন কথা শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কুলাঙ্গার! তোর এত স্পর্দ্ধা হয়েছে যে বারবার আমার কথা অবহেলা করিস। প্রহরী! কে আছিস্ রে? এখনি একে আমার চোখের সাম্‌নে থেকে নিয়ে গিয়ে একটা নির্জ্জন পুরানো দুর্গে বন্দী করে রাখ্।"

বলিবামাত্র একদল প্রহরী অস্ত্রশস্ত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া আসিয়া যুবরাজকে ধরিয়া রাজধানীর বাহিরে একটা পোড়ো দুর্গের মধ্যে কিছু খাবার ও খানকতক বই দিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিল। সঙ্গী বলিতে এক দাস ছাড়া আর কেহ রহিল না।

বন্দীভাবে কুমারের দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট ছিল না। রোজ নিয়মিত সময়ে স্নান আহার আর উপাসনা করিয়া বাকি সময়টা তিনি পড়া-শুনাতেই কাটাইয়া দিতেন। দাসটা দরজার কাছে শুইয়া পড়িয়া থাকিত।

সেই দুর্গের একটা কুয়োর মধ্যে দৈত্যরাজের কন্যা পরী মহীমোহিনী থাকিত। রাত্রি দুই প্রহর হইলেই পরী কুয়োর ভিতর হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইত। সেদিন রাত্রে দুর্গের মধ্যে মানুষ দেখিয়া পরীর বড় অদ্ভুত ঠেকিল এবং একটু কৌতূহলও হইল। সে কুমারের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া কুমারের পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "পৃথিবীর সব দেশেই ত আমি ঘুরেছি, কিন্তু এমন সুন্দর পুরুষ ত কখনো দেখিনি। এত রূপ কখনও মানুষের হয় না।"

মনে মনে কুমারের অপরূপ রূপের প্রশংসা করিতে করিতে দৈত্যরাজকন্যা দেশ বেড়াইতে আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিল। দানহাস নামের একটা দৈত্য হাওয়ার ঝাপটে হঠাৎ পরীর মুখোমুখি আসিয়া পড়িল। পরীর ঈশ্বরে ভক্তি ছিল বলিয়া, আর সে সুলেমানের দলের বলিয়া, ঈশ্বরবিদ্রোহী দৈত্যেরা সকলেই তাহাকে ভয় ও মান্য করিত। কাজেই

কুমারের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ পরী

মহীমোহিনীকে দেখিয়া দানহাস ঘটা করিয়া নমস্কার করিল। পরী বলিল, "হ্যাঁরে তুই কোথা থেকে আস্‌ছিস্? কি কি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখেছিস্ বল্ দেখি।"

দানহাস হাতজোড় করিয়া বলিল, "হে সুন্দরি, আপনার সঙ্গে ভাল সময়েই দেখা হয়েছে। একটা আশ্চর্য্য গল্প বল্‌বার আছে শুনুন :—

আমি সম্প্রতি চীনদেশ থেকে আস্‌ছি। চীনরাজের এক কন্যা আছেন, তাঁর নাম

বেদৌরা। বেদৌরার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী মানুষের ঘরে আর কখনও বোধ হয় জন্মায়নি; শুধু তাইবা বলি কেন? স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন ভুবন খুঁজলেও অমন রূপের ছটা দেখা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, রাজকন্যা কাউকেই বিবাহ করতে রাজি হন না; সেইজন্যই চীনরাজ আদরিণী কন্যাকে পাগল মনে করে দিনরাত একটা বাড়ীতে বন্ধ করে রেখেছেন আর দেশে দেশে প্রচার করে দিয়েছেন যে, যদি কোনো পুরুষ তাঁর মেয়ের পাগলামি সারিয়ে দিতে পারেন তাহলে তার হাতেই চীনরাজ কন্যাদান করবেন, আর যৌতুক দেবেন সমস্ত চীন সাম্রাজ্য।

দানহাসের কথা শুনিয়া পরী হাসিয়া বলিলেন, "চীনরাজকন্যার রূপের বড়াই অত করে মিছে কেন করছিস্? আমি এইমাত্র যে রাজপুত্রকে দেখে এলাম দেবতাদের মাথাও তার রূপ দেখে হেঁট হয়ে যায়। তোমার রাজকুমারীর মত এ রাজপুত্রও বিয়ে করতে চান না বলে রাজা ছেলেকে রাগ করে বন্দী করে রেখেছেন। যে পুরানো দুর্গে আমি থাকি, কুমারও সেইখানে রয়েছেন। এইমাত্র তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে এলাম। তুই চীন রাজকুমারীর অতুল রূপের গর্ব্ব আর মিছে করিস্‌নে। নইলে এখনি তোর বাচালতার উচিত প্রতিফল পাবি।"

দানহাস বলিল, "আচ্ছা, অত বৃথা কথা কাটাকাটির দরকার কি? আমি এখনি চীনরাজকন্যাকে এখানে নিয়ে আস্‌ছি। দুজনকে পাশাপাশি শোয়ালেই দেখা যাবে কে কত সুন্দর। আমাদের ঝগড়া করবারও আর কোনো দরকার থাকবে না।"

দৈত্য দানহাস প্রকাণ্ড দুইখানা পাখা মেলিয়া তখনই উড়িয়া চীনদেশে চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার পালঙ্কসুদ্ধ তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল। কামারলজমানের পাশে বেদৌরাকে নামাইতেই পরী কুমারের রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। দানহাস বলিল, "কখনো নয়, রাজকুমারীর রূপের জ্যোতিই বেশী উজ্জ্বল।"

ঝগড়া মিটিল ত না, বরং আরো বাড়িয়াই চলিল। শেষে ঠিক হইল যে, একজন মধ্যস্থ ডাকিয়া বিচার করিতে হইবে। পরী তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য মাটিতে জোরে পা ঠুকিতেই চড়্ চড়্ করিয়া মাটি ফাটিয়া বিকটমূর্ত্তি এক দৈত্য পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়া পড়িল। দৈত্যের এক পা খোঁড়া, এক পা বাঁকা, কপালে মস্ত একটা শিং, পিঠে প্রকাণ্ড কুঁজ, আর মাথা গিয়া আকাশে ঠেকে। দৈত্যটা পরীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, আমাকে কেন স্মরণ করেছেন, আদেশ করুন।"

পরী বলিল, "ওরে কাশকাশ, সত্যি করে বল্ দেখি এই দুটি ঘুমন্ত মানুষের মধ্যে কে বেশী সুন্দর? আমাদের এই তর্কের মীমাংসা করে দেবার জন্যেই তোকে ডেকেছি।"

কাশকাশ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমন্ত মুখদুটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, আমি ত কে বেশী সুন্দর বলতে পারলাম না। দুজনেরই সমান রূপ, দুজনেই অনুপম। তবে যদি আপনারা নিতান্তই রূপ ওজন করে দেখতে চান, তবে দুজনকে এক

এক করে জাগিয়ে দিন, যে অন্য জনের রূপ দেখে বেশী মুগ্ধ হবে তাকেই রূপে একটু খাটো বলা যাবে।"

পরামর্শ টা দানহাস আর পরীর মন্দ লাগিল না। দুজনেই রাজি হইলে পরী ছোট একটি মাছি হইয়া রাজকুমারের ঘাড়ে খুব জোরে এক কামড় দিল। কামড়ের জ্বালায় কুমারের চোখের ঘুম কোথায় ছুটিয়া গেল, ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তিনি দেখিলেন পূর্ণিমার আলোর মত অপরূপ সুন্দরী একটি বালিকা তাঁহার পাশেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এমন অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া রাজকুমারের ঘাড়ের জ্বালা কোথায় উড়িয়া গেল।

দুপুর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া স্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না, এমন রূপবতী একটি মেয়েকে হঠাৎ নিজের পাশে দেখিয়া কুমার ঠিক করিলেন এই বালিকার সঙ্গেই বোধ হয় মহারাজ তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। কুমার বেদৌরার রূপের অনেক প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! আমি কি হতভাগ্য! এমন স্ত্রীরত্ন কি পিতা আমার জন্য জগৎ খুঁজে এনেছিলেন? যদি এই তাঁর মনে ছিল, তবে আগে কেন আমায় দেখাননি? তাহলে এমন মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে অস্বীকার আমি কিছুতেই কর্‌তাম না।" অনেকক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজকুমার বেদৌরাকে জাগাইবার জন্য নানা নামে ডাকা ডাকি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীর ঘুম ত সাধারণ ঘুম নয়, সে দৈত্যদের মায়ার ঘোর, কাজেই কুমারের চেষ্টাতে সে ঘুম ভাঙিল না। তখন তিনি বেদৌরার হাতের একটি আংটি খুলিয়া নিজের আঙুলে পরিলেন, আর নিজের আংটিটা খুলিয়া বেদৌরাকে পরাইয়া দিলেন। দুজনেরই কাছে যাহাতে দুইজনের একটি স্মৃতিচিহ্ন থাকে এই ইচ্ছায় রাজকুমার আংটি বদল করিলেন। দৈত্যের মায়ায় রাজকুমারকে আর বেশীক্ষণ জাগিয়া থাকিতে হইল না।

কুমার ঘুমাইয়া পড়িতেই দানহাস মাছি হইয়া রাজকন্যার ঠোঁটের উপর এমন এক কামড় দিল যে, তখনই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জ্বালায় অস্থির হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতেই বেদৌরার চোখ পড়িল ঘুমন্ত রাজকুমারের উপর! এমন ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া রাজকুমারীর নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ভাবিয়া পাইলেন না কেমন করিয়া এমন সময় কুমার এখানে আসিলেন। কতক্ষণ ধরিয়া বেদৌরা কুমারের পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তবু তাঁহার চোখের পাতা যেন পড়িতে চাহে না। কুমারী মনে মনে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই অপূর্ব্ব সুপুরুষের সঙ্গেই কি পিতা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করে রেখেছিলেন? হায়রে, আমি কেন তাঁর আদেশ অবহেলা কর্‌লাম? পিতা যদি আর-একবার বলেন ত আমি আর এতটুকু আপত্তিও কর্‌ব না।" বেদৌরাও কুমারের ঘুম ভাঙাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দৈত্যের মায়ায় কুমার তখন আচ্ছন্ন, সে-ঘুম ভাঙে কি করিয়া? বেদৌরা তাঁহাকে জাগাইতে না পারিয়া অনেক দুঃখ করিলেন, অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন কি আর করেন, তিনিও আবার শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরী দেখিল বেদৌরা কামারলজমানকে জাগাইবার জন্য যত সাধ্য-সাধনা করিলেন, বেদৌরাকে জাগাইতে কুমার ততটা করেন নাই। তখন সে মহা গর্ব্বে হাসিয়া বলিল, "দেখ্ রে দৈত্যাধম! কে বেশী সুন্দর চেয়ে দেখ্। আজ তুই আমার কাছে হার মান্‌লি, যা এখন কুমারীকে চীনদেশে রেখে আয়।" তখন দানহাস ও কাশকাশ ঘুমন্ত রাজকুমারীকে

বিছানায় উঠিয়া বসিতেই বেদৌরার চোখ পড়িল ঘুমন্ত রাজকুমারের উপর

তুলিয়া লইয়া অন্ধকার রাত্রের আকাশের ভিতর দিয়া চীনদেশে উড়িয়া চলিয়া গেল, পরী নিজের কুয়োর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

পরদিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙিতেই কুমার দেখিলেন, সে ঘরের কোনোখানে রাত্রের সেই অপরূপ সুন্দরী কন্যা নাই। তখন তিনি মনে করিলেন মহারাজ বুঝি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এমন করিয়া ছলনা করিয়াছেন। দরজার কাছে যে-লোকটা শুইয়া থাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সব জানা যাইবে মনে করিয়া কুমার তাহাকে ডাকিয়া

দানহাস ঘুমন্ত রাজকুমারীকে তুলিয়া লইয়া অন্ধকার রাত্রের আকাশের ভিতর দিয়া চীনদেশে উড়িয়া চলিয়া গেল।

বেদোরার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে বেচারা ত কিছুই জানিত না, কুমারের মনের মত উত্তর কি করিয়া দিবে? কুমার দাসের ব্যবহারে চটিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া বেদম প্রহার দিলেন। মার খাইতে খাইতে প্রাণ যায় দেখিয়া সে ভাবিল কুমারের নিশ্চয় দুঃখে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, ফাঁকি দিয়া না পালাইলে আর এ-যাত্রা রক্ষা নাই। এই ভাবিয়া সে বলিল, "প্রভু, আমায় মেরে ফেল্‌বেন না, আমি এখনি সব ঠিক খোঁজখবর নিয়ে আস্‌ছি।"

কুমার বলিলেন, "যা, এখনি খোঁজ নিয়ে আয়, নইলে তোর প্রাণদণ্ড কর্‌ব।"

কুমারের হাতে নিষ্কৃতি পাইয়া বেচারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া মহারাজকে সকল কথা জানাইল।

সব শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে তলব করিলেন। মন্ত্রী আসিলে তাঁহাকে যাহা বলিবার বলিয়া রাজকুমারের কাছে ভাল করিয়া খোঁজ লইতে বলিলেন। মন্ত্রী চলিলেন যুবরাজের কাছে। শোনা কথার কতখানি সত্য, কতখানি মিথ্যা জানিবার ইচ্ছায় কুমারকে দুই-চার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, "মন্ত্রী-মশায়, কাল রাত্রে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আমার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল, আমি মাঝরাত্রে উঠে তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু সকালে উঠে আর তার কোনো চিহ্নও দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এখন বলুন দেখি সে-মেয়েটি এলই বা কোথা থেকে আর গেলই বা কোথায়?"

রাজকুমারের কথা শুনিয়া মন্ত্রী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কুমার, রাজার বিনা হুকুমে এ-দুর্গে কোনো মানুষের ঢুক্‌বার সাধ্যও নেই, অধিকারও নেই। তাছাড়া, আপনার দরজার গোড়ায় একটা লোক সারারাত শুয়ে থাকে, কি করে তাকে এড়িয়ে ঘরে অন্য কেউ ঢুক্‌বে? আমার বোধ হয় আপনি কোনো রকম স্বপ্ন দেখেছেন, রক্তমাংসে গড়া কোনো বালিকা এ-ঘরে কিছুতেই আসেনি।"

এ-কথা শুনিয়া কুমার ত চটিয়াই আগুন! তিনি মন্ত্রীর বয়স ও পদের মূল্য ভুলিয়া পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌তে এসেছিস? আমি সব বুঝি, তোর ষড়যন্ত্রেই এ-সব কাণ্ড হয়েছে। আমি কোনো কথা শুন্‌তে চাই না, এখনি তোকে সেই মেয়েকে এখানে এনে হাজির করে দিতে হবে?"

মন্ত্রী দেখিলেন বড়ই বিপদ, মানসম্ভ্রমও থাকে না, পাগলকে থামাইয়া রাখাও যায় না। এমন সময় পলায়নই সুবিধা বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "কুমার, আজ্ঞা করেন ত মহারাজকে ব্যাপারটা জানাই; তিনিও নিশ্চয় একটা উপায় করে দেবেন!"

মন্ত্রী গিয়া সম্রাট্‌কে আর এক পালা সেই-সব কথা বলিলেন। সম্রাট্ শাহজমান যুবরাজের এমন অবস্থা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন; তিনিও তখনই মন্ত্রীর সঙ্গে প্রিয় পুত্রকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু রাজাকে দেখিয়াও কুমারের সেই একই কথা। কুমার

বলিলেন, "বাবা, কেন আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন? সত্যি বলুন, কে সে মেয়েটি। আমি নিশ্চয় এখনি তাকে বিবাহ করব।"

রাজা কামারলজমানের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক! আমি এই পবিত্র রাজমুকুট ছুঁয়ে বলছি, সে-মেয়েটির বিষয় আমি কিছুই জানি না। তুমি খুব সম্ভব স্বপ্নেই তাকে দেখে থাকবে; আর যদি সে সত্যই এসেছিল তবে আমার অজ্ঞাতেই এসেছিল।"

রাজপুত্র বলিলেন, "বাবা, আমি নিশ্চয় করে বলছি, এ স্বপ্ন কিংবা মায়ার কথা নয়। আমি সজ্ঞানে স্বচক্ষে তাকে দেখেছি। নিজের হাতে আমি তার আঙুলে আমার আংটি পরিয়ে দিয়েছি আর এই দেখুন তার আংটি নিজের আঙুলে নিয়ে পরেছি। এখনও সেটা ঠিক তেমনিই রয়েছে।" কুমার আংটিটা খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন। এমন প্রমাণ নিজের চোখে পাইয়া তিনি আর অবিশ্বাস করেন কি করিয়া? কিন্তু কি উপায়ে যে সে সুন্দরী কুমারীকে আবার ফিরিয়া পাওয়া যায় ভাবিয়া তাহার কূল-কিনারা করিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কুমার বলিলেন, "মহারাজ! সেই মেয়েটিকে দেখে আমার মন এমনি খুসী হয়ে গিয়েছিল যে, তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আপনি তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।"

রাজা বলিলেন, "বৎস, এ আংটিটা দেখে তোমার কথা সত্য বলেই মনে হচ্ছে। আমারও একান্ত ইচ্ছা যে, সেই কুমারীকে তোমার হাতে দিয়ে সুখী হই। কিন্তু উপায় কোথায়? সে বালিকার কোনো পরিচয় ত জানি না, কি করে তার খোঁজ করব? বিধাতা মাত্র ভরসা, তিনি যদি মুখ তুলে চান, তবেই উপায় দেখা যাবে।"

রাজকুমারকে বন্দী করিয়া আর রাখিবার কোনো কারণ নাই, কাজেই শাহজমান তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু কুমার মনের দুঃখে শয্যায় আশ্রয় লইলেন। রাজ্যময় যুবরাজের অসুখের কথা ছড়াইয়া পড়িল। শত শত বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা সুরু করিল। মহারাজ সমস্ত রাজকার্য্য ফেলিয়া ছেলের মাথার কাছে আসিয়া বসিলেন, দিনরাত কিছুই আর জ্ঞান রহিল না।

এদিকে দৈত্য দানহাস চীনরাজকুমারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠিক জায়গায় রাখিয়া চলিয়া গেল। ভোর হইতেই চোখ মেলিয়া রাজকুমারকে না দেখিয়া তিনি ধাত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে আমার পাশেই যে রাজকুমার শুয়েছিলেন, তিনি কোথায়?"

ধাত্রী যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, "আপনি কি বলছেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

রাজকন্যা আবার বলিলেন, "কাল রাত্রে এই ঘরে এইখানে একটি পরম সুন্দর যুবক

ঘুমিয়ে ছিলেন, সকালে উঠে তাঁকে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাই জান্‌তে চাইছি যে, তিনি গেলেন কোথায় ?"

ধাত্রী বলিল, "রাজকুমারী! আপনি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। হাজার সিপাই-শাস্ত্রীতে ঘেরা এই সাত মহল পার হয়ে আমাদের লুকিয়ে এখানে আবার কে আসবে ? নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।"

রাজকুমারী মহা চটিয়া চোখ পাকাইয়া ধাত্রীর চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তিন চড় দিয়া বলিলেন, "বল্‌ তাকে কোথায় রেখেছিস! নইলে এখনি তোর মাথা ভেঙে ফেল্‌ব।"

ধাত্রী বেচারী কোনো-রকমে রাজকুমারীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া সোজা গিয়া রাণীর কাছে উঠিল। রাণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে রাজকুমারীর পাগ্‌লামির সব-কথা বলিয়া বুড়ী ধাই রাণীমার পা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রাণী মনে করিলেন মেয়ে না-জানি কি-সব স্বপ্ন দেখিয়া পাগল হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা ভাল করিয়া জানিবার জন্য ধাত্রীকে সঙ্গে করিয়া রাজকুমারীর মহলে চলিলেন। আসল কথাটা প্রথমেই না পাড়িয়া অনেক কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি ধাই-বুড়ীর উপর অত চটে গেলে কেন? তোমার এত বিদ্যা, বুদ্ধি, এই কি তোমার মত মেয়ের কাজ ?"

মায়ের মুখে এমন কথা শুনিয়া রাজকুমারীর হুঁস হইল। তিনি মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "মা, কাল রাত্রে যে যুবরাজকে দেখেছি তাঁরই সঙ্গে আমার বিবাহ দিন।"

মহিষী বলিলেন, "বাছা, তুমি কি যে বল্‌চ কিছু বুঝ্‌ছি না। তোমার কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়্‌লাম। তুমি নিশ্চয় স্বপ্নে কোনো রাজকুমারকে দেখেছ।"

রাজকন্যা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যখন আমি বিবাহ করতে চাইনি, তখন বাবা আর অপনি আমাকে বারবার করে এই নিয়ে কত অনুরোধ করেছেন, কিন্তু এখন আমি নিজে চাইচি বলে আপনারা আমায় পাগল ঠিক করে ঠাট্টা করছেন। আশ্চর্য্য বটে!"

মা মেয়েকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হইল না। তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া মহিষী ভয়ে মহারাজের শরণ লইলেন। মহারাজও কিছু কম ভয় পাইলেন না। তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর ঘরে আসিয়া তিনি মেয়েকে তন্ন তন্ন করিয়া সব-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদোরা রাত্রে যাহা-কিছু দেখিয়াছেন সবই বলিলেন।

তবু রাজার বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন, "বৎসে, তুমি এ-সব কি বল্‌ছ ?"

রাজকুমারী কামারলজমানের আংটিটা চীনরাজকে দেখাইয়া বলিলেন; "এই দেখুন আমার আঙুলে সেই রাজপুত্রের আংটি রয়েছে।"

আংটি দেখিয়া রাজা আরোও বিস্মিত হইয়া মনে মনে ঠিক করিলেন মেয়ের পাগ্‌লামি

আর-এক মাত্রা বাড়িয়াছে। কাজেই তাহাকে কিছু না বলিয়া রাজসভায় ফিরিয়া গেলেন। রাজকন্যার রোগের অবস্থা সভাসদ্দের বলিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি রাজকন্যাকে এই বিষম রোগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারে তবে মহারাজ রাজ্যশুদ্ধ রাজকন্যা তাহার হাতে সঁপিয়া দিবেন, কিন্তু যদি চিকিৎসা করিতে আসিয়া সে বিফল হয় তবে রাজার হুকুমে তাহার প্রাণটি খোয়া যাইবে।

রাজার হুকুম চারিদিকে রটিয়া যাইতেই দেশ-বিদেশের কত যে হাকিম বৈদ্য কবিরাজ যোগী সন্ন্যাসী ফকির আর রাজা রাজপুত্র চীনরাজ্য আর রাজকন্যা লাভের আশায় ভুলিয়া রাজসভা সরগরম করিয়া তুলিল তাহার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! কাহারও মনের বাসনাই মিটিল না, বিফল হইয়া সকলকেই জল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হইল। এক রাজকন্যার রোগ শান্তি করিতে গিয়া কত শত মানুষের রক্তে চীনরাজ্য লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজকন্যার রোগ বাড়িয়াই চলিল। চীনরাজ পড়িলেন মহা বিপদে।

বেদৌরার ধাত্রীর এক ছেলে ছিল, তাহার নাম মার্জ্জমান। এই ছেলেটির সঙ্গে অল্প বয়সে রাজকুমারীর খুব ভাব ছিল। বড় হইয়া দূরে যাইবার পরও এই দু'টি বাল্যবন্ধু তাহাদের বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই।

মার্জ্জমান এতদিন বিদেশে জ্যোতিষ বিদ্যা শিখিতেছিল। লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া দেশে ফিরিয়াই পথেঘাটে বাল্যসখীর অদ্ভুত রোগের কথা শুনিয়া সে মাকে বলিল, "মা, আমি একবার লুকিয়ে বেদৌরার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

ধাত্রী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, "তুমি যদি আমার মেয়ে সেজে যেতে রাজি থাক, তবে আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

মার্জ্জমান তাহাতেই রাজি। ধাত্রী তখন তাহাকে মেয়েদের মত পোষাক পরাইয়া সন্ধ্যার পর সঙ্গে করিয়া রাজকুমারীর কাছে লইয়া চলিল। প্রহরীদের বলিল, "এটি আমার মেয়ে।" তাহারা কাজেই কোনো বাধা দিল না। মার্জ্জমান বেদৌরার কাছে গিয়া নিজের পরিচয় দিল। এতদিন পরে ছেলেবেলাকার বন্ধুটিকে দেখিয়া রাজকুমারী মহা খুসী হইয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া অনেক গল্প করিলেন। সে-সব গল্প শেষ হইবার পর মার্জ্জমান পরম স্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কি শুনছি বোন? তোমার এমন কেন হল?"

বন্ধুর মুখে এমন-কথা শুনিয়া রাজকুমারী দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমিও কি আমাকে পাগল মনে কর? আমার বেশ টনটনে জ্ঞান আছে, আমি মোটেই পাগল নই।" এই বলিয়া তাহাকে রাজকুমারের আংটি দেখাইয়া সেই রাত্রের সমস্ত গল্প বলিলেন।

আংটিটি দেখিয়া আর রাজকুমারীর কথা শুনিয়া মনে মনে কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া মার্জ্জমান বলিল, "আমি তোমার সব-কথাই সত্য বলে বিশ্বাস করেছি বোন। কিন্তু তোমাকে এখন

কিছু দিন ভাবনা-চিন্তা দূরে ফেলে হেসে-খেলে কাটাতে হবে। ইতিমধ্যে আমি সেই রাজকুমারের সন্ধানে বেরোব, আর যেমন করে পারি তাকে ঠিক তোমার কাছে এনে হাজির করব। তার জন্যে তুমি এতটুকুও ভেব না।"

রাজকুমারীকে সান্ত্বনা দিয়া মার্জ্জমান পরদিনই চীনদেশ ছাড়িয়া বিদেশের পথে বাহির হইয়া পড়িল। কত পথ যে চলিল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু যেখানেই যায়, যতদূরেই যায় সেইখানেই শোনে রাজকুমারী বেদৌরার রোগের কথা। চারমাস ধরিয়া নানাদেশ ঘুরিয়া শেষে তোর্ক নামক এক বন্দরে পৌছিল, যেখানে চীনরাজকুমারীর কোনো কথা লোকের মুখে শোনা যায় না। কিন্তু সেখানে শোনা গেল যুবরাজ কামারলজমানের কথা। যুবরাজেরও রাজকন্যার মত অবস্থা। এই-বিষয়ে দুইজনেরই এমন মিল শুনিয়া মার্জ্জমান মনে মনে মহা খুসী হইয়া গেল। তখনই তাহার নাম ধাম পরিচয় জানিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। কোথায় কখন কেমন করিয়া তাহার দেখা পাওয়া যায় সব সন্ধান লইয়া মার্জ্জমান আর একদিনও নষ্ট না করিয়া জাহাজে চড়িয়া যুবরাজের খোঁজে যাত্রা করিল। দুইমাস পরে শাহজমান রাজার দুর্গে আসিয়া উঠিয়া সোজা একেবারে রাজার কাছে গিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাজ, যদি অনুমতি দেন ত আমি এখনি রাজকুমারের রোগ শান্তি করতে পারি।" শাহজমান মহা খুসী হইয়া তাহাকে যুবরাজের কাছে লইয়া গেলেন। মার্জ্জমান দেখিল যুবরাজ বেদৌরার মতই সুন্দর। দুজনের চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সে আরো খুসী হইয়া উঠিল। তার পর রাজকুমারের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া সে বলিল, "কুমার, যার জন্যে আপনি এত দুঃখভোগ করছেন তাঁর নাম বেদৌরা, তিনি চীনরাজের একমাত্র কন্যা। আপনাদের দুজনের দেখছি একই অবস্থা। তাঁকেও আমি এমনি দেখে এসেছি। যাক্ এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আর আপনাদের মিলন হতে দেরি নেই।" মার্জ্জমান বেদৌরার কথা যাহা কিছু জানিত কুমারকে জানাইয়া বলিল, "যুবরাজ, আর বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে চীনরাজ্যে যেতে হবে। আপনাকে দেখলেই রাজকুমারী বেদৌরার সব রোগ সব দুঃখ দূরে হবে আর আপনারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

মৃত-সঞ্জীবনীর গুণে মানুষ যেমন করিয়া মরণের মুখ হইতে বাঁচিয়া উঠে, মার্জ্জমানের কথায় যুবরাজের রোগ জীর্ণ প্রাণ তেমনি করিয়া তাজা হইয়া উঠিল। সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী রাজকন্যাকে আবার ফিরিয়া পাইবেন এই আশাতেই যুবরাজের মনের বল শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার সব রোগ দূর হইয়া গেল। যুবরাজকে সুস্থ সবল দেখিয়া রাজারাণী প্রজামন্ত্রী সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। মার্জ্জমানের গুণে মুগ্ধ হইয়া রাজসংসারের যে যেখানে ছিল সকলেই তাহাকে মহা আদর করিতে লাগিল। রাজা শাহজমান তাহাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসিয়া ফেলিলেন।

এদিকে যুবরাজের শরীর যত সবল হইয়া উঠিতে লাগিল তিনি ততই চীনদেশে যাইবার

জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিয়া পিতার অনুমতি লওয়া যায় এই হইল তাঁহার ভাবনা। কোনো সুযোগ না দেখিয়া যুবরাজ শেষে মার্জ্জমানের পরামর্শ চাহিলেন। মার্জ্জমান বলিল, "মহারাজ আপনাকে যে-রকম ভালবাসেন, তাতে আমার মনে হয় না যে, তিনি আপনাকে অত দূরদেশে যেতে দেবেন। তবে যদি মৃগয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়্‌তে পারেন তা হলে এক হয়।"

তাহাই হইল। পরদিন যুবরাজ পিতার কাছে মৃগয়ায় যাইবার অনুমতি চাহিলেন। মহারাজ কোনো আপত্তি না করিয়া লোকজন হাতী ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যুবরাজকে মার্জ্জমানের হাতে সঁপিয়া দিলেন। কামারলজমানকে মৃগয়ায় পাঠাইতেও রাজার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

দলবল সঙ্গে করিয়া কুমার-সারাদিন ধরিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া সন্ধ্যার পর অনেক পথ পার হইয়া এক সরাইখানায় আসিয়া উঠিলেন। সেইখানেই সকলে খাওয়া-দাওয়া করিয়া যে যাহার আলাদা আলাদা বিছানায় শুইয়া পড়িল। দুপুর রাত কাটিয়া গেলে মার্জ্জমান উঠিয়া দেখিল সঙ্গের সব লোকজন নিঝুম হইয়া ঘুমাইতেছে। সে তখন আস্তে আস্তে যুবরাজকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, "কুমার, যদি লুকিয়ে পালাতে চান্ তবে তার এই উপযুক্ত সময়। আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। এই-সব লোকজন উঠে পড়্‌বার আগেই চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্।" কুমার তৎক্ষণাৎ রাজি। তেজীয়ান দুটি ঘোড়ায় দুইজনে চড়িয়া তখনই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তার পর কত জলপথে স্থলপথে ঘুরিয়া, কতদিন কত রাত্রি কাটাইয়া দুই বন্ধু চীনরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু মার্জ্জমান যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া সোজা নিজের বাড়ী না গিয়া একটা সরাইখানায় ছদ্মবেশে বাসা বাঁধিল। দিন-তিনেক পরে কুমারের জন্য একটি গণৎকারের পোষাক আনিল। মার্জ্জমান পরদিন কুমারকে সেই পোষাক পরাইয়া অনেক শিখাইয়া পড়াইয়া রাজসভায় পাঠাইয়া দিয়া নিজে বাড়ী চলিয়া গেল।

কুমার গিয়া রাজপ্রাসাদের প্রকাণ্ড দরজার কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রহরী সিপাই-শান্ত্রীতে চারিদিক ঠাসা। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। শুন্‌লাম, চীনরাজ-কুমারীর কঠিন রোগ, তাই চিকিৎসা করতে এসেছি। যদি তাঁকে সারাতে পারি, তাহলে নিশ্চয় তাঁকে বিবাহ করব, না পারি ত প্রাণ দিতে একটুও আপত্তি করব না"

শহরের অনেক লোক ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য সেইখানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। লোকের ভিড়ে রাজার সিংহদরজায় ক্রমে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। রাজকুমারের এত অল্প বয়স আর এমন সুন্দর চেহারা দেখিয়া সকলের মন ভালবাসায় গলিয়া গেল; সকলেই তাঁহাকে এমন মরণ পণ করিতে বারবার করিয়া বারণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজকুমার সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বারবার চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি অহঙ্কার করে বল্‌ছি যে, রাজকুমারীর রোগ নিশ্চয় সারিয়ে দেব। যদি না দিতে পারি

তাহলে বৃথা গলাবাজি করার অপরাধে অনায়াসে প্রাণ দেব।" রাজকুমারের এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া মন্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে রাজার কাছে লইয়া গেলেন। রাজ্যশুদ্ধ লোক অমন সুন্দর ছেলেটির জন্য দুঃখ করিতে করিতে নিজের নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেল।

চীনাগণৎকারবেশে কুমার কামারলজমান চীনরাজপ্রাসাদের দ্বারে

কুমার চীনরাজের সভায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের কাছের মাটি চুম্বন করিয়া নিজের কাজের কথা পাড়িলেন। চীনরাজ বলিলেন, "ওহে বিদেশী যুবক! তোমার তরুণ মুখ দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তুমি রাজকুমারীর রোগ সারাতে পারবে। আমি যদিও চাই যে, তুমি তোমার কাজে সফল হও, কিন্তু তবু আমি তোমায় এ কাজে হাত দিতে মিনতি করে বারণ করছি। কত বিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসক জ্যোতিষী হার

মেনে অকালে প্রাণ দিয়েছেন। তুমি ত জানই রোগ সারাতে না পার্‌লে প্রাণ যাবে। তবে কেন এমন কাজে হাত দিচ্ছ? এই কিশোর বয়সে বাপমাকে কাঁদিয়ে অকারণে কেন প্রাণ দেবে? যদি অর্থের জন্য এমন দুঃসাহস করে থাক, তবে আমি তোমায় এখনি যথেষ্ট ধনরত্ন এনে দিচ্ছি, প্রাণভরে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও।"

যুবরাজ বলিলেন, "মহারাজ, আমি সামান্য টাকার লোভে এমন ভীষণ ফাঁদে পা দিইনি, বৃথা পৃথিবীর এক মুড়ো থেকে আর-এক মুড়োয় প্রাণ দিতে ছুটে আসিনি। আপনি অনুমতি দিন, আমি এখনি রাজকন্যার রোগ সারিয়ে দেব। যদি এই কাজটাই না কর্‌তে পার্‌লাম তবে আমার শিক্ষারই বা কি দরকার, প্রাণেরই কি দর্‌কার। তার চেয়ে আমার মরাই ভাল।"

যুবরাজের তরুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া রাজার মন কেমন করিতেছিল। কিন্তু কি করেন? যুবরাজ কিছুতেই পিছপা হন না দেখিয়া অগত্যা রাজকুমারীর অন্তঃপুরের প্রধান প্রহরীকে ডাকিয়া তাহার হাতে কুমারকে সঁপিয়া দিলেন। প্রহরীরা কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাজকন্যার বাহির মহলে পৌছিতেই তিনি বলিলেন, "দেখ. আমি রাজকুমারীকে চোখে না দেখে আড়াল থেকেই রোগ সারিয়ে দেব।" প্রহরীরা রাজকুমারকে সেইখানে বসিতে দিলে তিনি কাপড়ের ভিতর হইতে কাগজ কলম প্রভৃতি বাহির করিয়া রাজকন্যাকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিলেন—

"পূজনীয়া রাজকুমারী! যুবরাজ কামারলজমান আপনাকে জানাইতেছেন যে, তিনি আপনার ঘুমন্ত চোখ দুটি খুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাগ্যদোষে হতাশ হইয়াছিলেন। তাই আপনাকে তাঁহার ভালবাসা জানাইবার ইচ্ছায় নিজের হাতের আংটির সঙ্গে আপনার আংটিটি বদ্‌লাইয়াছিলেন। আপনার হাতের সেই মহামূল্য আংটিটি এই চিঠির ভিতর আজ তিনি আপনার কাছে পাঠাইতেছেন। আপনি যদি দয়া করিয়া নিজের ইচ্ছায় এই রত্নটি আবার তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাঠান, তাহা হইলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। না হইলে, আপনার পিতার আজ্ঞায় তাঁহার প্রাণ যাইবে। যুবরাজ উত্তরের আশায় আপনার প্রমোদভবনে বসিয়া আছেন।"

চিঠি লেখা হইয়া গেলে যুবরাজ তাহার ভিতর সাবধানে রাজকুমারীর আংটিটি রাখিয়া চিঠি বন্ধ করিয়া প্রহরীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তোমাদের রাজ-কুমারীর হাতে দাও। এ-চিঠি পড়েও যদি তাঁর রোগ না সারে তাহলে ফিরে এসে আমাকে জল্লাদের হাতে দিয়ে এস, আর রাজ্যময় প্রচার করে দিও যে, আমার মত মূর্খ, বোকা, আর কাণ্ডজ্ঞানহীন দৈবজ্ঞ জগতে আর একটি নাই।"

কুমারের কথা শুনিয়া প্রহরী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল। তার পর চিঠিখানা হাতে করিয়া গিয়া রাজকুমারীকে দিল। রাজকুমারী চিঠি খুলিয়াই নিজের আংটি দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া চিঠি পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া যুবরাজকে দেখিতে চলিলেন। দুজনেই দুজনকে

দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। বিস্ময়ে আর আনন্দে তাঁহাদের কথাবার্তা লোপ পাইয়া গিয়াছিল। দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনকে দেখার পর রাজকুমারী সেই আংটিটি যুবরাজের হাতে দিয়া বলিলেন, "আপনিই এটা পরুন, আপনার হাতে এটা বেশ চমৎকার মানাবে।"

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া ছুটিয়া গিয়া রাজাকে খবর দিল। রাজা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে রাজকুমারীকে জড়াইয়া ধরিলেন। এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া রাজার আনন্দ আর ধরে না। তিনি তখনই বেদৌরার সুন্দর হাতখানি কামারুজ্জমানের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি যেই হও না কেন, তুমিই আমার কন্যাকে ফিরে দিয়েছ, তাই আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার হাতেই তাকে দান করছি। কিন্তু বৎস! তোমার এ-বেশ ছদ্মবেশ বলে মনে হচ্ছে।"

হাসিয়া যুবরাজ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক। আমি দৈবজ্ঞ নই। মহারাজের অনুগ্রহ লাভের আশাতেই এমন বেশে এসেছি। আমি খালেদান দ্বীপের রাজা শাহজমানের পুত্র। আমার নাম কামারুজ্জমান।" এই বলিয়া যুবরাজ সেই সব পুরানো গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন—সেই দুর্গে বন্দী হওয়া, সেই বেদৌরার দেখা পাওয়া, আর আরযত অদ্ভুত কাণ্ড। সব শুনিয়া মহা খুসী হইয়া মহারাজ সেইদিনই যুবরাজের সঙ্গে বেদৌরার বিবাহ দিলেন। ধাত্রীর ছেলে মার্জ্জমান রাজসরকারে মস্ত বড় চাকরী পাইয়া গেল।

সুখে-স্বচ্ছন্দে চীনদেশেই তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় একদিন যুবরাজ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার পিতা শাহজমান মৃত্যুশয্যায় শুইয়া বলিতেছেন, "হায়! যে ছেলেকে এত ভালবাসলাম, এত যত্ন করে শিক্ষা দিলাম, বৃদ্ধবয়সে আমায় ফেলে চলে গিয়ে সেই কি না আমার মৃত্যুর কারণ হল।" দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে যুবরাজ এমন চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, বেদৌরার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যুবরাজ বলিলেন, "প্রিয়ে, আমার পিতা বোধ-হয় আর এ-জগতে নেই।" যুবরাজ স্বপ্ন দেখিয়াছেন শুনিয়া রাজকুমারী তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু যুবরাজের মন তাহাতে স্থির হইল না।

যুবরাজ বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সকলের কাছে বিদায় চাহিয়া বেদৌরাকে সঙ্গে করিয়া চীনদেশ ছাড়িয়া চলিলেন মাসখানেক চলিবার পর তাঁহারা প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, সেখানে আর লোকের মুখ দেখা যায় না; রাজকুমার বলিলেন, "এখানে তাঁবু ফেল।" লোকজন তাঁবু খাটাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কুমার ততক্ষণ একটা গাছতলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সব ঠিক হইতে-না-হইতেই তিনি তাঁবুতে ঢুকিয়া গহনা পোষাক ছাড়িয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যুবরাজেরও শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল। তিনি শুইবার জন্য তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া দেখেন রাজকুমারীর এক পাশে হীরা জহরত-বসানো একটি কোমরবন্ধ পড়িয়া আছে। সেটা হাতে করিয়া মন দিয়া রত্নগুলি দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, কোমরবন্ধে ছোট একটি থলি ভাল করিয়া আট্‌কানো আছে। থলিটা খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর একটি চমৎকার মণিতে কি সব লেখা আছে। রাজকুমার ভাবিলেন মণিটা নিশ্চয় মহামূল্য, তাই তাহার এত যত্ন। আসলে সেটা বেদৌরার রক্ষাকবচ, চীনরাজমহিষী মেয়েকে দিয়াছিলেন। রাজকুমার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সেটাকে হাতে করিয়া আবার বাহিরে আসিলেন। কিন্তু যেই না বাহিরে আসা, অমনি কোথা হইতে একটা পাখী আসিয়া ছোঁ মারিয়া কবচটা লইয়া পলাইল। রাজকুমার মহা বিপদে পড়িলেন। কি আর করেন, তাড়া করিয়া পাখীটির পিছন পিছন ছুটিলেন। রাজকুমার যতই ছুটেন, পাখীটা ভয় পাইয়া আরো তত দূরে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া তাঁহারা অনেক দূর আসিয়া পড়িলেন। পাখীটাকে মারিয়া কবচটা কাড়িয়া লইবার জন্য কুমার তখনও ছুটিতেছেন। ক্রমে একটা শহরের কাছে আসিয়া পাখীটা কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। মণিটা হারাইয়া দুঃখিত মনে রাজকুমার ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু পাখী তাড়া করিবার সময় ত পথ দেখিয়া আসেন নাই, কাজেই কোন্ পথে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন ঠিক করিতে না পারিয়া পাগলের মত অপথে-বিপথে ঘুরিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে একটা বাগানের দরজা খোলা দেখিয়া সেই দিকে গিয়া দেখেন এক বুড়ো মালী ভিতরে কাজ করিতেছে। বুড়ো মালী একজন ভদ্র মুসলমানকে দেখিয়াই তাঁহাকে বাগানের ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিল। রাজকুমার ভিতরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করার মানে কি?"

মালী বলিল, "এখানকার সব লোকই পৌত্তলিক। তারা মুসলমানদের উপর বড় চটা, বিদেশী মুসলমান হলে ত কথাই নেই, নাকাল করে ছাড়ে। তাই দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললাম। আপনি এতক্ষণ যে কোনো বিপদে পড়েননি, সে আপনার সৌভাগ্য। ভগবানকে তার জন্যে ধন্যবাদ দিন।"

মালী তাঁহার জন্য এত ব্যস্ত দেখিয়া যুবরাজ তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। না খাইয়া সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুমারের মুখ শুখাইয়া গিয়াছিল, মালী দেখিয়াই বুঝিল। সে তখন হাতের কাজ ফেলিয়া যুবরাজের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করিতে ছুটিল। পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া মালী কুমারের পরিচয় লইতে বসিল। কুমার তাঁহার সুখদুঃখের সব-কথা বলিলেন, দেশে ফিরিবার পরামর্শও চাহিলেন। মালী বলিল, "স্থলপথ বড় ভীষণ, তার উপর পথে অসভ্যদের অত্যাচারের ভয়, যেতে সময়ও বছরখানেকের কম লাগে না। তবে জলপথে একবার এবনি উপদ্বীপে গিয়ে পড়তে পারলে সেখান থেকে খালেমান দ্বীপে যাওয়া খুবই সোজা। প্রতি বৎসর এখান থেকে একখানা জাহাজ এবনি উপদ্বীপে যায়;

দুঃখের বিষয় দিনকয়েক আগেই একখানা ছেড়ে গেছে, কাজেই আর-একখানা না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে আমার কাছেই থাক্‌তে হবে।”

আর উপায় যখন নাই, তখন কুমারকে সেই বাগানে মালীর দোসর হইয়া দিন কাটাইতে হইল।

দেখিলেন এক বুড়ো মালী বাগানে কাজ করিতেছে

এদিকে ঘুম হইতে উঠিয়া যুবরাজকে দেখিতে না পাইয়া বেদৌরা দাসীদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবরাজ কোথায়?”

দাসীরা বলিল, “আমরা যুবরাজকে তাঁবুতে ঢুক্‌তে দেখেছি, কিন্তু কখন যে আবার বেরিয়ে গেছেন তা দেখিনি।”

বেদৌরা আবার ভিতরে গিয়া বিছানার উপর হইতে কোমরবন্ধটা তুলিয়া দেখিলেন,

রক্ষাকবচটা নাই। তখন তিনি মনে করিলেন যুবরাজ হয়ত কবচটা দেখিতে বাহিরে লইয়া গিয়াছেন, আবার এখনি আসিয়া দিয়া যাইবেন। রাজকুমারী কুমারের আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াই রহিলেন, কুমারের আর দেখা নাই।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত মাঠ কালো হইয়া উঠিল, তখনও যুবরাজের কোনো খবর আসিল না। রাজকুমারীর মন ভয়ে দুঃখে ভাঙিয়া পড়িল, তিনি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বেদৌরা বুদ্ধিমতী, শুধু কাঁদিয়া লাভ নাই জানিতেন। যুবরাজ যে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন একথা বেদৌরার দাসীরা ছাড়া আর কেহই জানিত না, দলের অন্যান্য লোকেরা জানিতে পারিলে হয়ত তাঁহাকে তাহাদের হ তেই বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া, বেদৌরা দাসীদের ডাকিয়া যুবরাজের পলায়নের কথা সকলের কাছে লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দাসীরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত, কাজেই সহজেই রাজি হইল। বেদৌরা তখন নিজের পোষাক ছাড়িয়া কামারলজমানের পোষাক পরিয়া সকলের কাছে দেখা দিলেন। বেদৌরার চেহারার সঙ্গে যুবরাজের এতই সাদৃশ্য ছিল যে, পুরুষের পোষাকে তাঁহাকে সকলেই কামারলজমান মনে করিল।

দুই একদিন যুবরাজের জন্য অপেক্ষা করিয়া বেদৌরা লোকজনদের তাঁবু তুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। তার পর নিজের চতুর্দোলার একজন দাসীকে চড়াইয়া নিজে যুবরাজের ঘোড়ায় চড়িয়া আবার যাত্রা সুরু করিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া কত নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, অরণ্য সমুদ্র পার হইয়া অনেক দিনের পর তাঁহারা আর্ম্মানস রাজার রাজ্যে এবনি উপদ্বীপে আসিয়া উঠিলেন।

সেখানকার রাজা ছিলেন শাহজমানের বন্ধু। বন্ধুপুত্র কামারলজমান আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে বেদৌরাকে ঘটা করিয়া অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। রাজকুমারীও আর্ম্মানস রাজাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইলেন। রাজার অনুরোধে তাঁহাকে দলবল সুদ্ধ তিনদিনের জন্য তাঁহার প্রাসাদে অতিথি হইতে হইল। তিন দিন ধরিয়া নকল যুবরাজের কল্যাণে প্রাসাদে নাচগান ও ভোজের মহা উৎসব লাগিয়া গেল।

তিন দিন কাটিয়া গেলে দেশে ফিরিয়া যাইবার ভান করিয়া বেদৌরা রাজার কাছে বিদায় চাহিতে গেলেন। রাজা বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার পরম বন্ধুর পুত্র। তোমার এত রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি দেখে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমার আর বেশী দিন বাঁচ্‌বার আশা নেই, কিন্তু আমার একটি ছেলেও নেই যে, মরবার সময় তাকে রাজ্য দিয়ে যাই। আছে এক মেয়ে হয়তাল-নিফাস। রূপে গুণে সে যে তোমার অযোগ্য হবে তা মনে হয় না। তুমি যদি দেশে ফিরে যাবার আগে আমাকে রাজ্যভার থেকে মুক্তি দিয়ে আমার একমাত্র মেয়েটিকে বিবাহ কর, তাহলে আমি শেষবয়সে এই ভাবনার সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাই।"

বেদৌরা পড়িলেন উভয়সঙ্কটে। তিনি ত আর সত্যই যুবরাজ কি কোনো পুরুষ নহেন যে, রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন; আবার এতদিন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া এখন অস্বীকারই

বা করেন কি বলিয়া? রাজার কথা যদি না রাখেন তাহা হইলে তিনি ত রাগ করিয়া অনায়াসেই বেদৌরাকে একটা বিপদে ফেলিতে পারেন। তাড়াতাড়ি খালেমান দ্বীপে গিয়াও বিশেষ লাভ নেই, কারণ সেখানেই যে কামারলজমানের দেখা মিলিবে এমন কিছু কথা নাই। বেদৌরা মহা ভাবনায় পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিলেন যদি ভগবানের কৃপায় কখনও যুবরাজের দেখা পাওয়া যায় তবে তখন না হয় হয়তাল-নিফাসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া দুইজনে মিলিয়া কুমারের সংসার করা যাইবে, এখন আর্মানস রাজার কথাতেই রাজি হওয়া যাউক। বেদৌরার মত পাইয়া আর্মানস মহা খুসী হইয়া প্রজা ও সভাসদদের মত লইয়া মহা আড়ম্বর করিয়া পরদিনই বেদৌরার হাতে রাজ-কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। সেইদিনই বেদৌরার অভিষেক হইল। তাঁহার যুবরাজ হওয়া উপলক্ষে এবনি উপদ্বীপে দিনকয়েক খুব ধূমধাম চলিল।

হয়তাল-নিফাসকে একলা পাইয়া বেদৌরা তাঁহাকে আসল কথা সব বলিলেন। বেদৌরার অনুরোধে তিনি সে-সব কথা লুকাইয়া রাখিতেও রাজি হইলেন। দুই রাজকন্যার খুব ভাব হইয়া গেল। তাঁহারা দুই সখীর মত দুজনের জন্য যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। বাহিরের লোকে কিছুই জানিল না। আর্মানস রাজার প্রাসাদে চীনরাজকুমারী এবনি উপদ্বীপে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই মালীর আশ্রয়ে অনেক দুঃখে কষ্টে কুমার কামারলজমানের দিন কাটিতে-ছিল। একদিন সকালে রোজকার মত কুমার বাগানের কাজে যাইতেছিলেন, এমন সময় বুড়ো মালী আসিয়া বলিল, "আজ পৌত্তলিকদের একটা পর্ব্ব আছে। তারা আজ কাজকর্ম্ম কিছু করবে না, আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটাবে। মুসলমানদেরও তারা কাজ করতে দেবে না। তুমি আজ আর কাজ কর্ম্ম কিছু করো না, আমি যাচ্ছি উৎসব দেখতে, তুমি সাবধানে বাগানের দরজা বন্ধ করে থাক।" মালী সাজসজ্জা করিয়া চলিয়া গেল। যুবরাজ একলা বসিয়া রহিলেন।

কাজকর্ম্ম না থাকিলে দুঃখী মানুষের দুঃখ আরো উথলিয়া উঠে। মনের দুঃখে যুবরাজ বাগানের ভিতর অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন প্রকাণ্ড দুটা পাখী ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার কাছেই আসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন একটা পাখী আর-একটাকে নখ আর ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিয়া আনন্দে ডাক ছাড়িয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই আর দুটা পাখী আসিয়া মরা পাখীটার পাশে বসিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া শোক করিতে লাগিল। তার পর ঠোঁট ও নখ দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া মরা পাখীটাকে গোর দিয়া উড়িয়া গিয়া কোথা হইতে সেই শত্রু পাখীটাকে ধরিয়া আনিল। অপরাধী পাখীটা প্রাণের ভয়ে খুব চেঁচাইতে লাগিল, কিন্তু অন্য পাখী দুটা তাহাতে একটুও না দমিয়া রাগের চোটে শত্রুকে মারিয়া তবে ছাড়িল। এবারে কিন্তু মাটি চাপা না দিয়া পাখীটাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।

যুবরাজ এতক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিলেন। পাখীগুলা চলিয়া যাইতেই গাছতলায় আসিয়া দেখেন মরা পাখীটার পেটের মধ্যে টক্‌টকে লাল একটা কি জিনিষ ঝক্‌মক্ করিতেছে। যুবরাজ ছুটিয়া আসিয়া সেটা হাতে তুলিয়া দেখিলেন, সেই তাঁহার হারানো মণি, তাঁহার প্রিয়তমার রক্ষাকবচ। ইহারই জন্ত তাঁহার এত দুঃখ কষ্ট।

হারামণি এতকাল পরে ফিরিয়া পাইয়া যুবরাজ আনন্দে দিশাহারা হইয়া মণিটাকেই যে কত আদর করিলেন তাহার আর ঠিক নাই। মণি হারাইবার পর একদিনও যুবরাজ সুখে ঘুমাইতে পারেন নাই, আজ মণি পাইয়া সযত্নে সেটিকে লুকাইয়া রাখিয়া বিছানায় শুইয়াই গাঢ় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন।

সেই বাগানে একটা শুক্‌না গাছ ছিল। পরদিন গাছটা তুলিয়া ফেলা দরকার, কিন্তু বুড়ো মালীর সেদিনও সহরে অন্য কাজ ছিল ; কাজেই সে যুবরাজের উপর গাছ উপড়ানোর ভার দিয়া চলিয়া গেল। যুবরাজ একটা কুড়ালি লইয়া গাছ কাটিতে গেলেন। কিন্তু গাছের গোড়ায় দুই চার কোপ দিতে-না-দিতেই কুড়ালিটা কি-একটা শক্ত জিনিষে ঠেকিয়া হাত হইতে ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। জিনিষটা কি দেখিবার জন্য যুবরাজ সেখানকার মাটি সরাইয়া দেখেন, মাটির তলায় একখানা পিতলের লম্বা পাত বিছানো। যুবরাজ পিতলের পাতখানা তুলিয়া ফেলিতেই দেখিলেন, সেখান হইতে দশ ধাপ সিঁড়ি মাটির ভিতরদিকে চলিয়া গিয়াছে। নীচে কি আছে দেখিবার জন্য যুবরাজ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পড়িলেন। সেখানে পঞ্চাশটি পিতলের কলসী সার দিয়া সাজানো। কলসীগুলির মুখ পিতলের ঢাকনী দিয়া ঢাকা, কলসীর ভিতর কি আছে জানিতে যুবরাজের বড় কৌতূহল হইল। তিনি একে একে সবগুলির মুখ খুলিয়া দেখেন, সবগুলি মোহরে বোঝাই করা। এমন অকস্মাৎ এত অর্থের সন্ধান পাইয়া যুবরাজের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি খুসী হইয়া গহ্বরের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিয়া গহ্বরের মুখ আবার তেমনি করিয়া ঢাকা দিয়া বুড়ো মালী ফিরিবার আগেই গাছ কাটিয়া কাজ সারিয়া রাখিলেন।

মালী ফিরিয়া আসিয়াই রাজকুমারকে ডাকিয়া হাসিয়া বলিল, "কুমার, আজ তোমার জন্তে একটা সুখবর এনেছি, শুন্‌লে খুসী হবে। আর তিনদিন পরে এই বন্দর থেকে এবনি উপদ্বীপে একখানা জাহাজ যাবে। আমি জাহাজের অধ্যক্ষের সঙ্গে তোমার যাবার সব বন্দোবস্ত করে এলাম। আর কি ? এইবার পাড়ি দেবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও।

এমন সুখবর শুনিয়া যুবরাজ আর স্থির হইয়া থাকেন কি করিয়া, আনন্দে তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তিনি মালীকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তুমি যেমন আমায় সুখবর দিলে, আমিও তোমায় তেমনি একটা সুখবর দিচ্ছি। এই দিকে এসে শোন।"

যুবরাজ মালীকে সঙ্গে করিয়া সেই গহ্বরটার ভিতর লইয়া গিয়া মোহর ভরা পঞ্চাশটা কলসী দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে তোমায় কত ধন-রত্ন দিয়েছেন।"

মালি বলিল, "এ তোমার অন্যায় কথা। মনে করো না যে, তোমার কথাতেই আমি এই-সব ধন-রত্ন নেব। তুমি পেয়েছ তুমিই নেবে। আমি কেন নিতে যাব? আমার পিতার মৃত্যুর পর আজ কম করে আশী বৎসর একটানে এই বাগানে কাজ করছি, কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকবে তবে তার মধ্যে একদিনও এসব চোখে দেখিনি কেন? তোমারই ভাগ্যগুণে তুমি পেয়েছ। আর তোমার মত রাজপুত্রেরই ত এ সব শোভা পায়। আমি বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি, এখন টাকাকড়ি নিয়ে আমি করবই বা কি? তুমি এসব নিয়ে দেশে যাও, ভাল কাজে খরচ করো; নিশ্চয় ভগবান এ ধনরত্ন তোমাকে দিয়েছেন।"

রাজকুমারের মন উদার ছিল, তিনি কিছুতেই একলা সব ধনরত্ন লইতে রাজি হইলেন না। কাজেই রাজপুত্রের মন জোগাইবার জন্য বুড়া মালীকে অর্দ্ধেক লইতে হইল।

যুবরাজের যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। মোহরগুলার জন্য মহা ভাবনা পড়িল। মালী বলিল, "এত মোহর যদি লুকিয়ে না নিয়ে যাও, তাহলে ডাকাতের হাতে মারা পড়বে। আমার কথা যদি শোন ত একটা সুবিধা হতে পারে। এবনি উপদ্বীপে জলপাই বড় পাওয়া যায় না। এই দেশ থেকে লোকে জলপাই নিয়ে গিয়ে সেখানে ব্যবসা করে। আমার বাগানে জলপাই-গাছ ঢের আছে। তুমি পঞ্চাশটা কলসী আনিয়ে অর্দ্ধেকটা ক'রে মোহরে ভরে উপরের অর্দ্ধেকটা জলপাই ভরে নিয়ে যাও। জাহাজের লোকেরা মনে করবে তুমি জলপাই ওয়ালা, জলপাই বিক্রী করতে এবনি উপদ্বীপে যাচ্ছ। তাতে তোমার বিপদ-আপদের ভয়ও কমে যাবে, মোহরগুলোও নিরাপদে সঙ্গে যাবে।"

যুবরাজ মালীর কথামত পঞ্চাশটা কলসী আনাইয়া মোহর ও জলপাই সাজাইয়া লইলেন; একটা কলসীর মধ্যে বেদৌরার কবচখানিও রাখিয়া দিলেন, পাছে সেখানা আবার হারাইয়া যায়।

মালীর বয়স অনেক হইয়াছিল, তাহার উপর সেদিন পরিশ্রমও ভয়ানক বেশী করিয়া ফেলিয়াছিল। এই দুই কারণেই বোধ হয় বুড়ো মানুষ সে রাত্রে ভীষণ জ্বরে পড়িয়া গেল। যুবরাজ প্রাণপণে তাহার সেবা করিলেন, কিন্তু উপকারী বন্ধুর কোনো উপকারই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জ্বর ছাড়িল না। ক্রমে জাহাজ ছাড়িবার দিন আসিয়া পড়িল। সেদিন সকালবেলা জাহাজের অধ্যক্ষ একদল খালাসী সঙ্গে করিয়া বাগানে আসিয়া বলিল, "এই বাগান থেকে কার আমার জাহাজে এবনি দ্বীপে যাবার কথা আছে তাকে শীঘ্র আসতে বল। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজ খুলব।"

যুবরাজ বলিলেন, "আমারই যাবার কথা। মালীর বড় অসুখ, আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আসছি। তোমরা ততক্ষণ আমার জিনিষপত্র আর জলপাইয়ের এই পঞ্চাশটা কলসী জাহাজে তোল গিয়ে।"

অধ্যক্ষ খালাসীদের কুমারের জিনিষপত্র তুলিতে হুকুম দিয়া বলিয়া গেল, "মশায়, তাড়াতাড়ি করে আসবেন, আমরা কেবল আপনার অপেক্ষাতেই থাকব।"

যুবরাজ মালীর কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখেন তাহার শেষ সময় উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে যুবরাজের চোখের উপর দিয়াই তাহার শেষ নিশ্বাস বহিয়া গেল। মালীর সেখানে আত্মীয়-বন্ধু বলিতে কুমার একা। কাজেই শেষ কাজ না সারিয়া তিনি জাহাজে যাইতে পারিলেন না। এই কাজেই তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় কাজ সারিয়া নদীর ধারে গিয়া শুনিলেন ঘণ্টা তিন চার অপেক্ষা করার পর সুবাতাস পাইয়া নাবিকরা জাহাজ খুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যুবরাজের মন একথা শুনিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

আবার একবৎসর জাহাজের অপেক্ষায় এই বিদেশে একলা পড়িয়া থাকিতে হইবে মনে করিতে যুবরাজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর বেদৌরার কবচখানি হাতে পাইয়া আবার হারানোর দুঃখও কম ছিল না। কিন্তু অকারণ দুঃখ করিয়া লাভ নাই, তাই যুবরাজ বাগানের কর্তার অনুমতি লইয়া ছোট একটি চাকর রাখিয়া সেই বাগানের কাজ-কর্ম্মেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। বুড়ো মালীর ছেলেমেয়ে ছিল না, কাজেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি আর বাকি পঁচিশ কলসী মোহরও যুবরাজই পাইলেন। মোহরগুলো চুরি যাইবার ভয়ে আর ভবিষ্যতে সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধার জন্য যুবরাজ আবার পঞ্চাশটা কলসীতে উপরে জলপাই ঢাকা দিয়া সেগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলেন।

এদিকে জাহাজখানি সুবাতাস পাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই এবনি উপদ্বীপে গিয়া পৌঁছিল। ঐ দ্বীপের নূতন রাজা পুরুষবেশী বেদৌরা তখন তাঁহার সমুদ্রতীরের প্রাসাদে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। জাহাজ আসিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল হয়ত এ-জাহাজে কামারলজমান থাকিলেও থাকিতে পারেন। তিনি খোঁজ করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া জাহাজঘাটায় গিয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জাহাজ কোথা থেকে আস্‌ছে, জাহাজে কে কে আছে, জিনিষপত্রই বা কি এনেছ?"

অধ্যক্ষ সব কথার খাঁটি উত্তর দিয়া বেদৌরাকে জাহাজের সব মাল দেখাইল।

বেদৌরা জলপাই খাইতে খুব ভালবাসিতেন। জাহাজে পঞ্চাশ কলসী জলপাই দেখিয়া তিনি সবগুলি রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। খালাসীরা কামারলজমানের কলসী-গুলি রাজবাড়ীতে দিয়া আসিল। বেদৌরা বলিলেন, "পঞ্চাশ কলসীর দাম কত?"

নাবিক বলিল, "মহারাজ, যার জলপাই সে লোকটি বড় গরীব। তার উপর আমরা তাকে এই জাহাজে আন্‌ব বলে ফেলে আসাতে তার মনে বড় কষ্ট হয়েছে। জলপাইয়ের দাম বলে যদি এক হাজার মোহর দেন তাহলে বোধহয় তার দুঃখ কষ্ট দুই একটু কমে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "আচ্ছা সেই ভাল। আমি হাজার মোহর দাম দিচ্ছি, কিন্তু লোকটির যেন পেতে কোনো কষ্ট না হয়।" বেদৌরা খাজাঞ্চীকে ডাকিয়া নাবিকের হাতে হাজার মোহর দিতে বলিলেন।

রাত হইলে বেদৌরা দাসীদের হয়তাল-নিফাসের শুইবার ঘরে কলসীগুলি দিয়া যাইতে

বলিলেন। দাসীরা কলসী আনিয়া দিতেই বেদৌরা একটা কলসীর ভিতর হাত দিয়া জলপাই বাহির করিতে লাগিলেন। কতক জলপাই বাহির হইবার পর মোহর বাহির হইতে দেখিয়া বেদৌরা অবাক হইয়া রহিলেন। তার পর দাসীদের সব-কয়টা কলসী উপুড় করিয়া ফেলিতে বলিলেন। দাসীরা পঞ্চাশটা কলসী শূন্য করিয়া দেখিল সব-কয়টাতেই অর্দ্ধেক মোহর আর অর্দ্ধেক জলপাই। একটা কলসী হইতে সেই হারানো রক্ষাকবচটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সেটা দেখিয়া বেদৌরার মনে এমন একটা ধাক্কা লাগিল যে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হয়তাল-নিফাস ও দাসীরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মুখে চোখে জল দিয়া নানারকম সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টা-যত্নে বেদৌরার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াই তিনি দাসীদের বিদায় করিয়া দিলেন। দাসীরা চলিয়া গেলে হয়তাল-নিফাসকে বলিলেন, "সখী, তুমি ত আমার অদৃষ্টের কথা সবই জান। এই যে মণিটা দেখ্‌ছ এইটাই আমার সর্ব্বনাশের গোড়া। এরি জন্যে আমি আমার প্রিয়তম কামারলজমানকে হারিয়েছি। কিন্তু সকল দুঃখের মূল মণিটাই যখন আবার ফিরে পেলাম, তখন আশা হচ্ছে হয়ত ভগবান কৃপা করে আমার প্রিয়তমকেও এনে দেবেন।"

পরদিন বেদৌরা জাহাজের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, "দেখ, যে লোকটির জলপাই আমি কিনেছি, সে আমার কাছে অনেক টাকা ধার নিয়ে পালিয়েছে। তোমাকে সেই পৌত্তলিকদের দেশ থেকে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে এনে দিতে হবে। দেরী কর্‌লে চল্‌বে না। আর যদি না যাও তাহলে তোমার জাহাজ আর মালপত্র ত ক্রোক করা হবেই, উপরি অবাধ্যতার জন্যে প্রাণটাও অকালে খোয়াতে হবে। কাজেই ভালয় ভালয় তাড়াতাড়ি কাজটা উদ্ধার করে দাও।"

জাহাজের অধ্যক্ষ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জল্পনা কল্পনা ফেলিয়া সেইদিনই আবার পৌত্তলিকদের দেশে ফিরিয়া চলিল; রাজার কথা ত অমান্য করা যায় না! রাত্রিবেলা সেই নদীর ঘাটে পৌঁছিয়া নাবিকেরা বাগানে কুমারকে গ্রেপ্তার করিতে চলিল। কুমারের চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। তিনি রোজকার মত বিছানায় পড়িয়া বেদৌরার কথা ভাবিতেছিলেন। বাগানের দরজায় ঠেলাঠেলির শব্দ শুনিয়া উঠিয়া খুলিতে গিয়াই দেখেন, নাবিকের দল। কুমারকে দেখিয়া আর কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়াই অধ্যক্ষ সোজা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে আনিয়া তুলিল। তার পর জাহাজ খুলিয়া যথাসময়ে এবনি উপদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিল।

কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ এইরকম অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া যুবরাজের মাথা গোলমাল হইয়া গেল; তিনি কাহাকেও কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। জাহাজ যখন এবনি বন্দরে আসিয়া ঠেকিল, তখন যুবরাজ প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে এমন অকস্মাৎ ধরে আনা হল কেন?"

নাবিক বলিল, "আপনি এখানকার রাজার টাকা ধার করে পালিয়েছেন, তাই তাঁর হুকুমে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

যুবরাজ ত শুনিয়া অবাক্। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "জন্মে কখনও এ দেশ চোখে দেখ্‌লাম না, রাজা কে তা জানিও না, চিনিও না, অথচ তার কাছেই হলাম ঋণী। এ মন্দ ব্যাপার নয়! যাক্, ভেবে আর কি হবে। অদৃষ্টে দুঃখভোগ আছে, যতদূর হবার হয়ে যাক্! অদৃষ্টের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া যুবরাজ চুপ চাপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জাহাজের অধ্যক্ষ কামারলজমানকে গ্রেপ্তার করিয়া জাহাজে আনিয়া তুলিল

এদিকে রাজকুমারী বেদৌরা জাহাজ ফিরিয়া আসার খবর পাইবামাত্রই বন্দীকে তাহার কাছে আনিতে বলিলেন। সভায় কামারলজমানকে আনা হইল, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ নিতান্তই দরিদ্রের মত, চোহারাও ম্লান। কিন্তু বেদৌরা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই স্বামী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। কেবল ছদ্মবেশে আছেন বলিয়াই মনের আনন্দ আর আগ্রহ সব চাপিয়া অচেনার মত বসিয়া রহিলেন। জনকয়েক প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন বন্দীকে যেন খুব ভাল ঘরে আদর যত্ন করিয়া রাখা হয়। কামারলজমান রাজার বন্দী হইলেন, কিন্তু রাজাটি যে তাঁহারই প্রিয়তমা বেদৌরা একথা স্বপ্নেও ভাবিলেন না। যাহার বিরহে তাঁহার এত দুঃখ, চোখের উপর দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিলেন না।

রাজকর্ম্মচারী যুবরাজকে প্রাসাদের একটি সুন্দর ঘরে লইয়া চলিয়া গেল। বেদৌরা

তখন জাহাজের মালিককে ডাকিয়া একটি বহুমূল্য হীরা উপহার দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার বড় উপকার করেছ, তার জন্যে তোমায় অনেক ধন্যবাদ। জলপাইওয়ালার দাম বলে যে হাজার মোহর তোমার হাতে দিয়েছিলাম, সেটা তুমিই নিও। তাকে আমি অন্য উপায়ে খুশী করে দেব।" নাবিক একগুণ পরিশ্রমের দশগুণ পুরস্কার পাইয়া খুব খুসী হইয়া মহারাজকে প্রণিপাত করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। বেদৌরাও খুশী হইয়া সখীকে সুখবর দিতে অন্তঃপুরে ঢুকিলেন।

পরদিন বেদৌরার হুকুমে যুবরাজকে সুগন্ধি জলে স্নান করাইয়া সুন্দর পোষাক পরাইয়া রাজসভায় আনা হইল। সভাসুদ্ধ তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বেদৌরা সভার মধ্যেই তাঁহাকে খুব আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুবরাজ ভাবিয়া পাইলেন না বিদেশী রাজা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া এত আদর-অভ্যর্থনা কেন করিতেছেন। কিন্তু এততেও যুবরাজ রাজাটিকে চিনিলেন না।

রাজপ্রাসাদেরই একটি প্রকাণ্ড সুন্দর মহল বেদৌরার হুকুমে কুমারের জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সভাভঙ্গ হইতেই তাঁহাকে সেই মহলে লইয়া যাওয়া হইল। যুবরাজ দেখিলেন শত শত দাসদাসী তাঁহার হুকুম তামিল করিবার জন্য সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আস্তাবলে দেশের সেরা যত ঘোড়া তাঁহার সুনজরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ঘরে ঘরে আমীর-ওমরাহের উপযুক্ত কত সুন্দর সব জিনিষ-পত্র থরে থরে সাজানো রহিয়াছে। তাঁহার জন্য এত ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া যুবরাজের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, বিস্ময়ও কিছু কম হইল না।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন ধনাধ্যক্ষের পদ খালি হওয়াতে বেদৌরা কুমারকে সেই পদে বসাইয়া দিলেন। কুমারের মন ছিল উঁচু, কাজেকর্ম্মে দক্ষতাও ছিল অসাধারণ, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজা প্রজা সকলকে বশ করিয়া সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এত সুখ সৌভাগ্যেও তাঁহার মনের দুঃখ ঘুচিল না। বেদৌরার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার সব আনন্দ নিভিয়া যাইত। বেদৌরা দেখিতেন নূতন ধনাধ্যক্ষ সবকথার উত্তরেই আগে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তবে কথা বলেন। নিজের মনও তাঁহার কামারলজমানের অভাবে ছট্‌ফট্ করিত, তাহার উপর কামারলজমানের এই-রকম মনের অবস্থা দেখিয়া বেদৌরা আর বেশীদিন লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন হয়তাল-নিফাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কুমারকে বলিলেন, "দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দর্‌কার আছে। আজ সন্ধ্যায় তুমি একলা আমার ঘরে একবার এস।"

যথাসময়ে যুবরাজ বেদৌরার ঘরে গিয়া পৌঁছিলেন। বেদৌরা কুমারকে যত্ন করিয়া বসাইয়া সে রাত্রের মত অন্তঃপুরের প্রহরীদের বিদায় দিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রক্ষাকবচ-খানি আনিয়া কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "অনেক দিন হল, একজন দৈবজ্ঞ আমাকে এই

মণিটি উপহার দিয়াছে। তুমি ত সব শাস্ত্রেই পণ্ডিত। এই মণিটার কি গুণ বল্‌তে পার কি?"

মণিটি দেখিয়াই যুবরাজ চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, তবু কোনো রকমে বলিলেন, "রাজা মশায়! এ মণির গুণ আর কি বল্‌ব? এই কাল মণির গুণেই আমি আমার প্রিয়তমাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। যদি অনুমতি করেন ত আমাদের সে দুঃখের অপূর্ব্ব কথা আপনাকে শোনাতে পারি।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, সেকথা আর একসময় শোনা যাবে, আর আমিও তার কিছু কিছু জানি। এখন তুমি একটু বস, আমি আস্‌ছি।" এই বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী বেদৌরার সাজে আসিয়া কামারলজমানের কাছে দাঁড়াইলেন। রাজার সাজে যাঁহাকে এতদিন চিনিতে পারেন নাই, যুবরাজ আজ তাঁহাকে পুরানো সাজে দেখিয়াই চিনিলেন। আজ তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, এই দ্বীপের রাজার যে কত গুণ তা আর কি বল্‌ব? তাঁর দয়াতেই আমাদের আবার মিলন হল। তাঁর ঋণ জীবনে কখনও শোধ দিতে পারব না।"

রাজকুমারী বলিলেন, "যুবরাজ! সে রাজাকে আর কখনও দেখ্‌তে পাবে না, আমিই ছিলাম সেই রাজা। এখন থেকে শুধু আমায় দেখেই খুসী থাক।"

কুমারের বিস্ময়ের খোরাক আরোই বাড়িয়া চলিল। রাজকুমারী তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া সকল কথা বলিতে বসিলেন। শুধু বলিয়াই শেষ হইল না, যুবরাজের ভাগ্যে এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার কথাও শুনিতে হইল। এই-সব অপূর্ব্ব গল্পে সে-রাত্রি তাঁহাদের পরম সুখে কাটিয়া গেল।

গল্প করিতে-করিতেই রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল। দুজনে উঠিয়া পড়িলেন। বেদৌরা সেদিন আর রাজকুমারীর সাজ না বদ্‌লাইয়াই একজন প্রহরীকে বুড়ো রাজার কাছে খবর দিতে পাঠাইয়া দিলেন। খবর পাইয়া সম্রাটের ত চক্ষু স্থির! তিনি তখনই সেখানে আসিয়া অন্তঃপুরে যুবরাজের ঘরে একজন অচেনা মেয়ে আর ধনাধ্যক্ষকে দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ কোথায়?"

রাজকুমারী বেদৌরা গলায় কাপড় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! কাল আমিই যুবরাজ ওর্‌ফে কামারলজমান নামে পরিচিত ছিলাম, আজ থেকে সম্রাট্ শাহজমানের পুত্র এই যুবরাজ কামারলজমানের স্ত্রী ও চীনসম্রাট্ গৌরের কন্যা হয়েছি।" বৃদ্ধ রাজা খুব বেশী বুঝিয়া উঠিলেন না। অগত্যা বেদৌরা তাঁহাকে আবার আগাগোড়া সব গল্পটাই শুনাইলেন। এতক্ষণে রাজার মাথায় কিছু ঢুকিল। তখন চীনরাজকুমারী রাজাকে প্রণাম করিয়া আবার বলিলেন, "মহারাজ! যদিও শাস্ত্রমতে একজনের দুই স্ত্রী বিবাহ করা ঠিক

নয়, তবু আমার বড় সাধ যে, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীর হাতে আপনার কন্যাকে দান করেন। আমার সখীর এতে অমত নেই, আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি যে, আপনার কন্যাই কুমারের প্রধান মহিষী হয়ে সুখে দিন কাটাবেন। আমি চিরকাল তাঁর অধীন হয়ে থাক্‌ব। এখন কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

সুলক্ষণা চীনরাজকন্যার কথায় মহা খুসী হইয়া সম্রাট্ আর্ম্মানস কুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, তুমি আমার একমাত্র কন্যাকে গ্রহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হও।"

যুবরাজ বলিলেন, "মহারাজ! যদিও আমি অনেক দিন আমার পিতামাতার চরণ দর্শন করিনি, তবু আপনার আজ্ঞা অমান্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

এই-কথা শুনিয়া আর্ম্মানস সেইদিনই কামারলজমানকে অভিষেক করিয়া খুব ধুমধাম করিয়া রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

বেদর ও জহরার কথা

সেকালে পারস্যদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য বিদ্যা-বুদ্ধি সবই ছিল। তাঁহার মত ন্যায়বান সাধু রাজা আর দুটি মিলিত না। সওদাগরের মুখে দেশে দেশে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেকদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে তিনি প্রজাপালন করিয়াছিলেন। কখনও কিছুর অভাব তাঁহার হয় নাই। কেবল একটি অভাব ছিল; রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁহার মৃত্যুর পর কে যে রাজা হইবে এই ছিল রাজার এক মহা ভাবনা। পুত্রলাভের আশায় দানধ্যান ক্রিয়াকর্ম্ম কোনো অনুষ্ঠানেরই রাজা ত্রুটি রাখেন নাই।

একদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজা সভায় রাজকার্য্য আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহারাজ! এক দাসীবিক্রেতা আপনার দর্শন চায়।"

রাজা বলিলেন, "তাকে এখানে এসে অপেক্ষা কর্‌তে বল; সভাভঙ্গের পর আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।"

প্রহরী তৎক্ষণাৎ সেই লোকটিকে আর তার দাসীকে আনিয়া হাজির করিল। যতক্ষণ না সভাভঙ্গ হইল, ততক্ষণ তাহারা একপাশে চুপচাপ বসিয়া রহিল। সভার শেষে সম্রাট্ সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে ক্রীতদাসী এনেছ; তার গুণটুন কিছু আছে?"

এই দাসী আপনারই মত বড়ঘরে জন্মে থাকে, তবে কি তার পক্ষে তার দুঃখকষ্ট ভোলা সম্ভব ?”

এই-কথা শুনিয়া রাজার বড়ই চমক লাগিল ; তিনি ভাবিয়া দেখিয়া বলিলেন, “বুঝেছি, তুমি কোনো রাজবংশের মেয়ে। অনুগ্রহ করে যদি তোমার পরিচয় দাও, তবে বড় সুখী হব।”

নূতন রাণী বলিলেন, “মহারাজ ! আমার নাম গুলনেহার। সমুদ্রের তলে আমার দেশ। সমুদ্রের গভীর জলের তলে যেসব রাজারা রাজত্ব করেন, আমার পিতা তাঁহাদেরই মধ্যে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমার ভাই শালে কিছুদিন রাজত্ব করেন। কিন্তু এক প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্য হারিয়ে শালেকে একটা দুর্গে এসে আশ্রয় নিতে হয়। কাজেই আমার মার সঙ্গে আমাকেও সেইখানে এসে জুটতে হল। একদিন আমার ভাই আমাকে নির্জ্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, ‘গুলনেহার, আমার ইচ্ছা যে, তুমি স্থলদেশের কোনো রাজাকে বিবাহ কর।” সে-কথা শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বল্‌লাম, ‘ভাই, এত বড় ঘরের মেয়ে হয়ে কি করে স্থলদেশের রাজাকে বিবাহ কর্‌ব ? অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে তোমার এমন অনুচিত কথা বলা ভাল হয়নি। দেশ উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে যদি তোমার প্রাণ যায়, তাহলে আমিও প্রাণ দিতে রাজি আছি ; কিন্তু তোমার এই হীন পরামর্শ শুনে কাজ কর্‌তে রাজি নই।’ আমার ভাই বল্‌লেন, ‘স্থলদেশের রাজা সমুদ্রের রাজার চেয়ে নীচ নয়, তুমি আমার কথা অবহেলা করো না।’ ক্রমাগতই শালের মুখে ঐ কথা শুনে আমার এমন রাগ হল যে, আমি আর সেখানে থাক্‌তে না পেরে সমুদ্র ফুড়ে সোজা চন্দ্রদ্বীপে এসে উঠ্‌লাম। কিছুদিন সেইখানেই লুকিয়ে কেটে যাবার পর একদিন চাঁদের আলোয় পড়ে ঘুমোচ্ছি এমন সময় একজন খুব বড়লোক একদল দাস সঙ্গে করে এসে আমায় ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমায় বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে একটা সামান্য লোক মনে করে মত না দেওয়াতে তিনি রাগ করে আমায় এক সওদাগরের কাছে বিক্রী করে দিলেন। সেই সওদাগরই আবার আপনার কাছে আমাকে বেচে গিয়েছে। মহারাজ ! আপনি যদি আমাকে এত ভাল না বাস্‌তেন তা হলে আমি আপনার এই জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে আমার মা আর ভাইএর খোঁজে চলে যেতাম। কিন্তু এখন আর আমার সে ইচ্ছা নেই। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আপনি যেন আমাকে আর ক্রীতদাসী মনে না করেন।”

রাজা গুলনেহারের অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইয়া মহা ঘটা করিয়া তাঁহাকে সকলের কাছে রাণী বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন গুলনেহার আত্মীয়-স্বজনদের দেখিবার ইচ্ছায় রাজার অনুমতি চাহিলেন। রাজা মত দিতেই রাণী একজন দাসীকে সোনার পাত্রে খানিকটা আগুন আনিতে বলিলেন। দাসী আগুন রাখিয়া গেলে রাণী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সেই আগুনে

একখানা সুগন্ধি কাঠ ফেলিয়া দিলেন। আগুন হইতে ধোঁয়া উঠিতে লাগিল আর রাণী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। অমনই সাগরের জল ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরেই সেই জলের ভিতর হইতে পরম রূপবান একটি পুরুষ উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার চুলের রং সমুদ্রের শৈবালের মত। সঙ্গে সঙ্গে গুলনেহারের মত রূপবতী পাঁচটি মেয়ে আর একজন বৃদ্ধা

আগুন হইতে ধোঁয়া উঠিতে লাগিল আর রাণী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন

উঠিলেন। সমুদ্রের জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া সকলে আসিয়া গুলনেহারের জানালা দিয়া প্রাসাদে ঢুকিলেন। সকলেই রাণীকে দেখিয়া খুব আদর করিলেন, রাণীও তাঁহাদের আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন। বৃদ্ধা গুলনেহারকে বলিলেন, "বাছা! আজ কতকাল পরে তোমায় দেখে বড় খুসী হলাম। তুমি কাউকে না বলে আমাদের ফেলে চলে আসাতে আমাদের

যে কি-রকম দুঃখ হয়েছিল তা বল্‌তে পারি না। যাক্ এখন তুমি কেমন আছ তাই বল। এর আগেই বা এতদিন কোথায় ছিলে তাও বল।"

রাণী মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি আপনাদের কাছে বড় অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।" শালের উপর রাগ করিয়া কেমন করিয়া দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই-সব কথা মাকে বলিলেন।

শালে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বোন্, তুমি নিজের দোষেই এত অপমান সহ্য করে আছ। তুমি মনে কর্‌লে সহজেই নিজের দাসত্ব ঘোচাতে পার্‌তে। যা হবার তা ত হয়ে গিয়েছে, এখন তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে চল, আমি শত্রুকে হারিয়ে আবার রাজ্য উদ্ধার করে নিয়েছি।"

পারস্যরাজ গুলনেহারের আত্মীয়-স্বজন আসিবার আগেই পাশের ঘরে লুকাইয়াছিলেন। সেইখান হইতে এই-সব কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়, হায়! গুল-নেহার যদি তার দেশে ফিরে চলে যায়, তবে আর আমি কার মুখ দেখে বেঁচে থাক্‌ব।"

গুলনেহার শালের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, আর কি আমার দেশে ফিরে যাবার সাধ্য আছে? আমি যে এখন পারস্যরাজকে বিবাহ করেছি।"

ভগিনীর মুখে এ-কথা শুনিয়া শালে বলিলেন, "বোন্, পরাধীনতা বড় কষ্টের ব্যাপার, তাই মনে করেই তোমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যদি পারস্যরাজের রাণী হয়ে সুখে আছ, আর তিনি যদি তোমায় ভালবাসেন, তাহলে তোমার এখানে থাকাতে আমাদের আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা দুজনে সুখে থাক।"

পারস্যরাজ এতক্ষণ গুলনেহার চলিয়া যাইবার ভয়ে অস্থির হইতেছিলেন, এখন গুল-নেহারের কথায় তাঁহার ভয় কাটিল। রাণী তখন পাশের ঘর হইতে রাজাকে ডাকিয়া আনিয়া আত্মীয়-স্বজনদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরিচয় হইবার পর ভোজনের আয়োজন লাগিয়া গেল। মহা আনন্দের সঙ্গে গল্পগুজব ও ভোজ চলিতে লাগিল। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে রাজা নিজে উদ্যোগ করিয়া অতিথিদের সুন্দর সুন্দর সাজানো ঘরে সোনার খাটে চমৎকার বিছানায় শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কুটুম্বরা যতদিন রহিলেন, প্রতিদিনই ঘটা করিয়া ভোজ হইতে লাগিল। দিনকয়েক কাটিবার পর রাণী গুলনেহারের কোলে একটি ফুলের মত সুন্দর ছেলে হইল। রাণীর মা কচি রাজকুমারকে সুন্দর পোষাক পরাইয়া পারস্যরাজের কোলে আনিয়া দিলেন। রাজার বহুদিনের সাধ আজ মিটিল। এমন সুন্দর ছেলে দেখিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন বেদর অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। রাজকুমারের জন্ম উপলক্ষ্যে রাজা আনন্দে রাজভাণ্ডার লুটাইয়া দান করিলেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন, দাস-দাসীদের দাসত্ব ঘুচাইয়া দিলেন। রাজ্যে মহা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল।

কিছুদিন পরে একদিন রাজারাণী কুটুম্বদের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় ধাত্রী রাজকুমারকে সেইখানে লইয়া আসিল। শালে কুমারকে কোলে করিয়া আদর করিতে লাগিলেন, তার পর বার কয়েক সেইখানে পায়চারি করিয়া জানালা দিয়া এক লাফে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। শালে কুমারকে লইয়া সমুদ্রের তলে চলিয়া গেলেন দেখিয়া রাজার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

গুলনেহার রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই শালে রাজকুমারকে বুকে করিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া আবার সেই পথে ঘরে ঢুকিলেন। ছেলেকে দেখিয়াই রাজার চোখের জল ঘুচিয়া গেল। শালে পায়রার ডিমের মত বড় তিন শ'হীরা রাজার কাছে রাখিয়া বলিলেন, "মহারাজ! গুলনেহারের ডাকে যখন আমরা সমুদ্র ছেড়ে উঠে আসি, তখন তিনি কোথায় কেমন আছেন কিছুই জানতাম না বলে আপনার জন্যে কোনো উপহার আনতে পারিনি। তাই এই যে হীরাগুলি এখন এনেছি, এগুলি সামান্য হলেও আপনি যদি আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলে গ্রহণ করেন, তাহলে বড় খুসী হব।"

রাজা বলিলেন, "সমুদ্ররাজ! আপনি আমার কাছে কোনো কিছুর জন্যই ঋণী নন। আপনাকে না জানিয়েই আমি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করেছি, তাতে যে আপনি মত দিয়েছেন, তার জন্য আমিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তার উপর এই যে অমূল্য উপহার দিলেন, এ কেবল আপনার অনুগ্রহ।"

আরও কিছুদিন পারস্যদেশে কাটাইয়া শালে একদিন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রাজকুমার বেদর দিন দিন রূপে গুণে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শিক্ষার জন্য দেশের যত বিখ্যাত বিদ্বান শিক্ষক আনিয়া সভা উজ্জ্বল করা হইল। রাজকুমারের বুদ্ধি আর প্রতিভা অসাধারণ ছিল, কাজেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পনের বৎসর বয়সেই তাঁহার রাজনীতি সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান হইয়াছিল যে, রাজা ঠিক করিলেন ইহার পর কুমারের হাতেই রাজ্যশাসনের ভার দেওয়া হইবে। প্রজারা রাজপুত্রের বিদ্যাবুদ্ধিতে মুগ্ধ ছিল, কাজেই রাজার প্রস্তাবে তাহারাও আনন্দিত হইল। তার পর একদিন শুভক্ষণে কিশোরকুমারকে রাজসভায় আনিয়া সভাস্থ সকলের সম্মুখে রাজা নিজের মাথার মুকুট খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। মন্ত্রীরা নূতন রাজার আজ্ঞাধীন ও বিশ্বাসী থাকিবেন বলিয়া শপথ করিবার পর প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি রাজকার্য্য সম্বন্ধে নূতন রাজার মত চাহিলেন। সে কাগজগুলি কিছুমাত্র সোজা ছিল না, কিন্তু বেদর অল্পসময়ের মধ্যেই সেগুলি এমন জলের মত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে নূতন রাজার বুদ্ধি দেখিয়া সভাসুদ্ধ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

যথাসময়ে সভাভঙ্গ করিয়া বালক রাজা বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে মাকে দেখিতে চলিলেন।

কুমারকে রাজার সাজে দেখিয়া তাঁহার মাতা দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া, "বৎস, চিরজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একবৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর বেদরের ইচ্ছা হইল সমস্ত রাজ্যময় ঘুরিয়া প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির চেষ্টা এবং রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। এই ইচ্ছায় বৃদ্ধ রাজার হাতে আবার রাজদণ্ড দিয়া তিনি মৃগয়ার ছলে ছদ্মবেশে নানাদেশে বেড়াইতে লাগিলেন। এই কাজেই একবৎসর কাটিয়া গেল। একবৎসর পরে কুমার যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন তখন রাজার ভয়ানক অসুখ। কিছুদিন রোগ ভোগ করার পর তাঁহার মৃত্যু হইল। বেদর দেশের প্রথামত শোকসজ্জা করিয়া একমাস নির্জ্জন ঘরে একলা কাটাইলেন, একমাসের মধ্যে একদিনও কোনো মানুষকে মুখ দেখাইলেন না।

একমাস কাটিয়া যাইবার পর মন্ত্রী ও সভাসদেরা আসিয়া নূতন রাজাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া শোকসজ্জা ছাড়িতে বলিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনি রাজবেশ পরিয়া আবার সভায় আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুবিচার ও সদ্ব্যবহারে প্রজারা একদিনের জন্য ও বৃদ্ধ রাজার অভাব বুঝিতে পারিল না।

আবার এক বৎসর পরে শালে সমুদ্র ছাড়িয়া পারস্যে আসিলেন। একদিন তিনি নানা বিষয় গল্প করিতে করিতে গুলনেহারের কাছে বেদরের অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বেদর মামার মুখে নিজের এত প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। শালে মনে করিলেন বেদর ঘুমাইয়াছেন। তিনি যখন বেদরের রূপগুণের আরও অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বোন্, তুমি যে এমন সুন্দর ছেলের আজও বিবাহের চেষ্টা করনি, এটা আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে।"

রাণী গুলনেহার বলিলেন, "ভাই, ও কথাটা আমার এতদিন মনেই হয়নি। যাক্, তুমি যখন আজ কাথাটা তুলেছ, তখন এমন একটি সুন্দরী আর গুণবতী রাজকন্যার নাম কর দেখি যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারি।"

শালে রাজা আস্তে আস্তে বলিলেন, "দেখ ত বেদর ঘুমিয়েছে কি না? কারণ আমি যে রাজকন্যার কথা বল্‌ব তার কথা শুন্‌লে ছেলে পাগল হয়ে উঠ্‌তে পারে। তাই কেবল তোমাকে বলে রাখ্‌ছি সে মেয়ের নাম জহরা, সে সমন্দলের রাজার মেয়ে।"

গুলনেহার বলিলেন, "ভাই, আজও কি জহরার বিবাহ হয়নি? আমি যখন সমুদ্র ছেড়ে আসি তখনই সে বছর দেড়ের। সেইটুকু বেলাতেই তার যা রূপের ছটা দেখেছি তাতে মনে হয় এখন বড় হয়ে সে নিশ্চয় ভুবনমোহিনী সুন্দরী হয়েছে। কাজেই এসম্বন্ধ যে সুখের হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।"

শালে বলিলেন, "কিন্তু এসম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। সমন্দলের রাজা বড় অহঙ্কারী; তিনি নিজেকে এতই বড় মনে করেন যে, তাঁর কাছে আর সকলেই অতিহীন। কাজেই

তিনি যে সহজে মত দেবেন তা আমার মনে হয় না। তবে আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব। ভগবানের ইচ্ছায় যদি কাজটা করে তুল্‌তে পারি ত বড় আনন্দের বিষয় হয়।"

শালে ও গুলনেহারের কথাবার্তা শেষ হইলে বেদর এমনভাবে চোখ মেলিয়া পাশ ফিরিয়া উঠিলেন যেন তিনি এতক্ষণ কতই ঘুমাইয়াছেন। আসলে তিনি চোখ বুজিয়া জহরার রূপগুণের কথা শুনিতেছিলেন। সুন্দরী জহরার কথাটা তাঁহার মনে গাঁথিয়া রহিল।

কিছুদিন পরে শালে যখন সমুদ্র-রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন তখন বেদরের সখ হইল তিনিও সেই সঙ্গে গিয়া জহরাকে দেখিয়া আসেন। কিন্তু লুকাইয়া শোনা কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে লজ্জা করাতে কোনোরকমে সেদিনকার মত শালের যাওয়াটা বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে মৃগয়ায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। শালে ভাগিনেয়ের সঙ্গী হইয়া মৃগয়া করিতে চলিলেন। মৃগয়া আরম্ভ হইবার কিছু পরেই সকলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। বেদর একলা একটা পুকুরের ধারে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া ঘাসের উপর বসিয়া জহরার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। এদিকে শালে বেদরকে না দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিয়া বেদরকে দেখিতে পাইলেন। বেদর কি যেন বলিতেছেন মনে করিয়া তিনি আড়ালে থাকিয়া শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিলেন বেদর বলিতেছেন, "জহর! যদিও আমি তোমার কথা অল্পই জানি, তবু তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করব না।"

বেদরের মুখে এই-সব কথা শুনিয়া শালে আড়াল হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি বোধ হয় আমাদের সেদিনকার কথা সব শুনেছ?"

বেদর বলিলেন, "মামা আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, আমি সেইসব কথা শুনেই মৃগয়ার ছল করে আপনার যাওয়া বন্ধ করেছি। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

শালে প্রথমে অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই বেদরকে বুঝাইতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন। বেদর স্থলের মানুষ; জলে ত তাঁহার একটা রক্ষাকবচ চাই, কাজেই শালে নিজের হাতের একটা আংটি খুলিয়া বেদরের আঙুলে পরাইয়া বলিলেন, "এই আংটি হাতে থাক্‌লে, সমুদ্রের জলের ভিতর তোমার কোনো ভাবনা নেই। এখন চল যাওয়া যাক্।" এই বলিয়া শালে বেদরকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রে গিয়া ডুব দিলেন।

কিছুক্ষণ পর বেদর মামার সঙ্গে তাঁহার প্রবালের প্রাসাদে গিয়া পৌঁছিলেন। বেদরের দিদিমা অনেক দিন পরে নাতিকে দেখিয়া খুসী হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আনন্দে তাঁহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বেদর দিদিমাকে প্রণাম করিলেন। তার পর শালে বেদরের আসিবার কারণ বলিলেন। বৃদ্ধা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বৎস, জহরার কথা বলা তোমার ভাল হয়নি। তুমি কি সমন্দলের রাজাকে চেন না? কোন্ সাহসে তুমি তাঁর কাছে বেদরের বিবাহের কথা তুল্‌তে যাবে?"

শালে বলিলেন, "মা, আমি গুলনেহারের কাছে কথাটা বলেছিলাম, মনে করেছিলাম বেদর ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু বেদর চোখ বুজে জেগে থেকে সব শুনে জহরাকে বিবাহ করবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন কি আর করব ? বলেছি যখন ত ন বিবাহটা যাতে ঘটে তার জন্তে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।"

পরদিন শালে একটা বাক্সে অমূল্য হীরা মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি সাজাইয়া একদল সৈন্তসামন্ত সঙ্গে করিয়া সমন্দলের রাজার সভায় চলিলেন। রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া শালেকে অভ্যর্থনা করিলেন, শালেও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রত্নগুলি উপহার দিলেন। তার পর দুইজনে গল্প করিতে করিতে নানা-কথার মধ্যে সমন্দলের রাজা শালের আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শালে সাহস করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি হয়ত শুনেছেন যে, আমার বোন গুলনেহারের একটি পরম রূপবান পুত্র আছে; তার গুণেরও সীমা নেই। তা ছাড়া এখন সে পারস্তের সম্রাট্। আপনার কন্তা জহরাকে যদি তার হাতে সম্প্রদান করেন তাহলে আমরা বড় কৃতজ্ঞ হই। আর বলতে কি, আমার ভাগ্নে বেদর জহরার অযোগ্য স্বামী হবে না।"

এই-কথায় সমন্দলরাজ রাগিয়া আগুন হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নরাধম! তোর এমন কথা তুলতে প্রাণে একটু ভয় হল না? তোর বোনের ছেলে কি আমার মেয়ের যোগ্যপাত্র? তুই যে আমার চেয়ে কত নীচ তার কি তোর কোনো জ্ঞান নেই?" শালেকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়া সমন্দলরাজ প্রহরীদের হাঁক দিয়া বলিলেন, "ওরে কে কোথায় আছিস? এই লোকটার বড় বাড় হয়েছে, এর মাথাটা কেটে নিয়ে যা।"

প্রহরীরা রাজার হুকুম পালন করিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু শালে ইতিমধ্যেই ছুটিয়া সিংহদরজায় গিয়া হাজির হইলেন। সেখানে দেখিলেন এক হাজার সশস্ত্র সৈন্ত তাঁহার সাহায্য করিবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে। শালের মা জানিতেন এই বিবাহ-প্রস্তাব তুলিলে মহা গণ্ডগোল বাধিবে, তাই তিনি সৈন্তসামন্ত সাজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সমন্দলের সৈন্তরা শালের পিছনে তলোয়ার তুলিয়া তাড়া করিয়া আসিতেছে দেখিয়া শালের রক্ষী সৈন্তরা চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা আজ্ঞা পেলেই শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করে ফেলব।" শালে নিজের সৈন্তদলের ভিতর ঢুকিয়া তাহাদের সিংহদরজা আটক করিতে বলিয়া কয়েকজন মাত্র সৈন্ত সঙ্গে করিয়া আবার ভিতরে গিয়া সমন্দলরাজকে বাঁধিয়া আনিলেন। তার পর অন্তঃপুরে ঢুকিয়া জহরাকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি ঝগড়ার সূত্রপাত দেখিয়াই জানালা দিয়া বাহির হইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া মরুদ্বীপে গিয়া উঠিয়াছিলেন।

সমন্দলরাজের প্রাসাদে এই-সব গোলযোগ দেখিয়া শালেরাজার কয়েকজন অনুচর বুড়ী রাণীমার কাছে সব খবর দিয়া গেল। বেদর তখন দিদিমার কাছে বসিয়া ছিলেন। তাঁহারই জন্ত এত গোলমাল ঝগড়া বিবাদ হইল দেখিয়া তিনি নিজেকে সব বিপদের মূল

ভাবিয়া মনের দুঃখে মামার বাড়ী ছাড়িয়া সাগর ফুঁড়িয়া উপরে উঠিয়া পড়িলেন। বেদর কিন্তু পারস্যদেশে যাইবার পথ জানিতেন না। কাজেই যেদিকে পাইলেন সেইদিকে চলিয়া একটা উপদ্বীপে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে জহরাও সেই দ্বীপে উঠিয়াছিলেন।

শালে কয়েকজন সৈন্য সঙ্গে করিয়া সমন্দলরাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিতেছেন

বেদর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় একটি পরমাসুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! আপনি একলা এই নির্জ্জন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? আপনার পরিচয় জান্‌লে সুখী হব।"

জহরা ম্লানমুখে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সমন্দলরাজের কন্যা জহরা। আজ শালেরাজা হঠাৎ জোর করে রাজবাড়ীতে ঢুকে আমার পিতাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে, যে-সব প্রহরীরা তাঁর সাহায্য কর্‌তে গিয়েছিল, শালের সৈন্যরা তাদের মেরে ফেলেছে। এই-সব দেখে প্রাণের ভয়ে আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।"

বেদর মহা খুসী হইয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! আমিই শালেরাজার ভাগিনেয়, আমারই নাম বেদর। তোমার পিতা যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে রাজি হন তাহলেই তিনি তাঁর রাজ্য ফিরে পাবেন।"

বেদরের জন্যই তাঁহাদের সকলের এত দুর্গতি বুঝিয়া জহরা অত্যন্ত চটিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই তিনি বেদরকে বিবাহ করিবেন না। কিন্তু বেদরের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ফাঁকি দেওয়া দরকার, তাই মনে মনে একটা বুদ্ধি ঠিক করিয়া জহরা বলিলেন, "আপনিই কি সেই বিখ্যাত সুন্দরী রাণী গুলনেহারের পুত্র? শুনে বড় খুসী হলাম! আপনাকে একবার চোখে দেখ্‌লে আমার বাবা কখনই অমত করবেন না।" এই-কথা বলিয়া জহরা হাসিয়া বেদরের দিকে ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। জহরা সত্যসত্যই খুসী হইয়াছেন মনে করিয়া বেদর যেই মাথা নীচু করিয়া জহরার হাতখানি চুম্বন করিতে গেলেন, অমনি রাজকুমারী তাহার মুখে থুথু ফেলিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! তুই মানুষের রূপ ছেড়ে লালঠোঁটওয়ালা শাদা পাখী হয়ে যা।" সম্রাট্ বেদর সেই মুহূর্ত্তেই একটা শাদা পাখী হইয়া গেলেন। তখন রাজকন্যার এক সখী পাখীটিকে একটা দ্বীপে রাখিয়া আসিল। দ্বীপটি নদনদী গাছপালা ফুলফলে ছবির মত সাজানো।

এদিকে শালে জহরার কোনো খোঁজ না পাইয়া রাগ করিয়া সমন্দলের রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া দিলেন। নূতন জয় করা রাজ্য শাসন করিবার জন্য একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সব ব্যবস্থার পর বাড়ী আসিয়া মাকে প্রথমেই বেদরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "বাছা, তোমার বিপদের কথা শুনে আমি যখন সৈন্যসামন্ত পাঠা'তে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময় বেদর যে কোথায় পালিয়ে গেছে, আজ পর্য্যন্ত তার আর কোনো খোঁজ পাইনি!" এ কথা শুনিয়া রাজার মন বেদরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তিনি তখনই দেশে দেশে খোঁজ করিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তার পর মায়ের হাতে রাজ্যের ভার দিয়া নূতন রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

এদিকে গুলনেহারের মনের অবস্থাও ভাল নয়। কতদিন হইল ছেলে মৃগয়ায় গিয়াছে, আজও তাহার কোনো খোঁজ-খবর নাই দেখিয়া মহা ভাবনায় পড়িয়া তিনি দেশে দেশে লোক পাঠাইয়া নিজে গিয়া ভাইয়ের বাড়ীতে উঠিলেন। মেয়ের মুখ দেখিয়াই রাণীমা বুঝিলেন গুলনেহার বেদরের খোঁজে আসিয়াছেন। তিনি তখন মেয়েকে আদর-যত্ন করিয়া বসাইয়া একে একে সব কথা বলিলেন। তার পর অনেক আশ্বাস দিয়া আবার পারস্য দেশে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

নির্জ্জন দ্বীপে পাখী বেদরের দিন অনেক দুঃখে কষ্টে কাটিতেছিল। এমন সময় একদিন এক ব্যাধ আসিয়া পাখীটিকে ধরিয়া সেখানকার রাজার কাছে বেচিয়া আসিল। একদিন রাজা নিজের হাতে পাখীটিকে খাওয়াইবার জন্য একজন চাকরকে খাবার আনিতে বলিলেন। লোকটি খাবার আনিয়া রাখিয়া গেল। পাখীটি তখনই রাজার হাত হইতে উঠিয়া গিয়া ঠোঁট দিয়া মানুষের মত ভালমন্দ দেখিয়া-শুনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। পাখীর এত বুদ্ধি দেখিয়া রাজার ভারি মজা লাগিল। তিনি রাণীকে অদ্ভুত পাখীটি দেখাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাণী আসিয়া পাখীকে দেখিয়াই ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। রাজা রাণীর

রাণী পাখীকে দেখিয়াই ঘোম্‌টা দিয়া মুখ ঢাকিলেন

এরকম অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "রাণী, এখানে লোকের মধ্যে ত তোমার দাসীরা আর প্রহরী কজন, এর মধ্যে আবার কাকে দেখে তোমার এত লজ্জা হল?"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যাঁকে পাখী মনে করেছেন, তিনি আসলে মানুষ। ইনি গুলনেহায়ের পুত্র বেদর। ইনিই এখন পারস্যের সম্রাট্। সমন্দল-রাজের কন্যা জহরা এঁর এমন দুর্গতি করেছে।"

রাজা বলিলেন, "কেন?"

রাণী জহরার রাগের কারণ বলিলেন। রাজা বেদরের এমন অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাণীকে বলিলেন, "তুমি এঁকে আবার মানুষ করে দাও।"

রাণী রাজার কথায় বেদরকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া এক পেয়ালা জলের উপর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জলটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। রাণী তখন সেই জলের খানিকটা পাখীর গায়ে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে যে রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন এই মন্ত্রপড়া জলের গুণে আর ঈশ্বরের কৃপায় তুমি আবার সেই রূপ ফিরে পাও।"

রাণীর মুখের কথা শেষ হইতে না-হইতে রাজা দেখিলেন পাখী আর নাই, তাহার জায়গায় এক পরম রূপবান রাজকুমার দাঁড়াইয়া। বেদর নিজের রূপ ফিরিয়া পাইয়া উপকারী রাজার পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আদর করিয়া পাশে বসাইয়া একসঙ্গে ভোজ খাইতে বলিলেন। ভোজের পর সম্রাট্ বেদর দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাজা তখনই তাঁহার জন্য একখানা জাহাজ সাজাইয়া দিলেন। বেদর সকলের কাছে বিদায় লইয়া জাহাজে উঠিলেন। দশদিন জাহাজ বেশ সুবাতাসে ভাসিয়া চলিল। পরদিন হঠাৎ এক ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া জাহাজ একটা পাহাড়ে ঠেকিয়া ডুবিয়া গেল। বেদর একখানা ভাঙা কাঠ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে তীরের কাছে গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানে দলে দলে ঘোড়া, গরু, মহিষ, উট প্রভৃতি জন্তু আসিয়া এমনভাবে দাঁড়াইল যেন তাহারা কিছুতেই বেদরকে উঠিতে দিবে না। তিনি অনেক কষ্টে তাহাদের তাড়াইয়া তীরে উঠিয়া শহরের প্রকাণ্ড রাজপথ ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে পথের কোনোখানে একটিও মানুষ না দেখিতে পাইয়া তাঁহার বড় খট্‌কা লাগিল। আরো কিছু দূরে গিয়া কয়েকটা দোকান দেখিলেন। দোকানের কাছে যাইতেই এক বুড়ো তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "কে গো বাছা তুমি? এখানে কিজন্য কোথা থেকে এসে উঠলে?" বেদর নিজের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বলিলেন। বুড়ো তাঁহাকে তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকিয়া পড়িতে বলিল।

বেদর দোকানে ঢুকিবার পর দোকানদার বলিল, "তোমার ভাগ্য ভাল যে, আমার দোকান পর্য্যন্ত নিরাপদে এসেছ।"

বেদর অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিলেন, "কেন মশায় ?"

বুড়ো বলিল, "এটা মায়াময় নগর। এখানকার রাণী খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু এমন ভীষণ মায়াবিনী আর দুটি নেই। পথে আস্‌তে আস্‌তে তুমি যে-সব ঘোড়া গরু দেখলে তারা,
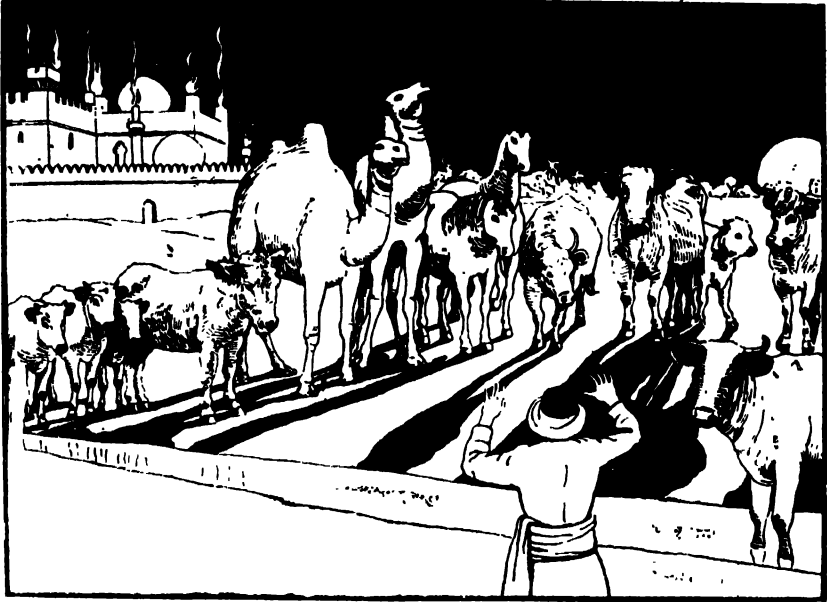
দলে দলে জন্তু আসিয়া দাঁড়াইল

আগে তোমারই মত সুন্দর পুরুষ ছিল। রাণী মায়ার জোরে তাদের অমন করে রেখেছে। তোমাদের মত সুন্দর লোক কেউ এখানে এলেই রাণীর দাসরা তাদের লোভ দেখিয়ে রাণীর কাছে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম তারা রাণীর কাছে খুব আদর অভ্যর্থনা পায় ; সেই আদরে ভুলে তারা দিন চল্লিশ রাণীর বাড়ীতে কাটায়। চল্লিশ দিন কেটে গেলেই ডাইনী রাণী আদর সোহাগ সব বিসর্জ্জন দিয়ে কাউকে জন্তু, কাউকে পাখী করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। তুমি যখন তীরে উঠতে চেষ্টা করছিলে তখন এই-সব জন্তুরা তোমায় যেমন করে বাধা দিচ্ছিল, নূতন মানুষ দেখলেই ওরা তাদের এ বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে অমনি করে। যাহোক, তুমি যখন আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছ তখন আর তোমায় কোনো ভয় নেই। রাণী আমাকে যথেষ্ট মান্য করেন। তুমি এখানে থাক্‌লে তিনি তোমার কিছু অনিষ্ট করে উঠতে পারবেন না।"

বুড়ো দোকানদারের কথায় বেদরের ভয়টা একটু কমিল, তিনি তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া তখনকার মত সেইখানেই বাসা বাঁধিলেন।

একদিন বেদর বুড়োর সঙ্গে দোকানে বসিয়া আছেন এমন সময় মায়াবিনী রাণী লাবি সদলে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সৈন্যসামন্ত প্রহরী সকলে একে একে দোকানদারকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। তার পর রাণী সকলের শেষে একটা কুচকুচে কালো ঘোড়ায় চড়িয়া দাসীদের সঙ্গে যাইতে যাইতে বেদরের অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া দোকানদারকে বলিল, "আবদুল্লা! এ সুন্দর ক্রীতদাসটি কি তোমার।"

দোকানী রাণীকে নমস্কার করিয়া বলিল, "রাণীঠাকৃরুন্, এ ছেলেটি আমার ভাই-পো। ছেলেপিলে নাই বলে একেই ছেলের মত ভালবাসি। অল্পদিন হল আমার ভাইটি মারা গেছে; তাই ছেলেটিকে কাছে নিয়ে এসেছি।"

রাণী বলিল, "অনুগ্রহ করে তোমার ভাই-পোর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে হবে। তুমি আমার সব কথাই জান বলে আমি আগুন ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি যে, আমি তোমার ভাই-পোর কোনো অনিষ্ট করব না। তুমি আমায় যখন এত স্নেহ কর, তখন আশা করি আমার এই অনুরোধটুকু রাখবে।"

রাণীর এরকম কথা শুনিয়া বুড়ো দোকানদার ভয়ে আর কোনো আপত্তি করিতে পারিল না। রাণী "কাল এসে নিয়ে যাব," বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

লাবি রাণীর হাতে পড়িতে হইবে শুনিয়া বেদরের মহা ভাবনা হইল। তিনি দোকানদারকে বলিলেন, "আপনার মুখে রাণীর কথা যা শুনেছি, তাতে তাঁর মত মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথা শুনে আমার ভয় কচ্ছে।"

বুড়ো বলিল, "বাছা, তোমার কোনো ভয় নাই। যাদুবিদ্যায় রাণী আমার সমান নয় বলেই সে আমায় ভয় করে। তুমি যদি আমার কথামত সব কাজ কর তাহলে রাণী তোমার কোনো অপকার কর্‌তে পার্‌বে না। আমার ভয়ে সে তোমার উপর কিছু চাল চাল্‌তে সাহসই করবে না।"

পরদিন লাবি রাণী আসিয়া বেদরকে চাহিল। বুড়ো রাণীর হাতে বেদরকে দিবার সময় তাহার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া দিল। রাণী মহা আদর যত্ন করিয়া বেদরকে ঘোড়ায় চড়াইয়া বাড়ী লইয়া গিয়া হাজির করিল। নিজে আগে নামিয়া বেদরকে সম্মান করিয়া হাত ধরিয়া ঘোড়া হইতে নামাইয়া দিল। তার পর বেদরের আদর অভ্যর্থনার কি ঘটা! রাণীর ধনদৌলত সব ত বেদরকে দেখান চাই। সে সব দেখাইবার পর রাণী বেদরকে সঙ্গে করিয়া খাইতে বসিল। নিজের হাতে দুইপাত্র মদ ঢালিয়া রাণী একপাত্র নিজে খাইয়া আর একপাত্র বেদরকে দিল। বেদর রাণীকে সম্মান দেখাইয়া সবটা চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তার পর রাণীর সুশিক্ষিতা দাসীরা আসিয়া গান-বাজনা করিয়া অতিথিকে সম্মান দেখাইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাজনার পর রাণী সকলকে বিদায় দিয়া শুইতে গেল।

এই-রকম উৎসব-আমোদের মধ্যে চল্লিশ দিন কাটিয়া গেল। একচল্লিশ দিনের দিনও কাটিয়া গেল। রাত্রি যখন দুপুর তখন রাণী আস্তে আস্তে বেদরের পাশ হইতে উঠিয়া গেল। লাবি মনে করিয়াছিল বেদর ঘুমাইয়াছেন। কিন্তু বেদর জাগিয়াই ছিলেন, রাণী কি করে দেখিবার জন্য ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিলেন। রাণী উঠিয়া একটা সিন্ধুক হইতে

মেঝের উপর দিয়া একটি ছোট নদী বহিয়া চলিল

খানিকটা গুঁড়া বাহির করিয়া মেঝেতে লম্বা একটা দাগ করিয়া ছড়াইয়া দিল। অমনই সেখান দিয়া একটি ছোট নদী বহিয়া চলিল। রাণী তখন একটা পাত্রে খানিকটা ময়দা লইয়া সেই মায়ানদীর জল দিয়া মাখিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ময়দা মাখিয়া তাহাতে আরো অনেক মশলা দিয়া একখানা পিঠা গড়াইল। পিঠাখানা আগুনে সেঁকিয়া লুকাইয়া রাখিয়া রাণী কয়েকটা মন্ত্র পড়িতেই নদীটা আবার শুকাইয়া গেল। তখন রাণীও আবার গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেদর সব দেখিয়া এমন ভাবে শুইয়া পড়িয়া রহিলেন যে, মায়ারাণীর মনে কোনো সন্দেহই হইল না।

রাত্রের এই-সব ব্যাপার দেখিয়া বেদরের এমন ভয় হইল যে, তিনি কি করিয়া একবার আবদুল্লার পরামর্শ লইবেন সেই ভাবনাতেই কোনো রকমে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া

উঠিয়াই তিনি রাণীকে বলিলেন, "আজ আমি একবার কাকার বাড়ী যাব, অনেক দিন তাঁকে না দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।"

রাণী বলিল, "যাও, কিন্তু দেখো যেন সেখানে বেশী দেরি না হয়।"

রাণীর মুখের কথা বাহির হইতে-না-হইতে বেদর ঘোড়া সাজাইয়া আবদুল্লার দোকানে যাত্রা করিলেন। দোকানে পৌছিয়াই তিনি আবদুল্লাকে মায়াবিনী লাবির সব কাণ্ড-কারখানা বলিলেন। সে-কথা শুনিয়া আবদুল্লা বেদরের হাতে দুখানা পিঠা দিয়া বলিলেন, "তাতে আর কি? লাবি যখন তোমাকে সেই পিঠা খেতে দেবে তখন তুমি লুকিয়ে চট্ করে আমার পিঠের এক টুকরো ভেঙে খেতে সুরু করে দিও। লাবি নিজের পিঠে মনে করে তার পর এক গণ্ডূষ জল এনে তোমার মুখে দিয়ে তোমাকে একটা জানোয়ার বানাবার অনেক চেষ্টা করবে, কিন্তু কিছুতে না পেরে মনে মনে বুক ফেটে মরবে। তখন তুমি তোমার অন্য পিঠেখানা তার হাতে দিয়ে খেতে বলো। তুমি অনেক করে সাধলে সে কিছুতেই না বলতে পারবে না। তার পর তার পিঠে খাওয়া হলেই তুমিও এক গণ্ডূষ জল তার মুখে ছুড়ে মেরে বলো, "তুই এখুনি একটা পশু হয়ে যা। রাণীকে যে জন্তু বানাতে চাও তারই নাম করলেই দেখবে সে তাই হয়ে গেছে। তার পর সেই জন্তুটাকে আমার কাছে ধরে এনো। তার পর যা করবার আমি সে-সব বলে দেব।"

বুড়ো আবদুল্লার পরামর্শ আর উপদেশ পাইয়া বেদরের স্ফূর্তি আর ধরে না। বেদর আবদুল্লার কাছে বিদায় লইয়া তখনই প্রাসাদে ফিরিয়া চলিলেন। রাণী বেদরকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, "প্রিয় বেদর! তোমার জন্যে আমি কখন থেকে পিঠে করে বসে আছি, এসো শীগগির তোমায় সেই পিঠে খেতে হবে।"

বেদর রাণীর কথায় যেন কতই খুসী হইয়াছেন এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি সেই পিঠাখানা লইয়া চট্ করিয়া আবদুল্লার পিটা ভাঙিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

বেদরকে পিঠা খাইতে দেখিয়া রাণী তাহার মুখে খানিকটা জল ছুড়িয়া দিয়া মন্ত্র পড়িয়া বলিল, "হতভাগা; তুই মানুষের রূপ ছেড়ে এখুনি একটা কানা ঘোড়া হয়ে যা।" কিন্তু তবুও বেদর যেমন মানুষ তেমনই মানুষের মত বসিয়া রহিলেন দেখিয়া মায়াবিনী রাণী বিস্ময়ে লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "প্রিয় বেদর! ভয় পেয়ো না, আমি কেবল একটু মজা করে তোমায় ভয় পাওয়াবার জন্যে অমন করছিলাম।"

বেদর বলিলেন, "আপনি যে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। ওতে কিছু হবে না। আপনি এখন আমার কাকার দেওয়া এই পিঠে-খানা খেয়ে দেখুন দেখি!"

রাণী পিঠেখানার একটুখানি খাইতে-না-খাইতে তাহার সমস্ত শরীর যেন কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া গেল। তখন বেদর এক গণ্ডূষ জল হাতে করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়ি ডাইনী, তুই এখনি একটা ঘোড়া হয়ে যা।" এই বলিয়া জলটা রাণীর মুখে ছুড়িয়া মারিতেই

সে ঘোড়া হইয়া গেল। বেদর সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়াই আবদুল্লার বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। আবদুল্লা বেদরের মুখে রাণীকে ঘোড়া করার গল্প শুনিয়া মহা খুসী হইয়া বলিল, "বৎস, তোমার আর এ দেশে থাকা উচিত নয়। এইবার তুমি এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিজের দেশে ফিরে যাও। কিন্তু এই ঘোড়াটা যেন কোনো কালেও কাউকে দান বিক্রী করো না, এর মুখ থেকে লাগামটি পর্য্যন্ত খুলো না। দেখো, আমার এই কথাটি যেন মনে থাকে।"

বেদর আবদুল্লার পরামর্শ শুনিয়া তাহার কাছে বিদায় লইয়া দেশের পথে রওনা হইলেন। একদিন দুদিন করিয়া পথে তিন দিন কাটিয়া যাইবার পর তিনি আর-একটা শহরে গিয়া পৌছিলেন। সেখানে হঠাৎ এক বুড়ী তাঁহার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বেদর তাহার কান্নার চোট দেখিয়া বলিলেন, "কাঁদো কেন?"

বুড়ী বলিল, "বাছা, ঠিক এই ঘোড়াটির মত আমার ছেলের একটি ঘোড়া ছিল। আহা, আজ ক' দিন হল ঘোড়াটি মারা গেছে। চোখের জল আর আমরা ধরে রাখ্‌তে পারি না। তুমি যদি এই ঘোড়াটি আমাদের কাছে বেচ তবে এইটিকে নিয়ে সেটির দুঃখ একটু ভুলে থাকি।"

বেদর বুড়ীর এত কান্নাকাটি শুনিয়া সোজা 'না' বলিতে না পারিয়া মনে করিলেন বেশী দাম চাহিলেই বুড়ী আর উৎপাত করিবে না। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "না, ঘোড়াটি ত আমি এক হাজার মোহরের কমে দিতে পার্‌ব না।"

বুড়ী তৎক্ষণাৎ "ধনের চেয়ে প্রাণ বড়" বলিয়া বেদরের হাতে একটা মোহরের থলি দিল। বেদর মহা বিপদে পড়িয়া বলিলেন, "আমি তামাসা কর্‌ছিলাম, বাছা, এ ঘোড় আমি বিক্রী কর্‌ব না।"

বুড়ী নাছোড়বান্দা, সে বলিল, "বাপু, তুমি যখন ঘোড়ার দাম চেয়ে আমার হাতের টাকা নিয়েছ, তখন আর তোমার কোনো কথা খাটবে না। বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে প্রাণের দায়ে পড়্‌বে।"

বেদর প্রাণের ভয়ে বুড়াকে ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। ঘোড়া পাইবামাত্র বুড়ী তাহার মুখের লাগাম খুলিয়া দিয়া কাছেরই একটা কুয়োর জল আনিয়া ঘোড়ার মুখে মারিয়া বলিল, "বাছা, ঘোড়ার রূপ ছেড়ে তোমার নিজের মূর্ত্তিতে দেখা দাও।" ঘোড়াটা অমনই আবার রাণী লাবি হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই বেদর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। বুড়ী তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। লাবির এই বুড়ী মাই তাহাকে যত মায়াবিদ্যা শিখাইয়াছিল। মেয়েকে ফিরিয়া পাইয়া বুড়ী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটা বাঁশী বাজাইয়া দিল। বাঁশীর শব্দেই এক বিকট দৈত্য সেখানে আসিয়া হাজির। বুড়ী দৈত্যকে হুকুম দিল আমাদের বাড়ী নিয়ে চল। দৈত্য তিনজনকে কাঁধে করিয়া আবার সেই মায়ানগরে উড়িয়া চলিল।

রাণী রাজধানীতে ফিরিয়া বেদরকে একটা পেঁচা বানাইয়া দাসীর হাতে দিয়া বলিল, "এটাকে একটা খাঁচায় পুরে রাখ।" দাসী তাই করিল।

এদিকে দাসীটার সঙ্গে আবদুল্লার ছিল খুব ভাব। সে একদিন সুযোগ বুঝিয়া আবদুল্লাকে বলিয়া আসিল, "রাণী তোমার ভাই-পোকে পেঁচা বানিয়ে খাঁচায় পুরে রেখেছে, তোমাকেও মার্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।"

ব্যাপার শুনিয়া আবদুল্লাও তাহার বাঁশী বাজাইল। অমনই চারখানা পাখা নাড়িয়া এক বিকটমূর্ত্তি দৈত্য সেখানে আসিয়া নামিল। আবদুল্লা দৈত্যকে বলিল, "তুমি এখনি রাণী লাবির প্রাসাদে গিয়ে পেঁচা রাজকুমারের দাসীকে নিয়ে তাঁর মা গুলনেহা রর কাছে পৌছে দিয়ে এস। ছেলের এমন দুর্দ্দশার কথা শুন্‌লে তিনি নিশ্চয় উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

দৈত্য এক নিমেষে আবদুল্লার আজ্ঞা পালন করিয়া আবার উড়িয়া চলিয়া গেল।

দাসীর মুখে ছেলের কথা শুনিয়া রাণী গুলনেহার ভাই শালেরাজার পরামর্শ লইতে ছুটিলেন। শালে অমনই হাজার হাজার সৈন্য লইয়া মায়ানগরে গিয়া লাবি ও তাহার বুড়ী ডাইনী মাকে মারিয়া ফেলিলেন। গুলনেহারও ভাইয়ের সঙ্গে গিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইতেই তিনি খাঁচার ভিতর হইতে পেঁচাটিকে বাহির করিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি আবার তোমার সেই সুন্দর চেহারায় দেখা দাও।"

রাণীর মুখের এই কয়টি কথাতেই বেদর আবার তেমনি অপরূপ সুন্দররূপে মায়ের কোলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গুলনেহার আনন্দে ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বেদরকে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার এতদিনের দুঃখ কাটিয়া সুখের বান ডাকিয়া উঠিল। তিনি আবদুল্লাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "তোমার ঋণ ত আমি জীবনে শোধ দিতে পার্‌ব না, তবু বল কি কর্‌লে তোমার সামান্য একটু উপকার কর্‌তে পারি।"

বুড়ো বলিল, "আমি রাণী লাবির যে দাসীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে যদি আমাকে বিবাহ করে আর আমি যদি বাকি দিন ক'টার মত পারস্যদেশে আশ্রয় পাই তাহলে আর আমি কিছু চাই না।"

দাসীর মত জিজ্ঞাসা করা হইল। বিবাহে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। তখন রাণী গুলনেহার খুব ঘটা করিয়া আবদুল্লার বিবাহ দিয়া তাহাকে একটা বড় কাজ দিয়া পারস্যরাজ্যে লইয়া গেলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া জহরার সঙ্গে বেদরের বিবাহ হইল। এবার আর কোনো গোলমাল হইল না। বেদরের শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে গুলনেহার দয়া করিয়া লাবির রাজ্যের যত পশু-পক্ষীকে আবার তাহাদের মানুষের রূপ ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা

রাণীর করুণায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া গেল।

এতদিনের পর রাজা শালে সমন্দলের রাজাকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া আত্মীয় স্বজনকে লইয়া পারস্যদেশে চলিলেন। সেখানে কিছুদিন খুব উৎসব আনন্দ করিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্রের তলে প্রবালের প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বেদর ও জহরাও মহাসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দুই আব্দাল্লার কাহিনী

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এক সহরে আব্দাল্লা নামে একজন ধীবর বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্র ছিল। মৎস্য ধরিবার জালটিই তাহার একমাত্র সম্বল ছিল। নয়টি সন্তান ও মায়ের ভরণপোষণ লইয়া সে অত্যন্ত বিব্রত থাকিত। প্রতিদিন প্রাতে সমুদ্রে জাল ফেলিয়া যাহা কিছু পাইত তাহা বিক্রয় করিয়া সন্তানদের উদরান্নের ব্যবস্থা করিত।

তাহার দশম সন্তানের যেদিন জন্ম হইল সেদিন তাহার গৃহে সামান্য কিছু খাদ্যও অবশিষ্ট ছিল না। সে দিন তাহার স্ত্রী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রভু, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে বাঁচাইবার কোনো উপায় কর।"

ধীবর বলিল, "দেখ, আমি ঈশ্বরের নাম লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে চলিলাম। এই নবজাত শিশুর আজ অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে। এই বলিয়া সে সমুদ্রতীরে চলিয়া গেল, এবং মনে মনে এই বলিতে বলিতে জাল ফেলিল, হে আল্লা, এই ক্ষুদ্র শিশুর ভাগ্য দুঃখ-পূর্ণ করিও না, কিছুক্ষণ পরে জাল তুলিয়া সে দেখিল শুধু কাদা ও প্রস্তরখণ্ড উঠিয়াছে।

পর পর পাঁচবার এইরূপই হইল। সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সে অপর এক স্থলে জাল ফেলিতে গেল এবং ভাবিতে লাগিল, "আল্লা কি এই শিশুর ভরণপোষণের কোনো ব্যবস্থা না করিয়াই ইহাকে জন্ম দিয়াছেন? ইহা কখনই সম্ভব নয়, কারণ যে মুখ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত আহারও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপাবান, মানুষের জীবন ধারণের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া থাকেন।

সে জাল লইয়া হতাশ মনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া তাহার অসুস্থ স্ত্রীকে মুখ দেখাইবে। বাড়ীতে এমন কিছুই অবশিষ্ট নাই, যদ্দারা তাহার স্ত্রীর ও শিশুদের উদর পূর্ত্তি হইতে পারে।

পথে এক রুটি-বিক্রেতার দোকানে অত্যধিক ভিড় দেখিয়া সে সেখানে দাঁড়াইল। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং উদরান্নের সংস্থানের উপায় বড় বেশী

লোকের নাই। যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সে তাহাই রুটিওয়ালার হাতে তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু ক্রেতার ভিড়ের জন্য রুটিওয়ালা কাহারও প্রতি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। ধীবর দোকানের পাশে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে রুটির স্তূপের দিকে

যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, সে তাহাই
রুটিওয়ালার হাতে তুলিয়া দিতেছে।

চাহিয়া রহিল। গরম রুটির সুগন্ধে সে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িল। রুটিওয়ালা তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে ধীবর, এদিকে এস।"

ধীবর নিকটে গেলে রুটিওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি রুটি চাও?"

ধীবর নিরুত্তর রহিল।

রুটিওয়ালা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বন্ধু, লজ্জিত হইও না। ঈশ্বর দয়াবান। তোমার নিকট যদি মূল্য নাও থাকে, আমি তোমাকে বিনামূল্যে রুটি দিব এবং যতদিন না তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, ততদিন এইরূপে তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিব।"

ধীবর উত্তর করিল, "প্রভু আল্লার নামে শপথ করিয়া কহিতেছি, আমার নিকট কিছুই নাই। যদি তুমি আমার সন্তানদের জন্য আজ আমাকে কিছু রুটি দাও, আমি আমার জালটি বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত আছি।"

রুটিওয়ালা হাসিয়া বলিল, "হে দরিদ্র ধীবর, এই জালটি তোমার জীবিকানির্ব্বাহের উপায়, ইহাই যদি তুমি বন্ধক রাখিয়া যাও তাহা হইলে তুমি কি করিয়া প্রাণধারণ করিবে ? তোমার কি পরিমাণ রুটি আবশ্যক, আমাকে বল।"

ধীবর উত্তর করিল, "আমাকে দশমুদ্রা মূল্যের রুটি দাও।"

রুটিওয়ালা তাহাকে দশমুদ্রা মূল্যের রুটি দিয়া বলিল, "এই সঙ্গে আরও দশটি মুদ্রা লইয়া যাও, তাহা দিয়া অন্যান্য খাদ্য কিনিয়া লইও, এবং এই বিশটি মুদ্রার পরিবর্ত্তে কাল আমার জন্য ঐ মূল্যের মাছ লইয়া আসিও। যদি মাছ আনা সম্ভব না হয় তাহা হইলেও তুমি আসিয়া রুটি লইয়া যাইতে দ্বিধা করিও না। যতদিন না তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় ততদিন মূল্যের জন্য আমি তোমাকে তাগাদা করিব না। তুমি যখন পারিবে তখন মাছ দিয়া আমার দেনা পরিশোধ করিও।"

ধীবর খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, "আল্লা আপনার মঙ্গল করুন।"

ধীবর যখন বাড়ী গিয়া পৌছিল তখন সে শুনিতে পাইল তাহার স্ত্রী ক্ষুধায় কাতর ছেলেগুলিকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছে, কর্ত্তা এখনই তোমাদের জন্য ভাল ভাল খাবার লইয়া আসিবেন।"

আব্দাল্লা তাড়াতাড়ি গিয়া ছেলেদের আদর করিয়া রুটি খাইতে দিল, এবং সমস্ত কথা স্ত্রীকে জানাইল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই ধীবর পুনরায় তাহার জাল লইয়া মাছ ধরিতে চলিল এবং যাইবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, "খোদা, আজ রুটিওয়ালার কাছে আমার মুখ রক্ষা করিও। আমি যেন তার ঋণ পরিশোধ করিবার মত মাছ ধরিতে পারি।"

যথারীতি সে জাল ফেলিল, কিন্তু কিছুই মিলিল না। সারাদিন চেষ্টা করিয়াও সে বিফলমনোরথ হইল। নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সে বাড়ী ফিরিবার পথে রুটির দোকানের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনে বলিয়া উঠিল, "খালি হাতে কেমন করিয়া বাড়ী যাই ? কিন্তু তাই বলিয়া রুটিওয়ালার কাছে গিয়াও আর হাত পাতা চলিবে না। অথচ রুটির দোকানের সম্মুখ দিয়াই বাড়ী যাইতে হইবে। রুটিওয়ালা যেন দেখিতে না পায় এই জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইবে।"

রুটির দোকানের সম্মুখে আসিয়াই সে আগের মত ভিড় দেখিতে পাইয়া পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু রুটিওয়ালা তাহাকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওহে ধীবর, শোন শোন ! বেশ যাই হউক, তুমি যে রুটি লইতেই ভুলিয়া গেলে !"

ধীবর উত্তর করিল, "না মহাশয়, ভুলি নাই, কিন্তু মূল্য না দিয়া রোজ রোজ রুটি লইতে আমার কেমন লজ্জা হইতেছিল। আরও একটি মাছও পাই নাই।

রুটিওয়ালা বলিল, "লজ্জা কি। আমি ত বলিয়া দিয়াছি যে, যখন তোমার দাম দিবার সঙ্গতি হইবে তখনই দাম দিও। দামের জন্য ত আটকাইবে না।"

তার পর রুটিওয়ালা নিত্যকার মত তাহাকে রুটি ও নগদ দশটি মুদ্রা দিল। ধীবর বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে সমস্ত জানাইল। স্ত্রী সব কথা শুনিয়া বলিল, "ঈশ্বর পরম দয়ালু। ইহাই যদি তাঁহার ইচ্ছা, একদিন-না-একদিন আমাদের সুদিন আসিবেই; তখন দয়ালু রুটিওয়ালার সমস্ত ঋণ শোধ করিতে পারিবে।"

এইরূপে প্রায় চল্লিশ দিন প্রত্যহ ধীবর রুটিওয়ালার নিকট হইতে রুটি ও দশটি করিয়া মুদ্রা নগদ লইল, এবং প্রতিদিনই সে সমুদ্রে জাল ফেলিল এবং প্রতিদিনই নিরাশ হইল। রুটিওয়ালা ঋণের পরিবর্ত্তে আর একদিনও তাহার নিকট মাছ চাহে নাই। প্রতিদিনই ধীবর রুটিওয়ালাকে বলিত, "ভাই সাহেব, একবার আমার হিসাবটা দেখিও।" জবাবে রুটিওয়ালা রোজই বলিত, "এখন হিসাব দেখার সময় নাই। তোমার সুদিন আসিলেই হিসাব করিব। আজ করিয়া লাভ কি?"

রুটির দোকান হইতে চলিয়া আসিবার সময় রোজই ধীবর ঈশ্বরের নিকট রুটিওয়ালার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে চলিয়া আসিত। কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিত।

একচল্লিশ দিনের দিন ধীবর তাহার স্ত্রীকে বলিল, "না, আর এরূপভাবে জীবন ধারণের কোন অর্থ হয় না, জালটা ছিঁড়িয়া ফেলি।"

স্ত্রী বলিল, "কেন?"

ধীবর নিরাশার সুরে কহিল, "আমার মনে হয় সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া জীবিকার সংস্থান করা আমার ভাগ্যে আর নাই। এমন করিয়া আর কত দিন চলিতে পারে? না, আমি আর জাল লইয়া সমুদ্রে যাইব না, কাজেই রুটির দোকানের সম্মুখ দিয়াও আমাকে আর আসিতে হইবে না। যত বারই আমি তাহার দোকানের সম্মুখ দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিতে চাই, প্রতিবারেই সে আমাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া রুটি ও মুদ্রা দিয়া থাকে। আর কত ধার করিব?"

স্বামীর কথা শুনিয়া স্ত্রী উত্তর করিল, "ঈশ্বরের জয় হউক। আমাদের দুরবস্থা জানিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনিই রুটিওয়ালার প্রাণে করুণা জাগাইয়া দিয়াছেন। ইহা তোমার অপছন্দ কেন হইতেছে তাহা বুঝি না।"

ধীবর কহিল, "আমার কাছে রুটিওয়ালার এখন অনেক পাওনা, একদিন ত সে তাহার পাওনা চাহিবেই, তখন কি করিব? কেমন করিয়া ধার শোধ করিব?"

স্ত্রী উত্তর করিল, "সে কি টাকার কথা তোমায় কিছু বলিয়াছে?"

—"না, টাকার কথা কিছুই বলে না। এমন কি, হিসাবটা পর্য্যন্ত করিতে চাহে না,—কেবল বলে, সময় হউক, তখন হিসাব করা যাইবে।"

স্ত্রী তখন তাহাকে বলিল, "সে যখন টাকার তাগাদা করিবে, তখন তাহাকে বলিও, সময় হইলেই দিব।"

ইহার উত্তরে সে কহিল, "সুদিন আর কবে আসিবে, বলিতে পার?"

স্ত্রী উত্তর দিল, "ঈশ্বর করুণাময়।"

তখন ধীবর বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ।"

তারপর সে জালখানা লইয়া সমুদ্রপারে রওনা হইয়া মনে মনে প্রার্থনা করিল, "খোদা, অন্তত একটি মাছ দিয়া রুটিওয়ালার কাছে আমার মুখ রক্ষা কর।"

এইবার জাল টানিয়া তুলিতেই তাহা ভারী বোধ হইল, এবং জাল টানিতে টানিতে ধীবর দস্তুর মত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। জাল টানিয়া তুলিয়া দেখিতে পাইল একটা মরা গাধা উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল। জাল হইতে পচা মরা গাধাটা দূর করিয়া ফেলিতে ফেলিতে সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও কোনো শক্তি নাই। গৃহিনীকে কত বলিতেছি সমুদ্রে আমাদের আর কোনো আশা নাই, এই ব্যবসা ছাড়িয়া দিই, কিন্তু সে প্রতিবারেই বলে ঈশ্বর করুণাময়, একদিন তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেনই। এই মরা গলিত গাধাটাই কি তাহার লক্ষণ?"

এইভাবে হতভাগ্য ধীবর অনেকক্ষণ আপনার মনে আক্ষেপ করিল, এবং মরা গাধার দুর্গন্ধ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া পুনরায় জাল ফেলিল। এবারও টানিতে গিয়া অত্যন্ত ভারী বোধ হইল, এবং জালের দড়ি ধরিয়া টানিতে টানিতে হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। জাল উপরে তুলিতেই দেখিতে পাইল মানুষের আকৃতি একটা জীব উঠিয়াছে। দেখিতে পাইয়াই ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে সে পলাইতে গেল, তখন সেই মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট জীবটি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ওহে ধীবর, পলাইও না, আমিও তোমারই মত মানুষ। ভয় নাই।"

ধীবর তাহার কথা শুনিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তুমি কি জীন?"

সে জবাব দিল, "না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী তোমারই মত একজন মানুষ।"

—তাহা হইলে তোমাকে সমুদ্রে কে ফেলিয়াছিল?

সে বলিল, "আমি সমুদ্রেরই সন্তান। আমি সমুদ্রে বেড়াইতেছিলাম, তখন তুমি আমাকে জালে ধরিয়াছ। আমরা জাতকে-জাত ঈশ্বরের হুকুম তামিল করিয়া থাকি, কাজেই তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক জীবের প্রতিই আমরা সমান করুণা দেখাইয়া থাকি; যদি ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিবার দুঃসাহস আমার হইত, তাহা হইলে তোমার জাল ছিঁড়িয়া আমার বাহিরে চলিয়া যাওয়া অসাধ্য হইত না। কিন্তু ঈশ্বর যখন যে অবস্থায় ফেলিবেন তখন সেই অবস্থাকেই মানিয়া লইতে শিখিয়াছি। আজ যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, চিরকাল তোমার বাধ্য হইয়া থাকিব। তুমি কি আমাকে মুক্তি দিবে? তাহা হইলে আমি ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। আমাকে কি সেই সুযোগ দিবে? আমি প্রতিদিন এখানে তোমার সাথে দেখা করিব, তুমি প্রত্যহ একটা-না-একটা কিছু ফল আমার জন্য আনিও। যাহা দিবে তাহাই আনন্দে আমি গ্রহণ করিব। বিনিময়ে মণিমুক্তা ইত্যাদি

অতি মূল্যবান সমুদ্রের দ্রব্যাদি আমি তোমাকে সাজি ভরিয়া দিব। কি বল ভাই, রাজি আছ?"

ধীবর উত্তর করিল, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

ধীবর সমুদ্রের লোকটিকে জাল হইতে ছাড়াইয়া দিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমার নাম আব্দাল্লা। এখানে আসিয়া আমাকে ডাকিলেই আমি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তোমার নাম কি ভাই?"

ধীবর উত্তর করিল, "আমার নামও আব্দাল্লা।"

তখন সমুদ্রের আব্দাল্লা বলিল, "বেশ ভাই, ভালই হইল তোমাতে আমাতে আজ হইতে মিতালি পাতাইলাম।" এই বলিয়া সে তখনই জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এদিকে সে যদি আর ফিরিয়া না আসে এই ভয়ে ডাঙার আব্দাল্লা ভারী আফশোষ করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে দুঃখ করিতে হইল না, একটু পরেই সমুদ্রের আব্দাল্লা অঞ্জলি ভরিয়া বহু মণিমুক্তা লইয়া আসিয়া মিতাকে দিল, এবং বলিল, "আমার সঙ্গে টুক্‌রি নাই, তাই হাতে যাহা ধরিয়াছে তাহাই আনিলাম। রোজ সূর্য্য উদয়ের আগে আসিয়া আমাকে ডাকিলেই আমার দেখা পাইবে। আজ তবে আসি।" এই বলিয়া সে সমুদ্রে চলিয়া গেল।

ধীবর মহা আনন্দে বাড়ী চলিল। পথে রুটিওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "ভাই, ভগবানের দয়া হইয়াছে, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এইবার আমার হিসাবটা করিয়া ফেল। এই রত্ন মাণিক্যগুলি নাও। আমাকে কিছু নগদ টাকা দাও, কাল মণিকারের দোকানে বাকী রত্নগুলি বিক্রয় করিয়া লইলেই সংসার খরচ চালাইতে পারিব।"

রুটিওয়ালার তহবিলে তখন যাহা কিছু ছিল সবই সে আব্দাল্লাকে দিয়া বলিল, "এই রুটিগুলি তোমার বাড়ীতে দিয়া আসিব চল। আজ হইতে আমি তোমার হুকুমের চাকর।"

ধীবর বাড়ী পৌছিল। রুটিওয়ালা টাকা লইয়া গিয়া ধীবরের জন্য বাজার করিয়া লইয়া আসিল, ধীবর তাহাকে নানা-প্রকার ফলমূল কিনিয়া আনিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল। রুটিওয়ালা সারাদিন নিজের কাজ ফেলিয়া ধীবরের কাজে তাহার বাড়ীতে ব্যস্ত রহিল। তাহাকে ঘরে যাইতে বলায় সে বলিল, "আজ হইতে সে ধীবরের চাকর—ঘরে যাইবে না।" ধীবর কহিল, "আমার দুর্দ্দিনে তুমিই আমাদের সকলকার জীবন বাঁচাইয়াছ, সুতরাং আমরাই তোমার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।"

রুটিওয়ালা সেই রাত্রি বন্ধু ধীবরের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিল।

ধীবর তখন স্ত্রীকে সমুদ্রের আব্দাল্লার সব কথা শুনাইল। স্ত্রী খুসী হইয়া বলিল, "এই কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে সম্রাটের লোক যন্ত্রণা দিবে।"

ইহার উত্তরে ধীবর কহিল, "এই কথা দুনিয়ার সকলকার নিকটে গোপন করিতে পারিব, কিন্তু আমার পরম বন্ধু রুটিওয়ালাকে গোপন করিতে পারিব না।"

পরদিন ভোর রাত্রে উঠিয়া ফলমূল লইয়া আব্দাল্লা মিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমুদ্রপারে উপস্থিত হইল।

পরদিন ভোর রাত্রে উঠিয়া ফলমূল লইয়া আব্দাল্লা মিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমুদ্রপারে উপস্থিত হইল। দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। ডাঙার বন্ধু সমুদ্রের বন্ধুকে ফলমূল দিল, সমুদ্রের বন্ধু ডাঙার বন্ধুকে এক ঝুড়ি মণিমুক্তা আনিয়া দিল। ডাঙার আব্দাল্লা ঝুড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পথে রুটির দোকানে আসিতেই রুটিওয়ালা বলিল, "হুজুর, আপনার জন্য ভাল ভাল রুটি তৈয়ার করিয়া আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এখনই গিয়া বাজার করিয়া দিয়া আসিব।"

আব্দাল্লা এক মুঠি রত্ন তুলিয়া রুটিওয়ালাকে দান করিল।

বাড়ী গিয়া সে দু চারটি মুক্তা লইয়া মণিকারের দোকানে বিক্রয় করিতে গেল। ধীবরের হাতে মণিরত্ন দেখিয়া মণিকার তাহাকে শুধাইল, "আর আছে?"

ধীবর বলিল, "আরও এক ঝুড়ি আছে।"

তখন জিজ্ঞাসা করিয়া মণিকার ধীবরের বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া নিজের চাকরদের বলিল, "এই লোকটিকে ধরিয়া রাখ, বেগমের মহাল হইতে অনেক হীরামুক্তা চুরি হইয়াছে, এই সেই চোরাই মাল।"

মনিবের হুকুমে শেখজীর চাকরেরা ধীবরকে বেদম প্রহার করিল এবং তাহাকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মণিকার-পটীর সকলেই তখন একযোগে বলাবলি করিতে লাগিল, "এই শয়তানই সব নষ্টের মূল।"

ধীবর চুপ করিয়া সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিল। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে বাদশাহের দরবারে লইয়া গিয়া হাজির করিল। বাদশা অভিযোগ শুনিয়া খোজা-প্রহরীকে হুকুম দিলেন, "ইহার নিকট যে জহরতগুলি পাইয়াছ তাহা বেগমকে দেখাও, তিনি যদি বলেন যে, ইহা তাঁহারই তবে এই লোক শাস্তি পাইবে। তাহার পূর্ব্বে ইহাকে শাস্তি দিও না। আর এগুলি যদি এ বিক্রয় করিতে চাহে তাহা হইলে বাদশাজাদীর জন্য ইহার নিকট হইতে কিনিয়া রাখ।"

খোজা-প্রহরী আসিয়া খবর দিল "না, এসব বেগমের নহে।"

শুনিয়া শেখ ও তাহার দলের লোকেরা ভয়ে ভয়ে বলিল, "হুজুর, এ লোকটা নেহাৎ গরীব ধীবর, সমুদ্রে মাছ ধরিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে, উহার কাছে এত মূল্যবান রত্ন দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয়, তাই শাহানশাহের দরবারে হাজির করিয়াছি। আমাদের অপরাধ লইবেন না।"

বাদশাহ কহিলেন, "তোরা নিজেরা পাপী, তাই সকলকেই পাপী মনে করিস্। ঈশ্বরই দয়া করিয়া ইহাকে এইসব দান করিয়াছেন। এখনই তোরা আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।" তিনি ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি ভগবানের প্রিয়পাত্র, সন্দেহ নাই। সত্য করিয়া বল এত রত্ন তুমি কোথায় পাইলে? আমি দেশের বাদশাহ, আমার দৌলতখানায়ও এত দামী জিনিষ নাই।"

তখন ধীবর জোড়হাতে আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী বাদশাহকে বলিল। বাদশাহ সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, "তোমার সৌভাগ্য, তুমি এত দৌলতের মালিক হইয়াছ। কিন্তু তোমাকে দুর্ব্বল জানিয়া ধনের লোভে কেহ তোমাকে হত্যা করিতে পারে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন অবশ্য তোমার কোনো ভয় নাই। কিন্তু আমার পরে যিনি বাদশাহ হইবেন, তিনি দৌলতের লালসায় তোমাকে খুন করিতে পারেন। কাজেই আমি প্রস্তাব করি, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন তুমি এ রাজ্যের উজিরী কর, আমার মৃত্যুর পরে তুমিই এই রাজ্যের মালিক হইবে।"

তখন বাদশাহের হুকুমে লোকজন ধীবরকে স্নান করাইয়া বহু মূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া বাদশাহের সম্মুখে লইয়া আসিল। তখনই তাহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা হইল। বাদশাহের হুকুমে সৈন্যসামন্ত লোকজন লইয়া আব্দাল্লার বাড়ীতে একদল লোক ছুটিল

খুব জাঁকজমকে বাদশাহজাদীর সঙ্গে ধীবর
আব্দাল্লার শুভ বিবাহ হইয়া গেল

এবং আব্দাল্লার স্ত্রীকে বেগমের সাজে সজ্জিত করিয়া বাদশাহের মহলে লইয়া আসিল। দরিদ্র ধীবরের ছেলেরাও রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। ধীবরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাদশাহের সম্মুখে হাজির করিতেই বাদশাহ সম্মান দেখাইয়া নিজের আসনের পার্শ্বে তাহাকে বসাইলেন। বাদশাহের একটিও পুত্র-সন্তান ছিল না, কাজেই ধীবরের নয়টি ছেলেই সকলের আদরের বস্তু হইয়া উঠিল। বেগমও ধীবরের স্ত্রীকে অত্যন্ত খাতির করিলেন। এদিকে বাদশাহের আদেশে অবিলম্বে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে

বাদশাহজাদীর সঙ্গে ধীবর আব্দাল্লার শুভ বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে রাজপ্রাসাদ ও রাজধানী জুড়িয়া বিরাট উৎসব চলিতে লাগিল।

বিবাহের পরদিন অতি ভোরে আব্দাল্লা যথারীতি এক ঝুড়ি ফল নিজের মাথায় লইয়া সমুদ্রের দিকে যাইতেছে বাদশাহ ইহা দেখিতে পাইলেন। তখন তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "আমার মিতার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি। আমি তাহার কাছে প্রতিশ্রুত যে, প্রতিদিন তাহাকে ফল দিব আর সে আমাকে মণিমুক্তা দিবে।"

এই কথা শুনিয়া বাদশাহ বলিলেন, "এখন মিতার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার সময় নয়।"

উত্তরে আব্দাল্লা কহিল, "এখন না গেলে আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-অপরাধে অপরাধী হইব। সে মনে করিবে, পার্থিব সুখসম্পদ আমার কর্তব্য কাজে বাধা জন্মাইয়াছে।"

বাদশাহ বলিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, তুমি তোমার কাজে যাও। আমি তোমাকে বাধা দিব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

নগরের যে রাস্তা দিয়া আব্দাল্লা সমুদ্রতীরে যাইতেছিল, পথের লোকজন তাহাকে দেখাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি বাদশাহের জামাতা, ফলের বিনিময়ে রত্ন আনিতে চলিয়াছে। আর যাহারা তাহাকে চিনে না, তাহারা বলিল, "ওহে, কি লইয়া যাইতেছ, লইয়া আইস, আমরা কিনিব।"

সে উত্তর দিল, "ফিরিবার পথে বিক্রয় করিব। অপেক্ষা কর ভাই সব।"

যথাসময়ে আব্দাল্লা সমুদ্রের তীরে গিয়া মিতার সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহাকে ফলগুলি দিল, সেও তাহাকে রত্ন আনিয়া দিল।

কিছুদিন হইতে আব্দাল্লা ফিরিবার পথে রোজই রুটির দোকান বন্ধ দেখিতে পায়। প্রায় দশ দিন রুটিওয়ালার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আব্দাল্লার মনে দুশ্চিন্তার উদয় হইল।

প্রতিবেশীর নিকট রুটিওয়ালার কথা শুধাইয়া সে জানিতে পারিল যে, তাহার খুব অসুখ, ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া সে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বন্ধু পরম আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন দিল এবং সমাদরের সঙ্গে তাহাকে বসাইল। তখন আব্দাল্লা তাহাকে বলিল, "রোজই বাড়ী ফিরিবার পথে তোমার খোঁজ করি, দোকান ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাই, তোমার কি হইয়াছে বন্ধু?"

সে জবাব দিল, "কই, আমার ত কিছুই হয় নাই। শুনিলাম বাদশাহের দরবারে চোর বলিয়া তোমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই ভয়ে লুকাইয়া আছি।"

আব্দাল্লা কহিল, "সত্যই তাই।" তারপর একে একে সমস্ত কাহিনী বন্ধুর নিকট বর্ণনা করিল, এবং ঝুড়িশুদ্ধ মণিমুক্তা বন্ধুকে দান করিল।

তারপর খালি ঝুড়িটি লইয়া সে রাজবাড়ী পৌছিল। তাহার ঝুড়ি খালি দেখিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বন্ধুর সহিত কি তোমার দেখা হয় নাই?"

আব্দাল্লা কহিল, "হাঁ দেখা হইয়াছে। তাহার কাছে আজ যাহা পাইয়াছি, সবই আমার বন্ধু রুটিওয়ালাকে দিয়া আসিয়াছি। এক সময় সে ধারে রুটি ও পয়সা জোগাইয়া আমাদের সকলকার জীবন বাঁচাইয়াছে। একদিনের জন্যও তাহার দয়া হইতে বঞ্চিত হই নাই। তাহার ঋণ, জীবনে কখনও শোধ দিতে পারিব না।"

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার নাম কি?"

আব্দাল্লা "তাহার নাম রুটিওয়ালা আব্দাল্লা। আমার নাম, ডাঙার আব্দাল্লা, আর আমার মিতার নাম সমুদ্রের আব্দাল্লা।—"

সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ বলিয়া উঠিলেন, "আর আমার নামও আব্দাল্লা, আর আমরা সকলেই ঈশ্বরের ভৃত্য, সুতরাং সকলেই আমরা ভাই। কাজেই তোমার রুটিওয়ালা বন্ধুকে ডাকিয়া পাঠাও। আমি তাহাকেও উজীর নিয়োগ করিব।

যথাকালে রুটিওয়ালা দ্বিতীয় উজীরের পদে নিযুক্ত হইল। আর প্রধান উজীর হইল জামাতা ডাঙার আব্দাল্লা।

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল। দুই মিতার দেখা সাক্ষাৎ ও আদান প্রদান নিয়মিত চলিল। মানব-প্রেমিক হজরত মহম্মদের সমাধি-মন্দির ডাঙার মিতা দেখিয়াছে কি না সমুদ্রের মিতা জানিতে চাহিল। উত্তরে সে বলিল,"না ভাই, এতদিন দরিদ্র ছিলাম, যাইবার সুযোগ পাই নাই। আজ তোমার দয়ায় আমার এ ধনদৌলত। কিন্তু যেদিন হইতে তোমার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে,সেইদিন হইতে আমার কোনোরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর নাই। তবে আগে মক্কা শরীফে তীর্থ করিয়া পরে অন্যত্র যাইব, মনে মনে স্থির করিয়াছি। তোমাকে আমি ভালবাসি সুতরাং তোমার মনে আনন্দ যাহাতে হইবে সেইরূপ কার্য্য আমি অবশ্যই করিব। তবে তোমাকে ছাড়িয়া যে একদিনও আমি থাকিতে পারিব না।"

ইহার উত্তরে সমুদ্রের মিতা ডাঙার মিতাকে কহিল, "তবে কি তুমি মদীনা শরীফ অপেক্ষা আমার স্নেহকেই বড় করিয়া দেখ? মহাবিচারের দিন তবে ঈশ্বরের দরবারে কি জবাব পেশ করিবে? তোমাকে সে দিন কে রক্ষা করিবে? মর্ত্তোর স্নেহ-প্রীতিকে তুমি কি স্বর্গের চাইতেও বড় মনে করিতে চাও?"

ডাঙার মিতা উত্তর করিল, "না, তাহা অবশ্য নয়। সেখানে যাওয়ার জন্য আমি বিশেষ উৎসুক হইয়াই আছি। এখন তোমার নিকট হইতে অনুমতি পাইলেই আমি সেই পবিত্র তীর্থে যাত্রা করিতে পারি।"

সমুদ্রের মিতা কহিল, "আমি তোমায় অনুমতি দিতেছি। আর সেই সমাধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার আমার নাম করিয়া মন্দিরকে সেলাম করিও। এখন আমার সঙ্গে

একবার আমার বাড়ীতে চল, মন্দিরের নাম করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা আমার নাম করিয়া দান করিয়া আমার মুক্তি প্রার্থনা করিও।"

তখন ডাঙার মিতা তাহাকে বলিল, "আমি ডাঙার মানুষ, জল আমার সহিবে না।"

সমুদ্রের মিতা বলিল, "আমি এক রকম মলম তোমায় দিতেছি, তাহা গায়ে মাখিলে জলে তোমার কোনই অসুবিধা হইবে না। চলাফেরা থাকা সবই ডাঙার মতই মনে হইবে। সমুদ্রের এক রকম অতি বৃহৎ মৎস্যের তেল দিয়া এই মলম তৈরী হয়। ইহার রং অনেকটা সোনার মত। এই মৎস্য আস্ত উট বা হাতী গিলিয়া ফেলিতে পারে। সমুদ্রের জীবজন্তু খাইয়াই ইহারা জীবন ধারণ করে।"

তখন ডাঙার আব্দাল্লা বলিল, "আমাকে দেখিতে পাইলেও ত খাইয়া ফেলিতে পারে।"

সমুদ্রের আব্দাল্লা বলিল, "না তোমাকে খাইবে না। তুমি আদমের বংশধর—সে তোমাকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যাইবে। আদমের সন্তানদেরই উহাদের একমাত্র ভয়, কেননা আদম-সন্তানকে খাইলেই ইহারা তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, মানুষের চর্ব্বিতে এক প্রকার বিষ আছে, যাহা ইহারা হজম করিতে পারে না। এমন কি একটা মানুষ দেখিতে পাইলেই উহারা মরিয়া যায়, তখন কাহারও আর নড়িবার চড়িবার কোনো শক্তিই থাকে না।"

ডাঙার আব্দাল্লা এই বলিয়া গায়ে মলম মাখিয়া জলে নামিয়া পড়িয়া দেখাইল যে, ভগবানের প্রতি তার একান্ত আস্থা আছে।

জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের তলদেশে যথাইচ্ছা সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কোনই অসুবিধা হইল না। অবশেষে সে মিতার নির্দ্দেশমত চারিদিক দেখিতে লাগিল, এখানে সেখানে নানা রকম মাছ, কোনটা বড়, কোনটা বা ছোট, কোনটা মহিষের মত দেখিতে, কোনটা বা ষাঁড়ের মত, কোনটা বা আবার কুকুরের মত, আবার কোনটা বা ঠিক মানুষের মত, তাহারা ডাঙার আব্দাল্লাকে দেখিতে পাইয়াই পলাইয়া যাইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একটা পাহাড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ সে একটা চীৎকার শুনিতে পাইয়া মিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, এই সেই মাছ, যে মাছের তেল গায়ে মাখিয়া সে সমুদ্রে আসিয়াছে। সে সমুদ্রের আব্দালাকে গিলিয়া ফেলিবে বলিয়া আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিয়াছে। তাই মিতার নির্দ্দেশমত ডাঙার আব্দাল্লাও সেই চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সেই বিরাট জন্তুটা মরিয়া গেল।

তারপর তাহারা একটা সামুদ্রিক সহরে উপস্থিত হইল। সেখানে পুরুষ মানুষ একটি নাই, সবই স্ত্রীলোক। তাহারা সমুদ্রের জন্তুদের ভয়ে সহরের বাহিরে কখনও আসে না। তাহাদের হাত পা সবই মানুষের মত, তবে মাছের মত লেজ আছে। এই সহর ছাড়িয়া তাহারা তখন আর এক সহরে গেল, এখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আছে। তাহাদেরও মাছের মত লেজ আছে। অথচ তাহারা ডাঙার মানুষদের মত কেনাবেচা করে না।

ইহাদের মধ্যেও বহু ধর্মাবলম্বী আছে, তাই বিবাহাদি নিয়মিত হয় না। এমনি করিয়া তাহারা প্রায় আশীটা সহর ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রত্যেক সহরের বাসিন্দাই অপর সহরের

সমুদ্রের তলদেশে যথাইচ্ছা সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাসিন্দাদের অপেক্ষা আলাদা ধরণের। সমুদ্রে হাজার হাজার সহর আছে। এক একটি সহর দেখিতে তাহাদের একদিন করিয়া লাগিল। কাঁচা মাছ খাইয়া খাইয়া ডাঙার মিতার ভারী বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, বাড়ীর জন্য তাহার মনটা ভারী উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, অনেকদিন ছেলেমেয়েদের দেখিতে পায় নাই, কাহাকেও কিছু না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। না-জানি তাহারা কত ভাবিতেছে। না, আর দেরী নয়, এবার ঘরে ফিরিতেই হইবে।

তখন সে সমুদ্রের মিতার বাড়ী যে সহরে সে সহরে ফিরিয়া আসিল। সহরটি নেহাৎ ছোট। মিতা তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া নিজের কন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া বলিল যে, ইনিই আমার ডাঙার মিতা, ইহার নিকট হইতেই সে প্রতিদিন ডাঙার ফলমূলাদি পাইয়া থাকে।

পরিচয় পাইয়া কন্যা তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিল। এবং তৎক্ষণাৎ পিতার বন্ধুর আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় ডাঙার মিতা

সেই কাঁচা মাছই খানিকটা খাইল। মিতার স্ত্রী তখন বাড়ীতে ছিল না; পাড়ায় কোন্ বাড়ীনে বেড়াইতে গিয়াছিল। দুইটি সন্তান লইয়া বাড়ী ফিরিয়া স্বামীর বন্ধুকে দেখিতে পাইল। স্বামার বন্ধুর তাহাদের মত লেজ নাই দেখিয়া বিস্ময়ে তাহারা হাসিয়া উঠিল। কেননা সমুদ্রের বাসিন্দাদের সকলেরই লেজ আছে এবং লেজশূন্য কোনো লোক যে থাকিতে পারে তাহা ইহাদের ধারণাই হয় না।

সমুদ্রের মিতা স্ত্রীপুত্রদের ধমক দিতেই তাহারা চুপ করিয়া গেল। এমন সময় দশজন জোয়ান লোক আসিয়া খবর দিল যে, লেজহীন ডাঙার মানুষকে সুলতান দেখিতে চাহিয়াছেন। যদি না লইয়া যাও, তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইব।

তখন সমুদ্রের মিতা বলিল, "ভাই, রাজার হুকুম অমান্য করিতে পারি না। চল, বলিয়া কহিয়া তোমাকে ছাড়াইয়া আনিব। কোন ভয় নাই। ঈশ্বর করুণাময়। আমার বিশ্বাস, তুমি ডাঙার মানুষ বলিয়া তিনি তোমাকে সম্মানই করিবেন।"

মিতা বলিল, "তাহাই হউক। ঈশ্বর করুণাময়।"

সুলতান প্রথমটা তাহাকে লেজহীন বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সুলতানের পাশে যে সকল পাত্রমিত্র উপস্থিত ছিল, এই অদ্ভুত লাঙ্গুলহীন জীবটিকে দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল।

সমুদ্রের মিতা সুলতানকে কহিল, "ইনি আমার ডাঙার মিতা, ইঁহারা মাছ না ভাজিয়া বা সিদ্ধ না করিয়া খাইতে পারেন না, তাই এখানে ইঁহার বড় অসুবিধা হইতেছে। যদি সুলতান আদেশ দেন তাহা হইলে ইঁহাকে ডাঙায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে পারি।"

সুলতান তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাজ্যের হীরা মুক্তা যাহা সে চায় তাহা উপহার দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

তারপর বন্ধু তাহার হাতে একটি থলিয়া দিয়া বলিল, "মক্কা-মদীনায় গিয়া আমার নাম করিয়া এই অর্থ দান করিও বন্ধু।"

যাইতে যাইতে পথে তাহারা লোকজনদের নাচ গান করিতে দেখিয়া ডাঙার মিতা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে,ইহা বিবাহের উৎসব নয়, কে একজন মারা গিয়াছে বলিয়াই নাকি সেই উৎসব। সমুদ্রের মিতা যখন শুনিল যে, ডাঙায় কেহ মারা গেলে তাহারা উৎসব করে না, শোক প্রকাশ করে তখন সে তাহার থলিয়াটি ফেরত চাহিয়া লইল। এবং কহিল, "আজ হইতে আমাদের বিচ্ছেদ হইল, আর কখনও আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে না। ভগবান যাহা তোমার নিকট জমা রাখিয়াছেন, তাহার অভাবে তোমরা যখন শোক কর, তখন বুঝিতে হইবে তোমরা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাজ কর। সুতরাং বিদায় বন্ধু বিদায়!"

এই বলিয়া সে সমুদ্রে চলিয়া গেল।

বহুদিন বাদে জামাতাকে দেখিয়া সুলতান ও বেগম ভারী খুসী হইলেন। রাজ্যে উৎসব চলিল। আব্দাল্লা তাহার অভিজ্ঞতার কাহিনী সকলকে কহিল। তখন তাহার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।